চিরকালের সেরা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা–

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

It isn't cover
banglaboipdf.com

চিরকালের সেরা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি
দেবব্রত ঘোষ

শিশু সাহিত্য সংসদ

CHIROKALER SERA

BHIBHUTIBHUSHAN BANDYOPADHYAY

(Selected works of Bhibhutibhushan Bandyopadhyay)

ed. Taradas Bandyopadhyay

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক

দেবজ্যোতি দত্ত

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক

নটরাজ অফসেট

১৭৯/১বি, মানিকতলা মেন রোড

কলকাতা-৭০০ ০৫৪

প্রকাশকের কথা

বাংলা সাহিত্যের বরণীয় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বড়োদের জন্য গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনার পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও কলম ধরেছিলেন তিনি। সে সব রচনাও স্মরণীয় হয়ে আছে আমাদের শিশুসাহিত্যে। সেই সব রচনা নিয়েই ছোটোদের জন্য প্রকাশিত হল এই সংকলন।

এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই শ্রীদেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে। তিনি আমাদের সহায়তা করেছেন নানাভাবে। চিত্রা দেবের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁর একটি রচনা পুনর্মুদ্রণের সম্মতি দিয়েছেন তিনি। শিল্পী দেবব্রত ঘোষের ছবি অন্যমাত্রা যোগ করেছে এই সংকলনটিতে। এখন যাদের জন্য এই আয়োজন, তাদের ভালো লাগলেই আমরা খুশি।

দেবজ্যোতি দত্ত

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

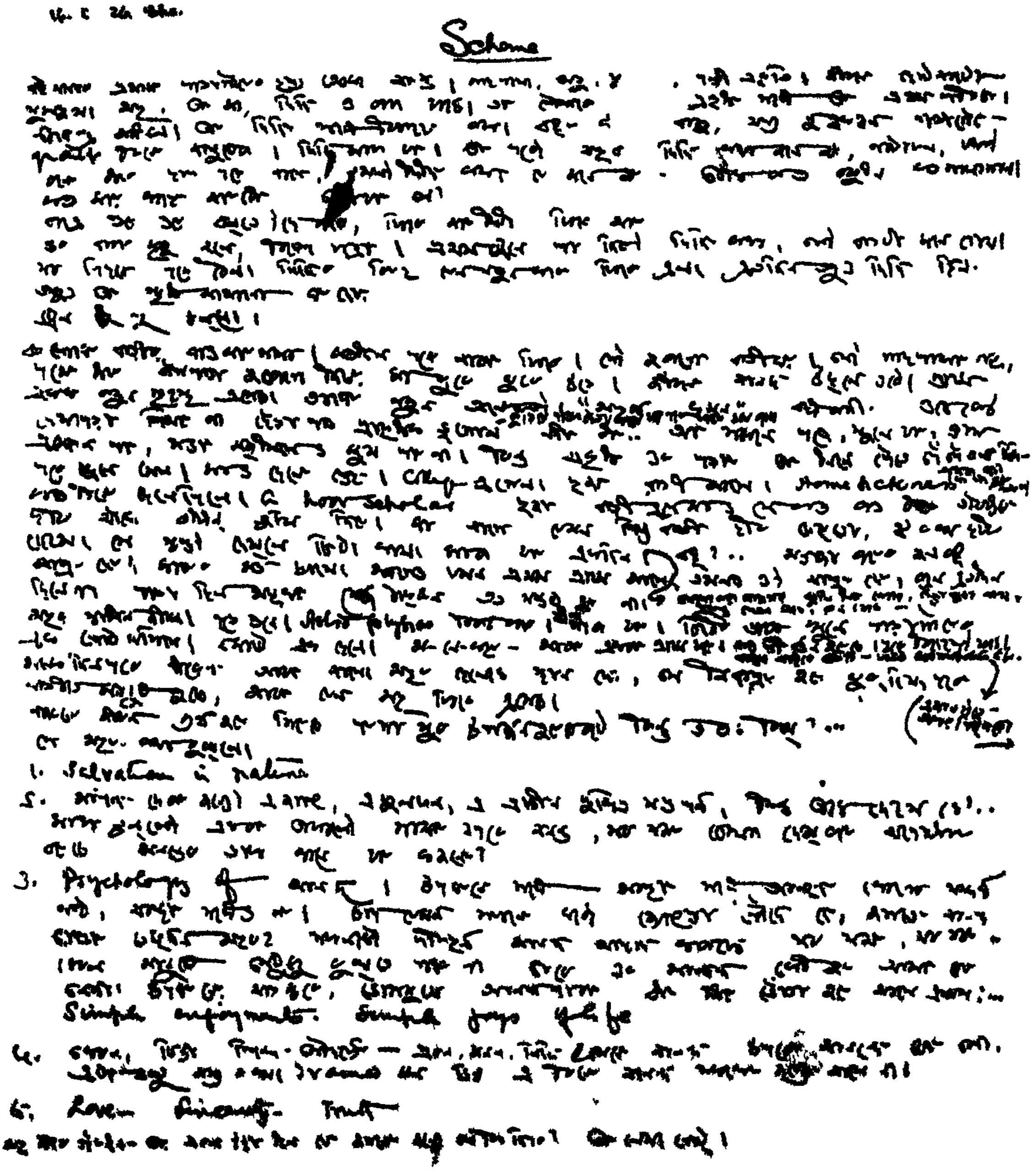

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের লেখার প্রতিলিপি

আমার লেখা

আমি কেমন করে লেখক হলাম, এ আমার জীবনের, আমার নিজের কাছেই, একটা অদ্ভুত ঘটনা। অবশ্য একথা ঠিক, নিজের জীবনের অতি তুচ্ছতম অভিজ্ঞতাও নিজের কাছে অতি অপূর্ব। তা যদি না হত, তবে লেখক জাতটারই সৃষ্টি হত না। নিজের অভিজ্ঞতাতে এরা মুগ্ধ হয়ে যায়—আকাশ প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে কত কল্পনাকে রচনা করছে যুগে যুগে—তারই তুলে কত শত শতাব্দী ধরে মানুষ নানা তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজের দিন কাটিয়ে চলেছে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, আশা-নৈরাশ্য, হর্ষ-বিবাদ, ঋতুর পরিবর্তন, বনপুষ্পের আবির্ভাব ও তিরোভাব--কত ছোটো-বড়ো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে—কে এসব দেখে, এসব দেখে মুগ্ধ হয়?

এক শ্রেণির মানুষ আছে যাদের চোখে কল্পনা সব সময়েই মোহ-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে রেখেছে। অতি সাধারণ পাখির অতি সাধারণ সুরও তাদের মনে আনন্দের ঢেউ তোলে, অস্তদিগন্তের রক্তমেঘস্তূপ স্বপ্ন জাগায়, আবার হয়তো তারা অতি দুঃখে ভেঙে পড়ে। এরাই হয় লেখক, কবি, সাহিত্যিক। এরা জীবনের সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। এক যুগের দুঃখ-বেদনা আশা-আনন্দ অন্য যুগে পৌঁছে দিয়ে যায়।

আমার জীবনের সেই অভিজ্ঞতা তাই চিরদিনই আমার কাছে অভিনব, অমূল্য, দুর্লভ হয়ে রইল। যে ঘটনা আমার জীবনের স্রোতকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে বাঁক ফিরিয়ে দিয়েছে—আমার জীবনের তার মূল্য অনেকখানি।

১৯২২ সাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ডায়মন্ডহারবার লাইনে একটা পল্লিগ্রামের হাইস্কুলে মাস্টারি চাকুরি নিয়ে গেলুম আষাঢ় মাসে।

বর্ষাকাল, নতুন জায়গায় গিয়েছি। অপরিচিতের মহলে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। বৈঠকখানা ঘরের সামনে ছোট্ট একটু ঢাকা বারান্দাতে একলা বসে সামনে সদর রাস্তার দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় একটি ষোলো-সতেরো বছর বয়েসের ছেলেকে একখানা বই হাতে যেতে দেখে তাকে ডাকলাম কাছে। আমার উদ্দেশ্য, তার হাতে কী, এই দেখব এবং যদি সম্ভব হয় পড়বার জন্যে চেয়ে নেব একদিনের জন্যে।

বইখানা দেখেছিলাম, একখানা উপন্যাস। তার কাছে চাইতে সে বললে, এ লাইব্রেরির বই, আজ ফেরত দেওয়ার দিন। আপনাকে তো দিতে পারছিনে, তবে লাইব্রেরি থেকে বই বদলে এনে দেব এখন।

—লাইব্রেরি আছে এখানে?

—বেশ ভালো লাইব্রেরি, অনেক বই। দু-আনা চাঁদা।

—আচ্ছা চাঁদা দেব, আমায় বই এনে দিয়ো।

ছোকরা চলে গেল এবং ফেরবার পথে আমাকে একখানা বই দিয়েও গেল। আমি তাকে বললাম, তোমার নামটি কী হে?

আট

সে বললে, আমার নাম পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, কিন্তু এ গ্রামে আমাকে সবাই বালক-কবি বলে জানে।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, বালক-কবি বলে কেন? কবিতা-টবিতা লেখ নাকি?

ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে বললে, লিখি বই কী। না লিখলে কি আমাকে বালক-কবি নাম দিয়েছে? আচ্ছা কাল এনে দেখাব আপনাকে।

পরদিন সে সকালবেলাতেই এসে হাজির হল। সঙ্গে একখানা ছাপানো গ্রাম্য মাসিক পত্রিকা গোছের। আমাকে দেখিয়ে বললে, এই দেখুন, এই কাগজখানা আমাদের গাঁ থেকে বেরোয়। এর নাম 'বিশ্ব'। এই দেখুন প্রথমেই 'মানুষ' বলে কবিতাটি আমার। এই আমার নাম ছাপার অক্ষরে লেখা আছে কবিতার ওপরে—বলেই ছোকরা সগর্বে কাগজখানা আমার নাকের কাছে ধবে নিজের নামটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। হ্যাঁ সত্যিই—লেখা আছে বটে, কবি পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী। তাহলে তো নিতান্ত মিথ্যা বলেনি দেখছি।

কবিতাটি সে-ই আমায় পড়ে শোনালে। বিশ্বের মধ্যে মানুষের স্থান খুব বড়ো—ইত্যাদি কথা নানা ছাঁদে তার মধ্যে বলা হয়েছে।

অবশ্য কাগজখানা দেখে আমার খুব ভক্তি হল না। স্টেশনের কাছে একটা ছোটো প্রেস আছে এখানে, সেই প্রেসেই ছাপানো—অতি পাতলা জিলজিলে কাগজ। পত্রিকাখানিকে 'মাসিক' 'পাক্ষিক' ইত্যাদি না বলে 'ঐকিক' বললেই এর স্বরূপ ঠিক বোঝানো হয়। অর্থাৎ যে শ্রেণির পত্রিকা গ্রামের উৎসাহী লেখা-বাতিকগ্রস্ত ছেলে-ছোকরার দল চাঁদা তুলে একটিবার মাত্র বার করে, কিন্তু পরের বারে উৎসাহ মন্দীভূত হওয়ার দরুন আশানুরূপ চাঁদা না ওঠাতে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়—এ সেই শ্রেণির পত্রিকা।

তবু আমার ঈর্ষা না হয়ে পারল না। আমি লিখি না বা লেখার কথা কখনো চিন্তাও করি না। অথচ এতটুকু ছেলে—এর নাম দিব্যি ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেল। এর ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হল, মনে ভাবলাম, বেশ ছোকরা তো! অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে কেমন কবিতা লিখেছে! সাহিত্যের সমঝদারিত্ব তার মধ্যে ছিল তা আমি জানি। তখনকার আমলের একজন বিশেষ লেখকের বই না থাকলে পল্লিগ্রামের কোনো লাইব্রেরি চলত না। সেই লেখকের এক-একখানা বইয়ের তিন-চার কপি পর্যন্ত রাখতে হত কোনো কোনো বড়ো লাইব্রেরিতে।

ছেলেটি বলত, ওসব ট্র্যাশ-ট্র্যাশ! দেখবেন ওসব টিকবে না।

এক-একদিন পাঁচুগোপাল আমাকে নিয়ে গ্রামের মাঠে বেড়াতে যেত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চোখও তার বেশ ছিল—মাঝে মাঝে মুখে মুখে কবিতা তৈরি করে আমাকে শোনাত। অনেকগুলো কবিতা হলে পর একটা কবিতার বই ছাপাবে এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করত। সেই সময় কলকাতার কোনো 'পাবলিশিং হাউস' ছয়-আনা গ্রন্থাবলি প্রকাশ শুরু করে দিল—তার প্রথম বই লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বইখানি স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে পাঁচুগোপাল আমায় এনে দিয়ে বললে, এ বই নিতে ভিড় নেই। নতুন এসেছে, এক-আধজন নিয়েছিল, কাল ফেরত দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখুনগে যান অমুকের বইয়ের জন্যে কী যে মারামারি। ডিটেকটিভ উপন্যাস না রাখলে লাইব্রেরি উঠে যাবে। কেউ চাঁদা দেবে না। পরের মাসে আর একখানি বই বেরোল। সেখানা আমার কাছে নিয়ে এসে সে বলল, আমি একটা কথা ভাবছি, আসুন আপনাতে আমাতে এইরকম উপন্যাস সিরিজ বের করা যাক। খুব বিক্রি হবে, আর একটা নামও থেকে যাবে। আপনি যদি ভরসা দেন, আমি উঠে-পড়ে লাগি। আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম, তুমি আর আমি

দুজনে মিলে বইয়ের কারবার করব, এ কখনো সম্ভব? এ ব্যবসার আমরা কীই বা জানি? তা ছাড়া, বই লিখবেই বা কে? এতে লেখকদের পারিশ্রমিক দিতে হবে, সে পয়সাই বা দেবে কে?

সে হেসে বললে, বাঃ তা কেন, বই লিখবেন আপনি, আমিও দু-একখানা লিখব। পরকে টাকা দিতে যাব কেন?

বাংলা সাহিত্যকে ভালোবাসতাম বটে, কিন্তু নিজে কলম ধরে বই লিখব এ ছিল সম্পূর্ণ দুরাশা আমার কাছে। অবিশ্যি পাঠ্যাবস্থায় অন্য অনেক ছাত্রের মতো কলেজ ম্যাগাজিনে দু-একটা প্রবন্ধ, এক-আধটা কবিতা যে না লিখেছি তা নয়, বা প্রতিবেশীর অনুরোধে, বিবাহের প্রীতি-উপহারে কবিতা যে দু-পাঁচটা না লিখেছিলাম তাও নয়—কিন্তু সে কে না লিখে থাকে?

সুতরাং আমি তাকে বললাম, লেখা কি ছেলেখেলা হে, যে কলম নিয়ে বসলেই হল? ওসব খামখেয়ালি ছাড়ো। আমি কখনো লিখিনি, লিখতে পারবও না। তুমি হয়তো পারবে—আমার দ্বারা ওসব হবে না।

সে বললে, খুব হবে। আপনি যখন বি.এ. পাস, তখন আপনার কাছে এমন কিছু কঠিন হবে না। একটু চেষ্টা করুন তাহলেই হয়ে যাবে। তখন বয়েস অল্প, বুদ্ধিসুদ্ধি পাকেনি, তবুও আমার মনে হল, বি.এ. পাস তো অনেকেই করে, তাদের মধ্যে সকলেই লেখক হয় না কেন? অথচ বি.এ. পাস করা লোকদের ওপর পাঁচুগোপালের এই অহেতুক শ্রদ্ধা ভেঙে দিতেও মন চাইল না। এ নিয়ে কোনো তর্ক আমি আর তার সঙ্গে করিনি। কিন্তু করলেই ভালো হত, কারণ এর ফল হয়ে দাঁড়াল বিপরীত। দিন দশেক পরে একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি সেখানে নোটিশ-বোর্ডে, দেওয়ালের গায়ে, নারকেল গাছের গুঁড়িতে সর্বত্র ছাপানো কাগজ টাঙানো—তাতে লেখা আছে—বাহির হইল! বাহির হইল!! বাহির হইল!!! এক টাকা মূল্যের গ্রন্থমালার প্রথম উপন্যাস।

লেখকের নামের স্থানে আমাব নাম দেখলাম।

আমার তো চক্ষুস্থির। এ নিশ্চয় সেই পাঁচুগোপালেব কীর্তি। এমন ছেলেমানুষি সে করে বসবে জানলে কি তার সঙ্গে মিশি! বিপদের ওপর বিপদ, স্কুলে ঢুকতেই শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দ সবাই জিজ্ঞেস করে, আপনি লেখক তা তো এতদিন জানতাম না মশাই? বেশ বেশ! তা বইখানা কি বেরিয়েছে নাকি? আমাদের একবার দেখিয়ে যাবেন। হেডমাস্টার ডেকে বললেন, তাঁর স্কুল লাইব্রেরিতে একখানা বই দিতে হবে। সকলের নানারূপ সকৌতূহল প্রশ্ন এড়িয়ে চলি সারাদিন—কবে থেকে আমি লিখছি, আর আর কী বই আছে, ইত্যাদি। স্কুলের ছুটির পরে বাইরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

তাকে খুঁজে বার করলাম বাসায় এসে। দস্তুরমতো তিরস্কার করলাম তাকে, এ তার কী কাণ্ড! কথার কথা একবার একটা হয়েছিল বলে একেবারে নাম ছাপিয়ে এরকমভাবে বার করে, লোকে কী ভাববে!

সে নির্বাক হয়ে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে, তাতে কী হয়েছে? আপনি তো একরকম রাজিই হয়েছেন লিখতে। লিখুন না কেন!

আমি বললাম, বেশ ছেলে বটে তুমি! কোথায় কী তার ঠিক নেই, তুমি নাম ছাপিয়ে দিলে কী বলে, আর দিলে দিলে একেবারে স্কুলের দেওয়ালে, নোটিশ-বোর্ডে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছ, এ কেমন কাণ্ড? নামই বা পেলে কোথায়? কে তোমাকে বলেছিল ও নামে আমি কিছু কিছু লিখেছি বা লিখব?

যাক—পাঁচুগোপাল তো চলে গেল হাসতে হাসতে। এদিকে প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে সকলের প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হল—বই বেরোচ্ছে কবে? কত দেরি আছে আর বই বেরোবার?—মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। সে যা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে তার আর চারা নেই। আমি এখন নিজের মান বজায় রাখি কেমন করে? লোকের অত্যাচারের চোটে তো অস্থির হয়ে পড়তে হয়েছে।

সাতপাঁচ ভেবে একদিন স্থির করলাম—এক কাজ করা যাক। সে এক টাকা সিরিজের বই কোনোদিনই বের করতে পারবে না। ওর টাকা কোথায় যে বই ছাপাবে? বরং আমি একখানা খাতায় যা হয় একটা কিছু লিখে রাখি—লোকে যদি চায়, খাতাখানা দেখিয়ে বলা যাবে, আমার তো লেখাই রয়েছে, ছাপা না হলে আমি কী করব। কিন্তু লিখি কী? জীবনে কখনো গল্প লিখিনি, কী করে লিখতে হয় তাও জানা নেই। কীভাবে প্লট জোগাড় করে, কী কৌশলে তা থেকে গল্প ফাঁদে—কে বলে দেবে? প্লটই বা পাই কোথায়? আকাশ-পাতাল ভাবি প্রতিদিন, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনে। গল্প লেখার চেষ্টা কোনোদিন করিনি। পাঠ্যাবস্থায় সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনে সাধ হত, লেখক হতে পারি আর না পারি, একজন বড়ো বক্তা হতে হবেই।

কিন্তু লেখক হবার কোনো আগ্রহই কোনোদিন ছিল না, সে চেষ্টাও করিনি। কাজেই প্রথমে মুশকিলে পড়ে গেলাম। সাতপাঁচ ভেবে প্লট সংগ্রহ আর করতে পারি না কিছুতেই। মন তখন বিশ্লেষণমুখী অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পায়নি। সবকিছুতেই সন্দেহ সব কিছুতেই ভয়।

অবশেষে একদিন এক ঘটনা থেকে মনে একটা ছোটো গল্পের উপাদান দানা বাঁধল। সেই পল্লিগ্রামের একটি ছায়াবহুল নিভৃত পথ দিয়ে শরতের পরিপূর্ণ আলো ও অজস্র বিহঙ্গকাকলীর মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যাই, আর একটি গ্রাম্য বধূকে দেখি পথিপার্শ্বের একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে কলসি কক্ষে প্রতিদিন স্নান করে ফেরেন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়—কিন্তু দেখা ওই পর্যন্ত। তাঁর পরিচয় আমার অজ্ঞাত এবং বোধ হয় অজ্ঞাত বলেই একটি রহস্যময়ী মূর্তিতে তিনি আমার মানসপটে একটা সাময়িক রেখা অঙ্কিত করেছিলেন। মনে মনে ভাবলাম এই প্রতিদিনের দেখা অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত বধূটিকে কেন্দ্র করে একটি গল্প আরম্ভ করা যাক তো, কী হয় দেখি! গল্প শেষ করে সেই গ্রামের দু-একজনকে পড়ে শোনালাম—পাঁচুকেও। কেউ বলে ভালো হয়েছে, কেউ বললে মন্দ হয়নি। আমার একটি বন্ধুকে কলকাতা থেকে নিমন্ত্রণ করে গল্পটি শুনিয়ে দিলাম। সেও বললে ভালো হয়েছে। আমি তখন একেবারে কাঁচা লেখক; নিজের ক্ষমতার ওপর কোনো বিশ্বাস আদৌ জন্মায়নি। যে আত্মপ্রত্যয় লেখকের একটি বড়ো পুঁজি, আমি তখন তা থেকে বহু দূরে, সুতরাং অপরের মতামতের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে উপায় কী। আমার কলকাতার বন্ধুটির সমঝদারিত্বের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল—তার মত শুনে খুশি হলাম।

পাড়াগাঁয়ে স্কুলমাস্টারি করি। কলকাতার কোনো সাহিত্যিক বা পত্রিকা-সম্পাদককেই চিনি না—সুতরাং লেখা ছাপানো সম্বন্ধে আমায় একপ্রকার হতাশ হতে হল। এইভাবে পূজার অবকাশ এসে গেল, ছুটিতে দেশে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম। পুনরায় ফিরে এসে কাগজপত্রের মধ্যে থেকে আমার সেই লেখাটি একদিন বার করে ভাবলাম, আজ এটি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

ঘুরতে ঘুরতে একটা পত্রিকা আপিসের সামনে এসে পড়া গেল। আমার মতো অজ্ঞাত অখ্যাত নতুন লেখকের রচনা তারা ছাপবে এ দুরাশা আমার ছিল না, তবু সাহস করে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। দেখা যাক

না কী হয়, কেউ খেয়ে তো ফেলবে না, না হয় লেখা না-ই ছাপবে। ঘরে ঢুকেই একটি ছোটো টেবিলের সামনে যাঁকে কর্মরত দেখলাম, তাঁকে নমস্কার করে ভয়ে ভয়ে বলি, একটা লেখা এনেছিলাম—ভদ্রলোক মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আর কোথাও আপনার লেখা কি বেরিয়েছিল? আচ্ছা রেখে যান, মনোনীত না হলে ফেরত যাবে। ঠিকানাটা রেখে যাবেন।

লেখা দিয়ে এসে স্কুলের সহকর্মী ও গ্রামের আলাপী বন্ধুদের বলি, লেখাটা নিয়ে বলেছে শিগগির ছাপবে। চুপিচুপি ডাকঘরে গিয়ে বলে এলাম, আমার নামে যদি বুকপোস্ট গোছের কিছু আসে, তবে আমাকে স্কুলে বিলি যেন না করা হয়। কারণ লেখা ফেরত এসেছে এটা তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে সহকর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে। দিন গুনি, একদিন সত্যিই ডাকপিওন স্কুলে আমায় বললে, আপনার নামে একটা বুকপোস্ট এসেছে, কিন্তু গিয়ে নিয়ে আসবেন। আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নবজাত রচনার প্রতি অপরিসীম দরদ যাঁরা অনুভব করেছেন তাঁরা বুঝবেন আমার দুঃখ। এতদিনের আকাশকুসুম চয়ন তবে ব্যর্থ হল, লেখা ফেরত দিয়েছে!

কিন্তু পরদিন ডাকঘর থেকে বুকপোস্ট নিয়ে দেখি যে, আমার রচনাই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের একটি চিঠি। তাতে লেখা আছে, রচনাটি তাঁরা মনোনীত করেছেন, তবে সামান্য একটু-আধটু অদল-বদলের জন্যে ফেরত পাঠানো হল, সেটুকু করে আমি যেন লেখাটি তাঁদের ফেরত পাঠাই, সামনের মাসে ওটা ছাপা হবে।

অপূর্ব আনন্দ আর দিগ্বিজয়ীর গর্ব নিয়ে ডাকঘর থেকে ফিরি। সগর্বে নিয়ে গিয়ে চিঠিখানা দেখাতেই সবাই বললেন, কারুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে বুঝি ওখানে?—আজকাল আলাপ না থাকলে কিছু হবার জো-টি নেই। সব খোশামোদ, জানেনই তো। তাঁদের আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না, যাঁর হাতে লেখা দিয়ে এসেছিলাম, তাঁর নাম পর্যন্ত আমার জানা নেই! তারপর সে গ্রামের এমন কোনো—লোক রইল না, যে আমার চিঠিখানা একবার দেখলে। কারো সঙ্গে দেখা হয়ে পথে তাকে আটকাই এবং সম্পূর্ণ অকারণে চিঠিখানা আমার পকেট থেকে বেরিয়ে আসে এবং বিপন্ন মুখে তাকে বলি, তাই তো, ওরা আবার একখানা চিঠি দিয়েছে, একটা লেখা চায়—সময়ই বা তেমন কই! হায়! সেসব লেখকজীবনের প্রথম দিনগুলি! সে আনন্দ, সে উৎসাহ, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার বিস্ময় আজও স্মরণে আছে, ভুলিনি। নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে যে গৌরব এবং আত্মপ্রসাদ নিহিত, লেখকজীবনের বড়ো পুরস্কার সবচেয়ে তাই-ই। স্বচ্ছ সরল ভাবানুভূতির যে বাণীরূপ কবি ও কথাশিল্পী তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে যান—তা সার্থক হয় তখনই, যখন পাঠক সেই ভাব নিজের মধ্যে অনুভব করেন। এইজন্য লেখক ও পাঠকের সহানুভূতি ভিন্ন কখনো কোনো রচনাই সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

বালক-কবির নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সে-ই একরকম জোর করে আমাকে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

পাঁচুগোপালের সঙ্গে মাঝে দেখা হয়েছিল। সে এখন চব্বিশ পরগনার কাছে কী একটা গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালায় হেডমাস্টার। এখনও সে কবিতা লেখে।

জুন ১৯৪৪ — *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*

বিভূতিভূষণের কিশোরসাহিত্য

বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রচলিত ধারায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান নির্ণয় করা ভারী শক্ত। আমার ছেলেবেলায় 'রাজর্ষি' ও 'রামের সুমতি'র সঙ্গে আর একটিমাত্র বই পড়বার অনুমতি পেয়েছিলাম মায়ের কাছে, সে বইটি হল 'পথের পাঁচালী'। দীর্ঘদিন আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল 'পথের পাঁচালী' শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত, তার আবার শিশুপাঠ্য সংস্করণ হয় কী করে? পরে জেনেছি বয়স্ক ও শিশু পাঠকদের সাহিত্যের আঙিনায় লক্ষ্মণের যে গণ্ডিটি টানা হয়েছে বিভূতিভূষণ বেশিরভাগ সময়েই তা মনে রাখেননি। কেন না তাঁর শিল্পীসত্তার মধ্যে সবসময় লুকিয়ে ছিল একটি কিশোর মন। তিনি ছোটোদের সঙ্গে একেবারে তাদের সমবয়সি হয়ে মিশতে পারতেন এবং তাঁর মধ্যে আরোপিত ছেলেমানুষি মোটেই থাকত না। সেইজন্য কিশোর পাঠকদের মনের খুব কাছাকাছি পৌঁছোতে তাঁর একটুও অসুবিধে হয়নি, নয়তো তাঁর কিশোর পাঠ্য রচনার পরিমাণ যেমন বেশি নয় তেমনই তাদের শুধুমাত্র শিশুসাহিত্যের মলাটবন্দি করাও সঙ্গত মনে হয় না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বিভূতিভূষণ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছেন তখন বাংলা শিশুসাহিত্যের শৈশব পেরিয়ে গিয়েছে, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার, সুনির্মল বসু অর্থাৎ শিশুসাহিত্যের দিকপাল লেখকরা সকলেই এসে গিয়েছেন এবং তাঁদের রচনার সঙ্গে বাঙালি শিশু ও কিশোরদের পরিচয় ঘটেছে। তবুও বিভূতিভূষণ কিশোরচিত্তে নিজের জন্য একটি স্থায়ী আসন করে নিলেন 'চাঁদের পাহাড়' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি শিশুসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। শিশুর মনে কৌতূহল বেশি, কল্পনাও। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে বাস্তব মোড়কে পুরে দেখার বাসনা তীব্র হয় এবং সেটি আর এক ধরনের কল্পনা। পরির দেশ কিংবা দৈত্য-দানব-রাক্ষস-খোক্কস শিশুদের যতটা মুগ্ধ করে কিশোর মনকে ততটা লুব্ধ করে না, তারা ভালোবাসে অজানা ভৌতিক-ভয়াল পরিবেশ এবং অচেনাদেশে গিয়ে ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হবার গল্প শুনতে। 'চাঁদের পাহাড়' ঠিক সেই প্রত্যাশাই পূর্ণ করে। এ উপন্যাসের নায়ক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় যুবক। তার তরুণ তাজা মন পাটকলের বাবু হবার কথা ভাবতেই পারে না—রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাকরাগাড়ি টানতে যাবে? কখনোই নয়। অতএব শুরু হয় আফ্রিকার চাঁদের পাহাড়ের গল্প। লীলা মজুমদার লিখেছেন, 'চাঁদের পাহাড়ের নামটিও মন গড়া নয়, সত্যিকার আফ্রিকার সত্যিকার পাহাড়ের স্থানীয় নামের অনুবাদ মাত্র।' অথচ উপন্যাসটির অনুবাদ কিন্তু বিদেশি ছায়ায় লেখা হয়নি। ছোটোদের জন্য নিছক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লেখার সময়েও বিভূতিভূষণের সত্যনিষ্ঠা অভূতপূর্ব। আফ্রিকা যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, বিচিত্র জগতের জন্য উপাদান সংগ্রহের সময় তাঁর সে বাসনা তীব্র হয়। আফ্রিকা ভ্রমণকারীদের রচনা অত্যন্ত খুঁটিয়ে পড়ে তিনি 'চাঁদের পাহাড়' রচনায় হাত দেন এমনকী ডিঙ্গোনেক বা বুনিপের কথাও সংগ্রহ করেছিলেন জুলুল্যান্ডের আরণ্য অঞ্চলের প্রচলিত প্রবাদ থেকে।

এই আহরণ শুধু কিশোরমনের উপযোগী করে নয়, কিশোরমনের ঔৎসুক্য নিয়েও। তাঁর আফ্রিকা ভ্রমণের বাসনার কথা 'ঊর্মিমুখর' দিনলিপিতেও রয়েছে, 'বাইরে কোথাও ভ্রমণের পিপাসা আবার জেগে উঠেছে। ভাবছি আফ্রিকা যাব, শম্ভু আজ এসেছিল, সে বললে, তার কে একজন আত্মীয় মাকিনন ম্যাকেঞ্জির আপিসে কাজ করে, তারই সাহায্যে যদি কিছু হয়...জগতের খানিকটা অন্তত দেখতে চাই।' শেষ পর্যন্ত বিভূতিভূষণের যাওয়া হয়নি, শংকরের হয়েছিল. চাঁদের পাহাড়ের নায়ক শংকরের সঙ্গে লেখকের মানস-ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়েছিল বলেই 'চাঁদের পাহাড়' এত বাস্তব, পড়তে পড়তে চীনে প্রবাদটির সত্যতা অনুভব করতে কিশোর পাঠকদের একটুও কষ্ট হয় না, যেন লেখকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তারাও উচ্চারণ করে, 'ছাদের আল্‌সের দিব্যি চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফটিক প্রস্তর হয়ে ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়া ভালো।'

বিভূতিভূষণ কোথাও তাঁর কিশোর পাঠকদের ফাঁকি দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেননি অথচ এই ছেলে ভোলানো ব্যাপারটি আমাদের শিশুসাহিত্যে অত্যন্ত বেশি। শিশুসাহিত্য রচনা করা খুবই কঠিন সে অর্থেও। শিশুর মন ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড়োদের লিখতে হয়। তা কি সত্যিই সম্ভব? যদি না সেই বয়স্ক ব্যক্তির অবচেতনায় লুকিয়ে থাকে একটি কিশোরমন। ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের চেয়েও শিশুপাঠ্য কবিতা লিখে যোগীন্দ্রনাথ সরকার কি সুকুমার রায় অনেক বেশি শিশুমনের কাছে আসতে পেরেছেন, অবনীন্দ্রনাথ কি উপেন্দ্রকিশোরের গদ্যরচনা সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে; বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'ও তাই। কিন্তু একই সঙ্গে বিভূতিভূষণ অন্যদের চেয়ে কিছুটা আলাদা। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনা যেমন ছোটো-বড়ো সকলেরই মন ছুঁয়ে যায় বিভূতিভূষণের রচনাতেও সেই আবেদন রয়েছে। 'মৌচাকে'র জন্য লিখলেও বিভূতিভূষণ জানতেন, 'মৌচাক' শুধু ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের আনন্দবর্ধন করে না। তাদের পিতা-মাতারও অবসর বিনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করে, অবশ্য বড়োদের পাঠক হিসেবে পাবেন বলেই তিনি তথ্য সংগ্রহে সচেতন তা নয়, গোপাল হালদার যে বলেছেন, বিভূতিভূষণের 'জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিস্ময়দৃষ্টি, কতকটা তা কবিসুলভ, কতকটা শিশুসুলভ কিন্তু সততায় সুস্থির' সেকথা তাঁর রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলি পড়লেই বোঝা যায়। বিপদসংকুল আফ্রিকায় সিংহের উপদ্রব, গা ছমছমকরা অন্ধকার গুহা, ভয়ংকর মরুভূমি এবং গহন অরণ্য বাঙালি কিশোরদের কাছে এমন নিবিড়রূপে ধরা দেয়নি। বাংলায় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সূত্রপাত হয়েছিল 'সখা' পত্রিকায় একশো বছরেরও আগে কিন্তু প্রকৃত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি বাংলা শিশুসাহিত্যে কমই আছে। হেমেন্দ্রকুমার রায় আমাদের সঙ্গে সে পরিচয় ঘটালেন। সেই ধারাকেই পুষ্ট করেছেন বিভূতিভূষণ। তবে গোয়েন্দা গল্প রচনায় অনেক বেশি কৃতিত্ব হেমেন্দ্রকুমারের, ভ্রমণসংক্রান্ত অ্যাডভেঞ্চারে বিভূতিভূষণের। একথা শুধু 'চাঁদের পাহাড়' পড়েই বলছি না, 'হীরামানিক জ্বলে' সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। শংকর ও সুশীলের মতো দুঃসাহসিক অভিযান বাঙালি কিশোরদের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা, বিভূতিভূষণ তাদের শুনিয়েছেন সাফল্যের মন্ত্রগুপ্তি 'লক্ষ্মী যান না কাপুরুষের কাছে, অলসের কাছে—তাদের তিনি কৃপা করেন যারা বিপদকে, বিলাসকে, আরামপ্রিয়তাকে তুচ্ছ বোধ করে।' অথচ যাবতীয় গুপ্তধন নিয়ে ফিরে আসেনি তাঁর উপন্যাসের নায়কেরা, তারা লোভী নয়, সাহসী, দু-হাত ভরে ধন নয়, নিয়ে আসে অনেকখানি অভিজ্ঞতা, খোঁজ পায় গভীর জীবন রহস্যের। ছেলেমেয়েদের জন্য বই লেখার অন্যতম শর্ত যে, শিক্ষা দেওয়া—বিভূতিভূষণের উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'মরণের ডঙ্কা বাজে' ঠিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি নয়, দুটি ভাগ্যান্বেষী যুবক জড়িয়ে পড়েছে চীন-জাপান যুদ্ধের সঙ্গে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি কিন্তু বাঙালি চিত্তে যুদ্ধ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। এই যুদ্ধ আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। যুদ্ধের ভয়াবহ সর্বনাশা রূপ তিনি যে কতখানি উপলব্ধি করেছিলেন তার পরিচয় মেলে এই কিশোরপাঠ্য উপন্যাসে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাংলার কিশোরসাহিত্যে গ্রন্থটি বিশেষ ছায়াপাত করেনি অথচ বাংলায় এ জাতীয় উপন্যাসের সূচনা হল তাঁরই হাতে। যুদ্ধের বর্ণনাকে তিনি বিশ্বাস্য করে তুলেছিলেন; অমিয়া চৌধুরানি তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, যুদ্ধবিমানগুলির নাম জানার জন্য বিভূতিভূষণ বন্ধুর বালকপুত্রের দ্বারস্থ হতেও দ্বিধা করেননি, ...'সেই গল্পের বইয়ে বিমানযুদ্ধের বর্ণনা দেবার সংকল্প করে একদিন আমাদের বাড়ি এসে হাজির হলেন। এসেই আমার বড়ো ছেলেকে ডেকে বললেন, ওরে ভোঁদো, কোথায় তুই? শিগ্‌গিব আয় বাবা। কতগুলি 'বমার'-এর নাম আমায় বলে দে। যুদ্ধের সময় যেসব বমার ইত্যাদি ব্যবহার হত ছেলেরা তাদের বাবার কাছ থেকে সব ছবি দেখে তাদের নাম খুব রপ্ত করেছিল, সেটা উনি জানতেন।' শুধু কি তাই? বিভূতিভূষণ হয়তো আরও জানতে চেয়েছিলেন, বাঙালি শিশু যুদ্ধবিমান সম্বন্ধে কতটা ওয়াকিবহাল। বিদেশে নানা বয়সের শিশু কতগুলি বস্তু ও শব্দের সঙ্গে পরিচিত তার গড় হিসাব রাখা হয়। যখন কোনো লেখক শিশুপাঠ্য বই লেখেন তখন তিনি সহজেই জেনে নিতে পারেন একটি পাঁচ বছরের শিশু কটি কথা বোঝে কিংবা একটি বারো বছরের বালকের পক্ষে কতগুলি শব্দের যথার্থ অনুধাবন করা সম্ভব। আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা অকল্পনীয়। বয়স্ক লেখককে অনুমান করে নিতে হয় শিশু ও কিশোর কতগুলি বস্তু চেনে এবং কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ বুঝতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ অনেকগুলি শব্দ গড়ে নিয়েছিলেন যেমন, ইশচে, বেরতো, ছ্রাবণ, সৈষ্ঠব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গল্পকথনের মৌখিক আমেজ নিয়ে আসার জন্য কিন্তু শিশুমহলে তাঁর এসব শব্দ প্রিয় হয়নি। শিশু গল্পে লাগামছাড়া কল্পনার রূপ দেখতে চায়, নিজের উচ্চারণের বিকৃতি নয়, তাই বড়োদেব একই সঙ্গে হতে হয় ছাত্র ও শিক্ষক, জিজ্ঞাসু ও উত্তরদাতা; সুখের বিষয়, বিভূতিভূষণ তাই ছিলেন। তবে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু করেননি, স্বতঃস্ফূর্ত শৈশব নিজেই এসেছে তাঁর রচনায়। তার ফলে তিনি যখনই যা লিখেছেন শিশু না হোক কিশোর পাঠক তার রসগ্রহণ করতে পেরেছে। তারা শুধু অপু ও দুর্গার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে তা নয়, 'তালনবমী'র গোপালের সহমর্মী হতে পেরেছে তা নয়—শংকর, সুরেশ্বর, বিমল, সুশীল, সনৎদের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে। বিভূতিভূষণের উপন্যাসের এই প্রধান চরিত্রগুলো শিশু বা কিশোর নয় কিন্তু তাদের উৎসুক কিশোর মনটি ছোটোদের প্রিয়। আসলে বিভূতিভূষণ শিশুসাহিত্য রচনার সময় পাঠকের সমভূমিতে নেমে আসতে পারতেন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, বিভূতিভূষণ ছোটোদের জন্য কমই লিখেছিলেন, সাকুল্যে চারটি উপন্যাস ও 'তালনবমী'তে সংকলিত দশটি গল্প। অথচ তাঁর প্রকাশিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা—পনেরো-ষোলোটির কম নয়। কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে লেখকের মৃত্যুর পরে, তবে প্রকাশকের নির্বাচনকে তো অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য বিভূতি-সাহিত্যে কিশোরপাঠ্য রচনার সূচনা 'চাঁদের পাহাড়' থেকে। পরে 'পথের পাঁচালী'র কিশোর সংস্করণ দুটি প্রকাশিত হয়। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, 'পথের পাঁচালী' ছাড়াও বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, 'দৃষ্টি প্রদীপ' ছাড়াও 'আরণ্যকে'র তিনটি কিশোর সংস্করণ হয়েছে—'ছেলেদের আরণ্যক', 'আরণ্যক' ও 'লবটুলিয়ার কাহিনী'।

আজকাল আর বড়োদের বইয়ের কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত হয় না কিন্তু বিভূতিভূষণের বইগুলির খোঁজ মেলে। যদিও বয়স্কপাঠ্য গ্রন্থকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও কোনো কোনো অংশ বর্জন করলেই কি তা শিশুসাহিত্য হয়? প্রমথ চৌধুরী ভাষা প্রসঙ্গে একবার যে বলেছিলেন, 'বানরের লেজ কাটিলেই কি মানুষ হয়' এও কতকটা সেই ধরনের ব্যাপার। হয়তো সেজন্যই এখন আর শিশুপাঠ্য সংস্করণ চোখে পড়ে না। কিন্তু বিভূতি-সাহিত্যের জাতই আলাদা, আমার তো মনে হয়, 'পথের পাঁচালী' কি 'আরণ্যকে'র কিশোর সংস্করণ না হলেও সেগুলি যেমন কিশোরপাঠ্য হিসাবে গণ্য হতে পারে তেমনই 'বনে পাহাড়ে' ধারাবাহিকভাবে শিশুপাঠ্য মৌচাকে প্রকাশিত হলেও ভ্রমণ-দিনলিপি বলে বড়োদের পাঠ্য হয়েছে। তাঁর ছোটোগল্পগুলি সম্বন্ধে একথা আরও বেশি প্রযোজ্য এবং পাঠকদের বয়সের সীমাও সেখানে ধরা পড়ে না। আগে উপন্যাসের প্রসঙ্গ শেষ করি।

বিভূতিভূষণের একটিমাত্র গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছিলেন 'মিস্‌মিদের কবচ'। নতুনত্ব থাকলেও এ যেন বিভূতিভূষণের নিজস্ব ক্ষেত্র নয়। প্রাকৃতিক রহস্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল, দুর্দম প্রকৃতির বাধা-বিপদ তাঁকে হাতছানি দিয়েছে, লোভ নয়, তাই গোয়েন্দা কাহিনির রহস্য ছাপিয়ে মিস্‌মিদের কবচের রহস্য এ গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন নয়, তাঁর লক্ষ্য কবচের অলৌকিক ভূমিকার প্রতি, যে কবচ পরে মিস্‌মিরা যুদ্ধে যেত সেটি ধারণ করলে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলি মাথা তোলে, সেটি হাতে পরেই জানকীবাবু এক ভদ্র ব্যবসায়ী থেকে খুনিতে পরিণত হলেন। অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতি বিভূতিভূষণের আকর্ষণ ছিল এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, এমনকী 'চাঁদের পাহাড়' বা 'হীরা মানিক জ্বলে'-তেও যেন রহস্যময় অলৌকিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত ধরে এসেছে। মানুষ নয় ভয়ংকর প্রকৃতিই যেন তার ভয়াল গ্রাসে মানুষকে পিষ্ট করতে চেয়েছে। একমাত্র 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসে প্রকৃতি নয়, মানুষ-বিশেষ করে যুদ্ধই—মানুষের শত্রু। উপন্যাসটির মানবিক আবেদন তীব্র, চীনে দুটি ভারতীয় ও কয়েকজন আমেরিকান যুবক-যুবতী এসেছে চীনাদের সেবার কাজ নিয়ে, বিমলের সঙ্গে এলিসের খুব ভাব হয়ে গেলেও তারা নিজেদের কর্তব্য ভোলে না। সত্যি কথা বলতে কি এ উপন্যাসে গড়ে তোলা কাহিনিই নেই, ছেলেদের উপন্যাসে যা বিরল ঘটনা।

'চাঁদের পাহাড়' ও 'হীরা মানিক জ্বলে' বহু পঠিত ও আলোচিত উপন্যাস। কিশোরমনের আকাঙ্ক্ষার স্বর্গের সঙ্গে বিভূতিভূষণের এত নিবিড় পরিচয় ছিল যে তিনি সহজেই শংকর ও সুশীলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। প্রথমটিতে আফ্রিকার গহন অরণ্য আর দ্বিতীয়টিতে ভয়ানক সমুদ্র সমস্ত চরিত্র এবং ঘটনার ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথম উপন্যাসে আল্‌ভারেজের মৃত্যু ও দ্বিতীয়তে সনতের শোচনীয় পরিণতি যেন তাদের জয়ের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে, ছোটোদের রচনায় এটিও নতুন দিগন্ত এনেছে; সুদূরের হাতছানিতে যারা পথে বেরোয় তাদের জীবনে যে মৃত্যু পায়ের ভৃত্যের মতো ঘোরাফেরা করে লেখক তা-ও জানাতে চেয়েছেন। এইভাবে বড়ো ও ছোটোদের মনের কাছাকাছি এসে বিভূতিভূষণ বারবার প্রথাসিদ্ধ গণ্ডিটিকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। একথা আরও বোঝা যায় তাঁর ছোটোগল্পগুলি পড়লে।

একমাত্র 'তালনবমী' গ্রন্থটিতে বিভূতিভূষণের শিশুপাঠ্য গল্পগ্রন্থ বলে গণ্য করা হলে তিনি ছোটোদের জন্য মাত্র দশটি গল্প লিখেছিলেন বলা চলে কিন্তু আমরা তাঁর লেখা দুশো আঠারোটি গল্পের মধ্যে অন্তত তিরিশটিকে কিশোরপাঠ্য গ্রন্থে সংকলিত হতে দেখেছি। লেখকের জীবদ্দশায় অবশ্য 'তালনবমী' ছাড়া

কিছু প্রকাশিত হয়নি। এ গ্রন্থে রয়েছে দশটি গল্প—তার মধ্যে 'তালনবমী' বা 'পথ চেয়ে' নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ভালো গল্প, যদিও এর রস ছোটোদের চেয়ে বড়োদের অভিভূত করে বেশি। একটি বালকের তালের বড়া খাবার মতো সামান্য সাধ না মেটার করুণ আবেদন সকলেরই মন ছুঁয়ে যায় যদিও ধনী জটি পিসিমারা যতই হৃদয়হীন হোন না কেন অভাবী বালকের কাছ থেকে বিনা পয়সায় তাল নিয়ে তাদের পরিবারকে বাদ দিয়ে গ্রামসুদ্ধ অবস্থাপন্ন বাকি পরিবারকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছেন একথা কিশোর মনকে বড়ো বেশি পীড়িত করে। পথ চেয়ে বসে থাকা গোপালকে লোভী ছেলে মনে হয় না বরং তার আশা পূরণের স্বপ্নটিকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে কিন্তু আগেও যে কথা বলেছি, বিভূতিভূষণ ছেলে ভোলানো গল্প লেখেননি, কোথাও তাদের শিশু মনে করে লঘুভাবে দেখেননি, তাই গল্প শেষ হয় অত্যন্ত করুণ পরিস্থিতির মধ্যে, দু-দিন যাদের বাড়ি হাঁড়ি চড়েনি, সেই দশ বছরের বালকটির বর্ষার জলকাদা ভেঙে সাপের ভয় তুচ্ছ করে যে বাড়িতে বিনা পয়সার তাল দিয়ে এসে নিমন্ত্রণ পাবার আশায় বসে রইল, 'তার সজল ঝাপসা দৃষ্টির সামনে পাড়ার হারু, হিতেন, দেবেন, গুটকে তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে একে তার বাড়ির সামনে দিয়ে জটি পিসিমার বাড়ির দিকে চলে গেল...'। বিভূতিভূষণ দারিদ্র্যের করুণ গল্প আরও লিখেছেন তবে সেগুলি বড়োদের গল্পরূপেই পরিচিত, প্রতিদিনের শত তুচ্ছের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া সেইসব না-মেটা সাধের গল্প আর কে লিখবেন, বিভূতিভূষণ ছাড়া।

ছোটোদের উপন্যাস লেখার সময় বিভূতিভূষণ যেমন বেছে নিয়েছিলেন দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, গল্পে তেমনই প্রাধান্য পেয়েছে অবিশ্বাস্য, অলৌকিক কাহিনি। ভূতের গল্পের প্রতি তাঁর নিজের যেমন টান ছিল তেমনই জানতেন শিশুমনে অলৌকিক কাহিনি প্রভাব বিস্তার করে বেশি। যদিও সত্যিই শিশুরা ভূতুড়ে গল্প ভালোবাসে কি না বলা শক্ত, তবে শিশুসাহিত্যিকেরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ। খুব বেশি ভয়াবহ না করে তাঁর রহস্য কাহিনি এবং ভৌতিক কাহিনিকে শিশুদের উপযোগী করে পরিবেশনে দক্ষ। বিভূতিভূষণের গল্প সম্বন্ধেও একথা খাটে। তাঁর 'রঙ্কিনীদেবীর খড়্গ' ও 'গঙ্গাধরের বিপদ' বেশ নতুন ধরনের অলৌকিক কাহিনি, গা ছমছমে পরিবেশ সৃষ্টি করে লেখক শেষ পর্যন্ত কিশোর পাঠকদের মুগ্ধ করে রাখেন। 'মেডেল' গল্পটি ভূতের, বন্ধক রাখা মেডেলটিতে ছাড়াতে না পারা ভূতটির মেডেলের সঙ্গে থেকে যাওয়া হয়তো নতুন নয় কিন্তু ভালো লাগে পড়তে। রঙ্কিনীদেবীকে সবাই ভয় পায় তাঁর কাছে নরবলি দেওয়া হত বলে, পরেও গ্রামের বিপদে তাঁর খাঁড়া থেকে রক্ত ঝরে পড়ত কিন্তু লেখকের মনে হয়েছে এটি ভয়ের ব্যাপার নয়, দেবী রুষ্ট হননি বরং সাবধান করে দিচ্ছেন। 'গঙ্গাধরের বিপদ'-এর অশরীরী আমির খাঁর দেহধারণের হতাশ ও মানুষিক চেষ্টা করুণা জাগায়। বর্ণনাটিও অপূর্ব: 'কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁসাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁসাহেবের মুখ-গলা-বুক, হাত-পা, সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়ছে...সব যেন ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে...খাঁসাহেব প্রাণপনে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করচে। কিন্তু পেরে উঠছে না...সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল... এক...দুই...তিন...চার...আর কোথায় খাঁসাহেব?' অস্তিত্ব বজায় রাখতে না পেরে হারিয়ে যেতে হয় তাকে। গঙ্গাধরের মনে হওয়া কথাটা ছড়ায় পাঠক মনে, 'হতভাগ্য এতদিনেও কি বোঝেনি সে মারা গিয়েচে?'

বিভূতিভূষণের শিশুপাঠ্য রচনায় বিশেষ করে ছোটোগল্পে অতিপ্রাকৃত গল্পের ওপর জোর দিয়েছিলেন

সেজন্য গল্পগুলির যথেষ্ট বাঁধুনি না থাকলেও সুখপাঠ্য হয়েছে। আগেই বলেছি, 'তালনবমী' ছাড়াও আরও কয়েকটি কিশোরপাঠ্য গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেখানে...'আরক', 'দাদু', 'বাঘের মন্তর', 'থনটনকাকা', 'নুটিমন্তর', 'হারুন অল রসিদের বিপদ', 'ঠেলাগাড়ি', 'কাশী কবিরাজের গল্প', 'অবিশ্বাস্য', 'বিরজাহোম ও তার বাধা', 'মায়াজাল', 'বিপদ', 'পৈতৃক ভিটা', 'আচার্য কৃপালনী কলোনি', 'রহস্য', 'ভৌতিক পালঙ্ক', 'ভূতের গল্প', 'অভিনন্দন সভা', 'হাসি', 'ঝড়ের রাতে', 'জাল' ও 'গল্প নয়' স্থান পেয়েছে। আমরা এদের বাইরের অনেক গল্পকেই কিশোরপাঠ্য রূপে ছাড়পত্র দিতে পারি যেমন, 'টান', 'অশরীরী', 'ছায়াছবি', 'কবিরাজের বিপদ' প্রভৃতি। কারণ আর কিছুই নয়। বিভূতিভূষণের রচনায় কোনো স্পষ্ট গণ্ডি কাটা নেই, গল্প বলা হয়েছে সরলভাবে। তাতে সাধারণ মানুষের কথা যেমন আছে তেমনই আছে অশরীরী মানুষের কথা। সাধারণ মানুষের গল্পগুলি সবই করুণ এবং বিভূতিভূষণের এ জাতীয় গল্পরচনায় অসামান্য দক্ষতা দেখা গিয়েছে 'তালনবমী'তে, 'চাউল' ও 'ঠেলাগাড়ি'ও সে পরিচয় ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। ভিন্ন স্বাদের গল্প হিসেবে 'রাজপুত্র' হচ্ছে রূপকথা, কাঞ্চীর যুবরাজ অভিষেকের আগের দিন বেরোলেন দেশভ্রমণে, তারপর আত্মপরিচয় গোপন রেখেই একটি গ্রামবাসীকে উদ্ধার করল বিপদ থেকে অথচ শেষটা পরিচিত গল্পের মতো হল না—রাজপুত্র গ্রামবাসীর প্রাণ বাঁচাল নিজের প্রাণের বিনিময়ে। তবে ছোটো-বড়ো সকলেরই ভালো লাগবে 'বামা' গল্পের বামাকে, নিজের শ্বশুরের ভিটেয় আর ব্রহ্মহত্যা করতে দেবে না বলে সে অতিথিকে যে কৌশলে বাঁচিয়েছে তা এত সাবলীল ও সুন্দর বলার কথা নয়।

বিভূতিভূষণ ছোটোদের জন্য 'আইভ্যান হো' উপন্যাসটি অনুবাদ করেছিলেন যদিও সেটি এখন দুষ্প্রাপ্য কিন্তু এই অনুবাদটিও প্রমাণ করে শিশুদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিকেই লেখক বেশি পছন্দ করতেন, ইতিহাস ও ভূগোল দুই-ই ছিল তার প্রিয় তবে নিজে যখন ছোটোদের জন্য লিখতেন তখন বিদেশি প্রভাব সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। 'সুন্দরবনে সাত বৎসর'-এর প্রধান লেখক ভুবনমোহন রায়, কোনো কারণে বিভূতিভূষণ এর কয়েকটি অধ্যায় লেখেন এবং লিখে আনন্দিত হন কিন্তু তিনি কতখানি লিখেছিলেন তা জানা যায় না। ভ্রমণ-দিনলিপি 'বনে-পাহাড়ে' ছাড়াও 'অরণ্য' গল্পে রয়েছে বিভূতিভূষণের প্রিয় জঙ্গলের কথা। আজও এ ব্যাপারে বাংলা সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। সকলের কাছেই তিনি অরণ্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন, 'আরণ্যকে'র তিনটি কিশোর সংস্করণ প্রকাশের সেও অন্যতম কারণ।

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ যেমন আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছিলেন, শিশুসাহিত্যেও তিনি তেমনই একটি ভিন্ন সুর এনেছিলেন। কাহিনি, ঘটনার উপস্থাপনা বা বিষয়বস্তু ছাড়াও আমরা তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই পাই অবিস্মরণীয় কয়েকটি অল্পবয়সি চরিত্র, এদের কেউই ঠিক কাল্পনিক চরিত্র নয়, লেখকের দিনলিপিতে তাদের হদিশ মেলে আর যাদের মেলে না তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে স্বয়ং বিভূতিভূষণের। সেজন্য কিছুটা অসঙ্গতি ও অন্যমনস্কতা বিভূতি-সাহিত্যে ছায়া ফেললেও কিশোর পাঠকদের মনে, গভীরে তিনি পৌঁছোতে পেরেছিলেন। সহজে বাঙালি কিশোর যতদিন অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন দেখবে ততদিন 'চাঁদের পাহাড়'ও থাকবে, সাহিত্যিকের সততার পরিচয় এখানেই।

চিত্রা দেব

বিভূতি স্মারক গ্রন্থ : মাঘ ১৪০১
বিভূতি স্মারক সমিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত বই

বইয়ের নাম	প্রকাশকাল
পথের পাঁচালী *(উপন্যাস)*	১৯২৯
ছোটদের পথের পাঁচালী *(উপন্যাস)*	১৯৪৪
আম আঁটির ভেঁপু *(উপন্যাস)*	১৯৪৪
মেঘমল্লার *(গল্প)*	১৯৩২
অপরাজিত *(উপন্যাস)*	১৯৩২
মৌরীফুল *(গল্প)*	১৯৩২
যাত্রাবদল *(গল্প)*	১৯৩৪
দৃষ্টি-প্রদীপ *(উপন্যাস)*	১৯৩৫
ছোটদের দৃষ্টি-প্রদীপ *(উপন্যাস)*	১৯৬৫
বিচিত্র জগৎ *(প্রবন্ধ)*	১৯৩৭
চাঁদের পাহাড় *(উপন্যাস)*	১৯৩৮
জন্ম ও মৃত্যু *(গল্প)*	১৯৩৮
আইভ্যানহো *(অনুবাদ)*	১৯৩৮
কিন্নর দল *(গল্প)*	১৯৩৮
আরণ্যক *(উপন্যাস)*	১৯৩৯
ছেলেদের আরণ্যক *(উপন্যাস)*	১৯৪৬
লবটুলিয়ার কাহিনী *(উপন্যাস)*	১৯৫৫
আবণ্যক *(উপন্যাস, কিশোর সংস্করণ)*	
মরণের ডঙ্কা বাজে *(উপন্যাস)*	১৯৪০
অভিনব বাঙলা ব্যাকরণ	১৯৪০
আদর্শ হিন্দু হোটেল *(উপন্যাস)*	১৯৪০
আদর্শ হিন্দু হোটেল *(নাটক)*	১৯৫৩
কো-এডুকেশন *(বারোয়ারি উপন্যাস)*	১৯৪০
অভিযাত্রিক *(ভ্রমণ)*	১৯৪১
মীনকেতুর কৌতুক *(বারোয়ারি উপন্যাস)*	১৯৪১
বেনীগির ফুলবাড়ী *(গল্প)*	১৯৪১
স্মৃতির রেখা *(দিনলিপি)*	১৯৪১
বিপিনের সংসার *(উপন্যাস)*	১৯৪১
দুই বাড়ী *(উপন্যাস)*	১৯৪১
পঞ্চদশী *(বারোয়ারি উপন্যাস)*	১৯৪১
মিসমিদের কবচ *(উপন্যাস)*	১৯৪২
অনুবর্তন *(উপন্যাস)*	১৯৪২
তৃণাঙ্কুর *(দিনলিপি)*	১৯৪৩
টমাস বাটার আত্মজীবনী *(অনুবাদ)*	১৯৪৩
নবাগত *(গল্প)*	১৯৪৪
তালনবমী *(গল্প)*	১৯৪৪

বইয়ের নাম	প্রকাশকাল
ঊর্মিমুখর *(দিনলিপি)*	১৯৪৪
দেবযান *(উপন্যাস)*	১৯৪৪
ছোটদের দেবযান *(উপন্যাস)*	১৯৭৬
উপলখণ্ড *(গল্প)*	১৯৪৫
বিধুমাস্টার *(গল্প)*	১৯৪৫
কেদাররাজা *(উপন্যাস)*	১৯৪৫
বনে-পাহাড়ে *(ভ্রমণ)*	১৯৪৫
ক্ষণভঙ্গুর *(গল্প)*	১৯৪৫
উৎকর্ণ *(দিনলিপি)*	১৯৪৬
অসাধারণ *(গল্প)*	১৯৪৬
হীরা মানিক জ্বলে *(উপন্যাস)*	১৯৪৬
সিমলা কালীবাড়ী পরিচয় *(প্রবন্ধ)*	১৯৪৭
অথৈ জলে *(উপন্যাস)*	১৯৪৭
মুখোশ ও মুখশ্রী *(গল্প)*	১৯৪৭
হে অরণ্য কথা কও *(ভ্রমণ)*	১৯৪৮
আচার্য কৃপালনী কলোনী *(গল্প)*	১৯৪৮
জ্যোতিরিঙ্গন *(গল্প)*	১৯৪৯
ইছামতী *(উপন্যাস)*	১৯৫০
কুশল-পাহাড়ী *(গল্প)*	১৯৫০
সুন্দরবনে সাত বৎসর *(বড়ো গল্প)* (যুগ্ম লেখক ভুবনমোহন রায়)	১৯৫২
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প *(গল্প)*	১৯৫৫
রূপহলুদ *(গল্প)*	১৯৫৭
অশনি সংকেত *(উপন্যাস)*	১৯৫৯
নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব *(গল্প)*	১৯৫৯
অনুসন্ধান *(গল্প)*	১৯৬০
ছায়াছবি *(গল্প)*	১৯৬০
আমার লেখা *(সংকলন)*	১৯৬১
দম্পতি *(উপন্যাস)*	১৯৬২
কুয়াশার রঙ *(গল্প)*	১৯৬২
প্রেমের গল্প *(গল্প)*	১৯৬৩
অলৌকিক *(গল্প)*	১৯৬৩
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর সঞ্চয়ন *(সংকলন)*	১৯৬৫
অনশ্বর *(উপন্যাস)*	১৯৭২

সূচি

আমার লেখা .... সাত

তালনবমী ৩
ভন্তুলমামার বাড়ি ৮
সই ১৮
চাউল ২২
পৈতৃক ভিটা ২৭
গঙ্গাধরের বিপদ ৩৪
অবিশ্বাস্য ৩৯
কাশী কবিরাজের গল্প ৪৪
চ্যালারাম ৫০
বাঘের মন্তর ৫৫
হারুন-অল-রসিদের বিপদ ৬২
গল্প নয় ৬৭
ভৌতিক পালঙ্ক ৭১
ঝড়ের রাতে ৭৭
বামা ৮৩
রঙ্কিণীদেবীর খড়্গ ৮৯

উপন্যাস

অপুর কথা ৯৭
চাঁদের পাহাড় ১৬৮
হিরা মানিক জ্বলে ২৪৩

অরণ্য ও প্রকৃতি

বনে পাহাড়ে ৩২১

ভ্রমণ

বিপুলা এ পৃথিবী ৩৩৯

গল্প

banglabooks.in

তালনবমী

ঝমঝম বর্ষা।

ভাদ্র মাসের দিন। আজ দিন পনেরো ধরে বর্ষা নেমেচে, তার আর বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই। খুদিরাম ভট্‌চাজের বাড়ি দু-দিন হাঁড়ি চড়েনি।

খুদিরাম সামান্য আয়ের গৃহস্থ। জমিজমার সামান্য কিছু আয় এবং দু-চার ঘর শিষ্য-যজমানের বাড়ি ঘুরে ঘুরে কায়ক্লেশে সংসার চলে। এই ভীষণ বর্ষায় গ্রামের কত গৃহস্থের বাড়িতেই পুত্র-কন্যা অনাহারে আছে—খুদিরাম তো সামান্য গৃহস্থমাত্র! যজমানবাড়ি থেকে যে কটি ধান এসেছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েচে। ভাদ্রের শেষে আউশ ধান চাষিদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দু-বেলা পেট পুরে খেতে পাবে।

নেপাল ও গোপাল খুদিরামের দুই ছেলে। নেপালের বয়স বছর বারো, গোপালের দশ। কদিন থেকে পেট ভরে না খেতে পেয়ে ওরা দুই ভায়েই সংসারের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেচে।

নেপাল বললে, এই গোপলা, খিদে পেয়েচে না তোর?

গোপাল ছিপ চাঁচতে চাঁচতে বললে, হুঁ, দাদা!

—মাকে গিয়ে বল; আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।

—মা বকে; তুমি যাও দাদা!

—বকুক গে। আমার নাম করে মাকে বলতে পারবিনে?

এমন সময় পাড়ার শিবু বাঁড়ুজ্যের ছেলে চুনিকে আসতে দেখে নেপাল ডাকলে, ও চুনি, শুনে যা!

চুনি বয়সে নেপালের চেয়ে বড়ো। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে, বেশ চেহারা। নেপালের ডাকে সে ওদের উঠোনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, কী?

—আয় না ভেতরে।

না যাব না, বেলা যাচ্ছে। আমি জটি পিসিমাদের বাড়ি যাচ্ছি। মা সেখানে রয়েছে কিনা, ডাকতে যাচ্ছি।

—কেন, তোর মা এখন সেখানে যে?

—ওদের তাল ভাঙতে গিয়েচে। তালনবমীর বেতো আসচে এই মঙ্গলবার; ওদের বাড়ি লোকজন খাবে।

সত্যি?

—তা জানিসনে বুঝি? আমাদের বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করবে। গাঁয়েও বলবে।

—আমাদেরও করবে?

—সবাইকে যখন নেমন্তন্ন করবে, তোদের কি বাদ দেবে?

চুনি চলে গেলে নেপাল ছোটো ভাইকে বললে, আজ কী বার রে? তা তুই কি জানিস? আজ শুক্করবার বোধ হয়। মঙ্গলবারে নেমন্তন্ন।

গোপাল বলল, কী মজা! না দাদা?

—চুপ করে থাক, তোর বুদ্ধিশুদ্ধি নেই; তালনবমীর বেতোয় তালের বড়া করে, তুই জানিস?

গোপাল সেটা জানত না! কিন্তু দাদার মুখে শুনে খুব খুশি হয়ে উঠল; সত্যি তা যদি হয়, তবে সে সুখাদ্য খাবার সম্ভাবনা বহুদূরবর্তী নয়, ঘনিয়ে এসেচে কাচে। আজ কী বার সে জানে না; সামনের মঙ্গলবারে—নিশ্চয় তার আর বেশি দেরি নেই।

দাদার সঙ্গে বাড়ি যাবার পথে পড়ে জটি পিসিমার বাড়ি। নেপাল বললে, তুই দাঁড়া, ওদের বাড়ি ঢুকে দেখে আসি। ওদের বাড়ি তালের দরকার হবে, যদি তাল কেনে।

এ গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকাণ্ড তালদিঘি, নেপাল সেখাল থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে।

জটি পিসিমা সামনেই দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভালো নাম হরিমতী; গ্রামসুদ্ধু ছেলেমেয়ে তাঁকে ডাকে জটি পিসিমা।

পিসিমা বললেন, কী রে?

—তাল নেবে পিসিমা?

—হাঁ, নেব বই কী। আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার।

ঠিক এই সময় দাদার পিছু পিছু গোপালও এসে দাঁড়িয়েচে। জটি পিসিমা বললেন, পেছনে কে রে? গোপাল? তা সন্ধেবেলা দুই ভায়ে গিয়েছিলি কোথায়?

নেপাল সলজ্জমুখে বললে, মাছ ধরতে।

—পেলি?

—ওই দুটো পুঁটি আর একটা ছোটো বেলে . . . তাহলে যাই পিসিমা?

—আচ্ছা, এসোগে বাবা, সন্ধে হয়ে গেল। অন্ধকারে চলাফেরা করা ভালো নয় বর্ষাকালে।

জটি পিসিমা তাল সম্বন্ধে আর কোনো আগ্রহ দেখালেন না বা তালনবমীর ব্রত উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করার উল্লেখও করলেন না, যদিও দুজনেরই আশা ছিল হয়তো জটি পিসিমা তাদের দেখলেই নিমন্ত্রণ করবেন এখন। দরজার কাছে গিয়ে নেপাল আবার পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলে, তাল নেবেন তাহলে?

—তাল?·তা দিয়ে যেয়ো বাবা। কটা করে পয়সায়?

—দুটো করে দিচ্ছি পিসিমা। তা নেবেন আপনি, তিনটে করেই নেবেন।

—বেশ কালো হেঁড়ে তাল তো? আমাদের তালের পিঠে হবে তালনবমীর দিন—ভালো তাল চাই।

—মিশকালো তাল পাবেন। দেখে নেবেন আপনি।

গোপাল বাইরে এসেই দাদাকে বললে, কবে তাল দিবি দাদা?

—কাল।

—তুই ওদের কাছে পয়সা নিসনে দাদা।

নেপাল আশ্চর্য হয়ে বললে, কেন রে?

—তাহলে আমাদের নেমন্তন্ন করবে, দেখিস এখন।

—দূর! তা হয় না। আমি কষ্ট করে তাল কুড়োব—আর পয়সা নেব না?

রাত্রে বৃষ্টি নামে। হুহু বাদলার হাওয়া সেই সঙ্গে। পুবদিকের জানলার কপাট দড়িবাঁধা; হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সারারাত খটখট শব্দ করে ঝড়বৃষ্টির দিনে। গোপালের ঘুম হয় না, তার যেন ভয় ভয় করে। সে শুয়ে শুয়ে ভাবচে—দাদা তাল যদি বিক্রি করে, তবে ওরা আর নেমন্তন্ন করবে না। তা কখনো করে?

খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। কেউই তখন ওঠেনি। রাত্রের বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, সামান্য একটু টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশে সেই তালদিঘির ধারে। মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। গ্রামের উত্তরপাড়ার গণেশ কাওরা লাঙল ঘাড়ে এই এত সকালে মাঠে যাচ্ছে। ওকে দেখে বললে, কী খোকা ঠাকুর, যাচ্ছ কনে এত ভোরে?

—তাল কুড়ুতে দিঘির পাড়ে।

—বড্ড সাপের ভয় খোকা ঠাকুর! বর্ষাকালে ওখানে যেয়ো না একা একা!

গোপাল ভয়ে ভয়ে দিঘির তালপুকুরের তালের বনে ঢুকে তাল খুঁজতে লাগল। বড়ো আর কালো

কুচকুচে একটা মাত্র তাল প্রায় জলের ধারে পড়ে; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসবার পথে আরও গোটা-তিনেক ছোটো তাল পাওয়া গেল। ছেলেমানুষ, এত তাল বয়ে আনার সাধ্য নেই, দুটি মাত্র তাল নিয়ে সোজা একেবারে জটি পিসিমার বাড়ি হাজির।

জটি পিসিমা সবেমাত্র সদর দোর খুলে দোরগোড়ায় জলের ধারা দিচ্ছেন, ওকে এত সকালে দেখে অবাক হয়ে বললেন, কীরে খোকা?

গোপাল একগাল হেসে বললে, তোমার জন্যে তাল এনিচি পিসিমা!

জটি পিসিমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

গোপাল একবার ভাবলে, তালনবমী কবে জিজ্ঞেস করে; কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার। সারাদিন গোপালের মন খেলাধুলোর ফাঁকে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঘন বর্ষার দুপুরে, মুখ উঁচু করে দেখে—নারকেল গাছের মাথা থেকে পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়চে, বাঁশঝাড় নুয়ে পড়চে বাদলার হাওয়ায়, বকুলতলার ডোবায় কটকটে ব্যাঙের দল থেকে থেকে ডাকচে।

গোপাল জিজ্ঞেস করলে, ব্যাঙগুলো আজকাল তেমন ডাকে না কেন মা?

গোপালের মা বলেন, নতুন জলে ডাকে, এখন পুরোনো জলে তত আমোদ নেই ওদের।

—আজ কী বার, মা?

—সোমবার। কেন রে? বারের খোঁজে তোর কী দরকার?

—মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা?

—তা হয়তো হবে। কী জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কী দরকার আমার?

সারাদিন কেটে গেল। নেপাল বিকেলের দিকে জিজ্ঞেস করলে, জটি পিসিমার বাড়িতে তাল দিইছিলি আজ সকালে? কোথায় পেলি তুই? আমি তাল দিতে গেলে পিসি বললেন, গোপাল তাল দিয়ে গেচে, পয়সা নেয়নি। কেন দিতে গেলি তুই? একটা পয়সা হলে দুজনে মুড়ি কিনে খেতাম!

—ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস দাদা, কাল তো তালনবমী!

—সে এমনিই নেমন্তন্ন করবে, পয়সা নিলেও করবে। তুই একটা বোকা!

—আচ্ছা দাদা, কাল তো মঙ্গলবার না?

—হুঁ।

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ির পাশের বড়ো বকুল গাছটায় জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে; জানলা দিয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে—কাল সকালটা হলে হয়। কতক্ষণে যে রাত পোহাবে! . . .

জটি পিসিমা আদর করে ওকে বললেন খাওয়ানোর সময়, খোকা, কাঁকুড়ের ডালনা আর নিবি? মুগের ডাল বেশি করে মেখে নে। জটি পিসিমার বড়ো মেয়ে লাবণ্যদি একখানা থালায় গরম গরম তিল-পিটুলি ভাজা এনে ওর সামনে ধরে হেসে বললে, খোকা, কখানা নিবি তিল-পিটুলি?—বলেই লাবণ্যদি থালাখানা উপুড় করে তার পাতে ঢেলে দিলে। তার পর জটি পিসিমা আনলেন পায়েস আর তালের বড়া। হেসে বললেন, খোকা তুই তাল কুড়িয়ে দিয়েছিলি, তাই পায়েস হল। . . . খা, খা, —খুব খা—আজ যে তালনবমী রে! . . . কত কী চমৎকার ধরনের রাঁধা তরকারির গন্ধ—বাতাসে! খেজুর গুড়ের

পায়েসের সুগন্ধ—বাতাসে! গোপালের মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠল। সে বসে বসে খাচ্ছে, কেবলই খাচ্ছে। . . . সবারই খাওয়া শেষ, ও তবুও খেয়েই যাচ্ছে . . . লাবণ্যদি হেসে হেসে বলছে, আর নিবি তিল-পিটুলি?

—ও গোপাল!

হঠাৎ গোপাল চোখ চেয়ে দেখলে জানলার পাশে বর্ষার জলে ভেজা ঝোপঝাড়, তাদের সেই আতা গাছটা . . . সে শুয়ে আছে তাদের বাড়িতে। মার হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুম ভেঙেচে, মা পাশে দাঁড়িয়ে বলচেন, ওঠ, ওঠ, বেলা হয়েচে কত! মেঘ করে আছে তাই বোঝা যাচ্ছে না।

বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—আজ কী বার, মা . . .?

—মঙ্গলবার।

তাও তো বটে! আজই তো তালনবমী। ঘুমের মধ্যে ওসব কী হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল!

বেলা আরও বাড়ল, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে যদিও বোঝা গেল না বেলা কতটা হয়েচে। গোপাল দরজার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠায় বসে রইল। বৃষ্টি নেই একটুও, মেঘ-জমকালো আকাশ। বাদলের সজল হাওয়ায় গা শিরশির করে। গোপাল আশায় আশায় বসে রইল বটে, কিন্তু কই, পিসিমাদের বাড়ি থেকে কেউ তো নেমন্তন্ন করতে এল না।

অনেক বেলায় তাদের পাড়ার জগবন্ধু চক্কোত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। তাদের পেছনে রাখাল রায় ও তাঁর ছেলে সানু; তার পেছনে কালীবর বাঁড়ুজ্যের বড়ো ছেলে পাঁচু আর ওপাড়ার হরেন. . .

গোপাল ভাবলে, এরা যায় কোথায়?

এ দলটি চলে যাবার কিছু পরে বুড়ো নবীন ভট্চাজ ও তার ছোটো ভাই দিনু, সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেছে।

দিনু ভট্চাজের ছেলে কুড়োরাম ওকে দেখে বললে, এখানে বসে কেন রে? যাবিনে?

গোপাল বললে, কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

জটি পিসিমাদের বাড়ি তালনবমীর নেমন্তন্ন খেতে। করেনি তোদের? ওরা বেছে বেছে বলেচে কিনা, সবাইকে তো বলেনি . . .

গোপাল হঠাৎ রাগে, অভিমানে যেন দিশাহারা হয়ে গেল। রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন? আমরা এর পরে যাব . . .

রাগ করবার মতো কী কথা সে বলেচে বুঝতে না পেরে কুড়োরাম অবাক হয়ে বললে, বা রে! তা অত রাগ করিস কেন? কী হয়েচে?

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল এসে পড়ল—বোধ হয় সংসারের অবিচার দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে কদিন থেকে। কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হল? তার সজল ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সামনে পাড়ার হারু, হিতেন, দেবেন, গুট্‌কে তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে একে তার বাড়ির সামনে দিয়ে জটি পিসিমাদের বাড়ির দিকে চলে গেল . . .

ভন্ডুলমামার বাড়ি

পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট করতে আসি, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেও ভালো, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশি গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হতে পেরে দেবলহাটি মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকি পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা যোলো আনার ওপর সতেরো আনা।

কার্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাসরুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনে একটা ছোটো মাঠ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েচে, স্থানটা নির্জন।

চায়ের কোনো ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরিব ছাত্র হেডমাস্টারের বাসায় থেকে পড়ে, তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বললুম, অবিনাশবাবু, বেশ ঠান্ডা পড়েছে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু . . .

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেনলি—ওরে ও কানাই, শোন শোন, যা দিকি একবার গঙ্গার বউয়ের বাড়ি, আমার নাম করে বলগে, দুটি গরম মুড়ি যেন ভেজে দেয়—এক্ষুনি . . .

আমি বললুম, অভাবে চালভাজা . . .

তারপর গল্পগুজবে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে বাঁধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন!

হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সপেক্টারবাবু। এইরকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়! . . . এখানকার লোকজন দেখেচেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোনো চর্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখায় এইজন্যে যে, কোনোরকমে ধারাপাত আর শুভঙ্করীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে! কারুর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাইনে, ঝালমশলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, নাহয় এসে পড়েচি পেটের দায়ে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু-চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো নাহয় নাই করেচি . . .

দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনও ভুলতে পারেননি। বেচারির জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যাকিছু অভিজ্ঞতা, যাকিছু কর্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় করে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর বা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ওই কলেজের কটা বছরেই তার

আরম্ভ ও শেষ। সেদিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়চে, রঙিন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

—হুগলি জেলার কোনোএক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ছিল কেন? এখন নেই?

—সেকথা পরে বলচি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সঙ্গে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে, গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।

—হুগলি জেলার কোনোএক গ্রামে আমার মামার বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানে যাই, তখন আমার বয়স বছর পাঁচেক। আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় আট-নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসতি, এক চালে আগুন লাগলে পাড়াসুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা। কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়ের ছাউনি, ছোটো-বড়ো আটচালা ঘর। এপাড়া থেকে ওপাড়া

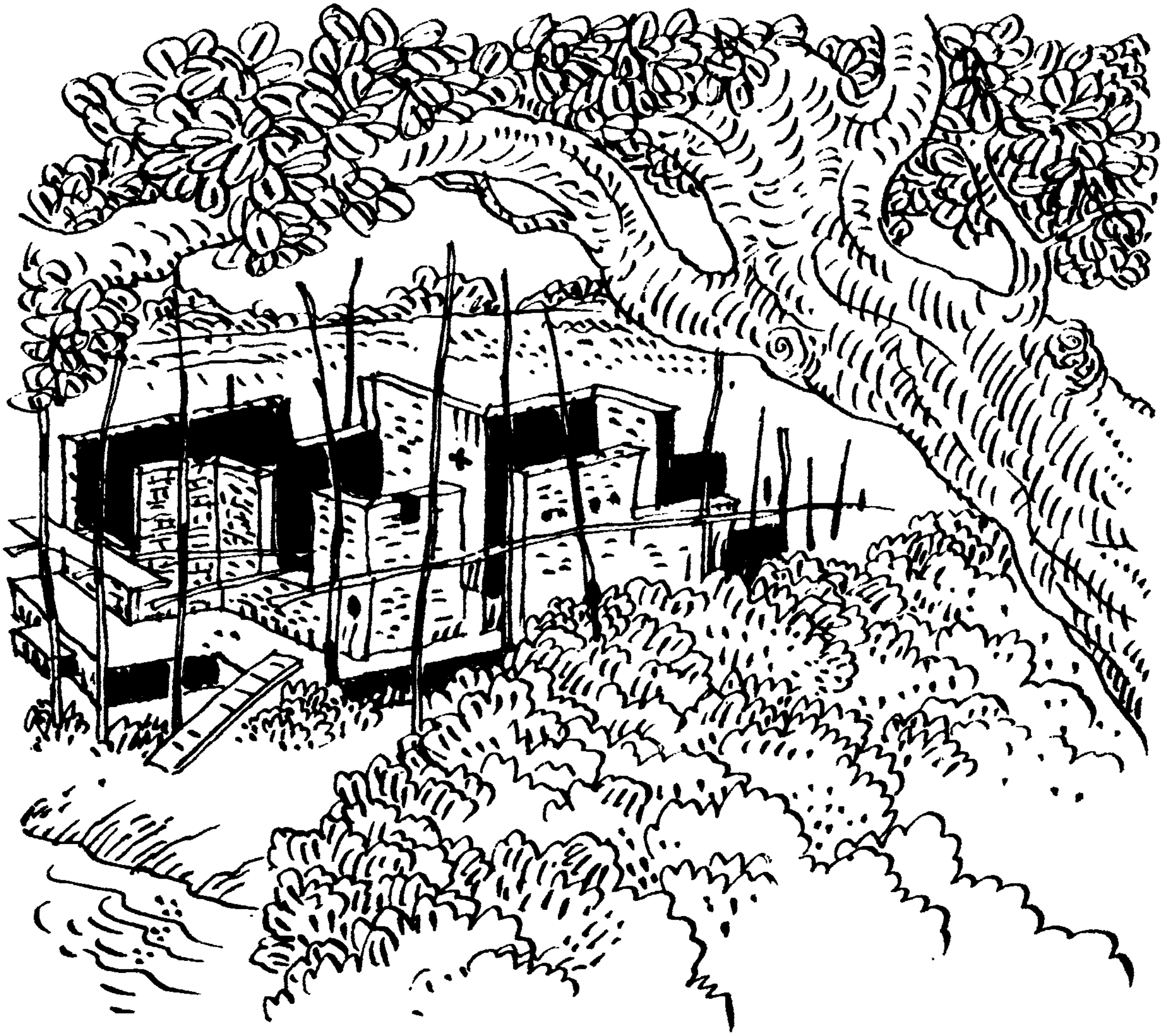

যাবার পথে একটা বড়ো আম-কাঁঠালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর গেলে তবে ওপাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেই বনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা হচ্ছে।

সেবার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামার বাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেকদিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে পড়ল, এপাড়া ওপাড়ার মধ্যে বাঁদিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা। একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু মনে হল অনেকদিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যেজন্যেই হোক, কারণ ভিতের গায়ে ও ঘরের মেঝেতে ছোটো-বড়ো ভাঁট্‌শেওড়ার গাছ গজিয়েছে, চুন সুরকি মাখার ছোটো খানাতে পর্যন্ত বনমূলোর চারা। মনে পড়ল, সেবার এসে বাড়িটা গাঁথা হচ্চে দেখেছিলুম। এখনও গাঁথা শেষ হয়নি তো? কারা বাড়ি তুলচে?

ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।

—কারা ওখানে বাড়ি করচে দিদিমা, সেবার এসে দেখে গিইচি, এখনও শেষ হয়নি?

—তোর এত কথাও মনে আছে। . . . ও তোর ভন্ডুলমামা বাড়ি করচে, এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্ছে না।

আমার ভারী কৌতূহল হল, সাগ্রহে বললুম, ভন্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভন্ডুলমামা কে?

—ভন্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণিরহাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলেবেলায় থাকত, বাড়িঘর তো ছিল না। ওপাড়ার মুখুজ্যেবাড়ির ভাগ্নে, চাকরি-বাকরি করছে, ছেলেপুলে হয়েছে, একটা আস্তানা তো চাই? তাই টাকা পাঠিয়ে দেয়, মুখুজ্যেরা মিস্ত্রি লাগিয়ে ঘরদোর শুরু করে দিয়েচে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করে—

আমি ছাড়বার পাত্র নই, বললুম, তবে বাড়ি গাঁথা হচ্ছে না কেন? মুখুজ্যেরা তো দেখলেই পারে?

—তা নয়, সবসময় তো টাকা পাঠাতে পারে না! যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রি লাগানো হয়।

কী জানি কেন সেই থেকে এই ভন্ডুলমামা ও তাঁর আধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার করে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতোই এই ভন্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানস-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরির স্থান লালমণিরহাট, মায় তাঁর ছেলেমেয়েসুদ্ধ। তাঁর টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়াল, অথচ কেন এসব হল তার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ আজও মনের মধ্যে খুঁজে পাই না।

কতবার দিদিমাদের চিলেকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেচি—লালমণিরহাট থেকে ভন্ডুলমামা আবার কবে টাকা পাঠাবে বাড়ি গাঁথার জন্যে . . . না, এবার বোধ হয় নিজে আসবে। মুখুজ্যেরা বোধ হয় ভন্ডুলমামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিজ্ঞেস করি—লালমণিরহাট কোথায় দিদিমা? দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণিরাট! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কী দরকার পড়ল? তা, কী জানি বাপু কোথায় লালমণিরহাট? নে নে, শুনবি নে তো আমায় রেহাই দে,—রাত্তিরে এখন গিয়ে

আমায় দুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে—তোমায় নিয়ে সারারাত গল্প করলে তো চলবে না আমার!

আমি অপ্রতিভের সুরে বলতুম, না দিদিমা, গল্প বলো, যেয়ো না, আচ্ছা মন দিয়ে শুনচি।

এরপরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর দুই পরে। এই দু-বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভন্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায় আমাদের পুকুরপাড়টা ভরে যেত, বনের গাছপালাগুলো যেন অস্পষ্ট, যেন মনে হত সন্ধ্যায় কুয়াশা হয়েছে বুঝি আজ, সেইদিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়ত ভন্ডুলমামার সেই আধ-তৈরি কোঠাবাড়িটার কথা—এমনি শেওড়া বনে ঘেরা পুকুরপাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হল কে জানে? এতদিন নিশ্চয় ভন্ডুলমামা মুখুজ্যেবাড়ি টাকা পাঠিয়েচে!

মামার বাড়িতে রাতে এসে পৌঁছোলাম। সকালে ওই পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি—ও মা, একী! ভন্ডুলমামার বাড়িটা যেমন তেমনি পড়ে আছে! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশি আর একটুও এগোয়নি, বনে-জঙ্গলে একেবারে ভরতি, ইটের গাঁথুনির ফাঁকে বট-অশত্থের বড়ো বড়ো চারা। আহা, ভন্ডুলমামা বোধ হয় টাকা পাঠাতে পারেনি আর!

ভন্ডুলমামার সম্বন্ধে সেবার অনেক কথা শুনলাম। ভন্ডুলমামা লালমণিরহাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েচে। তার এখন দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড়ো ছেলেটি আমারই বয়সি, ভন্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েচে। বড়ো ছেলেটির পৈতে হবে সামনের চৈত্রমাসে। সেই সময়ে ওরা দেশে আসতে পারে।

কিন্তু সেবার চৈত্রমাসের আগেই দেশে ফিরলুম, ভন্ডুলমামার সঙ্গে দেখার যোগাযোগ হয়ে উঠল না।

বছর তিনেক পরে। দোলের সময়। মামার বাড়ির দোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা জায়গা থেকে দোকানপসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদার শুরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাব মামার বাড়ি। আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি, অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পর তাঁকে রাজি করানো গেল। সারাপথ সে কী আনন্দ! একা টিকিট করে, রেলে চড়ে, মামার বাড়ি চলেছি। জীবনে এই সর্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েচি সেই আনন্দেই সারাপথ আত্মহারা!

কিন্তু এ সুখ সইল না। মামার বাড়ির স্টেশনে নেমেই কীরকম হোঁচট খেয়ে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপর পড়ে আমার হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অতি কষ্টে মামার বাড়ি পৌঁছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারিনে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি না লেখেন যে আমি আসবার সময় স্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি।

সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভন্ডুলমামার বাড়িটা অনেক দূর গাঁথা হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে, কিন্তু কড়ি এখনও বসানো হয়নি।

হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলুম যে আছাড় খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কী বলবেন, তখনকার মতো সে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল। উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভন্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেকদিন বন্ধ আছে মনে হল, গত বর্ষার পরে বোধ হয় আর মিস্ত্রি আসেনি। ঘরের মেঝেতে খুব জঙ্গল গজিয়েছে, গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ, বাড়ির উঠোনে বড়ো একটা সজনে গাছে প্রথম ফাল্গুনে ফুলের খই ফুটেছে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ভন্ডুলমামার

বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোটো দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড়ো ঘরটা বোধ হয় ভন্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলেমেয়েরা থাকবে। ভন্ডুলমামার বাপ আছে? কে জানে? তিনি বোধ হয় থাকবেন সিঁড়ির একপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে? বোধ হয় উঠোনের এক পাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভন্ডুলমামা ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদের উঠোনে কি আর এমন জঙ্গল থাকবে? ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করে খেলবে, হয়তো বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পূর্ণিমায় কী সংক্রান্তিতে। পুকুরপাড়ের এ জংলি চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে যে! আমার মামার বাড়ির এ পাড়াতে একঘর লোক বাড়বে . . . ওপাড়া থেকে খেলা করে ফেরবার পথে সন্ধে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না—ওদের বাড়িতে আলো জ্বলবে, ছেলেমেয়েরা কথা বলবে, কীসের আর তখন ভয়? দিব্যি চলে যাব।

আরও বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামার বাড়ি একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভন্ডুলমামার বাড়ির ছাদপেটানো হয়ে গিয়েছে, সিমেন্টের মেঝে, দালানের বাইরে রোয়াক হয়েছে কবে, আমি দেখিনি তো? রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ! কেবল একটুখানি এখনও বাকি, দরজা জানলায় এখনও কপাট বসানো হয়নি। বাঃ, ভন্ডুলমামার বাড়ি তাহলে হয়ে গেল!

ভন্ডুলমামা নাকি আজকাল বড়ো সুদখোর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন, আবার চলে যান। মাসকতক পরে আবার এসে কাবুলিওয়ালার মতো চড়াও হয়ে সুদ আদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেছে রত্নদত্ত।

তারপর এল একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মতো মামার বাড়িতে আর তত যাইনে, গেলেও এক-আধ দিন থাকি। সেই এক-আধদিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়তো দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভন্ডুলমামার বাড়িটা তেমনি জনহীন পড়ে আছে . . . বনজঙ্গল চারিপাশে আরও গভীরতর, কেউ কোনোদিন ওবাড়িতে পা দিয়েছে বলে মনে হয় না . . . একটা ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া চেহারা, শীতের সন্ধ্যায় বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কতবার ওবাড়িটা দেখেছি, সেই একই মূর্তি . . .

এমনি করে বছর কয়েক কেটে গেল।

ক্রমে এন্ট্রান্স পাস দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজে ঢুকলুম। সেবার সেকেন্ড ইয়ারের শেষ, এফ. এ. দেব, কী একটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েছি।

বোধ করি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পুবের জানলার ধারে খাটে শুয়ে আছি, বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়চি, এমন সময়ে একজন কালো শীর্ণকায় প্রৌঢ়লোক ঘরে ঢুকলেন। বড়ো মামিমা বললেন, এই তোর ভন্ডুলমামা, প্রণাম কর।

আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, বয়স হয়েচে, কলেজে পড়ি; নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশি মিটিং-এ ভলান্টিয়ারি করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই গেছে বদলে—তখন মনের কোন গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরোনো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভন্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েচে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুমমাত্র—

ভন্ডুলমামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলি বাঁধা, গলায় কীসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভন্ডুলমামা! উদাসীন ভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম।

ভন্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটু গায়ে পড়েই যেন। আমি কোন কলেজে পড়ি, কোন মেসে থাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায় জ্বালাতন করে তুললেন। আজকাল তিনি কলকাতায় চাকরি করেন, বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড়ো ছেলেও এবারে ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে—এসব খবরও দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আনবেন না?

ভন্ডুলমামা বললেন, আনব, শিগগিরই আনব বাবা। এখনও একটু বাকি আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কুয়ো—এ দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কলকাতায় বাসাভাড়া আর দুধের খরচ যোগাতেই . . . সেইজন্যেই তো খেয়ে না খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম, তবে ওই একটুখানি যা বাকি আছে . . . তা ছাড়া চিলেকোঠার ছাদটা এখনও . . . এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করব।

বলে কী! এখনও বাকি! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখে আসছি ভন্ডুলমামার বাড়ি উঠছে। এ তাজমহল নির্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব তো!

ভন্ডুলমামা আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন—সামান্য চাকরি, ছাপোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে? এখন তো বাসায় বাসায় কাটচে, আজ যদি চাকরি যায় তবে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব, তাই ভেবে আজ চৌদ্দ-পনেরো বছর ধরে একটু একটু করে বাড়িটা তুলচি। তবে এইবার আর দেরি হবে না, আসছে বছর সব এনে ফেলব। জায়গাটা বড়ো ভালোবাসি।

ভন্ডুলমামা বললেন তো চৌদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হল ভন্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে . . . যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধরে ভন্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে . . . শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন যেমন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে ভন্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে . . . ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।

পরের বছর আবার ভন্ডুলমামার সঙ্গে কলকাতাতেই দেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভন্ডুলমামা বললেন, এসো একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামি তোমায় দেখলে খুশি হবে। সামনের রবিবার তোমার নেমন্তন্ন রইল, অবিশ্যি, অবিশ্যি যাবে।

গেলুম, ভন্ডুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হল। ভন্ডুলমামা অনুযোগের সুরে বললেন, ওদের বলি, যা একবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসা বরবটি আর সিম লাগিয়ে রেখে এসেছি, মাচাও বেঁধে এসেছি, —তা কেউ কি কথা শোনে?

মামিমা ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন, যাবে সেখানে কেমন করে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধু সিম আর বরবটি পাতা চিবিয়ে তো মানুষ . . . তাতে বাড়ি হাট, আলগা, পাঁচিল নেই।

ভন্ডুলমামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয়ে ভয়ে যা বললেন তার মর্ম এই যে, মানুষ বাস না করলেই

বাড়িতে বট অশ্বত্থের গাছ হয়, ছাদ আঁটা হয়ে গেছে আজ অনেকদিন, কিন্তু কেউ বাস তো করে না। কাজেই বাড়ি খারাপ হতে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান বলে এখনও ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ? চৈত্র মাসের দিকে নাহয় করে দেওয়া যাবে। আর তোমরা সবাই যদি যাও, পাঁচিল আষাঢ় মাসেই করে দেওয়া যাবে।

বুঝলুম পাঁচিল পাতকুয়া এখনও বাকি। ভন্ডুলমামার বাড়ি এখনও শেষ হয়নি, এখনও কিছু বাকি আছে। কিন্তু এতদিন ধরে ব্যাপারটা চলচে যে, একদিক গড়ে উঠতে অন্যদিকে ধরচে ভাঙন।

এরপরে মামার বাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেছি ভন্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এ গাছটা খুঁড়ছেন ও গাছটা কাটছেন। ছেলেরা আসতে চায় না কলকাতা ছেড়ে। নিজেকেই আসতে হয়, দেখাশুনো করতে হয় বলে একদিন সলজ্জ কৈফিয়ৎও দিলেন। . . . পাঁচিল? হ্যাঁ তা পাঁচিল—সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে . . . সামনের বর্ষায় . . . ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন খেটে, ওই আমার বড়ো আদরের জায়গা—তোরা না থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।

আমি বললুম, ওখানে কেমন করে থাকেন? সারা গাঁয়েই তো মানুষ নেই, মামার বাড়ির পাড়া তো একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে।

—কী করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড়ো টান আমার যে। দেখো, চিরকাল পরের বাসায় পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে ঘরের কষ্ট বড়ো পেয়েছিলুম—তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুম রিটায়ার করে ওখানেই বাস করব। একটা আস্তানা তো চাই, এখন না হয় ছেলেপিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি, কিন্তু এরপরে দাঁড়াব কোথায়? তাই জলাহার করেও সারাজীবন কিছু কিছু সঞ্চয় করে ওই বাড়িখানা করেছিলুম! তা ওরা তো কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না থাকলে বাড়িখানা তো থাকবে না—আর এককাল না এককালে ছেলেদের তো এসে বসতেই হবে বাড়িতে। কলকাতার বাসায় বাসায় তো চিরকাল কাটবে না।

তারপর মামাদের মুখে ভন্ডুলমামার কথা আরও সব জানা গেল। ভন্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজে বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনও এ জায়গাটা ভাঙচেন, ওটা গড়চেন, নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করচেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুনই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভন্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোটো মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে; যা দু-একঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভন্ডুলমামা এ-গাঁ ও-গাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ির পাঁচটা বেগুন—এইরকম করে চেয়ে চিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।

তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমি ক্রমে বি.এ. পাস করে চাকরিতে ঢুকলুম। মামার বাড়ি আর যাইনে, কারণ সেগ্রাম আর যাবার যোগ্য নয়। মামার বাড়ির পাড়ায় গাঙ্গুলিরা, রায়েরা, ভড়েরা সব একে একে মরে হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ও পাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি ছাদ ভেঙে

ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে। শুধু একদিকের দোতলা-সমান দেওয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পুজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন সেখানে বড়ো বড়ো জগডুমুরের গাছ, দিনেই বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে। বিখ্যাত রায়দিঘি মজে গিয়েছে, দামে বোঝাই, জল দেখা যায় না, গোরু-বাছুর কচুরিপানার দামের ওপর দিয়ে হেঁটে দিব্যি পার হতে পারে।

সন্ধ্যারাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনও পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণহাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধরে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশপাখির ডানা ঝটাপটি!

আমার মামারাও গ্রামের ঘরবাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা করেছেন। ছোটো মামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সেখানে একবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটুলিহাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক পা ধুলো, বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড়-বসানো বাঁশের বাঁটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারিনি। পরে বুঝলুম ভন্ডুলমামা, এত বুড়ো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে! . . . শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য, শৌখিন আলাপি বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনে ও কথাবার্তার সুরে ভন্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সংকোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের শতরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত; তাঁর আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ করেছে এমন মনে হল না।

আমি গিয়ে ভন্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারে অচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভন্ডুলমামা খুব খুশি হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

ভন্ডুলমামা বললেন, না বাবা, আমি রিটায়ার করেছি। আজ বছর-পাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।

অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। ভন্ডুলমামা কিন্তু মামার বাড়ি থেকে নড়তে চান না। চার-পাঁচ দিন পরে কিছু চাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে-আনা বড়ো মামার সেই পুরোনো চটিজুতো জোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন, নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড়ো শখ হল, বয়েস হয়েছে কবে মরে যাব, বললুম তা দাও নবীন, জুতোজোড়াটা পুরোনো হলেও এখনও দু-তিন মাস যাবে। বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আঙুলে বড়ো লাগে বলে খালি পায়েই—

তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলুম শীর্ণকায় ভন্ডুলমামা ভারী চাল-ডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটিজুতোর ফটাং ফটাং শব্দ করতে করতে স্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর ওপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম, একটু দাঁড়ান মামা, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। ভন্ডুলমামার পুঁটলিটা নিজের হাতে নিলুম, টিকিট করে তাঁকে গাড়িতে তুলেও দিলুম। ট্রেনে ওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন, যেয়ো না হে একদিন, বাড়িটা দেখে এসো আমার—খাসা করেছি—কেবল পাঁচিলটা এখনও যা বাকি। কী করি, আমার হাতে আজকাল আর তো কিছু নেই, ছেলেরা

নিজেদের বাসার খরচই চালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই তো সব। দেখি, চেষ্টায় আছি—সামনের বছরে যদি . . .

ভন্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। কিন্তু এর মাস কতক পরে তাঁর বড়ো ছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ম্যাকমিলান কোম্পানির বাড়িতে চাকরি করে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারে খাবারের কৌটো, মুখে একগাল পান বউবাজারের ফুটপাত দিয়ে বেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে। আমিই ভন্ডুলমামার কথা তুললাম। হরিসাধন বললেন, বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন — আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন, তাতে রাজি নন। বুদ্ধিশুদ্ধি তো কিছু ছিল না বাবার, নেইও— সারা জীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জমত। ও গাঁয়ে যাবেই বা কেন বাপোঃ, যেমন জঙ্গল তেমনি ম্যালেরিয়া— তা ছাড়া লোকজন নেই, অসুখ হলে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পেছনে, বেচতে গেলে এখন ইট কাঠের দরেও বিকি হবে ভেবেছেন? কে নিতে যাবে —পাগল আপনি?

আমি বললুম, কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখন জাজ্বল্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরি করতে এত দেরি হয়ে গেল যে, ইতিমধ্যে গাঁ হয়ে গেল শ্মশান, লোকজন উঠে অন্যত্র চলে গেল, আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাঁথুনিও শেষ হল। কার দোষ দেবে?

তারপর ভন্ডুলমামার আর কোনো সংবাদ রাখিনি অনেক কাল। বছর তিনেক আগে একবার মেজো মামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে। পুজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তার মুখেই শুনলুম ভন্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হয়ে ক'দিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ বিশেষ দেখাশুনা করেনি, আর তাছেই বা কে গাঁয়ে যে দেখবে? এ অবস্থায় ঘরের মধ্যে মরে পড়েছিলেন। দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হয়। ভন্ডুলমামার এইখানেই শেষ।

এরপর আমি আর কখনো মামার বাড়ির গ্রামে যাইনি, হয়তো আর কোনোদিন যাওয়া না, বাড়িটাও আর দেখিনি, কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যে বাড়িটা গাঁথা হতে দেখেছি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার করে আছে। আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের, একগলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভন্ডুলমামার বাড়িটা একটা কায়াহীন উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই গাছ-গজানো উঠোন দিতে ঢোকবার পথ বনে ঢাকা, দরজা-জানলার কপাট নেই, থামে থামে কাঠ-থামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে।

আমার জীবনের সঙ্গে ভন্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কী করে ঘটল সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড়ো বড়ো ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে।

বিশেষ করে এইসব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্য যে, পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।

* * *

অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।

সই

দুপুরে বাসায় শুইয়া আছি, এমন সময় উচ্ছলিত খুশি ও প্রচুর তরল হাস্যমিশ্রিত তরুণ কণ্ঠস্বরে শুনিতে পাইলাম; ও সই, সই লো—ও—ও, ক্যামন আছ, ও সই?

পাশের ঘর হইতে আমার ভগ্নী (বিধবা, বয়স ত্রিশের বেশি) হাসির সুরেই বলিল, এসো সই এসো। বসো, কী ভাগ্যি যে এ পথে এলে?

—এই তোমার সয়া হাট কত্তি এল। নতুন গুড়ের পাটালি সের দুই করেলো আজ বেন বেলা। ছোটো

ছেলেডার আবার জ্বর আর ছর্দি। তাই তোমার সয়াকে হাটে পাঠালাম, আমি বলি সইয়ের সঙ্গে কতদিন দেখা হইনি। ছেলেডাকে নিয়ে আর হাটের ভিড়ের মধ্যে কনে যাব, সইয়ের বাড়ি একটু বসি।

কথার ভঙ্গিতে মনে হইল দুলে কি বাগদিদের মেয়ে। আমার বোনের সহিত সই পাতানো তাহার পক্ষে আশ্চর্য নয়, কারণ তাহারও শ্বশুরবাড়ি নিকটবর্তী এক পল্লিগ্রামেই। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য শহরের বাসায় থাকে।

দুপুরের ঘুম নষ্ট হইল। বোনের নবাগত সঙ্গীটি লেখাপড়া ভালো করিয়া শিখিলে এ্যানি বেসান্ট হইতে পারিত। মুখের তাহার বিরাম নাই! অনবরত বকিয়া যাইতেছে, এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ছেদস্বরূপ বলিতেছে, সই একটা পান দেবা? . . . দোক্তা খাও না? তা দ্যাও একটা এমনি পানই দ্যাও। ও হাবলা, এই তোর সেই সই-মা চিনতে পেরিলি, হাঁরে বোকা ছোঁড়া? গড় করলিনি যে সই-মাকে? নে পায়ের ধুলো আর নিতি হবে না, এমনি গড় কর।

পান খাইয়া সে আবার শুরু করিল, ঘরের কত ভাড়া দ্যাও, হ্যাঁ সই? তেরো টাকা? ও মা, কনে যাব। তা কী দরকার তোমার শহরে এত টাকা খরচ করে থাকবার, হ্যাঁ সই? দিব্যি তোমার ঘরডা-বাড়িডা রয়েচে গেরমে। আম-কাঁঠাল গাছগুলো দেখা-অবানে নষ্ট হয়ে যাবে। ন্যাও সই, মেয়ে যেন তোমায় চাকরি করে নিয়ে খাওয়াবে লেখাপড়া শিখে, হি---হি---হি---হি---বলিয়া সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে আর কি!

আমার শোবার ঘরের বাহিরের রোয়াকে তাহার হাসি ও বক্তৃতা চলিতেছে, তা-ও এমন উচ্চকণ্ঠে যে, কলকাতা শহরে হইলে ফুটপাতে ভিড় জমিয়া যাইত। আমি একে কাল রাত্রে মশার উপদ্রবে তেমন ঘুমাইতে পারি নাই, এমন বিপদও আসিয়া জোটে, আর জুটিল ঠিক কিনা দুপুরবেলাতেই। ছোটো বাসা, অন্য কোনো ঘরও নাই যে সেখানে গিয়া ঘুমাই।

— ও সই ছেলেডাকে একটু জল দ্যাও দিকিন, অনেকক্ষণ থে খাবে বলচে। তা ওর আবার লজ্জা দেখলে হয়ে আসে! জল চাবি তোর সই-মার কাছে, তার আবার লজ্জা দেখ না ছেলের?

আমার বোন জল আনিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিলে তাহার ছেলেকে আশ্বাসের সুরে বলিতে শুনিলাম— তোর সই-মা কি তোরে এমনি জল দেবে? কিছু খ্যাতি দেবে অখন দেখিস। দেখি? পেটটা পড়ে রয়েচে, অ মোর বাপ, সেই সকালে দুটা পান্তা খেয়োলো, আহা। পাটালি হাটে বিক্রি হলি চাল কিনে নে যাব, এ বেলা ভাত রাঁধব অখন। এখন তোমার সই-মা যা খাতি দ্যায়, তাই খেয়ে থাক। পয়সা নেই যে, মানিক।

এই সময় আমার বোন জল এবং বোধ হয় বাটিতে একটু গুড় লইয়া রোয়াকে গিয়া উপস্থিত হইল—কারণ শুনিলাম সে ছেলেটিকে বলিতেছে—নে, হাবলা, হাত পাত, গুড়টা খেয়ে জল খা। শুধু জল খেতে নেই।

হাবলা ও হাবলার মা যে একটু নিরাশ হইয়াছে, ইহা আমি তাহাদের গলার সুর হইতেই অনুমান করিলাম। হাবলার মা নিরুৎসাহভাবে বলিল, নে, গুড়টুকু হাতে নে। খেয়ে ফেল। যেন রোয়াকে না পড়ে—

ঠিক দুপুরের পরই সময়টা, এখন যে কিছু খাইতে দেওয়া প্রয়োজন, একথা আমার বোনের মাথায় আসে নাই বুঝিলাম। তা ছাড়া পল্লিগ্রামে এরকম নিয়মও নাই।

—ভালো কথা সই, তোমার জন্যি ভালো নক্কার বীজ এনেলাম। এই মোর আঁচলে বাঁধা ছেলো, তা রাস্তার মাঝখানে কোথায় পড়ে গিয়েচে। বাসায় জায়গা আছে গাছপালা দেবার? আসচে হাটবার আবার নিয়ে আসব।

এই সময়ে আমার ছোটো ভাগনে স্কুল হইতে ফিরিল। টিফিনের ছুটি হইয়াছে, সে সকালে খাইয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া ভাত খাইতে আসিয়াছে।

—ও টুলু, চিনতে পার তোমার সই-মারে? হি হি, ওমা ছেলে এরই মধ্যে কত বড়ো হয়ে গিয়েচে মাথায়। গায়ে এটা কী, জামা? বেশ জামাটা।

আমার ভাগিনেয় এই বয়সেই একটু চালবাজ। গ্রাম হইতে আগত এই সই-মাকে দেখিয়া সে যে খুব খুশি হইয়া উঠিয়াছে, এমন কোনো লক্ষণ তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। তাহার সই-মা বলিল, বেশ জামাটা টুলুর গায়ে। টুলুর আর কোনো ছেঁড়া-কাটা জামা-টামা নেই? হ্যাঁ সই? ছেলেডা এই শীতি আদুড় গায়ে থাকে। তোমার সয়া এবার অসুখে পড়ে গাছ কাটতে পারেনি। মোটে দশটা গাছে যা রস হয় তাই জ্বাল দিয়ে সের আড়াই পাটালি হয়। হাট্‌রা হাটে পাটালির দর নেই, তার ওপর ছ-পয়সা সের। ওই থেকে চাল ডাল, ওই থেকে সব। গাছের আবার খাজনা আছে। ছেলেডাকে একখানা দোলাই কিনে দেব ভাবচি আজ তিন হাটে, কোথা থে দেই বল দিকিন সই? কী রে—কী? হুঁ, উ উ? ছেলের আবার আবদার দেখো না?

আমার বোন বলিল, কী বলচে হাবুল?

—ওর কথা বাদ দ্যাও সই। রাস্তা দিয়ে ওই যে মিনসে চিনির কী বলে ওগুলো—

হাবুল বলিল, গোলাপছড়ি।

—তা যে ছড়িই হোক, ওই ওকে কিনে দিতে হবে। না, ও খায় না। কী ছড়ি? গোলাপছড়ি? হিহি, নাম দেখো না? —গোলাপছড়ি!

আমার ভাগনের দৃষ্টিও বোধ হয় ইতিমধ্যে গোলাপছড়ির দিকে পড়িয়াছিল। সে ছুটিয়া গিয়া ফিরিওয়ালাকে ডাকিয়া আনিল ও আমায় সটান আসিয়া বলিল, গোলাপছড়ি কিনব, মামা। পয়সা দাও।

বোধ হইল হাবুলও কিছু ভাগ পাইয়াছে, কারণ একটু পরেই হাবুলের মায়ের খুশিভরা গলার সুর শুনিতে পাইলাম, ন্যাও, হল তো? কেমন, বেশ মিষ্টি? খাও। পাটালির চেয়ে কি বেশি মিষ্টি? দেখি দে তো একটু গালে দিয়ে? কী জানি, এসব কখনো দেকিওনি চক্ষে।

একটু পরে টুলুকে ভাত দিতে তাহার মা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সেই সময়ে শুনিলাম, হাবুল নাকিসুরে বলিতেছে, না, মা, হুঁ। আর তোমারে দেব না। আমি তবে কী খাব?

হাবুলের মা তাহার সইকে আর পাইল না, কারণ ছেলেকে খাওয়াইয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া নিজের ঘরের মধ্যে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। অনুপস্থিত সইয়ের উদ্দেশে হাবুলের মা আপন মনে অনেক গল্প করিয়া গেল। খানিক পরে শুনিলাম বলিতেছে, ওই, সই কনে গেলে? ঘুমুলে না কি? মোরে আর একটা পান দেবা না?

কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না।

বেলা তিনটা বাজিয়াছে। আমি বেড়াইতে বাহির হইতে গিয়া দেখি অতি মলিন শাড়ি পরনে এক

বাইশ-তেইশ বছরের কালো-কালো মেয়ে একটা চুপড়ি পাশে রাখিয়া ঠিক পেঠার কাছে বসিয়া আছে। তার ছেলেটিও আছে বসিয়া তখনও গোলাপছড়ি চুষিতেছে। আমাকে দেখিয়া মেয়েটি থতমত খাইয়া মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল। দুপুরের বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ায় মনটা বিরক্ত ছিল, একটু রুক্ষ সুরেই বলিলাম, একটু সরে বসো পথ থেকে। চুপড়িটা রাস্তার ওপর কেন?

মেয়েটি ভয়ে ও সংকোচে জড়সড় অবস্থায় চুপড়ি সরাইয়া একপাশে রাখিয়া নিজে যেন একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু আগে উকিলদের ক্লাবে টেনিস খেলিয়া বাসায় ফিরিতেছি, দেখি বাসার পাশে বড়ো রাস্তার ধারে তুঁততলার শুকনো পাতার উপর আমার বোনের সই তাহার ছেলেটিকে লইয়া বসিয়া আছে। পাশে সেই চুপড়ি ও একটা ছোটো ময়লা কাপড়। সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই, তুঁতগাছের মগডালেও আর রোদ দেখা যায় না। হাবুলের বাপ এখনও পাটালি বিক্রি করিয়া হাট হইতে ফিরে নাই। মেয়েটি যেন কেমন ভরসা-হারা নিরাশ মুখে বসিয়া আছে, অন্তত তেমন হাসিখুশির ভাব আর দেখিলাম না।

চাউল

মানভূমের টাঁড় ও জঙ্গল জায়গা। একটু দূরে বড়ো পাহাড়শ্রেণি, অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বসন্তকালের শেষ, পলাশ ফুল বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েচে, নাকটিটাড়ের উঁচু ডাঙা জমি থেকে যতদূর দেখা যায়, শুধু রক্তপলাশের বন দূরে নীল শৈলমালার কোল ছুঁয়েছে।

জঙ্গল দেকতে এসেচি এদিকে, কাজেই রাস্তার ধারে পলাশবনের প্রান্তে ডাকবাংলোতে থাকি, জঙ্গলের কাঠে কেমন আয় হবে তাই দেখে বেড়াই। একদিন সন্ধের আগে নাকটিটাড়ের বন দেখে ফিরচি, পথের ধারে একটা হরিতকী গাছের তলায় একটি লোক ও একটি ছোটো মেয়ে বসে পুঁটলি খুলে কী খাচ্ছে। জনহীন পথিপার্শ্ব, কেউ কোনোদিকে নেই—সন্ধেরও আর অল্পই বিলম্ব, সামনে বাঘমুণ্ডীর বনময় পথ, এমন সময়ে লোকটা কী করে জানবার আগ্রহে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মাথার চুল কিছু পাকা, কিছু কাঁচা। পুঁটুলির মধ্যে খানদুই ছেঁড়া ন্যাকড়া, একখানা কাথা আর কিছু মকাই--সের দুই হবে, একটা খালি চায়ের কিংবা বিস্কুটের টিন। বোধ হয় সেটাই তৈজসপত্রের অভাব পূর্ণ করচে সবদিক দিয়ে। সঙ্গের মেয়েটির বয়স চার কি পাঁচ। পরনে ছোট্ট একটু ময়লা ন্যাকড়া, মেয়েটার কোমরে ঘুনশি।

আমি বললাম, কোথায় যাবে হে, বাড়ি কোথায়?

লোকটি মানভূমি বাংলায় বললে, তোড়াং হে . . . টুকু আগুন আছে?

-দেশলাই? আছে, দিচ্ছি। . . . তোড়াং কতদূর এখান থেকে?

- টুকু দূর আছে বটে। পাঁচ কোশ হবেক।

—কোথা থেকে আসা হচ্চে এমন সন্ধেবেলা?

—হেই সেই পুরুলিয়া থিকে। . . . আগুন দাও বাবু। শোরিল একেবারে কাবু হয়ে গিয়েছে। হেই মেয়েটার মা মরে গেল ওর দু-বছর বয়সে। ওকে রেখে জঙ্গলে কাঠের কাম করতি যাইতে পারি নাই—তাই পুরুলিয়া গেঁইছিলি। ভিক্ষা মাঙি দু-বছর রঁইয়েছিলি।

লোকটির কথাবার্তার ধরন আমাকে আকৃষ্ট করলে। ডাকবাংলোতে সন্ধ্যার সময় ফিরেই বা কী হবে এখন? সেখানেও সঙ্গিহীন ঘরদোর। তার চেয়ে একটু গল্প করা যাক এর সঙ্গে। কাছে একটা বড়ো পাথর পড়েছিল, সেটার ওপর বসে ওকে একটা বিড়ি দিলাম। নিজেও একটা ধরালাম। লোকটার বাড়ি নাকি পাঁচ-ছ ক্রোশ দূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র বন্য গ্রামে, বাঘমুণ্ডী ও ঝালদা শৈলমালা ও অরণ্যের মধ্যবর্তী কোনো নিভৃত ছায়াগহন উপত্যকাভূমিতে, পলাশ, মহুয়া, বট, কেঁদ গাছের তলায়। ওর আর দুটি সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার পরে এই মেয়েটি হয় এবং মেয়েটির বয়স যখন দু-বছর, তখন মা হল মৃত্যুপথযাত্রী। লোকটা জঙ্গলের কাঠ ভেঙে এনে চন্দনকিয়ারির হাটে বিক্রি করত এদেশের অনেক গ্রাম্যলোকের মতো। কিন্তু ঘরে কেউ নেই দু-বছরের মেয়েকে দেখবার, তাকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চ পাহাড়ে উঠে রৌদ্র ও বর্ষায়

কী করে কাঠ ভাঙে? তাই ঘরে আগড় বন্ধ করে ও চলে গিয়েছিল অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় পুরুলিয়া শহরে।

আমি বললাম, কাঠের কাজে আয় হত কেমন?

লোকটা বিড়িতে টান দিয়ে বললে, বোঝা পিছু তিন আনা, চার আনা। জঙ্গলে ছাড় লিত দু-পয়সা। চাল ছস্তা ছিলি। হইয়ে যেতো পেটের ভাত দুজনার। তারপর বাবু মেয়্যাটা হোলেক, ওর মা মর্যা গেলেক। তখন কচি মেয়্যাটারে ফেলে জঙ্গলে যেতে মন নাই সরলেক। বলি যাই পুরুলিয়া, ভারী শহর, পেটের ভাত দুজনার হইয়ে যাবেক।

—পুরুলিয়া বড়ো জায়গা?

—ওঃ বাবু, ইধার থিকে উধার যাওয়ার কূলকিনারা দু-বছরে নাই পাইলেক। ভারী শহর বাবু . . .

আমি ওকে আর একটা বিড়ি দিলাম। গল্প জমে উঠেচে। বললাম, তারপর . . .?

তারপর পুরুলিয়া শহরে কীভাবে গেল, তার গল্প করলে। ওদের পাশের গাঁয়ের একজন লোক পুরুলিয়া শহরে কী একটা কাজ করে, তার ঠিকানা খুঁজে বার করতে দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়েছে, তখন এক বড়োলোকের বাড়ির ফটকে মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করতে দাঁড়াল। তারা দুটি পয়সা দিলে। দু-পয়সার ছোলা কিনে বাপ-মেয়েতে রাত কাটিয়ে দিলে গাছতলায় শুয়ে। পুলিশে আবার শুতে দেয় না; অর্ধেক রাত্রে এসে লণ্ঠনের আলো ফেলে বলে, হিঁয়াসে হঠ যাও! তার পরদিন আলাপি লোকের সন্ধ্যান মিলল। গিয়ে দেখে দেশে সে লোকটা যত বড়াই করে, আসলে সে তত বড়ো নয়। সামান্য একটা দু-কামরা ঘরে সে আর তার স্ত্রী থাকে—তামাক মেখে বিক্রি করে মাথায় নিয়ে, কখনো জলের কুঁজো পাইকেরি দরে কিনে ফিরি করে খুচরো বেচে—এইসব উঞ্ছবৃত্তি। অথচ দেশে বলেছিল সে বড়ো সাহেবের আরদালি।

যাহোক অনেক বলা-কওয়াতে সে জায়গা একটু দিলে—ঘরের বাইরের দাওয়ার একপাশে শুয়ে থাকতে হবে, তবে নিজের এনে খাওয়া-দাওয়া, তার ভার সে নেবে না। বছর দুই সেখানেই থেকে চলেছিল যা হয় এরকম—তারপর এই আকাল পড়ল, চালের দাম চড়ল—শহরে চালের দাম হল আঠারো টাকা। ভিক্ষে আর তেমন লোকে দিতে চায় না—তাও হয়তো চলত যা হয় করে, কিন্তু যাদের বাড়িতে থাকা তারা গোলমাল করতে লাগল। তারা আর জায়গা দিতে চায় না, বলে, আমাদের লোক আসবে, বাড়ি ছেড়ে দাও। রোজ গোলমাল করে, তাই আজ তিন দিন শহর থেকে বেরিয়ে জন্মভূমি তোড়াং গ্রামে চলেচে।

ছোটো মেয়েটা এতক্ষণ খালি বিস্কুটের টিন হাতে করে বাজাচ্ছিল।

ওর দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চেয়ে লোকটা বললে, এর নাম রেঁখেছে থুপি।

আমি বাপের মনে আনন্দ দেবার জন্যে বললাম, থুপি? বেশ নাম।

বাপ সগর্বে বললে, হাঁ, থুপি। তারপর আমায় বললে, বাবু, তামাক কিনবার পয়সা দিবেন দুটি?

আমি পয়সা সামান্যই নিয়ে বেড়াতে বার হয়েচি, জঙ্গলের পথে পয়সা কী করব? ওকে দুটি মাত্র পয়সা দিতে পারলাম। থুপি কী একটা বললে ওর বাবাকে, বাবা তাকে কাঁধে নিয়ে চলল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম—

রাস্তা যেখানে উঁচু হয়ে ওদিকের সব দৃশ্য ঢেকে দিয়েচে, সেখানে ওর পাঁচ বছরের মেয়েটিকে কাঁধে

নিয়ে পুঁটুলি বগলে ও চলেচে—সেদিকেই অস্তদিগন্ত ও সূর্যাস্ত, রঙিন আকাশের পটে ওর মূর্তি দেখাচ্ছে ছবির মতো, কারণ আগেই বলেছি রাস্তা উঁচু হওয়ার দরুন সেখানে আর কিছু দেখা যায় না, রাস্তাই সেখানে চক্রবালরেখার সৃষ্টি করেচে।

মনে মনে ভাবলাম, ওর কোথাও অন্ন নেই, গৃহ নেই—পাঁচ বছরের মেয়েকে কত স্নেহে কাঁধে তুলে ও যে চলল গ্রামের দিকে, সেখানে অন্ন কী জুটবে এ দুর্দিনে, --যদি পুরুলিয়া শহরে না জুটে থাকে। কোনো বৃথা আশার আকর্ষণ ওকে নিয়ে চলেচে গ্রামের মুখে? তার পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। . . .

এ হল গত মাসের কথা। তখনও চাল ছিল ষোলো টাকা, আঠারো টাকা মণ, ক্রমে তাই দাঁড়াল বত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা। এইসময় একবার কার্য উপলক্ষে বিহার থেকে আমায় যেতে হল বাংলাদেশে, পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলায়। মানুষের এমন কষ্ট কখনো চোখে দেখিনি—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হবে।

যে আত্মীয়ের বাড়ি ছিলাম তাদের বাড়িতে সন্ধ্যা থেকে কত রাত পর্যন্ত শীর্ণ, বুভুক্ষু, কঙ্কালসার বালকবালিকা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় কালো হাঁড়ি উঁচু করে তুলে দেখিয়ে বলচে, একটু ফেন দিন মা, একটু ফেন! ... অনাহারে মৃত্যুর কত মর্মন্তুদ কাহিনি শুনে এলাম সারা পথ কুমিল্লা থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত—স্টিমারে, ট্রেনে।

বিহারে এসে দেখি এখানেও তাই। বহেরাগোড়া স্কুলের বোর্ডিঙে ড্রেন্ দিয়ে যে ভাতের ফেন গড়িয়ে পড়ে, তাই ধরে খাবার জন্যে একপাল বুভুক্ষু ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে হাঁড়ি হাতে দু-বেলা বসে থাকে—তারই জন্যে কী কাড়াকাড়ি!

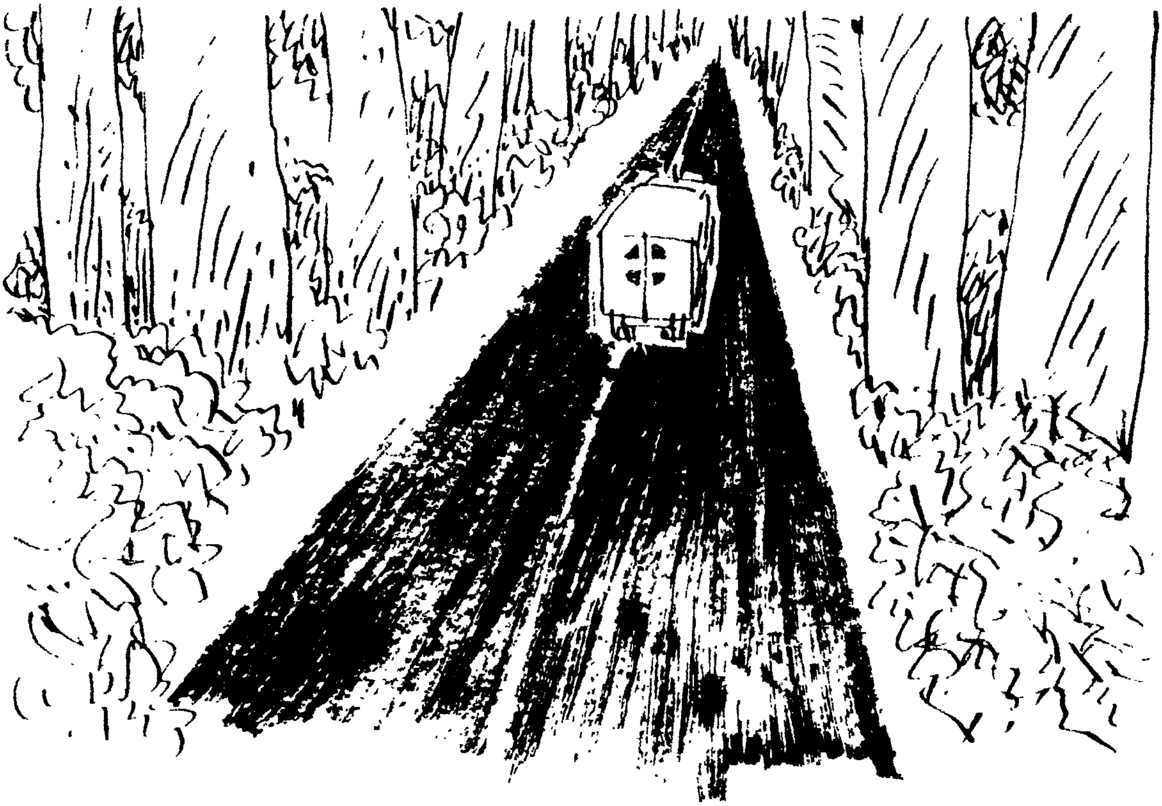

হেডমাস্টার বললেন, এই গ্রামের ডোম আর কাহারদের ছেলেমেয়ে এখানেই পড়ে আছে ভাতের ফেনের জন্যে—সকাল থেকে এসে জোটে আর সারাদিন থাকে, রাত নটা পর্যন্ত। সামান্য দুটো ভাতের জন্যে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে।

পুরুলিয়া থেকে আদ্রা যাচ্ছি, প্ল্যাটফর্মের খাবারের দোকানে খাবার খেয়ে পাতা ফেলে দিয়েচে লোকে—তাই চেটে চেটে খাচ্ছে উলঙ্গ, কঙ্কালসার ছোটো ছোটো ছেলেরা—অথচ সে পাতায় কিছুই নেই! কী চাটছে তারাই জানে!

এই অবস্থার মধ্যে ভাদ্র মাসের শেষে আমি এলাম একটা জায়গায়, যেখানে অনেক লোক খাটচে একজন বড়ো কন্ট্রাক্টরের অধীনে ডাইনামাইট দিয়ে পাথর ফাটানো কাজে। জঙ্গলের মধ্যে পাথর ফাটিয়ে এরা টাটায় চালান দিচ্ছে, স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে নতুন ইজারা নেওয়া পাথর-খাদান।

একদিন সেখানকার ছোট্ট ডাক্তারখানাটার সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। ডাক্তারখানাটার সংকীর্ণ বারান্দাতে একজন কুলি শুয়ে আছে। পিঠে ব্যান্ডেজ বাঁধা—ব্যান্ডেজ ভিজে রক্ত দরদরিয়ে পড়ে সিমেন্টের রোয়াক ভিজিয়ে দিয়েচে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

ডাক্তারবাবু বললেন, এমন মাঝে মাঝে এক আধটা হচ্ছেই। ব্লাস্টিং করতে গিয়ে পাথর ছুটে লেগে মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েচে। সেলাই করে দিয়েচি, এখন টাটানগর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স আসচে!

ভিড় একটু সরিয়ে কাছে গিয়ে দেখি একটা পাঁচ-ছ বছরের মেয়ে ওর কাছে একটু দূরে বসে—কিন্তু সে কাঁদেও না, কিছুই না—নির্বিকার ভাবে বসে একটা খড় তুলে মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে।

আমি তাকে দেখেই চিনলাম—আট মাস পূর্বে মানভূমের বন্য অঞ্চলে দৃষ্ট সেই ক্ষুদ্র বালিকা থুপি!

আহত কুলির মুখ ভালো করে দেখে চিনলাম—এ সেই থুপির বাবা, যে সগর্বে বলেছিল, এর নাম রেখেচি থুপি।

আশপাশের দু-একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কোথা থেকে এসেছিল জানো?

একজন বললে, মানভূম জিলা থেকে আজ্ঞে।

—কী গাঁ?

—তোড়াং।

—ওর কোনো আপনার লোক এখানে নেই?

—কে থাকবেক আজ্ঞে—ওর ওই বিটি ছানাটা আছে। কত কত ধুর গিক্যা এখেনে কাজ করতে এসেচে, চাল দেয় সেই জন্যে আজ্ঞে।

—কোম্পানি কত করে চাল দেয়?

—হপ্তায় পাঁচ সের মাথাপিছু।

সুতরাং থুপির বাপের ইতিহাস আমি অনেকটা অনুমান করে নিলাম। গ্রামে গিয়ে দেখলে বাড়ি ভেঙেচুরে গিয়েচে, চাল মেলে না, মিললেও ওর সামর্থের বাইরের জিনিস তা কেনা। মকাই ও বিরি কলাই, তারপরে বুনো কচু ও ভুঁই-কুমড়োর মূল খেয়ে যতদিন চলবার চলল—কারণ ঠিক এই ইতিহাস আমি বিভিন্ন অঞ্চলগুলি থেকে আগত প্রত্যেক কুলির মুখেই শুনেচি—শেষে এখানে ও এসে পড়ল মজুরি, বিশেষ করে চাল পাওয়ার লোভে। পয়সা দিলেও গ্রামে আজকাল চাল মিলচে না, আমি সেদিন বহেরাগোড়া অঞ্চলে দেখে এসেছি।

অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এল। ধরাধরি করে থুপির বাবাকে গাড়িতে ওঠানো হল—সে কেবলমাত্র একবার যন্ত্রণাসূচক 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া অত আদরের অত গর্বের বস্তু থুপির নামও করলে না, তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

ডাক্তার বললেন, টাটা এখান থেকে সাতাশ মাইল রাস্তা। ঝাঁকুনিতেই বোধ হয় মারা যাবে—বিশেষ করে রক্ত বন্ধ হল না যখন এখনও।

দু-ধারে শালবনের মধ্যবর্তী রাঙা মরুম মাটির সোজা রাস্তা বেয়ে অ্যাম্বুলেন্সের মোটর ছুটল থুপির বাবাকে নিয়ে—পুনরায় অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে, পুনরায় পশ্চিমের আকাশ লক্ষ করে জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে। অতি সাধের অনাথা থুপিকে কার কাছে রেখে চলল, সে হিসেব নেবার অবসর তখন তার নেই।

পৈতৃক ভিটা

মধুমতী নদীর ওপরেই সেকালের প্রকাণ্ড কোঠাবাড়িটা।

রাধামোহন নদীর দিকের বারান্দাতে বসে একটা বই হাতে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু বইয়ে মন বসাতে পারলে না।

কেমন সুন্দর ছোট্ট গ্রাম্য নদীটি, ওপারে বাঁশবন, আমবন---বহুকালের। ফলের বাগান যেন প্রাচীন অরণ্যে পরিণত হয়েছে। একা এত বড়ো বাড়িতে থাকতে বেশ লাগে। খুব নির্জন, পড়াশুনা করবার পক্ষে কিংবা লেখাটেখার পক্ষে বেশ জায়গাটি। তাদেরই পৈতৃক বসতবাটি বটে, তবে কতকাল ধরে তাদের কেউ এখানে আসেনি, কেউ বাস করেনি।

রাধামোহনের বাবা শ্যামাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর বাল্যবয়সে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যান। মেদিনীপুরে তাঁর মামার বাড়ি। সেখান থেকে লেখাপড়া শিখে মেদিনীপুরে ওকালতি করে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন এবং সেখানে বড়ো বাড়িঘর তৈরি করেন। স্বগ্রামে যে একেবারেই আসেননি তা নয়, তবে সে দু-একবারের জন্যে। এসে বেশিদিন থাকেনওনি। অত বড়ো পয়সাওয়ালা উকিল, থাকলে তাঁর চলত না।

গ্রামের বাড়িতে জ্ঞাতিভাইরা এতদিন ছিল, তারা সম্প্রতি এখান থেকে উঠে গিয়ে অন্যত্র বাস করছে, কারণ গ্রামে বসে থাকলে আর সংসার চলবার কোনো উপায় হয় না।

যা কিছু জমিজমা আছে, না দেখলে থাকে না। বাড়িটারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। নইলে বাড়িঘর সব নষ্ট হয়ে যাবে।

রাধামোহন নিজে গত বৎসর ওকালতি পাশ করে পরলোকগত পিতৃদেবের পসারে বসেছে। এবার দেশের চিঠি পেয়ে পুজোর ছুটিতে একাই গ্রামে এসেছে বাড়িঘর এবং জায়গাজমির একটা বিলিব্যবস্থা করতে।

পাশের বাড়ির বৃদ্ধ ভৈরব বাঁড়ুজ্যে দু-দিন খুব দেখাশুনা করছেন। তিনি জোর করে তাঁর বাড়িতে রাধামোহনকে নিয়ে গিয়ে কদিন খাইয়েছেন। নইলে রাধামোহন নিজেই রেঁধে খাবে পৈতৃক ভিটেতে, এই ঠিক করেই এসেছিল।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যের বড়ো ছেলে কেষ্ট এসে বললে, দাদা, চা খাবেন, আসুন।

—তুই নিয়ে আয় এখানে কেষ্ট। বেশ লাগছে সন্ধেবেলাটা নদীর ধারে।

—আনব?

—সেই ভালো, যা।

গ্রামের সবাই অবিশ্যি আত্মীয়তা করেছে, ভালোবেসেছে। বৃদ্ধ লোকেরা বলেছে, আহা তুমি শ্যামাকান্তদার ছেলে, কেন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে যাবে। আমরা তো মরিনি এখনও। এসো আমাদের বাড়ি।

রাধামোহন সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।

কেষ্ট চা দিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে গেল। তারপর রাধামোহন আবার একলা। অন্ধকার রাত্রি, মধুমতীর জলে তারাভরা আকাশের ছায়া পড়েছে। রাধামোহন বসে বসে ভাবছে, এই এত বড়ো বাড়িটা তার ঠাকুরদাদা তৈরি করেছিলেন কেন এখানে? সেকালের পুলিশের দারোগা ছিলেন তিনি। অনেক পয়সা রোজগার করেছেন বটে কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল না সেকালের লোকের। এই বনজঙ্গলে ভরা গ্রামে কেউ পয়সা খরচ করে বাড়ি করে? কী কাজে আসছে এখন?

আচ্ছা সুরকির কলওয়ালারা বাড়িটা নেয়? তাহলে পুরোনো ইটের দরে বাড়িটা বিক্রি করা যায়।

খুট করে কীসের শব্দ শোনা গেল।

রাধামোহন দেখলে, একটি দশ-এগারো বছরের টুকটুকে ফর্সা মেয়ে ঘরের দাওয়ার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ঘরের মধ্যে হ্যারিকেন জ্বলছে, বারান্দাতে সামান্য আলো এসে পড়েছে, সুতরাং একেবারে অন্ধকারে সে বসে নেই।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে একবার ছেলে পাঠায়, একবার মেয়ে পাঠায়, লোকটা খুব যত্ন করছে বটে।

ও বললে, কী খুকি, ভাত হয়েছে বুঝি?

একটু পরে মেয়েটি সংকোচের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

রাধামোহন বললে, তোমার নাম কী?

—লক্ষ্মী।

—বেশ নাম। পড়ো?

—উঁহু।

—গান জানো?

—উঁহু।

রাধামোহন হেসে বললে, তবে তা মুশকিল দেখছি, বিয়ের বাজারে তুমি যে বিপদে পড়বে। রান্না?

বালিকা ঘাড় নেড়ে জানায় সে জানে।

— ওই একটা গুণ রয়েছে তোমার। কী কী রান্না জানো?

—স-ব।

—সব? বাঃ বেশ খুকি তুমি। বসো।

বালিকা সলজ্জভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, না, বসব না।

—কেন? কাজ আছে?

—না।

—তবে বসো।

—না, আমি যাই। তুমি খেয়ে এসো।

—যাচ্ছি। ভাত হয়েছে?

—তোমার খুব খিদে পেয়েছে—না? যাও খেয়ে এসো।

রাধামোহন কী একটা বলতে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলে খুকি কখন চলে গিয়েছে। সে একটু পরে বাঁড়ুজ্যেবাড়ি খেতে গেল।

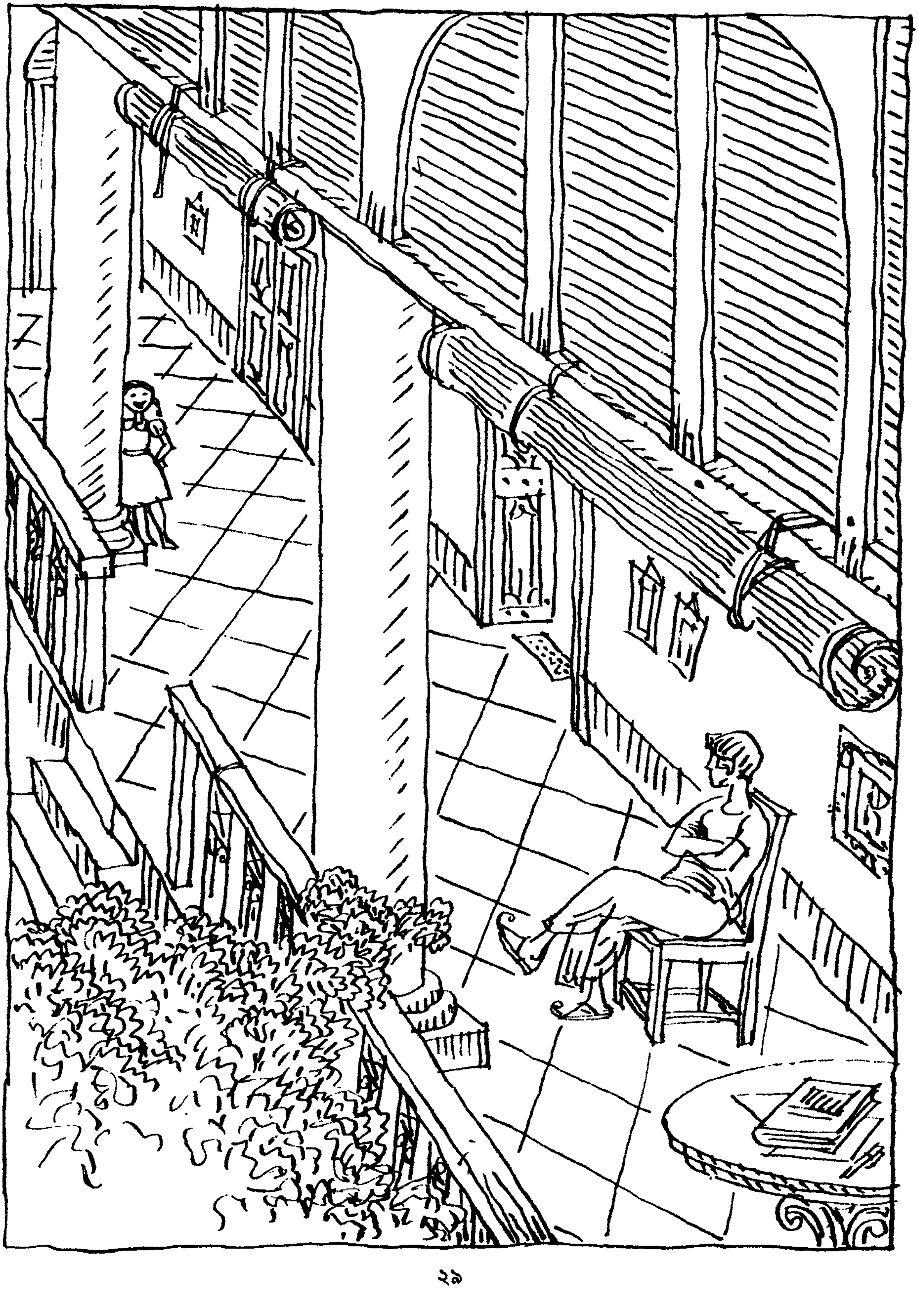

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে বললেন, এসো বাবাজি, এসো। রান্নাও হয়ে এল প্রায়।

রাধমোহন বললে, হ্যাঁ, আপনার মেয়ে ডাকতে গিয়েছিল যে—

খাওয়া-দাওয়া করে রাধামোহন চলে এল। একা নির্জন বাড়িতে তার বেশ লাগে। তার পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষেরা যেন অদৃশ্য চরণে এখানে বিচরণ করেন। এই বাড়িতে তার পিতামহ বাল্যকালে খেলে বেড়িয়েছেন। তার পিতামহী নববধূরূপে প্রথম এসে, দুধে-আলতায় পা রেখে দাঁড়িয়েছেন এবাড়ির প্রাঙ্গণে। আজ তারা বিদেশে গিয়ে বড়ো বাড়ি ফেঁদে বাস করছে, দেশকে ভুলেছে।

গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে সব পূর্বপুরুষেরা যেন এসে অনুযোগ করেন, কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে? কী করেছিলাম আমরা?

পরদিন সকালে উঠে সে নিজের জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত রইল, সারাদিন কাটল সেভাবে। রাত্রে বারান্দাতে বসেছে, আবার সেই খুকিটি এসে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। প্রথমটা রাধামোহন টের পায়নি—বড়ো লাজুক মেয়ে, নিঃশব্দচরণে কখন এসে যে দাঁড়ায়!

রাধামোহন বললে, ও খুকি!

—উঁ?

—ভাত হয়েছে নাকি?

—আজ দেরি হবে। মাংস হচ্ছে তোমার জন্যে।

—সত্যি? তবে তো আজ 'ফিস্ট'-এর ব্যবস্থা। ও, তুমি বুঝি 'ফিস্ট' বুঝতে পারলে না? ভোজ যাকে বলে। কী বল?

খুকি হেসে চুপ করে রইল। বেশ মেয়েটি! বেশি কথা বলে না, শান্ত সলজ্জ ব্যবহার।

রাধামোহন বললে, তোমার মামার বাড়ি কোথায় খুকি?

—ভুলে গিয়েছি।

—ভুলে গিয়েছি কীরকম? সেখানে যাও না? খুকি ঘাড় নেড়ে বললে—না।

রাধামোহনের হাসি পেল খুকির কথায়। বেশ নিঃসংকোচ ভাব ওর।

খুকি আবার বললে, তুমি একা এসেছ কেন?

রাধামোহন হাসতে হাসতে বললে, কেন বলো তো?

—বৌঝিদের নিয়ে এসো। এত বড়ো বাড়ি পড়ে আছে। আমোদ করুক।

—তোমার তাই ইচ্ছে খুকি?

—খু-উ-ব। আমি তো তাই চাই।

—কেন?

—কতকাল এ বাড়ি এমনই পড়ে আছে না! কেউ পিদিম দেয় না।

একথাটা ওর মুখ থেকে শুনে রাধামোহনের আশ্চর্য লাগল। এতটুকু মেয়ের মুখে এমন কথা! পাকা গিন্নির মতো।

ও কৌতুকের সঙ্গে বললে, তোমার তাতে খারাপ লাগে নাকি খুকি?

—বাঃ, লাগে না! তোমরা সবাই এসো। বাড়িতে শাঁখ বাজুক, সন্ধের পিদিম দেওয়া হোক।

কথা শেষ করেই সে ব্যস্তভাবে বললে, তোমার খুব খিদে পেয়েছে, না? বড্ড রাত হয়ে গেল।

—না না, এমন আর বেশি রাত কী।

—তোমার আবার সকালে খাওয়া অব্যেস।

—তুমি কী করে জানলে খুকি?

অস্ফুট হাসির সুর মাত্র শোনা গেল, কোনো উত্তর এল না।

একটু পরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে খুকি বললে, ভালো লাগে, বড্ড ভালো লাগে।

রাধামোহন ওর দিকে চেয়ে বললে, কী ভালো লাগে খুকি?

—এই তুমি আজ এসেছ। কেউ তো কখনো আসে না এবাড়িতে। তুমি যাও, মাংস রান্না হয়ে গিয়েছে!

—হয়ে গিয়েছে! তুমি কী করে জানলে?

খুকি হেসে বললে, আমি জানি যে! যাও তুমি।

—দাঁড়াও, আমি মুখটা ধুয়ে আসি। একসঙ্গে যাব। মুখ ধুয়ে এসে কিন্তু রাধামোহন খুকিকে আর দেখতে পেলে না। চঞ্চল মন ছেলেমানুষের, আগেই চলে গিয়েছে। বেশ খুকিটি, কেমন পাকা পাকা কথা বললে। হাসতে হাসতে প্রাণ যায়।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে ওকে দেখে বললে, এসো এসো বাবাজি। এই তোমায় ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। আজ একটু রাত বেশি হয়ে গেল, একটু মাংস নেওয়া হল আজ। বলি রোজ রোজ ডাল-ভাত ওরা খেতে পারে না। আমার বাড়ি আজ দু-দিন খাচ্ছে, সে আমার ভাগ্যি। নইলে ওদের অভাব কী। তাই আজ—

রাধামোহন সলজ্জভাবে বললে, না না, সে কী কথা! যা জুটবে তাই খাব। পর ভাবেন নাকি কাকা? আমি তো বাড়ির ছেলে।

পরদিনও আবার খুকি সন্ধ্যার সময় এসে হাজির।

রাধামোহন বললে, এসো খুকি, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

খুকি হেসে বললে, আমার কথা?

—সত্যি তোমার কথা!

খুকি ছেলেমানুষিভাবে ঘাড় দুলিয়ে বললে, কেন, আমি জানি।

—তুমি জানো?

—জানি। কিন্তু বলব না।

রাধামোহন আজ খানিকটা সন্দেশ আনিয়ে রেখেছে, খুকিকে দেবে বলে। অবিশ্যি আনিয়েছিল হরি নন্দীর চাকর অমূল্যকে দিয়ে, ইসলামকাটির বাজার থেকে। ইসলামকাটির সন্দেশ এঅঞ্চলে বিখ্যাত। অমূল্য দেখা যাচ্ছে গল্প করে বেড়িয়েছে। রাধামোহন মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল অমূল্যর উপর। খুকিকে হঠাৎ খুশি করে দেবে সন্দেশ হাতে দিয়ে ভেবেছিল। সেটা আর হল কই।

তবুও রাধামোহন বললে, না, তুমি জানো না খুকি। কী বলো তো?

খুকি মৃদু হেসে বললে, জানি আমি।

ওর হাসির মধ্যে এমন একটা বিজ্ঞতা আছে যে, রাধামোহন আর কোনো প্রশ্ন করলে না এ নিয়ে। ও জানে। ওর মৃদু হাসির মধ্যে দিয়েই সে কথা বোঝা গেল।

অমূল্যটা আচ্ছা তো! পাড়াগাঁয়ের লোকের পেটে কোনো কথা থাকে!

খুকি আবদারের সুরে বললে, কই, দাও আমাকে সন্দেশ?

রাধামোহন ব্যস্ত হয়ে ওকে সন্দেশ দিতে গেল, কিন্তু ওকে আর সেখানে দেখা গেল না। চঞ্চলা বালিকা, কখন হঠাৎ চলে গিয়েছে। ওর ধরন বড়ো আশ্চর্য রকমের!

আহারের সময় ভৈরব বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে ও সন্দেশটা নিয়েই গেল! বললে, খুকি বড়ো লাজুক, তখন চলে এল, ওকে একটু এই—

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে হেসে বললে, খুকি বুঝি তোমার কাছে গিয়েছিল?

—রোজই যায়। গল্পসল্প করে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ও একটু লাজুক বটে। খুব ছেলেমানুষ তো!

পরদিন সন্ধ্যায় খুকি আবার নির্দিষ্ট স্থানটিতে এসে দাঁড়াল বারান্দাতে।

রাধামোহন বললে, কাল অমন করে গেলে কেন তুমি? আমি ভারী রাগ করেছিলাম কিন্তু।

খুকি হেসে চুপ করে রইল।

—খেয়েছিলে সন্দেশ?

—বা রে, যখন তুমি বললে, ওই তো আমার খাওয়া হয়ে গেল।

পরক্ষণেই সে যেন স্নেহের সুরে বললে, তুমি এই এসেছ, আমার কত ভালো লাগছে! বাড়িতে পিদিম জ্বলছে। একা একা ভালো লাগে?

—শহরে যাবে? চলো আমার সঙ্গে। চলো—

—আমার এখানেই ভালো। ওসব আমার ভালো লাগে বুঝি?

—বাঃ, কত টকি-ছবি, কত খাবারদাবার—

—হোক গে। আমার তাতে কী। তুমি আবার আসবে বলো।

—আসব নিশ্চয়ই। কেন আসব না?

—এতদিন তো আসনি। ভিটেতে সন্ধের সময় পিদিম জ্বলেনি তো? আচ্ছা আসি আজ। তুমি তো মঙ্গলবারে যাবে?

রাধামোহন একটু আশ্চর্য হল। মঙ্গলবারে সে যাবে, বলেছিল ভৈরব বাঁড়ুজ্যেকে। ভৈরব কাল আবার বাড়িতে গল্প করেছে!

তারপর দু-দিন রাধামোহন বৈষয়িক কাজে অন্য গ্রামে গিয়ে রইল। সোমবার অনেক রাত্রে নৌকাযোগে স্বগ্রামে ফিরল বটে, কিন্তু ভৈরব বাঁড়ুজ্যের বাড়ির কারও সঙ্গে অত রাত্রে আর দেখা করলে না। ঘরে চিঁড়ে ছিল, তাই খেয়ে রাত কাটালে।

পরদিন সে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, ভৈরব এসে বললে, বাবাজি, কাল কত রাত্রে এলে? খেলে কোথায়? আমাদের ডাকা তোমার উচিত ছিল। তুমি তো ঘরের ছেলে। এত লজ্জা করো কেন? ছিঃ—

রাধামোহন বললে, আপনার খুকিটিকে একবার ডেকে দিন না!

—বেশ বেশ। এখুনি ডাকছি—দাঁড়াও—

একটু পরে একটি আট বছরের কালোমতো মেয়ের হাত ধরে ভৈরব বাঁড়ুজ্যে সেখানে নিয়ে এলেন। রাধামোহন বললে, এ খুকি তো নয়, এর দিদি।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে বললেন, এর দিদির তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সে তো শ্বশুরবাড়ি আছে। তুমি তাকে দেখোনি।

—তবে আপনার বাড়ির অন্য কোনো মেয়ে—

—আমার বাড়িতে বাবাজি আর কোনো মেয়ে নেই। তবে অন্য কোনো মেয়ে—কিন্তু না, আর কোনো মেয়ে এপাড়ায় নেই ও বয়সের। দু-ঘর তো মোটে ব্রাহ্মণের বাস। বয়স কত?

রাধামোহনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বললে, ওর নাম বলেছিল লক্ষ্মী।

—লক্ষ্মী? সে অবার কে? কই, ও নামের মেয়ে এ গ্রামেই নেই। তোমার শুনতে-টুনতে ভুল হয়ে থাকবে বাবাজি।

—শুনতে ভুল হতে পারে নামটা, কিন্তু সে খুকিটি কে? সে তো আর ভুল হবে না।

—কই বাবাজি, বুঝতে তো পারলাম না। ও বয়সের ও নামের মেয়ে আমাদের পাড়ায় কেউ নেই ঠিকই।

রাধামোহন চিন্তিত মনে বিদায় নিলে। আশ্চর্য ব্যাপার, খুকিই বা আর দেখা করতে এল না কেন?

স্বগ্রাম থেকে ফেরবার দু-বছর পরে রাধামোহন তার পিসির বাড়ি গিয়েছে জব্বলপুরে। সেখানে পুরোনো ফটো-অ্যালবাম খুলে দেখতে দেখতে একটি মেয়ের ফটো চোখে পড়ল। এই মেয়েটিকে সে যেন কোথায় দেখেছে! ঠিক মনে পড়ল না।

পিসিমাকে ডেকে ফটোটা দেখাতে তিনি বললেন, একে তুই দেখবি কোথায়? ও তো আমার ছোটো বোন। তোর ছোটো পিসি। বারো বছর বয়সে মারা যায়, তখন তুই কোথায়? তোর মার বিয়েই হয়নি। আমরা তখন সব আমাদের গাঁয়ের বাড়িতেই থাকি।

তারপর পিসিমা যেন কতকটা আপনমনেই বললেন, আহা, একটু একটু মনে হয় ওকে। বেশ দেখতে ছিল। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। তারপর তোর বাবাও দেশ ছেড়ে মেদিনীপুর চলে গেল। দেশের বাড়িতে যাওয়াই হয়নি। বিয়ের পর আমি একবার মোটে গিয়েছিলাম, সেও আজ বিশ বছর আগের কথা।

রাধামোহন অবাক হয়ে চেয়ে রইল অ্যালবামখানা হাতে করে। হঠাৎ মনে পড়াতে বললে, কী নাম ছিল ছোটো পিসিমার?

পিসিমা উত্তর দিলেন, লক্ষ্মী।

গঙ্গাধরের বিপদ

অনেকদিন আগেকার কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সেসময় মশলা-পোস্তায় গঙ্গাধর কুন্ডুর ট্রাম চলে। সেসময় মশলা-পোস্তায় গঙ্গাধর কুন্ডুর ছোটোখাটো একখানা মশলার দোকান।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলি জেলা, চাঁপাডাঙার কাছে। অনেক দিনের দোকান, যে সময়ের কথা বলচি গঙ্গাধরের বয়স তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগত প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। দোকানঘরের ভাড়া দু-মাসের বাকি, মহাজনদের দেনা ঘাড়ে—দুপুরবেলা দোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে নিয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধের সময় গোমস্তা ভাড়া নিয়ে আসবে বলে শাসিয়ে গিয়েচে। কী বলা যায় তাকে!

এক পুরোনো পরিচিত মহাজনের কথা মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারি মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েছে, শোধও করেচে, কিন্তু সুদের হার বড়ো বেশি বলে ইদানিং বছর কয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায়নি।

ভেবেচিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হল। সুদ বেশি বলে আর উপায় কী? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধের মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে দেরি হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হনহন করে হেঁটে আসচে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে বললে, এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা . . .

সন্ধে হয়ে গিয়েচে। যেখানে থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো গাছপালার বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েচে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হল এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এল। ওই গাছগুলোর তলায়—সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েচে, মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। পরনে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নিচু করে হিন্দিতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বললে, বাবু, সস্তায় মাল কিনবেন?

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বললে, কী মাল?

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বললে, এখানে কথা হবে না বাবু, পুলিশ ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন . . .

ঝুপ্‌সি গাছের তলায় একজায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বললে, জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট মাল—লুকিয়ে দেব!

গঙ্গাধর চমকে উঠল।

সে কখনো ও ব্যাবসা করেনি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কী সর্বনেশে জিনিস! ভালো লোকের পাল্লায় সে পড়েচে! না—সে কিনবে না।

লোকটা সম্ভবত পাঞ্জাবি মুসলমান। বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। অনুনয়ের সুরে বললে, বাবু, আপনি নিন। আপনার ভালো হবে। সিকি কড়িতে দেব . . . আমার মুশকিল হয়েচে আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিশের ভয় তো আছে? কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে; সেই হয়েচে আরও মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিশের ভয় হল যে কেন বাবু তা বুঝিনে। আগে যারা এ ব্যাবসা করত, তাদের কাছে যাচ্ছি, তারা আমার দিকে চেয়েও দেখচে না। . . . আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন, পরে দামদস্তুর হবে . . .

লোকটার গলার সুরে একটা কী শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজল। কোকেনের ব্যাবসাতে মানুষ রাতারাতি বড়োলোক হয়েচে বটে। বিনা সাহসে বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালের কি লক্ষ্মীলাভ হয়! দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে এই ভয়ে বেশি জোরে ডাকতেও পারবে না। চাপা গলায় বাঙালি-হিন্দিতে ডাকলে, কোথায় গিয়া, ও খাঁসাহেব?

এদিকে-ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁসাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বললে, জলদি চলো, অনেক দূর যানে হোগা।

কী একটা যেন ঢাকবার জন্যে লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে। আমার সঙ্গে এসো, মাল দেখাব।

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেক দূর গেল। যে সময়ের কথা বলচি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড়ো বড়ো ভড় ও নৌকো কাদার ওপর পড়ে আছে, দু-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদাকাঁটার বন, পেছনে অনেক দূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁসাহেব একটা বড়ো অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বললে, আমায় দেখতে পাচ্ছ তো? . . .

কেন পাব না? এমন বয়স এখনও হয়নি যে এই সন্ধেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না।

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে, তোমার ডেরা কোথায়, খাঁসাহেব?

লোকটা চকিতে পেছনে ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, কেন, সে তোমার কী দরকার? পুলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভালো হবে না জেনো। মাল দেব, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে—আমার বাসার খোঁজে তোমার কী কাজ?

লোকটার চোখের চাউনি অদ্ভুত। গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করল, খুব ভালো দেখা যায় না, কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠল। তার সঙ্গে টাকা রয়েচে—এ অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধেবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েচে? লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না। তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বাড়বে বই কমবে না। ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূর গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে গুদামঘরের আশেপাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়; সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হল গুদামঘরটা পুরোনো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে জায়গায় জায়গায়, চালের খোলা উড়ে গিয়েচে মাঝে মাঝে, সামনের দোরটা উই-ধরা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন।

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হল। কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায় একা মানুষে আসে, বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে করে? সে আসত না কখনোই; সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যাবসাদার, বাংলাদেশ থেকে নতুন আসেনি। ওই লোকটির কথার সুরে কী জাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে, সে ছাড়ায়। একথা এখন তার মনে হল।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁসাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের, যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুল। কোথাও যে চলে গিয়েছিল এমন মনে হয় না। পাকা আর ঝুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁসাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকল। গঙ্গাধরকেও খাঁসাহেবের পেছনে যখন আসতে বললে তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিমঝিম করচে, বুক টিপটিপ করচে। এই অন্ধকার গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ওলোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জানত যে তার কাছে টাকা আছে, অনুসন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের লোক কি না! গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে দৌড়ে পালাবে? কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবি মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মতো গঙ্গাধর গুদামঘরের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য! গুদামের ওদিকের দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা। গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকার। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকে-মুখে লাগে। একটা কীরকম ভ্যাপসা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেজেটা স্যাঁতসেঁতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকেনি।

এদিকে আবার খাঁসাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ . . . মিনিট দুই হবে, কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা . . . আবার সেই ভয়টা হল। কেমন এক ধরনের ভয় . . . যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই বা কীরকম ভয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে।

মিনিট-দুই পরেই খাঁসাহেব—এই তো আধ-অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে। . . .

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বললে খাঁসাহেব। বললে, তুমি কালা নাকি? এতক্ষণ কথা বলচি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বললাম, তা দেখতে পেয়েচ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বললাম পিপে দুটো। হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে কেন?

বা রে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগল কি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচাকা হয়ে গিয়েচে, মূঢ়ের মতো দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই কোথায় শাবল? . . .

কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁসাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁসাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা, সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়চে . . . সব যেন ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে . . . খাঁসাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করচে। কিন্তু পেরে উঠচে না . . . সব ভেঙে গেল, গুড়িয়ে গেল, উড়ে গেল . . . এক . . . দুই . . . তিন . . . চার . . .

আর কোথায় খাঁসাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিশে গিয়েচে . . . একটা ঠান্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপটা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চিৎকার করে গুদামঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশি ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায়নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারত না।

মাস দুই পরে মেটেবুরুজে খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর টাকা নিয়ে যাবার দিন কী ঘটনা ঘটেছিল সেটা বললে। খোদাদাদ খাঁ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সাহজি, ও হল আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড়ো ব্যাবসাদার ছিল। আজ বছর পনেরো আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সঙ্গে ষড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখত কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে খুন হয়। কে বা কেন খুন করলে জানা যায়নি, কেউ ধরা পড়েনি। তবে দলের লোকই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয় আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রি করার জন্যে; ওর পুরোনো কোকেনের বাক্সো হয়েছে দোজখের বোঝা। . . . তা বাবু, সে গুদামঘরটা কোথায় তুমি দেখাতে পারবে?"

গঙ্গাধর অন্ধকার কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেত না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়ল, পুরোনো ভাঙা গুদামঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য এতদিনেও কি বোঝেনি সে মারা গিয়েচে? . . . কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।

অবিশ্বাস্য

চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

আমি দরিদ্র স্কুলমাস্টার। চাকুলিয়া এরোড্রোমের চিফ ইন্‌জিনিয়ারের তকমা-পরা উর্দি-আঁটা চাপরাসি নামল যে স্টেশনওয়াগন থেকে, সে স্টেশনওয়াগন আমার খোলার বাড়ির দোরে কেন? এগিয়ে গেলুম। কী ব্যাপার চাপরাসি সাহেব? কোথা থেকে আসা হচ্ছে? ভুল করোনি তো?

—আপ্‌কো নাম আছে চাটার্জিবাবু? ইস্কুল-কা-মাস্টার? একঠো চিট্টি হ্যায় বড়াসাব কা, আপকা নামমে।

—কোন বড়োসাহেব?

—চিফ ইন্‌জিনিয়ার সাব, চাকুলিয়া এরোড্রোম।

—হ্যাঁ, আমরাই নাম শৈলেন চট্টোপাধ্যায়।

—এস্, এন, চাটার্জি—এহি লিজিয়ে—ঠিক হুয়া, ওহি নামমে চিট্টি হ্যায়।

অ্যাঁ? . . . বলে কী! আমার নামের চিঠি। তাতে লেখা আছে :

ভাই বগ্‌দা,

অনেক কষ্টে তোর সন্ধান পেয়েছি। তোর 'বগ্‌দা' নাম আমরাই দিয়েছিলাম, মনে আছে? তুই এখানে মাস্টারি করিস শুনলাম। তাই গাড়ি পাঠালুম। বউ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসবি, এখানেই খাবি রাত্রে। গাড়ি করে পাঠিয়ে দেব। আসা চাই—একা নয় কিন্তু সস্ত্রীক। ইতি—তোদের ধীরেন রায়।

ঘাটপাত্‌লে হাইস্কুল। আমার মাসির বাড়ি। মেসোমশায় আমায় ভালো চোখে দেখেননি কখনো। তাঁর কড়া, নির্মম শাসন, হৃদয়হীন শাস্তি। মাসিমার খিটখিটে মেজাজ, বেশি ভাত খাই বলে দু-বেলা পাকেপ্রকারে অনুযোগ। সহপাঠিরা 'বগ্‌দা' বলে খ্যাপাত। পেট ভরে খেতে পেতাম না। কাপড় সেলাই করে পরতে হত।

কিন্তু ধীরেন রায় কোন ছেলেটি? আজ পঁচিশ বছর আগেকার বিস্মৃতপ্রায় স্কুল জীবনের দিনগুলির কুয়াশার মধ্যে ধীরেন বলে কোনো ছেলের মুখ তো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল না চোখের সামনে? নাম সব ভুলে গিয়েছি। চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বয়েস হল পনেরো-ষোলো বছরের কথা কত মনে আছে, বিশেষত এই দরিদ্র জীবনে।

সুহাসিনী শুনে হঠাৎ বড়ো ভয় পেয়ে গেল। অত বড়োলোকের বাড়ি যাওয়ার উপযুক্ত শাড়ি নেই, গহনা তো দু-গাছা ব্রোঞ্জের ওপর সোনার কাজ-করা চুড়ি। তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি লাল কলকা-পাড় একমাত্র ভালো শাড়িখানা, যা কিনা ফ্ল্যাগের মতো সর্বজনবিদিত, পরিবর্তনহীন ও অকাট্য হয়ে উঠেচে, পরে উঠল ছেলেমেয়ের হাত ধরে গাড়িতে।

গবর্নমেন্টের গাড়ি হুহু বেগে ছুটল মাঠ-বনের পাশ কাটিয়ে চওড়া পিচঢালা রাস্তা বেয়ে। স্টেশন-ওয়াগনের মধ্যে তিনটি গদিমোড়া বেঞ্চি—হাত-পা মেলে দিব্যি বসা গেল।

সুহাসিনী জীবনে এতদূর মোটরগাড়ি চড়ে যায়নি কখনো, সে এবং ছেলেমেয়েরা খুশি-উপচে-পড়া চোখগুলো বড়ো বড়ো করে জানলা দিয়ে দ্রুত চলমান গাছপালা, পাথর, ঝরনার দিকে চেয়ে ছিল। মাঝে মাঝে বলছিল, হ্যাঁগা, আমরা ক-মাইল এলাম? ওই ঘরখানাতে কারা আছে? দেখো দেখো—কী চমৎকার ফুল ফুটে আছে বনে! আচ্ছা, এটা কী নদী? আর কদ্দূর আছে? বেশ সিনারি ও জায়গাটার, না? ওটা কী পাহাড়? ওই যে বনধুঁধুলের ফুল ফুটে আছে দেখলাম, ওই ধুঁধুল কি তরকারি রেঁধে খায়? জবার জামাটা খুব ময়লা না তো? তাকিয়ে দেখো তো! বাঃ কী সুন্দর ঢালু পাহাড়টা। দেখো দেখো—পাহাড়ের ওপর ওটা কী গাছ? কুসুম গাছ? . . .

চাকুলিয়া এরোড্রোমে গাড়ি পৌঁছে গেল। তারপরও পাঁচ মিনিট চলবার পর একটা সাদা বড়ো বাংলোর সামনে হর্ন দিয়ে গাড়ি দাঁড়াতেই ফুলপ্যান্ট ও হাতগোটানো কামিজ-পরা এক ভদ্রলোক হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দেখা দিলেন, তাঁর পেছনে একটি ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়ালেন, ছোটো-বড়ো ছেলেমেয়ে সঙ্গে। সুহাসিনীর মুখ চুন হয়ে গিয়েচে দেখলাম, বেচারি এমন বড়োলোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণে কখনো আসেনি, দেখেশুনে ঘাবড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় ওর পক্ষে।

—আরে এই যে, আয় বগ্‌দা! এসো এসো বউঠাকরুন! ওগো, এই দেখো আমাদের বগ্‌দা! তারপর—সব ভালো? একটি ছেলে, দুটি মেয়ে? বেশ বেশ . . . থাক থাক, এসো বাবা, সুখে থাকো, —ইনি তোমাদের কাকিমা হন, প্রণাম করো।

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে সাহেবি পোশাক-পরা ব্যক্তিটির দিকে চেয়েছিলুম। আরে, এ দেখছি আমাদের ক্লাসের সেই হাজু! যে সেকেন্ড মাস্টারের অঙ্কের পিরিয়ডে নিয়মিত টাস্কের খাতা দেখাত, একদিনও বাদ দিত না বলে মনে আছে। সেকেন্ড মাস্টার একে বড্ড ভালোবাসতেন। কিন্তু নীলমণি মিত্রের ইংরেজির পিরিয়ডে হাজু পেছনের বেঞ্চিতে আত্মগোপন করত কোথায়, একদিন একটাও পার্সিং করতে শুনিনি ওর মুখে। আর মনে আছে ফুটবল খেলতে গিয়ে স্কুলের মাঠে ওর হাড় ভেঙে গিয়েছিল। মাস খানেক সেজন্য হাসপাতালে ছিল। মেয়েরা চলে গেল বাড়ির মধ্যে, আমি ও হাজু বসে বসে কত পুরোনো কথা বলতে লাগলুম। ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। হাজুর বড়ো মেয়ে চা ও খাবার দিয়ে গেল আমাদের দুজনের।

মিথ্যে কথা বলব না, অনেকক্ষণ থেকে এই খাবারের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল ক্ষুধাতুর মন। তা খাবার এল ভালোই—লুচি, বেগুন ভাজা, ইলিশ মাছ ভাজা, সন্দেশ, রাবড়ি। পরিশেষে চা।

হাজু বললে, সব বাড়ির তৈরি। গৃহিণী ভালো রাঁধিয়ে—ওই মস্ত এক সুখ।

—কই, তোর বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি তো?

—চল বাড়ির মধ্যে। খাবার-টাবার তৈরি করছিল। রাত্রে এখানে খেয়ে যাবি কিন্তু।

—এই তো ভাই যথেষ্ট পেটভরা খাওয়া হল। আবার রাত্রে কী খাব? —কথাটা কিন্তু আদৌ অতিরঞ্জিত বলিনি।

চা খাওয়ার পর হাজু বললে, চল—এরোড্রোমের রানওয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

—বউকেও নিয়ে যাব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যাব, সেখানে খাওয়া যাবে।

সুহাসিনী এসে মোটরে উঠল হাজুর সঙ্গে—আলাপ করিয়ে দিলাম। হাজু বললে, বউঠাকরুন, একদিন আপনার হাতের রান্না খেতে যাচ্চি কিন্তু—

সুহাসিনী বললে, সামনের রবিবার চলুন না সবাই। দিদি, মন্টু, নীলিমা, অনিমা, সবাই যাবে।

হাজু হেসে বললে, সে হবে না। স্টেশন ছেড়ে বেশিক্ষণ কোথাও যাবার জো নেই আমার। খাব গিয়ে সন্ধের পরই। ঘণ্টা খানেক থাকব। বাড়িতে এরা না থাকলে চলবে না, এরোড্রোমের সাহেবসুবো আসে ওইদিন বেড়াতে—তাদের চা-টা দিতে হবে। আমি ঠিক যাব।

—মন্টু, নীলিমা, অনিমাকে নিয়ে যাবেন কিন্তু।

চাকুলিয়া এরোড্রোমের নানা জায়গা ঘুরে কেনেডি বলে এক সাহেবের বাংলোয় হাজু মোটর নিয়ে হাজির হল। কেনেডি এরোড্রোমের গ্রাউন্ড অফিসার এবং ইন্‌জিনিয়ার। হাজুর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব আছে বোঝা গেল। আমাকে, বিশেষ করে সুহাসিনীকে, খুব খাতির করলে। সুহাসিনী তো ভয়ে ও সংকোচে জড়সড়। ছেলেমেয়েদের বিস্কুট, পনির, কলা প্রভৃতি খেতে দিলে। আমাদের দিলে কফি। দেশি গান শুনতে নাকি বড়ো ভালোবাসে শুনে আমি সুহাসিনীকে একটা গান করতে বললাম। সুহাসিনী গরিবের ঘরণী বটে, কিন্তু ভারী সুন্দর ওর কণ্ঠ, তবে সময়াভাবে চর্চা না হওয়ায় নতুন আর কিছু শিখতে পারেনি। রজনী সেনের একটা গান ও কেমন চমৎকার গাইলে। কেনেডি শুনে খুব খুশি। আমি বললাম, যেদিন আমাদের বাড়ি যাবে কেনেডিকেও নিয়ে যেয়ো। সুহাসিনীও তাই বললে। কেনেডিকে আমি সুহাসিনীর অনুরোধ

বুঝিয়ে দিলাম। কেনেডির খুশি আর ধরে না। সুহাসিনীকে বললে, মাই ইন্ডিয়ান সিস্‌টার, আই মাস্ট কিপ্‌ ইওর ইন্‌ভিটেশন।

হাজুর বাংলোয় যখন আমরা ফিরে এলাম, তখন রাত আটটা। তখুনি আমাদের খাবার জায়গা হল। ঘি-ভাত, মাংস, মাছ, চাটনি, পায়েস ও সন্দেশ। বেশ রান্না। ঘি খুব ভালো! মুঙ্গের থেকে কে একজন ওকে এই ঘি নাকি এনে দেয়।

খাওয়া হয়ে গেলে স্টেশনওয়াগন তৈরি হয়ে এল আমাদের জন্যে। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মোটরে চড়ে আমরা রওনা হলাম। আবার সেই অরণ্যপথ ও মুক্ত প্রান্তর, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। আমাদের মন আনন্দে পূর্ণ। সমস্ত পথ সুহাসিনী কেবল সেই কথা বলতে বলতে এল। বললে, আগে ভেবেছিলাম বড়োলোকের কাণ্ডকারখানা, না জানি কী বিপদেই পড়ব গিয়ে। কিন্তু এমন অমায়িক সবাই! দিদি তো মাটির মানুষ। তেমনি ঠাকুরপো। সাহেবটাই বা কী ভালো লোক! ওদের কিন্তু ভালো করে খাওয়াতে হবে রবিবারে। আমি ছেলেমেয়েদেরও আসতে বলে দিয়ে এসেচি।

আমরা রাত দশটার সময়ে এসে নিজেদের খোলার ঘরের বাসায় পৌঁছোলাম। উৎসাহ ও আনন্দে সুহাসিনী সারারাত প্রায় জেগেই রইল এবং শুধুই এরোড্রোম-ভ্রমণের নানা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। সে জীবনের কখনো এমন মোটর-ভ্রমণ করেনি, এমন সুখাদ্য খায়নি, এত বড়ো দরের লোকের সঙ্গে মেশেনি। সবটা মিলিয়ে আজ তার জীবনের একটি অতি স্মরণীয় দিন। আমার তৃপ্তি এই ভেবে যে, আমার নিজের কোনোদিনও ক্ষমতা হত না ওকে এভাবে আনন্দ দিই—তবুও অপরের দৌলতে যা হয় একটু আমোদ-আহ্লাদের মুখ দেখে নিলে একদিন।

—আচ্ছা, ওঁদের কী খাওয়াব বলো দিকি? সাহেবটা যদি আসে, আমাদের খাওয়া খাবে তো?

—ঘি-ভাত রাঁধতে পারবে না?

—খুব।

—মাংস আর ঘি-ভাত রেঁধো। পায়েসের দুধ কতটা লাগবে বলো তো?

—তা আড়াই সেরের কম নয়। সেও ধরো একটা টাকা। বাদাম, কিসমিস চাই।

—বাদাম নয়, পেস্তা বলো।

—ওই হল। পেস্তা।

—মাছ, কী মাছ আনব?

—রুই কি কাতলা এনো। কিন্তু মাছ কোথায় পাবে এসময়? মনে হচ্ছে না যে, মাছ পাবে। দেখো চেষ্টা করে। তোমার বন্ধুটি মাছ-মাংস খুব ভালোবাসেন।

—কে বললে তোমায়?

—দিদি বলছিলেন।

—মুরগি খায় বলেচে?

—ওঃ, খুব। বাড়িতে মুরগি পোষে, পেছন দিকটাতে। না খেলে বাড়িতে মুরগি পোষে কেন?

শেষরাতের দিকে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেও যেন বড়ো স্টেশনওয়াগনের গদি-আঁটা বেঞ্চিতে বসে চক্রাকারে মস্ত বড়ো রান্‌ওয়েটায় ঘুরচি . . . ঘুরচি . . .

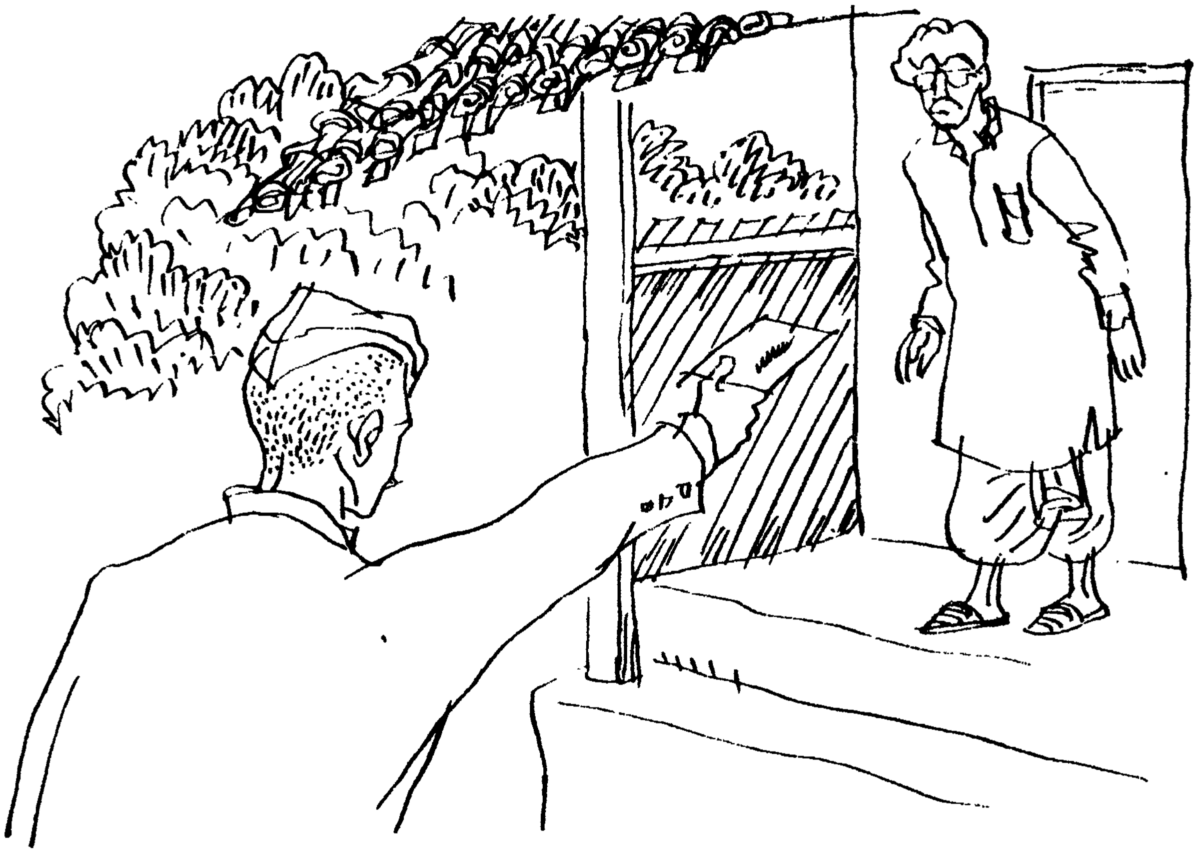

—বাবু! বাবুজি! বাবু!

আগেই মোটর আসার শব্দ পেয়েছি। সেই স্টেশনওয়াগানটা। ছুটে বাইরে এলাম। সবে স্কুল থেকে এসে বসেছি হাত-পা ধুয়ে। বেলা পাঁচটা।

—কী ব্যাপার চাপরাসি সাহেব? বড়োসাহেব পাঠিয়েছে বুঝি? চিঠি কই, দেয়নি?

—বাবুজি, বড়াসাব—নেহি হ্যায়। আজ বেলা করিব এক বাজে বহুৎ ভারী অ্যাকসিডেন্ট হুয়া দো নম্বর রান্‌ওয়েমে। পাথল ফাটাতা থা ডিনামাইটসে। বড়াসাব হুঁয়াপর হাজির থা—মগর ওহি পাথল ফাট কর্‌কে ছুটা বহুত দূর। বড়াসাবকো মাথামে গিয়া—একদম চুর হো গিয়া। মাইজিকো ফিট হুয়া, আবতক হোঁশ নেহি আয়া। কেনেডি সাহেবনে ভেজিন আপকো পাস—চলিয়ে। কেনেডি সাবকা চিট্টি হ্যায়—

সুহাসিনী বাইরে এসে বললে—কার চিঠি গা? ওঁরা আসবেন? হাজু ঠাকুরপো লিখেচে? কবে আসবে?

কাশী কবিরাজের গল্প

আমার উঠোন দিয়ে রোজ কাশী কবিরাজ একটা ছোট্ট ব্যাগ হাতে যেন কোথায় যায়। জিজ্ঞেস করলেই বলে, এই যাচ্চি সনকপুর রুগী দেখতে, ভায়া—

একদিন বললে, নৈহাটি যাচ্চি রুগি দেখতে, সেখান থেকে শ্যামনগর যাব।

—সেখানেও আপনার রুগি আছে বুঝি?

—সব জায়গায়। কলকাতায় মাসে দুবার যাতি হয়।

আমার হাসি পায়। কাশী কবিরাজ আমাদের গ্রামে বছরখানেক আগে পাকিস্তান থেকে এসে বাসা করেছে। জঙ্গলের মধ্যে একখানা দোচালা ঘর। আমগাছের ডালপালায় ঢাকা। দিনে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। ছেঁড়া কাপড় পরে কাশী কবিরাজের বউকে ধান সেদ্ধ করতে দেখেছি। এত যদি পসার, তবে এমন অবস্থা কেন?

একদিন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আকাশে ঘন মেঘ এসে জমল। বৃষ্টি আসে আসে। কাশী কবিরাজ দেখি আমার উঠোন দিয়ে হনহন করে চলেচে ব্যাগ হাতে।

ডেকে বললাম, ও কবিরাজমশাই—শুনুন শুনুন, কোথায় চললেন? বৃষ্টি আসচে—

কাশী কবিরাজ আমার চণ্ডীমণ্ডপে এসে উঠে বসল।

বললে, একটু রানাঘাট যাতাম এই ট্রেনে, রুগি ছেলো।

—কে রোগী?

—একজন মাদ্রাজি। পা ফুলে বিরাট হয়েচে, সব ডাক্তারে জবাব দিয়েচে। তিনবার এক্স্-রা কত্তি গিয়েলো। আমি বলিচি, ওসব এক্স্-রা টেক্স্-রা আমার সঙ্গে লাগবা না। আমার মুখিই এক্স্-রা—

আমার হাসি পেল। নিজের যদি অত গুণ, তবে দোচালায় বাস করো কেন জঙ্গলের মধ্যে? লম্বা লম্বা কথা বললেই কি লোকে তোমাকে বড়ো কবিরাজ ভাববে?

—একটু চা খান, দাদা—

—তা খাওয়াও ভাই, বৃষ্টি এল। একটু বসেই যাই—

—আপনার পসার তাহলে বেশ বেড়েচে?

— বাড়বে কী ভায়া, বরাবর আছে। আমার তান্ত্রিক কবিরাজি। যা কেউ সারাতি পারবে না, তা আমি সারাব।

—বলেন কী!

—এইজন্যেই তো আমার পসার। শুধু ঝাড়ানো—কাড়ানো—

—ঝাড়িয়ে রোগ সারিয়েছেন?

—আরে এ পাগল বলে কী? বড়ো বড়ো রোগ ঝাড়িয়ে সারিয়েচি।

—বটে।

—তোমরাই ইংরাজি লেখাপড়া জানো কিনা, —সমস্ত অবিশ্বাস করো জানি। ভূত মানো?

এই রে! ঝাড়ফুঁক থেকে এবার ভূতপ্রেতে এসে পৌছুল। কাশীনাথ কবিরাজ অনেক কিছু জানে দেখছি। বললাম,যদি বলি মানিনে?

—তা তো বলবাই, ইংরাজি পড়াতে তোমাদের ইহকালও গিয়েচে, পরকালও গিয়েচে! রাগ করো না ভায়া। যা সত্যি, তাই বললাম। চা এসেচে? তাহলে একটা গল্প শোনো বলি। আমার নিজের চোখে দেখা।

খুব বৃষ্টি এসে পড়ল। চারিদিক অন্ধকার করে এল। কাশীনাথ কবিরাজ তার গল্প আরম্ভ করল।

কাশীনাথ কবিরাজ তান্ত্রিক-মতে চিকিৎসা করে বলে অনেক দূর দূর থেকে তার ডাক আসে। আজ বছর দশেক আগে হরিহরপুরের জমিদার শিবচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ি থেকে তাঁর ছেলের চিকিৎসার জন্যে কাশীনাথের ডাক এল।

আমি বললাম, আগে কখনো সেখানে গিয়েছিলেন আপনি?

—না।

—নাম জানতেন?

—খুব। আমাদের ওদেশে হরিহরপুরের জমিদারের নাম খুব প্রসিদ্ধ।

—যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বেলা কত?

—সন্দের কিছু আগে। তারপর শোনো— কাশীনাথ ওদের বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল। সেকেলে নামকরা জমিদার, মস্ত বড়ো দেউড়ি, দু-তিন মহল বাড়ি। দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘর, তার পাশে একটা বড়ো বারান্দা। ওদিকে ঠাকুরদালান, বাইরে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ। তবে এসবই ভগ্নপ্রায়—পূর্বের সমৃদ্ধি ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র, বড়ো বড়ো বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে বাড়ির গায়ে। মন্দিরের চুড়োর ফাটলে বন্য শালিখের গর্ত, কাঠবিড়ালির বাসা। সামনে বড়ো একটা আধ-মজা দিঘি পানায় ভরতি।

সন্ধ্যার কিছু আগে সেই মস্ত বড়ো পুরোনো ভাঙা বাড়ি দেখে কাশীনাথের মনে কেমন এক অপূর্ব ভাব হল।

আমি বললাম, কী ভাব?

—সে তোমারে বলতে পারিনে, ভায়া। ভয়ও না, আনন্দও না। কেমন যেন মনে হল, এ বড্ড অপয়া বাড়ি—এ ভিটেতে পা না দেওয়াই ভালো আমার পক্ষে। তোমার হবে না, কিন্তু আমার হয় বাপু, এমনি।

—অন্য কোথাও হয়েচে?

—আরও দু-একবার হয়েচে এমনি। কিন্তু সেকথা এখন আনবার দরকার নেই। তারপর বলি শোনো না—

তারপর কাশী কবিরাজ সেখানে গিয়ে রোগী দেখল। দশ বৎসর বয়সের একটি ছেলের টাইফয়েড জ্বর, খুব সংকটাপন্ন অবস্থা। কাশী কবিরাজ গিয়ে তান্ত্রিক প্রণালিতে ঝাড়ফুঁক করে শেকড়বাকড়ের ওষুধ বেটে খাওয়াল। রোগী কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে উঠল।

অনেক রাত্রে কাশী খাওয়াদাওয়া সেরে দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘরে এসে দেখল, সেখানে তার জন্যে শয্যা প্রস্তুত। উৎকৃষ্ট শয্যা, দামি নেটের মশারি, কাঁসার গেলাসে জল ঢাকা আছে, ডিবের বাটিতে পান—সব ব্যবস্থা অতি পরিপাটি।

আমি বললাম, বড়োলোকের বাড়ির বন্দোবস্ত—

—হাজার হোক, বনেদি ঘর তো? যতই অবস্থা খারাপ হোক, পুরোনো চালচলন যাবে কোথায়?

—তারপর?

কাশী কবিরাজ বেশিক্ষণ শোয়নি, এমন সময় সে দেখল ঘোমটাপরা একটি বউ হনহন করে মাঠের দিক থেকে এসে দেউড়ির মধ্যে দিয়ে জমিদারবাড়ি ঢুকচে। কাশী খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। এত রাত্রে বাইরের মাঠ থেকে এসে বাড়ি ঢুকল কে? ভদ্রলোকের ঘরের সুন্দরী বধূ বলেই মনে হল, যতটুকু দেখেছে তা থেকেই।

যাক। সে এসেছে কবিরাজি করতে, অতশত খোঁজে তার কী দরকার? যে যা ভালো বোঝে করুক।

আমি বললাম, রাত তখন কত?

—রাত একটার কম নয়, বরং বেশি।

—যেদিক থেকে এল, সেদিকে কোনো লোকালয় নেই?

—না মশাই। ফাঁকা মাঠ অনেকখানি পর্যন্ত, তারপর কোদালে নদী। কোদালে নদীতে গরমকালে জল থাকে না। হেঁটে পার হওয়া যায়—তার ওপারে বলরামপুর গ্রাম।

—আপনি কী করে বুঝলেন ভদ্রবংশের মেয়ে?

—হাত-পায়ের যতটুকু খোলা, ধবধবে ফরসা। আধ-জ্যোৎস্না রাত, আমি দিব্যি টের পাচ্ছি—মুখখানা অবিশ্যি ঘোমটায় ঢাকা ছেলো।

—বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবার সময় অন্য কোনো লোক সেখানে ছিল?

—না।

—আপনাকে টের পেয়েছিল?

—কোনোদিকে না চেয়ে হনহন করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

কাশী কবিরাজ নির্বিরোধী ভালো লোক, সে জলের গেলাস তুলে খানিকটা জল খেয়ে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু নানা চিন্তায় ঘুম আর আসে না, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। লোকে বাড়িতে চিকিৎসক ডাকে ঘুমুবার জন্যে নয়। কাশী কবিরাজ অভিজ্ঞ লোক, দায়িত্ববোধ তার যথেষ্ট, সে অবস্থায় তার চোখে ঘুম আসে কী করে?

মিনিট খানেক পরে কাশী হঠাৎ দেখলে, সেই বউটি তার পাশের দেউড়ি দিয়ে আবার বার হয়ে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সে তড়াক করে উঠে পড়ল। বউটি ক্রমে দূর মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় তার সাদা কাপড় দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, মাঠের দিকে গেল একা?

—একদম একা। আর অত রাত!

—আপনি কী ভাবলেন?

—আমি আর কী ভাবব মশাই, একেবারে অবাক। এত রাত্রে একটি সুন্দরী মেয়ে এমন ভাবে যে নির্জন মাঠের দিকে চলে যেতে পারে, তা কখনো দেখিওনি।

কাশী কবিরাজ সাত-পাঁচ ভাবছে, এমন সময়ে বাড়ির মধ্যে থেকে একজন ছুটে এসে বললে, শিগগির আসুন, কবিরাজ মশাই, রোগী কেমন করচে।

কাশী গিয়ে দেখে, রোগীর অবস্থা সত্যই খারাপ। কিন্তু হঠাৎ এত খারাপ হওয়ার কথা তো নয়। যাহোক তখনকার মতো ব্যবস্থা করতে হল। অনেকক্ষণ খাটুনির পরে রোগী খানিকটা সামলে উঠল। তখন আবার এসে শুয়ে পড়ল কাশীনাথ বাইরের দেউড়ির ঘরে।

এরপর রোগীর অবস্থা ক্রমশ ভালোর দিকেই চলল। জমিদারবাবুর মন বেশ ভালো—প্রথম দিন বড়োই যেন মুষড়ে পড়েছিলেন। এমনকী কবিরাজের সঙ্গে বসে দুপুরের পর খানিকক্ষণ পাশাও খেললেন। কবিরাজকে তাঁদের বড়ো দিঘিতে একদিন মাছ ধরতে যাবার আমন্ত্রণও জানালেন। খাওয়ার ব্যবস্থাও দুপুরে বেশ ভালোই হল—মাছের মুড়ো, দই, দুধ, সন্দেশ ইত্যাদি। কবিরাজ খুব খুশি . . .। জমিদারবাবু বেশ প্রফুল্ল।

সেই রাত্রে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এমন ধরনের ব্যাপার কাশী কবিরাজ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

রোগীর অবস্থা ভালো থাকার দরুন সেদিন আর বেশি খাটুনি ছিল না ওর। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শয্যা আশ্রয় করল। কিন্তু ঘুম আসতে দেরি হতে লাগল। কোথাকার ঘড়িতে একটা বেজে গেল ঢং করে। ঠিক সেই সময়ে দেখল কাশী কবিরাজ, সেই ঘোমটাপরা বউটি দেউড়ি দিয়ে ঢুকে অন্দরের দিকে চলেছে।

বলতে কী কাশী কবিরাজের বড়ো বিস্ময়বোধ হল! কী সাহস মেয়েটার! এত রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে আসতে ভয়ও কি করে না?

মিনিট পনেরো কেটে গেল, কি বিশ মিনিট। তারপর কাশী কবিরাজকে আশ্চর্য স্তম্ভিত করে দিয়ে সেই বউটি ওর ঘরে এসে ঢুকল। আমি বললাম, আপনার ঘরে?

—হ্যাঁ, একেবারে আমার সামনে।

—ঘরে আলো ছিল?

—বাড়িতে রোগী থাকার দরুন আমার ঘরে সারারাতই একটা হারিকেন জ্বলে।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি মুখের ঘোমটা অনেকখানি তুলে কবিরাজের দিকে চাইল। বেশ সুন্দরী মহিলা। দেখলে সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়, এমনি চেহারা। কাশী কবিরাজকে বলল, তুমি এখানে থেকো না, চলে যাও এখান থেকে।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত কাশী কবিরাজ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বলল, আপনি কে মা?

—আমি যেই হই, তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

—মা, আমি চিকিৎসক। রুগি দেখতে এসেচি। আমার কাজ না সেরে আমি কী করে যাব?

—তুমি এ রুগি বাঁচাতে পারবে না। কাল সকালে তুমি চলে যাও এখান থেকে—

—কী করে আপনি জানলেন রুগি বাঁচবে না!

—আমি ওর মা। ওর সৎমা ওকে খুব কষ্ট দিচ্চে, সে কষ্ট আমি দেখতে পারচিনে—আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেচি—নিয়ে যাবই। তুমি তাকে কিছুতেই রাখতে পারবে না—

কাশীনাথ কবিরাজ তখনও ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেনি! সে আমতা আমতা করে বললে, আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি মারা যাওয়ার পরে আজ চার বছর হল ওর বাবা আবার বিয়ে করেচে। আমার সেই সতীন ওকে বড়ো যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি সেখানে শান্তিতে থাকতে পারি না—খোকা আপন মনে কাঁদে। আমি শুনতে পাই—ওকে আমি নিয়ে যাবই। তুমি কেন অপযশ কুড়োবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—

কাশীনাথের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছে যেন। কী ব্যাপারটা সামনে ঘটচে, তার যেন কোনো ধারণাই নেই, তবুও সে হাতজোড় করে বললে, মা, একটা কথা। আমি জমিদারবাবু—আপনার স্বামীকে

সব বলি। তিনি তাঁর ছেলেটিকে বড়ো ভালোবাসেন। ছেলেটিকে আপনি নিয়ে গেলে তাঁর কী অবস্থা হবে, সেটা তো আপনার বিবেচনা করা উচিত।

বউটি বললেন, তাঁর এপক্ষের ছেলেমেয়ে হবে। তাঁদের নিয়ে থাকবেন তিনি—

—ওকথা বলবেন না, মা। আপনি তাঁর কথা চিন্তা না করলে কে চিন্তা করবে? সবদিকে বুঝুন। তাঁর কথা ভাবতে হবে আপনাকেই। আমি আজই সব বলচি তাঁকে খুলে। যদি তিনি তাঁর এপক্ষের স্ত্রীকে বলে ছেলেটির ওপর অত্যাচার নিবারণ করতে পারেন, তবে আপনি আমাকে কথা দিন, ছেলেটিকে আপনি নিয়ে যাবেন না? আমি সে চেষ্টা করি, মা?

—করো।

বলেই মূর্তি অদৃশ্য হল না কিন্তু। ঘর থেকে বার হয়ে দেউড়ি দিয়ে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গিয়ে নিশীথরাত্রের শুভ্র জ্যোৎস্নার কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বলেন কী!

—হ্যাঁ মশাই।

—আচ্ছা, এ মূর্তির কোনো অংশ অস্পষ্ট নয়?

—দিব্যি মানুষের মতো। কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই কোথাও। কথাবার্তা বললাম, আমার কোনো ভয় হল না। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলচি, তেমনি মনে হল।

মূর্তিটি অদৃশ্য হওয়ার খানিক পরেই বাড়ির মধ্যে থেকে কাশীকে ডাকতে এল। রুগির অবস্থা খুব খারাপ। অথচ সমস্ত দিন এমন ভালো ছিল। তখনকার মতো সুব্যবস্থা করে ভোরের দিকে কাশী কবিরাজ জমিদারবাবুকে বললে, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, বাইরে চলুন।

আমি বললাম, বাইরে এসে সব কথা বললেন নাকি?

—হ্যাঁ, গোড়া থেকে। বললাম, এই আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

—বিশ্বাস করলেন?

—কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমি জানি। আমি এই অসুখের সময় একদিন ওকে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচি!

তার পরে ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত।

জমিদার বললেন, আমি জানি, ওর সৎমা ওর ওপর খুব সদয় নয়—তবে এতটা আমি জানতাম না। আমি কথা দিচ্চি, খোকা সেরে উঠলে ওর মামার বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখাব। এ সংস্রবে আর আনব না। আমার এস্ত্রীকেও আমি শাসন করচি। আপনি তাঁকে জানাবেন।

রাত ভোর হয়ে গেল।

রোগীর অবস্থা ক্রমশ ভালো হয়ে উঠতে লাগল। এগারো দিনের পরে কাশী কবিরাজ পথ্য দিলেন তার রোগীকে।

বললাম, ওর মাকে আর দেখেননি? আসেননি আপনার কাছে?

—না।

চ্যালারাম

দিল্লির এক পার্কে চ্যালারামের সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

ভীষণ জোয়ান, পুরো ছ-ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, হাতের কবজি এই মোটা, এই গোঁফ-দাড়ি। এই বুকের ছাতি। কথায় কথায় জানতে দেরি হল না যে, চ্যালারাম একজন অসাধারণ লোক। তার মুখের ভাব এমনি যে, দেখলে মনে হয়, জীবনের অনেকখানি এ দেখেচে। এমন ব্যাপার ঘটেচে এর জীবন, যা সচরাচর মানুষের জীবনে ঘটতে দেখা যায় না।

তার ওপর মুশকিল হয়েচে আমরা বাঙালি, আমাদের জীবনে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত সংকীর্ণ। তবুও অমৃতসরে, দিল্লিতে, করাচিতে, ডেরাগাজিখাঁতে যারা জন্মায়—তারা অনেক কিছু দেখে, অনেক কিছু করে। আমরা যারা খুব কিছু করি, বাপের পয়সার খই ছড়াতে ছড়াতে বিলেতে গিয়ে উঠি। আমাদের

চেয়ে মাদ্রাজি, তেলেগু, নোয়াখালি ও চাটগাঁয়ের মুসলমানেরা ভালো—তারা তবুও পাঁচটা দেশ দেখে, জাহাজের খালাসি-টালাসি হয়, যাহোক তবুও কিছু।

চ্যালারাম আমার কৌতূহল আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমেই বললে, সে ফ্রান্সে গিয়েছিল যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ শেষ হবার পরে সে আবার একটা কীসে ভরতি হয়ে মেসোপটেমিয়ায় যায়। মরুভূমিতে আরবদের হাতে পড়েছিল, টাইগ্রিসে নৌকোর বাচ খেলে এসেছে। বেবিলনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে চুরুট খেয়েচে।

আমি বললুম, তোমার জীবনে সকলের চেয়ে একটা বড়ো ঘটনার কথা বলো না, শুনি।

চ্যালারাম বলতে আরম্ভ করলে—

অমৃতসর জেলায় আমাদের বাড়ি। আমাদের গ্রামে সবাই এমন গরিব যে, একজন একুশ টাকা মাইনে পেত কলকাতায় কী কাজ করে—গ্রামের মধ্যে সেই ছিল বড়োলোক ও বড়ো চাকরে। সে বলত কলকাতায় সে পুলিশের দারোগা।

আমার স্বভাব ছিল দুঁদে ও নির্ভীক। আঠারো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করে কলকাতায় এলাম। ভাবলাম, পুলিশের দারোগা যদি হঠাৎ না হতে পারি, হেড কনস্টেবল হওয়া কে আটকাবে?

কলকাতা এসেই ভুল ভেঙে গেল। গ্রামের সেই লোকটাকে খুঁজে বার করে দেখলাম সে এক বড়োলোকের বাড়ির দারোয়ান। সে আমার কলকাতায় থাকবার একমাসের খরচ দিতে চাইলে, যদি গাঁয়ে ফিরে কাউকে তার দরোয়ানির করার কথাটা বলে না বেড়াই। তারই পরামর্শে মোটরগাড়ির কাজ শিখলাম। কিছুদিন কলকাতায় মোটর চালাবার পরে ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ বাধল। আমি সৈন্যদলে ভরতি হয়ে করাচি ও সেখান থেকে গেলুম ফ্রান্সে। এসব দিনের অভিজ্ঞতা খুব চিত্রিত হলেও বিস্তৃত বর্ণনা করার দরকার নেই। যুদ্ধ শেষ হবার পরে গ্রামে ফিরে গেলাম, কিন্তু বেশিদিন ভালো লাগল না। আবার একটা চাকরিতে ভরতি হয়ে গেলুম মেসোপটেমিয়ায়। তিন বছর পরে মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরে বম্বে এলাম। হাতে তখন কিছু টাকা হয়েচে, ভাবলাম একটা ট্যাক্সি গাড়ি কিনে বম্বে কি কলকাতার রাস্তায় চালাব। কিন্তু দু-তিন দিন পরে একটা সরাইখানায় জনকয়েক পাঠান গুন্ডার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বেধে ছুরি মারামারি হল। তাতে একজন পাঠান জখম হল। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিল। পুলিশের ভয়ে দুজনে রাতারাতি বম্বে ছেড়ে চম্পট দিলাম।

অনেক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে দুজনে আমরা কোয়েটা হয়ে মরুভূমির পথে কাবুল পৌঁছেগেলাম। তখন নতুন বাস ও লরি চলচে কাবুলে, অনেক বড়োলোকের মোটর হয়েচে। কিন্তু ভালো মোটর ড্রাইভারের সংখ্যা তত বেশি নয়। আমাদের মোটর চালানো কাজ পেতে দেরি হল না।

কয়েক বছর কেটে গেল। বেশ সুখেই আছি! আগের পয়সা হাতে ছিল, সেই পয়সায় নিজে একটা লরি কিনে কাবুল কান্দাহারের পথে চালাই। জিনিসপত্র সস্তা, অনেক বন্ধুবান্ধবও জুটে গেল, লরি চালিয়ে ক্রমশ উন্নতি হতে লাগল। কাবুলে ভোলানাথ বলে একজন লোক ছিল, বিখ্যাত লোক। সে জাতে গুজরাটি ব্রাহ্মণ, অনেক দিন থেকে কাবুলে আছে। এখানে পুরুতের কাজ করে। মীরমক্দ্ বাজারের দক্ষিণে ছোটো একটা গলির মধ্যে তার একটা ছোটো মন্দির আর বাড়ি।

ভোলানাথের মন্দিরটি এক অদ্ভুত জায়গা।

সন্ধ্যার পর থেকে নানা ধরনের লোক সেখানে এসে আড্ডা দিতে আরম্ভ করে। চা হরদম চলচে। মোটা কড়া তামাকের ধোঁয়ায় মন্দিরের চাতাল অন্ধকার হয়ে যায়। এদিকে ঘণ্টা বাজে, আরতি হয়, প্রসাদ বিতরণ হয়। রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত লোকের পর লোক আসচে। তার মধ্যে খুব বড়ো প্রতিপত্তিশালী ব্যাবসাদার থেকে আমার মতো বাজে লোকও আছে। আর সবারই ওপর ভোলানাথের প্রভাব খুব বেশি। সবাই তাকে মানে, খাতির করে, তার কাছে পরামর্শ নেয়।

একদিন রাত আটটার সময়ে ভোলানাথের মন্দিরে গিয়েচি।

চা পান শেষ হয়ে গিয়েচে। ভোলানাথ আমায় বললেন, চা খাবে নাকি?

বললাম, থাক, রাত হয়েচে এখন আর চা খাব না।

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল দলের মধ্যে একজন আফগান রাজকর্মচারী বসে। আমি তাঁকে অনেকবার পথেঘাটে মোটর হাঁকিয়ে যেতে দেখেচি। অত বড়ো লোককে এখানে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু মুখে কোনো কথা কাউকে বলা উচিত বিবেচনা না করে চুপ করে রইলাম।

একটু পরে আফগান অফিসারটি চলে গেলেন।

শুনলাম আমাদের মধ্যে কে কে মেশিনগান চালাতে জানে আফগান অফিসার তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন।

ব্যাপার কী? মেশিনগান কী হবে? লড়াই কোথায়?

অনেক রাত্রে উঠে আসচি, আমার এক বিশেষ বন্ধু জোয়ালাপ্রসাদ আমায় চুপিচুপি বললে— টাকাটড়ি যদি ব্যাঙ্কে থাকে, উঠিয়ে নাও এই বেলা—

অবাক হয়ে বললাম, কেন, কী হয়েচে?

—আমানুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে শিগগির।

—কে বিদ্রোহ করবে!

—আমার কাছে অত খবর তো পৌঁছোয়নি। তুমি নিজে সাবধান হও, মিটে গেল! দু-একদিনের মধ্যে আগুন জ্বলবে। বেশি রাতে রাস্তায় চলাফেরা কোরো না।

মীরমক্‌দ্‌ বাজারের নীচ শ্রেণির কাফিখানাগুলোতে তখনও আমোদ-প্রমোদ চলচে। এসবগুলো ভয়ানক জায়গা রাতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বেখাপ্পায় ছোরার ঘায়ে কত লোক যে প্রাণ হারিয়েচে তার ঠিকানা নেই।

বাজার ছাড়িয়েচি, এমন সময় হঠাৎ দূরে দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পট-পট-পট-পট মেশিনগানের আওয়াজ।

বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল।

মীরমক্‌দ্‌ বাজারের লোকজন হুড়হুড় করে দোকান কাফিখানা ছেড়ে বার হয়ে এল, কেউ কিছু জানে না, সবাই কানখাড়া করে শুনচে। . . .

বিদ্রোহ কথাটা কিন্তু শিগগির তুলোর আগুনের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই সন্ত্রস্ত ভীত হয়ে উঠল—বিদ্রোহ মানে খুন, মানে লুটপাট, মানে গৃহদাহ, মানে পৈশাচিক অরাজকতা ও নিষ্ঠুরতা। বিশেষত এইসব জায়গায়।

ঠিক তাই ঘটল। বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ যখন পুরোমাত্রায় চলেচে, তখনকার কথা সবই জানি, কিন্তু সেসব কথা বলব না। চোখের সামনে যেসব ব্যাপার দেখেচি, এতদিন পরেও সেকথা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। মীরমক্‌দ্ বাজারে রক্তের স্রোত বইল। কে যে কাকে মারে, তার ঠিকানা নেই কিছু। সুযোগ পেয়ে বদমাইস খুনি গুন্ডার দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেচে—বাচ্চা-ই-সাকোর সৈন্যেরা করেচে রাজনৈতিক বিদ্রোহ—সুবিধা পেয়ে শহরের সাধারণ গুন্ডা ও দস্যুর দল দিনদুপুরের খুন রাহাজানি শুরু করে দিলে। আরও কত কী করলে, তার আর উল্লেখ না করাই ভালো।

একদিন রাত্রে আমার বন্ধু জোয়ালাপ্রসাদ এসে আমায় বললে, চুপিচুপি উঠে এসো ভোলানাথের ডেরায়—কোনো কথা জিজ্ঞেস কোরো না।

মীরমক্‌দ্ বাজার পার হবার সময়ে তার অন্ধকার চেহারা দেখে মনটা দমে গেল। ভোলানাথের মন্দিরে গিয়ে দেখি শিখ ও জাঠ যেকজন ড্রাইভার কাবুলে উপস্থিত ছিল, সবাই জড়ো হয়েচে—জনদশেক সবসুদ্ধু। আর উপস্থিত আছেন সেই আফগান অফিসার আর তার সঙ্গে আর একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ আফগান, সাহেবি পোশাক পরা। মন্দিরের অস্পষ্ট আলোয় ওদের মুখ ভালো দেখা যায় না।

আফগান সর্দার বললেন, তোমাদের মধ্যে কে কে এই রাত্রেই কাবুল থেকে কান্দাহারের পথে মোটর নিয়ে যেতে পারবে? সেখান থেকে কে কে বোম্বাই পৌঁছুতে পারবে?

আমি তো অবাক। কোথায় কান্দাহার, আর কোথায় বোম্বাই। তা ছাড়া যাবার পথ কই?

বিদ্রোহীরা তো খাইবারের পথ আটকেচে। আপাতত কাবুল নদী পেরুনো যাবে কি না সন্দেহ। কেন, কাকে নিয়ে যেতে হবে?

আফগান অফিসার বললেন, চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই পৌঁছুতে হবে। দশখানা লরি চাই। প্রাইভেট মোটর দুখানা থাকবে। তা চালাবার লোক চাই। যত টাকা চাও পাবে।

আমরা সবাই ঘাড় নাড়লুম। অসম্ভব। চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই! এই ভীষণ দিনে।

আফগান অফিসারটি অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করলেন, ভয়ও দেখালেন—কোনো ফল হল না।

এমন সময় সাহেবি পোশাক পরা সেই সুপুরুষ লোকটি অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন, তোমাদের আপত্তিটা কী?

আমার ডাইনে বাঁয়ে দু-তিনজন শিখ ও জাঠ চমকে উঠেই আভূমি নত হয়ে সেলাম করলে। জোয়ালাপ্রসাদ বিস্ময়ে কাঠ হয়ে কলের পুতুলের মতো বলে উঠল—জাঁহাপনা! . . . আমিও তখন চিনলাম। কী সর্বনাশ! স্বয়ং রাজা আমানুল্লা।

আমানুল্লা বললেন, শোনো। যা চাও তাই পাবে, আমার দশখানা লরি দরকার। কে কে রাজি আছ? আকাকে বোম্বাই পৌঁছে দিতে হবে। বড়ো বিপদে পড়ে তোমাদের ডেকেচি। তোমাদের বিশ্বাস করতে পারি?

আমরা সমস্বরে বলে উঠলুম, জান কবুল, হুজুরালি—আমরা তৈয়ার। হুকুম করুন কোথায় গাড়ি আনতে হবে। আমানুল্লা রিস্টওয়াচে সময় দেখে বললেন, এক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি এইখানে নিয়ে এসো। তারপর কোথায় যেতে হবে ইনি বলে দেবেন।

সেই রাত্রে দশখানা লরি ও দুখানা প্রাইভেট মোটর চুপিচুপি কাবুল ছেড়ে কান্দাহারের পথে রওনা

হল। চারখানা লরিতে বোঝাই হল শুধু টাকা—তামার চওড়া পাতে আঁটা কাঠের ভারী বাকসো বোঝাই নগদ টাকা। প্রাইভেট মোটর দুখানায় রাজা, রানি, ছেলেমেয়ে। সামনে পেছনে দুখানা লরিতে তেরপল চাপা মেশিনগান।

শেষ রাত্রে কুয়াশার মধ্যে কাবুলের নিঃশব্দ রাজপথ দিয়ে দেশের রাজা-রানিকে নিয়ে আমরা তিরের বেগে গাড়ি উড়িয়ে দিলাম।

কাবুল নদী পেরিয়ে একটা ছোটো পাহাড়ের ওপর বিদ্রোহীদের একটা ঘাঁটি। এতগুলো গাড়ি গেলে নিশ্চয়ই ওরা সন্দেহ করে পথ আটকাবে। জাঠ পূরণমল মেশিনগানের পেছনে তৈরি হয়ে বসল। আমরা কী করব ভাবচি—স্বয়ং আমানুল্লা হুকুম দিলেন কেটে বেরিয়ে চলো—

গম্বুজের কাছে ওরা অনেকে জড়ো হয়েচে দূর থেকে দেখতে পাচ্চি। আমরা অ্যাকসির্লারেটারে পা দিয়ে সজোরে চাপলাম—চালাও! হুহু করে স্পিডোমিটারে ত্রিশ মাইল থেকে ঠেলে উঠল চল্লিশ . . . পঞ্চাশ—চক্ষের নিমেষে ওদের ঘাঁটিটা একটা রাঙা কালো আবছায়ার মতো পাশ দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল—দুমদাম রাইফেল চলল—পটপট মেশিনগান উত্তর দিলে আমাদের দিক থেকে। একখানা টাকা বোঝাই লরি টায়ার ফেটে অচল হয়ে পড়ল। রইল সেটা পড়েই—কেউ তার দিকে চাইলাম না।

পেছনে ওরা এবার তাড়া করবে নিশ্চয়ই। আমাদের সময় ছিল না; কান্দাহারের খবর পেলাম, কোয়েটা যাবার পথ বিদ্রোহীরা আটকেছে। ঘুরে হেলমন্দ নদী পার হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমরা আফগানিস্থানের সীমানা পার হই। তারপর বেলুচিস্তানের দুর্গম মরুভূমি . . . কালো কালো গাছপালাহীন পাহাড় আর কটা বালির মরুভূমি—মরুভূমি আর পাহাড়।

এই মরুভূমির মধ্যে কালাত থেকে চামানের পথে বেলুচ দস্যুরা আমাদের আক্রমণ করলে, ভাবলে লরি বোঝাই সওদাগরি মাল যাচ্চে। মেশিনগান খেয়ে হটে গেল। একবার জল গেল ফুরিয়ে। ইঞ্জিনের ট্যাঙ্কের গরম জল রাজা-রানিকে খেতে দিলাম নিজেদের বঞ্চিত করে। হয়তো সেবার সবসুদ্ধ মরতে হত মরুভূমির মধ্যে; কারণ ঠিক সেই সময় বেজায় বালির ঝড় উঠল। রাস্তা নেই, দিক মুছে গেল, তার ওপর মুশকিল একখানা সেলুন গাড়ির ইঞ্জিন অকর্মণ্য হয়ে পড়ল, কী যে সেটার ঘটল, কিছুতেই আমরা তা ধরতে পারলাম না। বাকি গাড়িখানায় ওই গাড়ির ছেলেমেয়েদের তুলে দিলাম—সেই ভীষণ গরমে, তৃষ্ণায় আর ঠাসাঠাসিতে তাদের কী কষ্ট! একেবারে নেতিয়ে পড়ল গাড়ির মধ্যে। আমানুল্লা নেমে এসে লরিতে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যে কালাত থেকে করাচিগামী গবর্নমেন্টের ডাকমোটরের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। ডাক পাহারা দেবার জন্যে সঙ্গে একখানা সাঁজোয়া গাড়ি, কারণ ওই সময়টা বেলুচ দস্যুদের বড়ো উৎপাত চলছিল মরুভূমির পথে। একদিনে চামান, পরদিন দুপুরে করাচি। ঠিক হল সেখান থেকে ট্রেনে রাজা-রানি বম্বেতে যাবেন। আমরা ফিরলাম সেই দিনেই কাবুলে। জনপিছু দুশো টাকা বকশিশ মিলল, গাড়িভাড়া ও তেলের দাম বাদে। বিদায় নেবার সময় আমানুল্লা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, যদি কখনো ফিরি, তোমাদের ভুলব না। চেয়ে দেখি রানিমার চোখে জল। আমাদেরও কারো চোখ সেসময় শুষ্ক ছিল না, বোধ হয় কঠোরপ্রাণ দুর্ধর্ষ জাঠ পূরণমলেরও না—নইলে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল কেন?

বাঘের মন্তর

বাইরে বেশ শীত সেদিন। রায়বাহাদুরের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে বেশ গল্প জমেছিল। আমরা অনেকে ছিলাম। ঘন ঘন গরম চা ও ফুলুরি মুড়ি আসাতে আসর একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছিল।

রায়বাহাদুর অনুকূল মিত্র একজন মস্ত বড়ো শিকারি। আমরা কে তাঁর কথা না শুনেছি? তাঁর ঘরে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে শুধু দেখবে মরা বাঘ ও ভালুকের চামড়া, বাঘের মুখ ভালুকের মুখ বাঁধানো—ঘরগুলো দেখে মনে হয় ট্যাক্সিডারমিস্টের কারখানায় বুঝি এসে পড়লাম!

কিন্তু সেদিন আরেকজন লম্বামতো প্রৌঢ় ব্যক্তিকে রায়বাহাদুরের অতি-কাছে বসে থাকতে দেখে ও শিকার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। রায়বাহাদুরের সামনে শিকারের কথা বলে এমন লোক তো আজও দেখিনি। যে অনুকূল মিত্র জীবনে ত্রিশটি রয়েল বেঙ্গল, পনেরোটি লেপার্ড মেরেছেন, ভালুক ও বুনো শুয়োরের তো লেখাজোখা নেই—এ ছাড়া আছে গন্ডার, আছে বাইসন, আছে অজগর পাইথন, আছে শজারু, আছে কাক বক হাঁস, এহেন রায়বাহাদুরের পাশে বসে শিকারের কথা বলা! নাঃ, লোকটা কে হে? বড়ো কৌতূহল হল জানবার।

উপেনবাবু, আমাদের উপেন মাইতি আপন মনে চা খেয়েই চলেছেন, তাঁকে দেখে বললাম, ও উপেনবাবু, ওই লোকটি কে?

উপেনবাবু যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, অ্যাঁ? কই, কে?

—ঘাবড়াবেন না। ওই আধ-বুড়ো লোকটি কে?

—উনি?

—হুঁ। বলুন না।

—বিজ্ঞ শিকারি নিধিরাম ভট্টাচার্য।

—নামটা যেন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মতো শোনাল। আপনি অনায়াসে বলতে পারতেন, নৈয়ায়িক নিধিরাম সার্বভৌম।

—তা শিকারের ব্যাপারে উনি বড়ো কেউকেটা নন। ওঁর 'শিকারযোগ' বই পড়েননি? তিনটে এডিশন হয়ে গেল। আসুন আলাপ করিয়ে দিই।

আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। নিধিরাম ভট্চাজ যে কোনোকালে চাল-কলা-বাঁধা পুরুত ছিলেন না তা তাঁর কথাবার্তার ধরনে আগেই বুঝেছিলাম, এখন সেটা আরও ভালো করে জানা গেল। নানা স্থানের বাঘ-ভালুকের শিকার কীভাবে হয় সে-গল্প করলেন। রাত্রে কীভাবে গাছের উপর বসে কাটিয়েছেন, কোন জঙ্গলে একবার বাঘের মুখে পড়েছিলেন, ইত্যাদি নানা গল্প। লোকটি ভালো গল্প বলতে পারেন। এমন সুন্দর, নিখুঁতভাবে গল্প বলছিলেন যে আমরা ঘটনাবলী যেন চোখের ওপর ঘটতে দেখছি। আরও দেখলাম, নিধিরাম বেশ প্রকৃতি-রসিক ব্যক্তি। জ্যোৎস্না রাত্রি

ও বর্ষামুখর শ্রাবণ রাত্রিগুলির এমন সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছিলেন মুখে মুখে! আমি বললাম, একটা কিছু আশ্চর্য ঘটনা বলুন।

নিধিরাম ভট্চাজ বললেন, সবই আশ্চর্য। বনের সব ব্যাপারই আশ্চর্য।

—তবুও।

—তবুও কী? ভূতের গল্প? ভূত দেখিনি কখনো চোখে।

—বিশ্বাস করেন?

—না।

বারে, এ আবার অতি অদ্ভুত লোক। বাঙালি হয়ে ভূতে বিশ্বাস করে না এমন লোক তো দেখিনি! পরে কথার ভাবে বুঝলাম তিনি তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী। বললাম, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে ভূত মানে না?

—তন্ত্রশাস্ত্র আমি পড়িনি। মন্তর-তন্তরের কথা বলছি।

—ও! কীরকম মন্তর-তন্তরের?

—সব বাজে, ভুয়ো।

—ও-ও বাজে?

—একদম।

—আমি একেবারে অতটা যেতে রাজি নই। মন্তরের শক্তি নিশ্চয়ই আছে।

—ওই করে করে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। আপনারা ইংরেজি লেখাপড়া শিখেও এইসব মানেন?

এইবার নিধিরাম ভট্চাজের ওপর আমার শ্রদ্ধা হল। আশ্চর্য মানুষ তো? আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রৌঢ় ব্যক্তি। আমি বললাম, সুন্দরবনে আপনি গিয়েছেন?

—অনেকবার। এই মন্তর-তন্তর সম্বন্ধে সেখানকার একটি ঘটনা বলি।

আমি বেশ এগিয়ে গিয়ে বসলাম তাঁর কাছে। দিনটা এইসব গল্প শুনবার উপযুক্ত বটে।

উনি বলতে লাগলেন :

সেবার কাকডাঙার ট্যাঁকে আমাদের বজরা লেগেছিল। আমাদের যিনি শিকারের গুরু, খুলনার উকিল সীতাকান্ত রায়ের ভাইপো শ্যামাচরণ রায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে। কথাটা উলটে বলা হল। আসলে তাঁর সঙ্গেই আমরা গিয়েছিলাম—নইলে আমাদের অবস্থার লোক আর বজরা কোথায় পাবে বলুন।

যেখানে বজরা বাঁধা হল সেখানটা একটা খালের মুখ। গভীর বনের মধ্যে দিয়ে এসে এখানে নদীতে পড়েছে কাকডাঙার খাল। খালের দৃশ্য বড়ো সুন্দর। দু-ধারে হেঁতাল ঝোপ, বনের মধ্যে গরান আর গোলপাতার গাছ। জলের ধারে টাইগার ফার্নের জঙ্গল। এই টাইগার ফার্নের জঙ্গলের মধ্যেই সাধারণত বড়ো বড়ো বাঘ আত্মগোপন করে থাকে। শ্যামাচরণ রায় ফর্সিতে তামাক খেয়ে নিয়ে আমাদের বললেন, কাকডাঙার খালে ডিঙি ওঠাও।

ডিঙি বেয়ে আমরা চললাম খালের মধ্যে দিয়ে। সুন্দরবনে যাঁরা কখনো যাননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না এইরকম খাল বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় কী চমৎকার রূপ চোখে পড়ে সুন্দরবনের। কখনো হেঁতাল ঝোপ, কখনো বন্য লেবুর জঙ্গল, গোল গাছের সারি, কোথাও বা বাতাবি লেবুর মতো প্রচুর ফল হয়ে আছে। কোথাও বা হলুদ ফুল ফুটে আলো করে আছে বন্য লতা। কেয়া ঝোপে কেয়া ফুল ফুটে বাতাসকে মিষ্টি করেছে।

অনেকে বলেন সুন্দরবন বড়ো একঘেয়ে। তাঁরা গভীর জ্যোৎস্না রাত্রে এবনের চেহারা কখনো দেখেননি, অন্ধকারে দেখেননি সূর্য উঠবার আগে রাঙা আলোয় মোড়া নিস্তব্ধ বনানীর রূপ, শোনেননি এর বিচিত্র বিহঙ্গ-কাকলি। আমার গুরু শ্যামাচরণ রায় এত ভালোবাসতেন এই বন যে, বাড়িতে বলেছিলেন তিনি মারা গেলে তাঁর দেহটি যেন সুন্দরবনে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর আত্মা এতে শান্তি পাবে।

আমি বললাম, তিনি বেঁচে আছেন?

—না। বহুদিন দেহ রেখেছেন।

—দেহ কি সমাধিস্থ করা হয়েছিল বনের মধ্যে?

—না। হিন্দুর দেহ সমাধিস্থ করা নিয়ে গোলমাল হয় সমাজে। তাই হয়নি।

—বড়ো দুঃখের কথা। তারপর বলুন।

—শুনুন তারপর, কিন্তু একটা কথা, সবটা শেষ হয়ে না গেলে কোনো প্রতিবাদ করতে পারবেন না।

—বেশ, বলুন।

নিধিরামবাবু ভালোভাবে তামাক টেনে দম নিয়ে অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে তারপর আবার বলতে লাগলেন—

অনেক দূর চলে গেলাম খাল বেয়ে। সত্যি কথা বলতে কী, শিকার করার নেশার চেয়েও এই ঘন বনভূমির দৃশ্য আমাকে পেয়ে বসেছিল। যখন প্রায় মাইলখানেকেরও বেশি চলে গিয়েছি নদী থেকে, তখন খালের ধারের বনঝোপের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, বাবু, ও বাবুরা—

আমরা চমকে উঠলাম। ডিঙির হিন্দু মাঝি বলে উঠল, রাম রাম!

শ্যামাচরণ রায় গলা উঁচু করে ডাঙার দিকে চেয়ে বললেন, আঃ, চুপ করো সবাই। কে ওখানে?

ক্ষীণ স্বরে কে বললে, বাবু, আমি।

—কে তুমি? কোথায় তুমি, সামনে বেরিয়ে এসো—

—এই যে বাবু আমি, হেঁতাল ঝোপের পাশেই বসে।

সত্যি এতক্ষণ লোকটাকে দেখতে না পাওয়ার দরুন ওর স্বর অশরীরীর কণ্ঠনিঃসৃত বলে ভ্রম হচ্ছিল বটে, এবার লোকটাকে সবাই দেখতে পেলে। ওই তো বসে আছে হেঁতাল ঝোপের ডাইনে। ওকে আগেও দেখা গিয়েছিল, এবার বুঝলাম। কিন্তু আলো-ছায়ায় জলের মধ্যে দিয়ে ওকে গাছের কাটা গুঁড়ির মতো দেখাচ্ছিল। আমরা দস্তুরমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওকে ওখানে একা বসে থাকতে দেখে। সুন্দরবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা বুঝবেন এরকম বনের মধ্যে একা বসে থাকতে বাতুলেও ভয় পায়।

শ্যামাচরণ রায় বললেন, ও, বেশ। তা ওখানে কী করছ?

—বাবু, হেঁতালের ফল খাচ্ছিলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে। গরিব লোক!

—কথাটার ঠিক জবাব হল না। খিদে পাওয়া তো শরীরের ধর্ম, সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, এ জঙ্গলে ঢুকলে পাকা কুল ছাড়া যে আর কিছু খাবার পাওয়া যায় না তাও ঠিক। কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে?

—বাবু, আমি ফকির মানুষ; ভয়-ডর করলি আমাদের চলে? আমারে একটু নৌকায় তুলে নেবেন

বাবু? কাল-রন্‌ঘাটের ট্যাঁকে আমাকে নাবিয়ে দিলে হেঁটে পিরের দরগায় গিয়ে রাত কাটিয়ে কাল সক্কালেবাড়ি যাব। নেবেন বাবু?

—তোমার বাড়ি সেখানে?

—কাল-রন্‌ঘাটের কাছে মানিক সেনের পাড়ায়। শ্যামাচরণবাবু কিছু বলবার আগে আমাদের ডিঙির মাঝি দুজন আপত্তি জানিয়ে বললে, নেবেন না বাবু! ডিঙির নিয়ম জানেন তো, সুন্দরবনে চলতি ডিঙিতে পথের লোক তুললে সে বড্ড অপয়া। বাবু যাচ্ছেন যখন একটা শুভ কাজে—

শ্যামাচরণবাবু রেগে বললেন, তোদের কী বুদ্ধি!

—কেন বাবু?

—আমার শিকার হোক আর না হোক, ওকে এখানে ফেলে যাব বাঘের মুখে? নিয়ে চল ওকে।

আর এর পরে কি কথা চলবে? ডিঙি থামিয়ে তাকে উঠিয়ে নেওয়া হল। আমাদের মনে হল লোকটা একজন ফকির। সাজপোশাক দেখে অন্তত তাই আমার মনে হয়েছিল। হিন্দু কি মুসলমান, বাইরের সাজ দেখে বোঝা শক্ত। আমরা চুপ করে আছি। শ্যামাচরণ রায় বললেন, কী সাধনা?

—বাঘ আনবার মন্তর জানি কিনা, তার সাধনা। আমি বললাম, সেটা আবার কী?

—আছে বাবু। আমার গুরু আমায় শিখিয়েছেন।

শ্যামাচরণবাবু বললেন, হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকো?

—না বাবু। মন্তরে বাঘ আসবে।

—আমরা শিকার করতে চলেছি। তুমি বাঘ এনে দিতে পারলে দশ টাকা বকশিশ পাবে।

—বাবু! আপনার দয়া!

—ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে না।

—ও কথাই বলবেন না বাবু।

লোকটাকে আমরা ততক্ষণে সবাই ঘিরে বসেছি। শ্যামাচরণবাবু বললেন, সুন্দরবনে এক-একজন লোক আছে, যারা শিকারির সামনে বাঘ হাজির করে পয়সা রোজগার করে। তারা তো হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকে জানি। তুমি সে দলের নও?

—আপনাকে আগেই বলেছি বাবু। মন্তর আসল জিনিস। বাঘ টেনে আনে।

এইসময় আমরা নিধিরাম ভট্‌চাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকার ব্যাপারখানা বুঝলাম না তো?

নিধিরামবাবু আমাদের বুঝিয়ে দিলেন--

এক শ্রেণির লোকের পেশা হচ্ছে এই। তারা ঝোপের মধ্যে বসে হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে বাঘের আওয়াজ নকল করে ডাকে, তাতে নর-বাঘ সেখানে ছুটে আসে এবং শিকারির বন্দুকের পাল্লায় ধরা দেয়। পাঁচ টাকা ছিল ওদের ফি যুদ্ধের আগে। এখন কত জানি না।

আমরা বললাম, এমনভাবে বাঘ আসতে আপনি দেখেছেন?

—অনেক দেখেছি। তবে সবসময় সফল হয় না ওদের চেষ্টা। বাঘ হয়তো সে জঙ্গলে নেই কিংবা কাছে নেই। নয়তো মানুষের সাড়া পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। সে অবস্থায় কী হবে? —তারপর শুনুন। আমি

ঘুন শিকারি, মন্তরে বাঘ এনে দেয় এমন কথা কখনো শুনিনি। শিকার কত এগিয়ে গেল তাহলে ভাবুন তো? শিকারের শখ যাঁদের আছে তাঁরা জানেন একটা জ্যান্ত বাঘের পেছনে কী খাটুনিটাই মশাই তাঁকে স্বীকার করতে হয়। জঙ্গল ঠ্যাঙাও, নয়তো মাচান বেঁধে রাত জাগো। সোজা কষ্ট মশায়? আর সে-জায়গায় যদি মন্তরে বাঘ আসে, তবে শিকার কত সোজা হয়ে গেল বলুন! পাঁচের জায়গায় দশ টাকা দিতে কেন তারা আপত্তি করবে?

—ঠিক কথা। বলুন আপনি।

তারপর ঘণ্টা দুই কেটে গেল, কাকডাঙার খালের মাজায় এসে আমরা নোঙর করলাম।

—মাজায় মানে কী?

—খালের অর্ধেকটা পার হয়ে এসে। —সন্ধে হয়ে এল। আমরা সাহস করলাম না এখন ডাঙায় নামতে। রাত্রের খাবার সঙ্গে করে আনা হয়েছিল, তাই খেয়ে সবাই ডিঙিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিলাম। সমস্ত রাত উত্তেজনায় শ্যামাচরণবাবুর ঘুম নেই চোখে। তিনি শুধু বসে বসে ফকির সাহেবের আজগুবি মন্তরের কথা শুনছিলেন—সে কতবার সাধনা করেছে বনের মধ্যে এই বাঘ আনার জন্যে। গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে বসে এই মন্তরের সাধনা করাই তার কাজ। আরও কত কী যে বাজে গল্প! সারাদিন খেটেখুটে রাতে যে একটু ঘুমুবে, তার উপায় নেই।

কিন্তু শ্যামাচরণ রায় স্বয়ং ফকির সাহেবের মুরুব্বি। তাঁর কথার ওপর কথা বলবে কে? আমরা চুপচাপ শুয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করলাম। শেষরাতের দিকে খানিকটা কৃতকার্য যে হইনি তাও নয়।

আমি বললাম, একটা কথা। আপনারা কাকডাঙা খালের মাঝামাঝি এলেন কেন? বজরা ছেড়ে আসার হেতু কী?

—হেতু খুব স্পষ্ট। বজরায় বসে তো শিকার চলবে না! বজরা আছে নদীতে, তার একদিকে জঙ্গল, অন্যদিকে কূলকিনারা দেখা যায় কি না যায়। ছোটো খালের মধ্যে না গেলে দু-দিকের জঙ্গল তো তুমি দেখতে পাচ্ছ না। তুমি তো জঙ্গলে চড়ুইভাতি করতে আসনি?

নিধিরাম ভট্চাজ একটু তর্কপ্রিয় লোক। কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ পাছে করে এই আশঙ্কায় সর্বদাই কোমর বেঁধে তর্কের জন্য তৈরি হয়ে থাকেন এবং গল্প শুরু করবার সময়ে কেন যে বলেছিলেন আমার কথার কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত, এখন তা বুঝলাম। আমরা তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আপনাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছি জানবার আগ্রহে, আপনার গল্পের খুঁত ধরবার জন্য নয়। বলে যান আপনি।

নিধিরাম ভট্চাজ বললেন, খুব ভালো কথা। শোনো তারপরে। আমার এগল্প শেষ হয়ে এসেছে। যা কিছু প্রতিবাদ করবার গল্পের শেষে করতে তো তোমাদের বলছি।

ডিঙি নোঙর করে সারারাত্রি সেখানে থাকবার সময়ে সেরাত্রেই বুঝতে পারা গেল, কী ভয়ানক জায়গায় আমরা এসেছি। জ্যোৎস্না রাত্রির আলো-ছায়া বারবার কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল বাঘের গর্জনে। কাকডাঙার খাল সম্বন্ধে শ্যামাচরণ রায় বিবেচনায় ভুল করেননি। ভোরে উঠে শ্যামাচরণবাবুকে বললাম, চমৎকার জায়গায় এসেছেন!

শ্যামাচরণ রায় বললেন, কাঁচা শিকারির কথা হয়ে গেল।

—আজ্ঞে কেন?

—বনের বাঘ আর শিকারির বাঘ এক নয়। ওরকম বাঘ ডাকে সুন্দরবনের বহু জায়গায়। কিন্তু চোখে দেখতেও পাবে না কোনোদিন একটি। তাই তো ফকির সাহেবকে ধরেছি। এখন ফকির সাহেবের দয়া—

—আর আপনার হাতযশ—

সকালের রোদ বেশ উঠলে আমরা সবাই ডিঙি থেকে নেমে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আধমাইলটাক দুরে একটা ফাঁকা জায়গা আছে বনের মধ্যে, তাকে বলে হাতল বাদিয়ার ডাঙা। সেখানে আমরা রান্না করে খাব দুপুরে।

আমরা জিনিসপত্র নিয়েই নামলাম, নয়তো কে আবার এ বনের মধ্যে দিয়ে ডিঙিতে ফিরবে রান্নার জিনিস নিতে। মাঝি দুজনকেও সঙ্গে নিলাম, এ নির্জন জঙ্গলে তারা দুটি প্রাণী ডিঙিতে বসে থাকতে রাজি নয়।

দু-দিকে ঘন গরান আর হেঁতালের জঙ্গল, টাইগার ফার্নের ঘন সমাবেশ, পা বাঁচিয়ে চলতে হয় শুলোর ভয়ে। শুলো হল গাছের বায়ব্য শিকড়, কাদা থেকে মাথা তুলে তীক্ষ্ণ সড়কির মতো খাড়া হয়ে থাকে, ঝরা পাতার তলায় পা দিলেই রক্তপাত। দু-ধারে বন, মাঝখান দিয়ে জুড়ি পায়ে চলার পথটা।

ফকির সাহেব সকলের আগে, তার পেছনে গুরুজি শ্যামাচরণ রায়, তাঁর পিছনে দুজন লোক, তারপর আমি, সর্বশেষে মাঝি দুজন।

হঠাৎ এক জায়গায় কী একটা শব্দ হল, শ্যামাচরণবাবু ও লোক দুজন চমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে এগিয়ে গেলাম।

বললাম, কী হল? থামলেন যে?

সেই সময় নজর পড়ল দলের পুরোভাগে ফকির সাহেব ছিলেন, তিনি নেই। বলতে যাচ্ছি, ফকির সাহেব বুঝি—

শ্যামারচরণবাবু বললেন, উঃ সর্বনাশ! এমন কাণ্ড কখনো—উঃ!

তাঁর পেছনের লোকদুটি তখনও আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে। একজন বললে. উঃ! বাবুর ডান পাশের ঝোপ থেকেই তো—

শ্যামাচরণবাবু আড়ষ্ট গলায় বললেন, আহা, গরিব লোক! আমিই মন্তর আওড়াতে বলেছিলাম ওকে মনে মনে—

ব্যাপার তখনই শুনলাম। ডানদিকের টাইগার ফার্নের বন থেকে ভীষণ এক রয়্যাল টাইগার লাফিয়ে পড়ে ফকির সাহেবকে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

চেয়ে দেখে মনে হল বাঁ দিকের হেঁতাল ঝোপের মাথা যেন তখনও নড়ছে।

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বললাম, তারপর? পাওয়া গেল ফকির সাহেবকে?

—তা কখনো যায়! ওই শেষ। একটা হিংলাজের দানার মালা কেবল একটি হেঁতালের ডালে বেঁধে ঝুলছিল। আমরা অনেক খুঁজেছিলাম। শ্যামাচরণ রায় বড়ো শিকারি, বাঘের ধরন-ধারণ তাক-বাক অনেক কিছু জানেন। কিছুই করতে পারলেন না। নামও জানিনে ফকির সাহেবের যে কাউকে কোথাও খবর দেব।

আমার গুরুজি শ্যামাচরণ রায় বলতেন, লোকটি সত্যিই গুণী ছিল। মন্তরের জোরে বাঘ আকর্ষণ সে ঠিকই করেছিল, আমার অসতর্কতায় মারা পড়ল ও। বাঘকে আকর্ষণ করতেই শিখেছিল, বাঘের হাত থেকে বাঁচার মন্তর তো শেখেনি!

অপরাহ্নের দিকে আমরা খোঁজাখুঁজি শেষ করে কাকডাঙার খাল বেয়ে বজরা ধরলাম নদীতে। মন সবারই এত খারাপ হয়ে গেল যে, সেবার আমাদের শিকারে আর কোনো উৎসাহই রইল না। শ্যামাচরণবাবুকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, গুরুজি, ফকির সাহেবকে দলের আগে আগে যেতে কে বলেছিল? আপনি তো জানেন নিরস্ত্র অবস্থায় আগে আগে ওভাবে যেতে নেই?

শ্যামাচরণ রায় বলেছিলেন, বিশ্বাস করিনি যে। বোগাস বলে ভেবেছিলাম তোমাদের মতো।

হারুন-অল-রসিদের বিপদ

জানিপুর থেকে দুটি ছেলে পড়তে আসে ইস্কুলে।

এ অঞ্চলে আর ইস্কুল নেই, ওদের বাড়ির অবস্থা ভালো, যদিও সাত পুরুষের মধ্যে অক্ষর পরিচয় নেই, তবুও বাপমায়ের ইচ্ছে, যখন ধান বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেল, তখন ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক। চাষা লোকদের জন্যেও লেখাপড়ার দরকার আছে বই কী। ধানের হিসেব, জনমজুরের হিসেব রাখাও তো চলবে।

ওরা আসে মাদলার বিলের ধারের বড়ো মাঠের ওপর দিয়ে। আজকাল সকালে ইস্কুল, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দোলে মাঠের মধ্যে, কত কী পাখি ডাকে, বড়ো বড়ো খোলাওয়ালা গেঁড়িগুলো বিলের দিকে নামে মাঠের পথ বেয়ে, আশ ধানের জাওলা খায় লুকিয়ে ছাড়া গোরুতে। ওরা পরামাণিকদের বাগানের আম কুড়োতে কুড়োতে চলে আসে মাঠ ও বাগানের মধ্যে দিয়ে, যদি সামনে বিপিন মাস্টারের বেতের ভয় না থাকত ইতিহাসের ঘণ্টায়, তবে বড়ো মজাই হত। কিন্তু তা হবার নয়, এমন সুন্দর পথযাত্রার শেষে অপেক্ষা করচে রুক্ষমূর্তি বিপিন মাস্টার ও তাঁর হাতের খেজুর ডালের বেত।

একটি ছেলের নাম হারুন, আর অপরটির নাম আবুল কাসেম। দুটি বেশ দেখতে, পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শান্ত চেহারা, অতি সরল, কলকাতা তো দূরের কথা, মহকুমার টাউন বনগাঁও কখনো দেখেনি। আবুলের হাতে অনেকগুলো পদ্ম ফুল, মাদলার বিল থেকে তুলেচে, ক্লাসের টেবিল সাজাবে, ফণি মাস্টার ফুল ভালোবাসেন, তাঁকে দিতে হবে।

হারুন বললে, এই আবুল, এঁচড় পাড়বি?

—কোথাকার রে?

—চল না, রাস্তার গাছের। ও গাছ তো সরকারি, তুমিও পাড়তে পার, আমিও পারি।

—কী হবে এঁচড়? বিপ্‌নে মাস্টারকে দিবি?

—তাই চল, যাবার সময়ে ওর বাড়িতে দুখানা বড়ো দেখে দিয়ে যাই। মারের দায়ে বেঁচে যাওয়া যাবে এখন।

বেত্রভীতি থেকে উদ্ধাব পাওয়ার এপথ ওদেরই আবিষ্কৃত। যেদিন ওরা এঁচড় দেয়, সেদিন ইতিহাসের ঘণ্টায় ওদের দেখতে পান না যেন বিপিন মাস্টার। অন্য সবাইকে মারেন। ওরা গাছে উঠে দুখানা বড়ো এঁচড় সংগ্রহ করলে। হারুন উঠল গাছে, আবুল রইল নীচে দাঁড়িয়ে। কোষওয়ালা বড়ো এঁচড়। ইতিহাসের পড়া কারো হয়নি আজ।

রাস্তার ধারে বিপিন মাস্টারের টিনের বাড়িটা। বাইরে কেউ নেই।

হারুন ডাকলে, স্যার, স্যার—

বিপিনের স্ত্রী ঘুমচোখে বাইরে আসতে আসতে বলছিলেন, আপদগুলো সকালবেলাই এসে—

এমন সময় ওদের হাতের এঁচড় দেখে থেমে গিয়ে মুখে হাসি এনে, গলার সুর মোলায়েম করে বললেন—কীরে? এঁচড়? কোত্থেকে আনলি?

ওরা এঁচড় ফেলে চলে এল। বিপিন মাস্টার ইস্কুলে গিয়েচেন ওদের আগে। আজ তাঁরই প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস। একটু দেরি করে ক্লাসে ঢুকলে আট আনা জরিমানা করা তো বাঁধাধরা রুটিনের কাজ।

ওরা ঢুকল ক্লাসে দুরুদুরু বক্ষে।

বিপিন মাস্টার কড়া সুরে হেঁকে বললেন, এই যে। হারুন আর আবুল—এদিকে এসো—

ওদের একজন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বিপিন মাস্টার বললেন, দেরি কীসের?

—আজ্ঞে, এঁচড়—

—কী? এঁচড়? কীসের এঁচড়? সরে এসো এদিকে—

পিঠে বেত পড়বার আর দেরি নেই দেখে হারুন ভূমিকাবাহুল্য না করে সংক্ষেপে আসল কথাটা বলবার প্রচেষ্টায় উত্তর দিলে, আপনার বাড়িতে এঁচড়—

—কী? আমার বাড়িতে? তার মানে?

—এঁচড় দুখানা বেশ বড়ো বড়ো আপনার বাড়িতে দিয়ে এলাম।

—কবে?

—এখন স্যার। তাইতে তো দেরি হল—এঁচড় পাড়তে দেরি হল—

বিপিন মাস্টারের উদ্যত বেত্র নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এ যে কত বড়ো অমোঘ মহৌষধ ওরা দুজনেই তা জানে। বিপিন মাস্টার আর কোনো কথা বললেন না। ওরা দুজনে গটগট করে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে সামনের বেঞ্চির ভালোছেলে যুগলকে ঠেলে সরিয়ে সেখানে বসবার চেষ্টা করতে যুগল দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দেখুন স্যার, আমি কতক্ষণ থেকে বসে আছি এখানে, আমাকে টেনে ওরা বসতে চাচ্ছে এত দেরিতে এসে—

বিপিন মাস্টার মুখ খিঁচিয়ে বললেন, বসতে চাইচে তা হয়েচে কী? তোমার একার জন্যে বেঞ্চি হয়নি—সরে বসে ওদের বসতে দাও। ওরা কী দাঁড়িয়ে থাকবে—ডেঁপো ছোকরা কোথাকার—

হারুন এক ঠ্যালা মেরে যুগলকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসে পড়ল। আবুল বসল যুগলের ওখানে। যুগল বেচারিকে উঠেই যেতে হল দু-দিক থেকে ঠ্যালা খেয়ে। বিপিন মাস্টার দেখেও দেখলেন না। আজ তিন পিরিয়ড বিপিনবাবুর।

ওরা বুঝেসুজেই আজ এঁচড় এনেচে। তিন পিরিয়ডের ধাক্কা সামলাতে হবে তো? কিন্তু তার চেয়েও বড়ো ধাক্কা আজ পৌঁছোল এসে। ওরা দুজনে ক্লাসের বাইরে এসে দেখলে একখানা ঘোড়ার গাড়ি স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

হারুন বললে, কে রে? কে এল?

আবুল ঠোঁট উলটে বললে, কী জানি!

এমন সময় ওপর ক্লাসের শিবনাথ মাস্টার বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে বললেন, যাও সব ক্লাসে গিয়ে বোসো। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু এসেচেন—এখুনি ক্লাস দেখতে আসবেন—

সব ছেলে চুপচাপ ক্লাসে এসে বসে। আবুল ও হারুন সেইসঙ্গে এসে বসে। ওদের গাঁয়ের পাশে রসুলপুর, সব মুসলমান চাষিদের বাস। সে গ্রাম থেকে পড়তে আসে একটি ওদের বয়সি ছেলে, নাম তার হায়দার আলি।

হারুণ বললে, আমাদের পরনে ময়লা কাপড়—

হায়দার বললে, তাতে কী হয়েচে?

—মার খাবি এখন—

—ইস্ তা আর জানিনে। মারলেই হল।

কথাটা বললে বটে, কিন্তু মনে ততটা ভরসা ছিল না হায়দারের। ভয়ে ভয়ে সে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে সাহেবি পোশাকপরা ইন্‌স্‌পেক্টর এবং তাঁর পেছনে হেডমাস্টার ওদের ক্লাসে দেখা দিলেন। বিপিনবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু বললেন, এটি কোন ক্লাস? বেশ বেশ। এদের কীসের ঘণ্টা?

বিপিনবাবু বললেন, ইতিহাসের।

—বেশ বেশ।

পরে হারুনের দিকে চেয়ে বললেন, কী নাম?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বললে, হারুন-অল-রসিদ।

—অ্যাঁ?

—স্যার, হারুন-অল-রসিদ।

—বোগদাদ থেকে কবে এলে?

—আজ্ঞে, স্যার?

—বলি বোগদাদ ছেড়ে এখানে ছদ্মবেশে নয় তো?

হারুন বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। হেডমাস্টার হাস্‌লেন।

—সরে এসো এদিকে। ইতিহাস পড়েচ?

—আজ্ঞে, স্যার।

—কুতুবুদ্দিন কে ছিলেন?

হারুন বললে, রাজা।

—কোথাকার রাজা? কোথায় থাকতেন?

—বিলেতে।

—বেশ। আকবর কে ছিলেন?

হারুন ভেবে বললে—সেনাপতি—

—কার সেনাপতি?

—রাজার।

—কোন রাজার?

—বিলেতের।

—বাঃ, বাঃ—হারুন-অল-রসিদ বোগদাদি, বেশ ইতিহাসের জ্ঞান তোমার, বোগদাদের খবর কী?

—অ্যাঁ?

—বলি বোগদাদের খবর কী?

হারুন ভাবলে বোগদাদ হয়তো তাদের গ্রামের ইংরেজি নাম। তাই সে বললে, খবর ভালো, স্যার।

হেডমাস্টার ও ইন্‌স্‌পেক্টর হো হো করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে হাসবার ব্যাপার কী আছে, হারুণ তা খুঁজেই পেলে না। বিপিন মাস্টারের দিকে হঠাৎ ওর নজর পড়তেই দেখলে তিনি রোষকষায়িত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে আছেন—ওকে গিয়ে খাবেন এই ভাব।

হারুন ভেবে পেলে না কী এমন অন্যায় কাজ সে করে বসল।

বিপিন মাস্টার নিশ্চয়ই চটেচে, ওঁর মুখে তার রেশ আছে।

ইন্‌স্‌পেক্টর ওর দিকে চেয়ে বললেন, বেশ মজার ছেলেটি, সো সিম্পল্‌।

হেডমাস্টার বললেন, পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কিছুই জানে না।

—চলুন, অন্য ক্লাসে যাওয়া যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে হেডমাস্টার এসে ওদের ক্লাসে বললেন, পুণ্যশ্লোক নৃপতি হারুন-অল-রসিদের নামে তোমার নাম। তাঁর কথা কিছু জানো? তিনি ছিলেন গরিবের মা-বাপ, ছদ্মবেশে প্রজাদের দুঃখ দেখে বেড়াতেন। শিখে রেখো।

বিপিন মাস্টার ছুটির আগে ওদের ক্লাসে এসে বেত আস্ফালন করে বললেন, সরে এসো এদিকে, মুখ্যুর ধাড়ি। ক্লাসের মুখ হাসিয়েচ আজ। বেত লাগাই এসো। হারুন কাঁদো কাঁদো মুখে এগিয়ে যেতেই হেডমাস্টারের ঘর থেকে স্কুলের চাকর এসে বললে, হারুনকে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু ডাকচেন।

কী বিপদেই আজ পড়েচে ও। কার মুখ দেখে না জানি আজ সে উঠেছিল!

অফিসঘরে ওকে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি আপাতত কোথায়?

হারুন ভয়ে ভয়ে বললে, জানিপুর।

—কতদূর এখান থেকে?

—দু-মাইল, স্যার।

—কী খেয়ে এসেচ?

—পান্তা ভাত।

—মসরুর কোথায়?

—আজ্ঞে?

—খোজা মসরুর?

নাঃ, কী বিপদেই আজ ভগবান তাকে ফেললেন। এসব কথা সে জীবনে কখনো শোনেনি। কেন এত বড়ো বড়ো লোক খাপছাড়া কথা বলে, যার কোনো মানে হয় না? উত্তর দিতে না পারলে এখুনি বিপ্‌নে মাস্টার বেত উঁচিয়ে আসবে মারতে।

হারুনের মুখ শুকিয়ে গেল। ও করুণ নয়নে একবার ইন্‌স্‌পেক্টরবাবুর দিকে চেয়ে দেখে চোখমুখ নিচু করলে। একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে বিপ্‌নে মাস্টারটা ওঘরে কোথাও আছে নাকি। সকালের এঁচড় পাড়া আজ একেবারে মাঠে মারা গেল! অদৃষ্ট আর কাকে বলে? নাম রেখেছেন তার বাপ-মা, তার কী দোষ?

কখন তার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল ওর অজ্ঞাতসারে।

ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু বললেন, কেঁদো না খোকা। যাও, বাড়ি যাও। তোমার নামটা খুব বড়ো একজন ভালো লোকের নাম। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ লোক, বুঝলে, যাও—

স্কুল থেকে বাড়ি যাবার পথে আবুল বললে—এঁচড় আজ না দিয়ে কাল দিলেই হত। আজ তো পড়াই হল না। তোকে কী বলছিলরে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু?

হারুন বললে—তুই পাড়গে যা এঁচড়। বিপ্‌নে মাস্টারকে আজ এখুনি চার-পাঁচখানা দিয়ে আসি। কাল নইলে আজকের শোধ তুলবে। কী মুশকিলে পড়েছিলাম আজ বল তো।

বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দুজনে বাড়ি পৌছোল।

গল্প নয়

সেদিন হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে ঢুকে দেখি কামরাতে আদৌ ভিড় নেই।

সকালের ট্রেনে কামরা অনেকটা খালি পাওয়া যায় বটে। নিজের ইচ্ছামতো বিছানা পেতে নিয়ে বসেছি, এমন সময় একটি বৃদ্ধ মুসলমান একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ঢুকল এবং আমার বিছানার অদূরে বসল।

খবরের কাগজ পড়বার ফাঁকে খবরের কাগজের ওপর দিয়ে ওদের চেয়ে দেখলাম। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে কখনো পড়েছে কি না সন্দেহ। বৃদ্ধ মুসলমান পরম যত্নে শিশুটিকে কোলের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছে। কিন্তু শিশুটির চেহারা দেখে মনে হল, বেশিদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস ওকে ভোগ করতে হবে না। শুধু কখানি হাড়ের ওপর চামড়া দিয়ে ঢাকা, মাংস আদৌ নেই বললই হয়, সেইজন্যে হাঁটুর ও পায়ের নীচের চামড়া কুঁচকে জড়ো হয়ে এসেছে। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, মাথার চারিদিকে বড়ো বড়ো সাত-আটটি ঘা। ওষুধের তুলো লেপটানো রয়েছে।

এক্ষেত্রে আমরা যেমন করে থাকি, তাই করলাম।

কড়া সুরে বললাম, সরে বসো না বাপু, একেবারে ঘাড়ের ওপর কেন। গাড়িতে যথেষ্ট জায়গা তো পড়ে রয়েছে। বৃদ্ধ মুসলমানটি আমাকে বলতে পারত অনায়াসেই, কেন মশাই, আপনার বিছানাতে আমি বসিনি তো। তফাতেই বসে আছি, তবে সরে বসতে বলছেন কেন? টিকিট করে আপনিও যাচ্ছেন, আমিও যাচ্ছি। আপনি সরে বসতে বলবার কে?

কিন্তু এক্ষেত্রে যেমন সাধারণত হয়ে থাকে—লোকটি সরে বসল। আমি আবার আমার খবরের কাগজে মন দিলাম।

একবার গাড়িতে ফেরিওয়ালা উঠে বিস্কুট ফেরি করতে লাগল। মুসলমানটি শিশুকে দুখানা বিস্কুট কিনে দিলে। আর একবার তাকে চানাচুর কিনে দিলে। আমার মনে হল আমার নিজের ছেলে হলে তাকে এই রুগ্ন অবস্থায় আমি কি বিস্কুট-চানাচুর খাওয়াতাম?

কিন্তু মুখে কোনো কথা ওকে বলিনি।

যা খুশি করুক, আমার বলবার দরকার কী?

এক-একবার চেয়ে দেখি, আমার বিছানার কাছে এসে বসল কি না। কি কুশ্রী কদাকার হয়েছে দেখতে ছোটো ছেলেটা!

ইতিমধ্যেই অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। গাড়িতেও লোকজনের যথেষ্ট ভিড় হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ আমার কানে গেল একটি ছোটো মেয়ের স্নেহময় স্বরে কে যেন বলছে, এ বিস্কুটগুলো তেমনি মিষ্টি নয় বলে খোকা খাচ্ছিল না—এখন দেখো কেমন খাচ্ছে, না মা? দেখো, কেমন হাত দিয়ে মুখে তুলে কুটুর কুটুর কাটছে—

এমন ধরনের কথা এবং এমন ধরনের সুর আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত বলেই প্রথম ওই কথাটা আমার অন্যমনস্ক মনকে আকৃষ্ট করে।

আমাদের ছোট্ট খোকাটি যখন তার মামার বাড়ি যায় তখন তার ছোটো মাসি ও মামাতো বোনেরা এমনি স্নেহমাখা আগ্রহ নিয়ে খোকার প্রত্যেকটি তুচ্ছ কাজ এবং অকাজ লক্ষ করে এবং ওইরকম সুরে সহর্ষ মন্তব্য করে।

সোজা হয়ে উঠে বসে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। ইতিমধ্যে কখন দুটি স্ত্রীলোক এসে গাড়িতে ঢুকেছিল আমি লক্ষ করিনি। একটি তরুণী বধূ, মলিন শাড়ি পরনে, রুক্ষ চুল, মুখশ্রী সুন্দর, চোখ দুটিতে পল্লিপ্রান্তের শান্ত অবসর। বধূটির পাশে আধা-বয়সি একটি থানপরা স্ত্রীলোক, কিন্তু এর রং কিছু ফর্সা, তরুণীটির রং কালো।

দুজনেই থলে নিয়ে চলেছে এই ট্রেনে চাল আনতে। এরা সম্ভবত উঠেছে বাগনান স্টেশনে, যাবে বোধ হয় ঝাড়গ্রামে। প্রত্যেক স্টেশনেই দেখেছি চাল আনবার জন্যে পল্লির গরিব মেয়েরা ভিড় করে উঠেছে। কোথা থেকে এরা চাল আনে তা ঠিক বলতে পারব না।

এর দুটিও সেই দলের লোক। এদের সঙ্গের আট ন-বছরের খাটো কাপড় পরা খুকিটি বোধ হয় আধা-বয়সি স্ত্রীলোকটির মেয়ে।

তরুণী বধূটি জিজ্ঞেস করছে বৃদ্ধ মুসলমানটিকে, সেখানে তারা বুঝি রাখলে না?

এদের আগের কথাবার্তা আমি শুনিনি। কারা রাখলে না, কোথায় রাখলে না, এসব কথা নিশ্চয় আগে হয়ে গিয়ে থাকবে।

বৃদ্ধ বললে, না গো। তাইতে তো একে নিয়ে যাচ্ছি।

—মা কতদিন মারা গিয়েছে বললে?

—এ তখন সাত মাসের।

শুনেই মেয়ে দুটি পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে। তরুণীটি বললে, আহা!

অন্য মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, এখন একে কোথায় নিয়ে যাবে?

—বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

—একে সেখানে দেখবার লোক আছে?

—না গো, কেউ না, আমাদেরই দেখতে হবে।

—ডাক্তার দেখানো হয়নি?

—কিছু না। পরে কি করে গো?

—বয়েস কত হল?

—এই এগারো মাস।

—আহা, শরীরে শুধু হাড় আর চামড়া সার হয়েছে।

—তা নসিবের দোষ। কী করব। এখন খোদা যদি বাঁচান, তবেই বাঁচবে।

—কী খেতে দিচ্ছ?

—কী দেব, যা জোটে। আমি একা মানুষ বলেই তো কলকেতায় ওদের ওখানে রেখেছিলাম। এমন হাল করবে তা কী করে জানব। করে এখন খবর দিয়েছে, নিয়ে যাও।

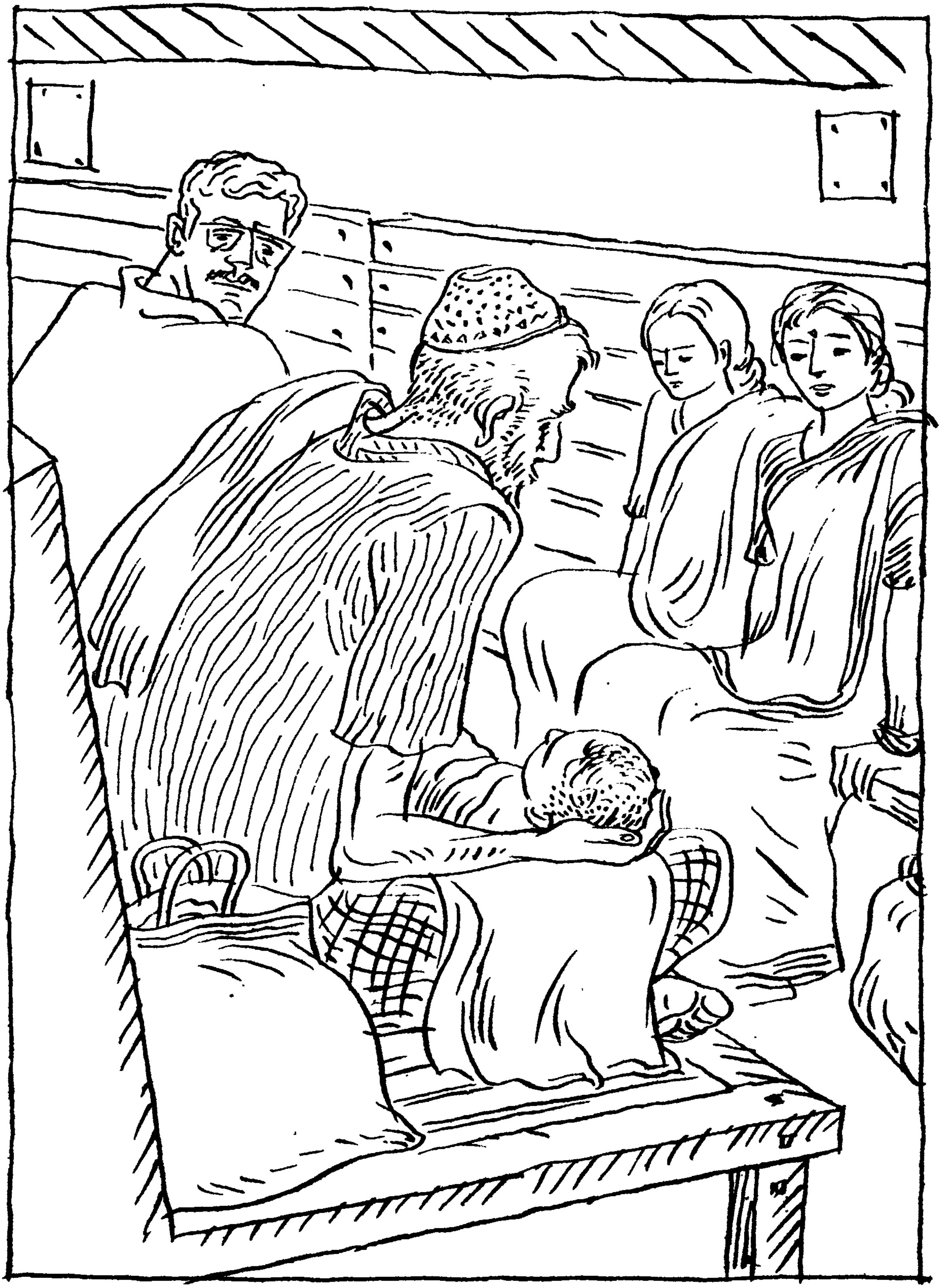

—ঠান্ডা মোটে লাগিওনি, বিষ্টি হচ্ছে, জানালাটা বন্ধ করে দাও। আহা, এমনিতেই তো ওর কাশি হয়েছে।

আরও কত কী প্রশ্ন মেয়ে দুটি করতে লাগল, আমার সব মনে রাখবার কথা নয়। আমার এটি গল্প নয়; সুতরাং বানানো কিছু এর মধ্যে স্থান পাবে না। এইটুকু আমার মনে আছে, ওরা দুজনে যতগুলি প্রশ্ন করলে, সবগুলি ওই ছোট্ট রুগ্ন খোকার রোগ সম্বন্ধে, পথ্য সম্বন্ধে, ওর চিকিৎসা সম্বন্ধে, ওর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে। একবার তরুণী বধূটি করে আর একবার অন্য মেয়েটি করে। এ একবার ও আর বার। যা কিছু প্রশ্ন, সব ওই খোকাকে ঘিরে। আর ওদের চোখে—বিশেষ করে সেই তরুণী বধূটির চোখে—অদ্ভুত স্নেহঝরা দৃষ্টি।

একবার খোকা হাঁচল।

তরুণী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, জীব।

আমার অন্যমনস্কতা চলে গিয়েছে ততক্ষণ। আমি বিস্মিত হয়ে উঠেছি। এমন একটা ঘটনা যেন দেখছি যা শুধু এই বিংশ শতাব্দীর নয়, সর্বকালের, সর্বযুগের। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসায়, শঠতায়, নিষ্ঠুরতায়, স্বার্থপরতায়, ঈর্ষায় যে বিংশ শতাব্দীর নভোমণ্ডল আজ ধূমমলিন—যে বিংশ শতাব্দীতে আছে শুধু অর্থের আদর—সেখানে এই ময়লা শাড়ি পরনে দরিদ্র পল্লিবধূটি ও তার করুণাময়ী সঙ্গিনী এক নতুন বার্তা শুনিয়ে দিলে। সে বার্তা নতুন হলেও হিমালয়ের মতোই পুরোনো।

এই গাড়ির মধ্যে এত পুরুষমানুষ ছিল, কেউ ফিরেও চেয়ে দেখেনি ছেলেটার দিকে। সনাতনী মাতৃরূপা নারী দুটি এসে এই মাতৃহীন মৃত্যুপথযাত্রী শিশুকে মাতৃস্নেহের বহু পুরাতন অথচ চির-নূতন বাণী শুনিয়ে দিলে : সেদিন সে ট্রেনের মধ্যে গুটি-কয়েক ক্ষণের জন্য বিংশ শতাব্দী ছিল না—সমাজদ্রোহী, 'কালোবাজার-পুষ্ট' লোভী বিংশ শতাব্দী। ছিল সেই অমর মাতৃলোক, বিশ্বের সমগ্র জীবজগৎ যার করুণাধারায় বিধৌত।

পাঁশকুড়া স্টেশনে বধূটি ও তার সঙ্গিনী ট্রেন থেকে নেমে গেল।

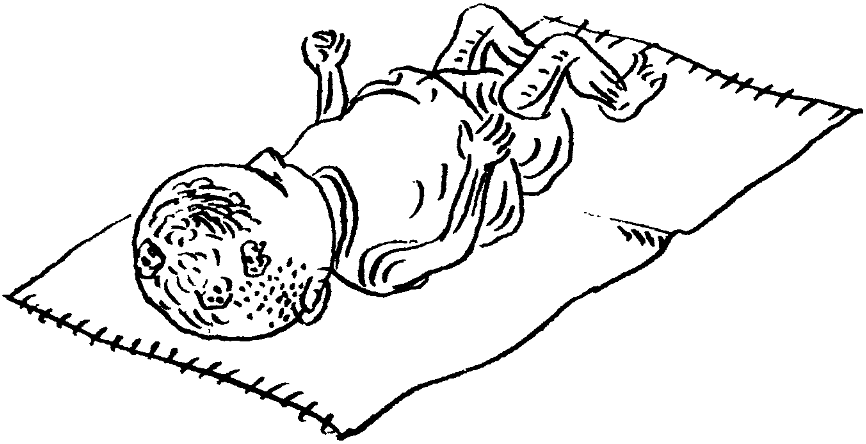

ভৌতিক পালঙ্ক

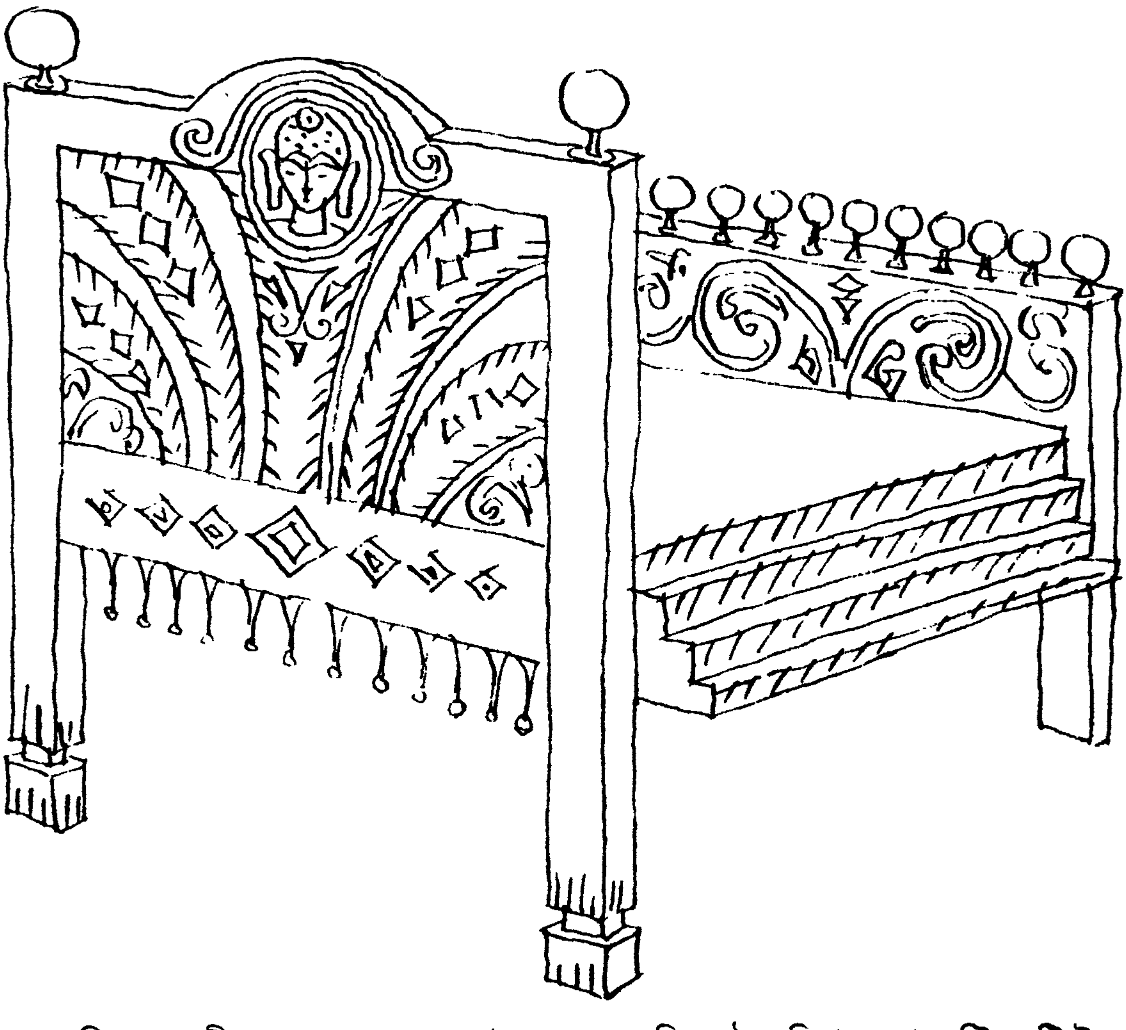

অনেক দিন পর সতীশের সঙ্গে দেখা। বেচারা হন্তদন্ত হয়ে ভিড় ঠেলে বিকালবেলা বেন্টিংক স্ট্রিটের বাঁ দিকের ফুটপাথ দিয়ে উত্তরমুখে চলেছিল। সমস্ত আপিসের সবেমাত্র ছুটি হয়েছে। শীতকাল। আধো-অন্ধকার আধো-আলোয় পথ ছেয়ে ছিল। ক্লান্ত দেহে ছ্যাকড়াগাড়ির মতো ধীরে ধীরে পথ ভেদ করে চলেছিলাম। সহসা সতীশের জামাটা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলাম, আরে, সতীশ যে!

সতীশ সবিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে বলে উঠল, খগেন! বাই গড্! আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

বললাম, তার প্রমাণ, আমাকে ধাক্কা দিয়েই তুমি চলে গেছলে আর একটু হলে। ভাগ্যিস্ ডাকলাম।

—সরি। আমি এখন বিশেষ ব্যস্ত।

—তা তো বুঝতেই পারছি। তা কোথায় চলেছ শুনি?

—তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। বেশিদূর নয়। যাবার পথে সব বলব।

—আশ্চর্য!

—'না' বললে শুনব না। জোর করে নিয়ে যাব।

ছেলেবেলা থেকেই সতীশকে চিনি। কথা অনুযায়ী সে কাজ করে। আর শরীরে কিছু বল থাকায়, প্রায়ক্ষেত্রে সে বলপ্রয়োগ করে স্বার্থসিদ্ধি করতে ভোলে না। অগত্যা তার সঙ্গে যেতে হল।

তার গন্তব্যস্থান খুব নিকটেই ছিল এবং সে তার উদ্দেশ্য খুব সংক্ষেপেই ব্যক্ত করল। সেদিন সকালে খবরের কাগজে বেচা-কেনার কলমে একটি বিজ্ঞাপন ছিল :

একটি অতি আধুনিক এবং রহস্যজনক চীনদেশীয় খাট অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রয় করা হইবে। জগতে ইহা অদ্বিতীয়। সুযোগ হারাইলে অনুশোচনা করিতে হইবে। ২/৩ . . . স্ট্রিট।

সতীশ তার পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটি বার করে বললে, পড়ো।

—বুঝলাম। তার 'রহস্যজনক' শব্দটির মানে কী?

—ওইটেই তো আমায় ভাবিয়ে তুলেচে! কোনো হদিস করে উঠতে পারছি না।

সতীশ চলছিল রাস্তার নাম দেখতে দেখতে। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল, পেয়েছি। এই গলি।

সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সেই গলির পানে তাকিয়ে আমার সারা শরীরে—কেন জানি না একপ্রকার শিহরণ জাগল। চীনাপল্লির চীনা-আবহাওয়ায় রহস্যজনক খাট! সতীশের হাতটা ধরে বললাম, খাটে কাজ নেই সতীশ, চলো ফিরে যাই। আমার বাঙালি-খাট বেঁচে থাকুক।

সতীশ প্রবলবেগে এক ঝাঁকানি দিয়ে উঠল, ভীতু কোথাকার! এতটা এগিয়ে এসে কখনো ফেরা যাবে না।

গলির মোড়ে ডান পাশে একটা নিম গাছ ভূতের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকের ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে যতসব অখাদ্য-কুখাদ্যের উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে। অন্নপ্রাশনের ভাত যেন ঠিকরে বার হয়ে আসতে চাইল অসহ্য যন্ত্রণায়। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কোনোগতিকে পথ চলতে লাগলাম।

একটা দমকা বাতাস বিভ্রান্ত হয়ে আচমকা দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে এসে আমাদের শরীরে যেন আছাড় খেয়ে পড়ল। মাথায় ওপরদিকে কয়েকটা বাদুড় ডানার শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। দুটো অভিভাবকহীন কুকুর এই অনধিকার-প্রবেশকারীদের পানে চেয়ে বিশ্রী সুরে অভিযোগ করতে লাগল।

পথে আর জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। পাশে একটি চীনা-ডাক্তারের বহু পুরাতন সাইন-বোর্ড। তার ওপরকার নরকঙ্কালের ছবিটি জীর্ণপ্রায়। কোথা থেকে একটি পিয়ানোর অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছিল।

শীঘ্রই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট গৃহে এসে পৌঁছোলাম। অমন বাড়ি আমি আর জীবনে দেখিনি। ইট বার-করা পঙ্গুপ্রায় বহু প্রাচীনকালের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে এই বাড়ির ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল।

ভাঙা ফটক দিয়ে অতি সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাড়ির ভেতরে গিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত লোক এখানে কোথা থেকে এল? যে নির্জন নিস্তব্ধ গলি আমরা পিছু ফেলে আসলাম, সেখানে তো কাবুর ছায়া পর্যন্ত খুঁজে পাইনি! ভৌতিক কাণ্ড নাকি? সকলের মুখেই কৌতূহলের ছাপ বর্তমান। নানা জাতির লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। এতগুলি লোক, কিন্তু কাবুর মুখে একটি কথা নেই। ছুঁচ পড়লে পর্যন্ত তার শব্দ শোনা যায়।

ঘণ্টাখানেক পর একটি বৃদ্ধ মোটা চীনা আমাদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেল। তার মাথার একটি চুলও কাঁচা ছিল না। তার সামনের ওপরের দুটি দাঁত সোনা নিয়ে বাঁধানো, আর বাঁ হাতের উল্কিতে একটি ভোজালির ছবি। সে আমাদের ইশারা করে অনেকগুলি ঘর পার করে সেই খাটের ঘরে নিয়ে গেল। বাড়িটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো—চারিদিকে গোলকবাঁধা।

হ্যাঁ, খাট বটে! অমন খাট আমি জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। খাট আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঠিক ওইরকম আশ্চর্য চীনা-খাট সেই প্রথম এবং শেষ দেখলাম। তার অপূর্ব ভাস্কর্য, অপূর্ব কারুকার্য! একপাশে ভগবান বুদ্ধের ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্ত মূর্তি। আয়তনে খাটটি বিশেষ বড়ো নয়। দুটি মানুষ বেশ আরামে শুতে পারে। আবার আশ্চর্য, সেই খাট বাড়িয়ে দশজনের জায়গা করা যায়! দেখে চমকে গেলাম। সকলের সঙ্গে দরকষাকষি হতে লাগল। ওই সামান্য একটা কাঠের খাটের প্রতি সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়েছিল। কেনবার জন্যে সকলের কী সে ব্যাকুলতা! দাম হুহু করে বাড়তে লাগল। শেষে সতীশের ভাগ্যেই ওই খাটটি জুটল—পনেরোশো টাকায়।

সেই খাট নিয়ে বাড়ি ফিরতে সতীশের প্রায় দশটা বাজল। যে দেখল, সেই বলল—চমৎকার!

সেখানে থেকে খাওয়া-দাওয়া করে আমি বাড়ি গেলাম। সতীশ বলল, আবার এসো, নেমন্তন্ন রইল।

—তথাস্তু। বলে চলে এলাম।

আমি যাবার আগেই পরের দিন সকালে সতীশ এসে হাজির। উসকোখুসকো চুল, মুখ শুকনো। চোখ দুটি জবা ফুলের মতো লাল—দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় হয়তো সারারাত্রি ঘুম হয়নি।

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, আরে, ব্যাপার কী?

—বিপদ, বিষম বিপদ! সতীশের গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছিল না।

—কীসের বিপদ?

—সেই খাট!

একটা যে কিছু হবে, তা আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। কেউ কখনো খাল কেটে কুমির নিয়ে আসে? হাজার হোক, ওটা একটা রহস্যজনক খাট।

পূর্বরাত্রের ঘটনা সে সবিস্তারে বর্ণনা করে গেল। সারারাত্রি সে ঘুমোতে পারেনি। ওই খাটের ওপর সে শুয়ে ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে তার মনে হল, কে যেন খাটটা নাড়াচ্ছে! উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেখল, না খাট ঠিকই আছে। আবার শুয়ে পড়ল—আর খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল। কীসের একটা ভীষণ শব্দে সারা ঘরখানা যেন গমগম করছে! দেওয়ালের সঙ্গে যেন খাটখানার ভীষণ ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

ধড়মড় করে উঠে ও আলো জ্বালল। না, সব কিছু নিঃশব্দ নিথর—কোথাও এতটুকু শব্দ নাই। সে আবার শুয়ে পড়ল। এবার আর সে আলো নেবাল না। ভোররাত্রে কার দুর্বোধ্য আর্তকণ্ঠের বিলাপধ্বনিতে তার চেতনা ফিরে এল। কে যেন খাটের পাশে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে মরছিল।

আমি বললাম, বলেছিলাম তো তোমায় প্রথমেই, ও খাট কিনে কাজ নেই। যেমন তোমার রোখ। এইবার বোঝো।

সতীশ বলল, দেখো খগেন, তোমায় হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না। ওই হতভাগ্য খাটখানার ওপর এমন মায়া লেগে গেছে যে কী বলব! আমি ওকে ছাড়তে পারব না কোনোমতেই।

—তবে মরো ওই নিয়ে!

—আমি তোমার সাহায্য চাই।

—আমার সাহায্য!

—হ্যাঁ, আজ তুমি আমাদের ওখানে রাতে খাওয়া-দাওয়া করবে। সারারাত না ঘুমিয়ে ওই খাট পাহারা দেব। দেখি, ওর গলদ কোথায়!

—আর আমার আপিস?

—পাগল, কাল যে রবিবার!

অগত্যা বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। সতীশ আমার অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে ছিল। সে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্!

—তারপর। আর কোনো গন্ডগোল হয়নি তো?

—না, দিনের বেলা গন্ডগোল হবার তো কোনো কারণ নেই!

সতীশের মা বললেন, দেখো দেখি বাবা খগেন, এত বলছি—যা, বিক্রি করে দে, তা আমার কথা যদি ও শুনেচে!

সতীশ বলল, বলছ কী মা, ভয় পেয়ে পনেরোশো টাকার খাটটা বিক্রি করব?

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রি জাগবার সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে খাটের ঘরে গিয়ে বসলাম। আমার হাতে দীনেন রায়ের ডিটেকটিভ উপন্যাস, আর সতীশের হাতে হেলথ অ্যান্ড হাইজিন।

রাত্রি ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। ঠিক হল, আগে সতীশ ঘুমুবে আর আমি জাগব। তারপর সতীশ জাগবে, আর আমি ঘুমুব।

বইখানা খুলে আমি বসে রইলাম। পড়তে পারলাম না একটি অক্ষরও, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম; চারদিকে কান খাড়া করে বসে রইলাম ভয়ে ভয়ে। এতটুকু শব্দে থেকে থেকে চমকে উঠছিলাম। ওই বুঝি অপদেবতা আমার গলাটি দিলে টিপে!

কাদের বাড়িতে ঘড়িতে সুর করে দুটো বেজে গেল। হঠাৎ মনে হল, কে যেন বাইরের বারান্দায় চলে বেড়াচ্ছে! তার পদশব্দ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার সারা শরীর ডোল দিয়ে উঠল, লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

হঠাৎ সশব্দে খোলা জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে বোধ হল, আমি যেন শূন্যে উঠে গেছি, আমার জ্ঞান যেন লোপ পেয়ে গেছে। আমি মৃত না জীবিত, তাও ঘোর সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠল। আমি সভয়ে ডেকে উঠলাম, সতীশ! সতীশ!

সতীশ ধড়মড় করে উঠে বসল, ব্যাপার কী খগেন? ব্যাপার কী?

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। সতীশ আমার দু-কাঁধে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে ডাকল, খগেন! খগেন!

আমি আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললাম, ওঃ! যা ভয় পেয়েছিলাম!

—তা তো বুঝতেই পারছি। যাক আর তোমায় জাগতে হবে না। তুমি ঘুমোও, আমি জেগে বসে আছি।

—না, আমারও ঘুমিয়ে কাজ নেই। আর তা ছাড়া ঘুমও আমার হবে না আদৌ।

—ভীতু কোথাকার!

তারপর ভীতু আমি ও সতীশ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে রইলাম। আমরা দুজনেই নিঃশব্দে জেগে রইলাম। কেউই একটিও কথা কইলাম না। আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরের টুকরো আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। অসংখ্য তারকা মিটমিট করে জ্বলছিল। বোধ হল, তারা যেন আমাদের বিপদে ফিকফিক হাসছে! আমরা চুপটি করে বসে আছি, এমন সময়ে হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিকের আলো দপ করে নিবে গেল। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, কে?

বোধ হল কে যেন মেন সুইচ্‌ বন্ধ করে দিয়েছে!

হঠাৎ এক উৎকট হাসিতে সারা ঘর ভরে উঠল। অমন হাসি আমি জীবনে কাউকে হাসতে দেখিনি। হাসি যেন আর শেষ হতে চায় না। সে কী বিকট শব্দ! —হা-হা-হা-হি-হি-হি-হো-হো-হো-হে-হে-হে . . .

বোধ হল, কে যেন ঠিক দরজার কাছে হেসে খুন হচ্ছে! আমি শিউরে উঠলাম।

সতীশ চট করে টর্চটা দরজার ওপর ফেলল। তাতে হিতে বিপরীত হল। বোধ হল কে যেন দরজার ঠিক বিপরীত দিকে জানলাটার ধারে বসে আর্তকণ্ঠে বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে মরছে! তার কান্নার কোনো ভাষা খুঁজে পেলাম না। কেবল একটা করুণ সুর সারা ঘরময় ঘুরে ঘুরে মরতে লাগল। তার পর সেই খাটের উপর গিয়ে সেই বিলাপধ্বনি আর নড়ল না। তার কান্নায় যেন খাটটা ভিজে গেল। সেই অবোধ্য ভাষার সকরুণ বিলাপধ্বনি চিত্তে এমন এক অজ্ঞাত বেদনার সঞ্চার করল, যার ফলে আমাদের সমস্ত শক্তি যেন ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে লাগল। মনে হল, কে যেন ক্লোরোফর্‌ম্‌ দিয়ে আমাদের অজ্ঞান করে দিচ্ছে! আমরা যেন ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়ছি!

সতীশের সাহসটা ছিল কিছু বেশি, তাই সে খাটের উপর টর্চ ফেলে গর্জে উঠল, কে, কে ওখানে?

কিছুটা দেখা গেল না, কেউ সাড়া দিল না। সহসা সেই খাটখানা ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিল। মনে হল অগণিত নরকঙ্কাল যেন তার চারিদিকে নৃত্য করচে। তাদের হাড়ের খটখট শব্দে কানের পরদা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হল। আমার বুকের ভেতরটা টনটন করতে লাগল কীসের যেন বেদনায়। বোধ হল, হয়তো বুকখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে!

একটু একটু করে আমার জ্ঞান হারিয়ে গেল।

তারপর কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোধ হল, আমি যেন অনেক দূরে এক চীনাবাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছি। একটি ছোটো ঘরে তখন সেই গভীর রাত্রে টিমটিম করে একটি দীপ জ্বলছিল। ঘরের মেঝের ওপর একটি লোক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েচে।

একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর তার সেই রোগ-পাণ্ডুর মুখখানা দেখে আমার বড়ো দয়া হল। রোগে ভুগে ভুগে বেচারা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। তার পাশে বসেছিল—তার স্ত্রী হবে বলেই বোধ হল—চেহারা কিন্তু তার স্বামীর চারগুণ। একটা মস্ত টুলের ওপর বসে সে ঢুলছিল।

তার পাশেই আমাদের এই খাটটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে এটাকে কে এখানে নিয়ে এল?

হঠাৎ স্ত্রীলোকটি বিকট এক হাঁ করে হাই তুলল, তারপর দুটো সশব্দ তুড়ি দিয়ে একবার ঘরের

চারিদিকে চেয়ে দেখল। দেখলাম—তার স্বামী ইতিমধ্যে উঠে সেই খাটের দিকে এগিয়ে গেছে চুপিচুপি। চকিতে ক্রুদ্ধা বাঘিনির মতো তার স্ত্রী তাকে জোর করে খাট থেকে নামিয়ে বিছানায় ফেলে দিলে। সে ভীষণভাবে গর্জন করতে লাগল, আর তার স্বামী ব্যাকুলভাবে অনুনয় করতে লাগল, ওই খাটের পানে অঙ্গুলি সংকেত করে! বোধ হল, সে চায় খাটে উঠতে; কিন্তু তার স্ত্রী তাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না।

উত্তেজনায় কাশতে কাশতে তার মুখ দিয়ে একঝলক রক্ত বেরিয়ে গেল। আমি শিউরে উঠলাম। তারপর লোকটার মাথাটা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, আর সে উঠল না। তার স্ত্রী তার পাশে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম—ভোরের আলোয় চারদিক ভরে গেছে। দেখলাম—সতীশের মা আমার চোখেমুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন।

তিনি আমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে বললেন, খগেন, বাবা খগেন!

আমি বললাম, আমি কোথায়?

—নীচের ঘরে।

—সতীশ কেথায়?

—সতীশের এখনও জ্ঞান হয়নি।

তারপর শুনলাম—রাত্রি চারটে নাগাদ আমরা নাকি দুজনে সদর দরজায় এসে মাটিতে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ করতে থাকি। সতীশের মা বাইরে এসে এই অবস্থা দেখে চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে দেন। পাকা তিন ঘণ্টা তদারক করার পর আমাদের জ্ঞান হয়। ডাক্তার এসে বলে গেছিল—ভয়ের কোনো কারণ নেই। একটা 'সাড্‌ন্ শক' (sudden shock) আর কি! জ্ঞান হলে একটু ব্রোমাইড দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সতীশের জ্ঞান হতে সেও সেই আমারই মতো অবিকল উদ্ভট স্বরে কথা বলে গেল। আমি বিস্ময়ে সকলের পানে তাকিয়ে রইলাম।

সতীশের মা বললেন, আগে ওই সর্বনেশে খাট বিদায় করো বাবা!

খাট বিক্রির একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। পরের দিন বিকালে অসংখ্য লোকে বাড়ি ছেয়ে গেল। খাটটা বিক্রি হল—শেষ পর্যন্ত দু-হাজার টাকায়। এক ইহুদি সেটা কিনে নিয়ে গেল।

যাক, মাঝ থেকে কিছু লাভ হল। বিক্রি না হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ওটা বিলিয়ে দিতে হত।

এখন মাঝে মাঝে সেই রহস্যজনক খাটের কথা ভাবি। এক-একবার মনে হয় সেটা এখন কার কাছে আছে, খোঁজ করি। সেই অতৃপ্ত আত্মা—যাকে তার দুর্দান্ত স্ত্রী কোনোক্রমেই ব্যাধির ভয়ে খাটের ওপর জীবিত অবস্থায় শুতে দেয়নি; সে কী আজ তৃপ্ত হয়েছে? না, এখনও সে ওই খাটের পিছনে প্রতি রাত্রে ঘুরে ঘুরে মরে—কাউকে ওর ওপর শুতে দেবে না বলে?

ঝড়ের রাতে

যাচ্ছিলাম বই আনতে ভূপেনদের বাড়ি। পড়ি নীচের ক্লাসে, বয়স বারো বছর। বই পড়ার বড্ড ঝোঁক। পাড়াগাঁ জায়গা, বই তেমন মেলে না। আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে—নাম তার ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাড়ি নদীর ওপারে সুখপুকুর ঘাটবাঁওড়—একদিন বললে তার বাড়ি দু-তিনখানা বই আছে। নাম কী? ভেবে বললে, একখানার নাম রাজস্থান। মোটা বই, না সরু? মোটা, খুব মোটা।

আর যাবি কোথায়! রাজস্থান বইয়ের নাম আমার শোনা আছে। বই দিবি তো? হ্যাঁ দেবে, যদি তার বাড়ি আমি যাই।

—কিন্তু তাহলে সেদিন বাড়ি ফিরব কী করে?

—কেন, সেদিন আমাদের বাড়িতে থাকবে।

এই শর্তে রাজি হয়ে বই আনতে যাচ্ছি ভূপেনদের বাড়ি। নদীর ওপারে, আমাদের স্কুল থেকে পাঁচ মাইল পথ। সময়টা বোধ হয় পুজোর পর। দিন ছোটো নদী পার হতে না হতে বেলা গেল। সঙ্গে সঙ্গে নামল বৃষ্টি। মেঘ অনেকক্ষণ থেকে জমে ছিল আকাশে।

দৌড়ে গিয়ে একটা আমগাছের তলায় দাঁড়ালাম। ছাতি আনিনি সঙ্গে। এটা বর্ষাকাল নয়, ওবেলা চমৎকার রোদ ছিল। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি নামবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি। আমতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে বুঝলাম আমগাছের শাখাপত্র বৃষ্টির জল থেকে বাঁচাতে পারবে না। বাড়িঘর আছে কি না দেখবার আগ্রহে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি কিছুদূরে আমবাগানের ফাঁকে একটা পুরোনো কোঠাবাড়ি যেন বৃষ্টির মধ্যে আবছায়া দেখা যাচ্ছে।

এক দৌড় দিলাম বাড়িটা লক্ষ করে এবং সর্বাঙ্গ ভিজে জুবড়ি হয়ে হুড়মুড় করে বারান্দার দোর ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বাড়ি কাদের, কে আছে না আছে সেখানে, এদিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নেই।

কে যেন একজন বারান্দার ও কোণ থেকে রুক্ষস্বরে বলে উঠল, কে হে?

চমকে চেয়ে দেখি একজন বুড়ো মানুষ একটা মাদুরের ওপর ঝুঁকে বসে কী করছিল, মুখ ঈষৎ তুলে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করছে।

অপ্রতিভের সুরে বললাম, আমি একজন স্কুলের ছেলে। সুখপুকুর যাব।

—সুখপুকুরে যাবে তা এখানে কী?

—আজ্ঞে, বিষ্টিটা এল কিনা, ওই আমতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছিলাম।

—কোন আমতলায়?

—ওই রাস্তার ধারের।

—ভালো আম। বড্ড ভালো আম ওর।

একথাটা যেন আমি ছেলেমানুষ হলেও কানে কেমন একটু অসংলগ্ন ঠেকল। তবুও প্রবীণ ব্যক্তির কথার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর জন্যে বললাম, ও।

বৃদ্ধ রাগতভাবে বলে উঠলেন, ও? কী ও? ও মানে কী? ও?

আমি অবাক! চুপ করে রইলাম। অন্যায় কথা বলে ফেলেছি নাকি? 'ও' বলা উচিত হয়নি!

—তোমার নাম কী হে?

—আজ্ঞে দুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—এঃ! দুলাল! আদরের দুলাল! কোন ক্লাসে পড়ো?

—সিক্স ক্লাসে।

—সিক্স ক্লাসে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সিক্স ক্লাসে।

কী আশ্চর্যের কাণ্ড, এই কথার পর বৃদ্ধের রাগী মেজাজ হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। নয়তো আমি সত্যি ভাবছিলাম বৃষ্টি একটুখানি থামলেই এখান থেকে চলে যাব। যা থাকে কপালে। এমন রাগী লোকের ঘরে থাকবার কোনো দরকারই নেই। বুড়ো শান্ত হয়ে বললে, সিক্স ক্লাসে পড়ো? আচ্ছা এসে বোসো এখানে।

সিক্স ক্লাসে অধ্যয়নের অধিকারবর্গে আমি গিয়ে মাদুরটার এক পাশে বসলাম।

—নাম কী?

আবার বিনীতভাবে নামটি বলি।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। বাইরে বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধ বললেন, খাবে কিছু?

—আজ্ঞে—না।

—না কেন? খাও না! ওই কোণে উঠে গিয়ে দেখো শুকনো নারকোল আছে। নিয়ে এসো, দা দিচ্ছি কেটে খাও।

—আমি ঝুনো নারকোল কাটতে জানিনে।

—জানো না? গেরস্ত ঘরের ছেলের সব জানা দরকার। তবে খাবে কী? আর তো কিছু নেই।

—থাক গে। খাব না কিছু।

—না না, তা কী হয়। ছেলেমানুষ, খিদে পেয়েচে বই কী। ওবেলা তো কখন খেয়ে বেরিয়েচ। সুখপুকুর যাচ্ছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন?

—একখানা বই আনতে।

—কী বই?

—রাজস্থান বলে একটা বই।

বৃদ্ধ রাগের সুরে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজস্থান জানি। অমন করে বলে নাকি? একটা বই। ও কীরকম কথা? রাজস্থানের নাম কে না জানে। তুমিই বুঝি সিক্স ক্লাসে পড়ো, আর কেউ কিছু জানে না?

আমার এবার রাগ হল, ভয়ও হল। নাঃ, এখানে আর থাকা নয়। এরকম বদমেজাজি বুড়োর কাছে কেউ থাকে?

বুড়ো আবার তখুনি সুর নরম করে বললে, যাকগে। ছেলেমানুষের সঙ্গে আর কী হবে বকে। এখন খাবে কী তাই বলো।

—আপনি যা বলেন।

—তাই তো, কিছুই ঘরে নেই।

—আপনি কী খাবেন?

—আমি? ওবেলার পান্তা ভাত আছে, নেবু দিয়ে তাই খাব। এসো ভাগ করে দুজনে খাই।

সত্যিই আমার বড়ো খিদে পেয়েছিল। কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছিলুম বাড়ি থেকে। পান্তা ভাত, পান্তা ভাতই সই। বুড়ো আমাকে বড়ো খাটালে। হাঁড়ি পেড়ে আনলাম ওর কথায়, কলার পাতা কেটে আনালে, ভাত বাড়িয়ে নিলে। কিছু তরকারি নেই, শুধু নুন আর ভাত। গপগপ করে বুড়ো গিলতে লাগল সেই ভাত। নেবু দিয়ে খাবে বলেছিল, তাই বা কই? তা হলেও তো হত। কোনোরকমে খাওয়া শেষ হল।

আমার তখন ভয় হয়েছে বৃদ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় আমার গলা টিপে না মারে। সুতরাং যখন বুড়ো বললে ঘুমুতে, তখন আমার মনে ভয় ও অস্বস্তি দুই-ই এসে জুটল।

বললাম, শোব কোন ঘরে?

—ঘর? ঘর তো মোটে এই একটা।

—এটা তো দালান।

—দালানও যা, ঘরও তাই। এখানে মাদুর পেতে নাও। ওই দেওয়ালের কোণে মাদুর আছে।

—আপনি শোবে. না?

—না। আমি কাজ করছি, দেখচ না?

এতক্ষণ কিছুই দেখিনি লক্ষ করে। এইবার একটু কৌতূহলের সঙ্গে চাইতেই তিনি বললেন, যাও, শুয়ে পড়ো। এদিকে তাকাতে হবে না।

আমি ভয়ে ভয়ে শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু আমার চোখ-কান রইল বুড়োর দিকে। আমি ঘুমুলাম না, ঘুম আমার হলও না—শুয়ে আড়চোখে বুড়োর দিকে চেয়ে রইলাম।

বুড়ো কী যে করছে, অনেকক্ষণ অবধি আমি ঠাওর করতেই পারলাম না।

অবশেষে মনে হল, বুড়ো ছবি আঁকছে!

খুব মন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ছবি আঁকছে।

ভালো করে দেখবার সাহস আমার হয়নি। ছবি আঁকছে নিশ্চয়ই। সেটা বুঝতে পারলাম। আমারও ঘুম হল না। বুড়ো প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত ছবি আঁকল, ভোরের কিছু আগে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম।

জেগে উঠে দেখি রোদ উঠেচে। বুড়ো তখনও ওঠেনি। আস্তে আস্তে উঠে বুড়োর মাদুরের কাছে এসে দেখি মাদুরের ওপর মাটির খুরি অনেকগুলো সারি সারি সাজানো, তাতে নানা রং। সরু মোটা কতকগুলো তুলি একটা পিঁড়িতে কাতভাবে সাজানো, কতকগুলো তুলি মাদুরের ওপর ছড়িয়ে পড়ে

আছে—আর সামনে একখানা তক্তার ওপর পেরেক দিয়ে আঁটা কাগজ কিংবা চটের ওপর একখানা যা ছবি।

ছবিখানা কোনো একটি মেয়ের

কার এমন সুন্দর মুখ, এমন বড়ো বড়ো টানা চোখ—কী জানি?

আধখানা মাত্র আঁকা হয়েছে—তাও সব যেন হয়নি, কিছু কিছু বাকি আছে। কিন্তু এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারে এ বুড়ো? এমন ছবি যে মানুষ আঁকতে পারে সে বিশ্বাস আমার ছিল না। ক্লাসে ইন্দু মাস্টারের দেওয়া আতা, পাখি, চেয়ারের ড্রইং আঁকি, তাও মনের মতো হয় না আমার নিজেরই। ভাবি আতা আঁকব, হয়ে যায় যে জিনিস, তাকে বেলও বলা চলে, আমও বলা চলে, হয়তো কুমড়ো বলাও যেতে পারে। সুতরাং তলায় 'আতা' বলে লিখে দিতে হয়।

কিন্তু এই খিটখিটে মেজাজের বুড়ো, এ এমন ছবি আঁকতে পারে!

অবাক হয়ে গেলাম। বুড়োকে ডেকে বলব সেকথা? দরকার নেই, ঘুমুচ্চে ঘুমুক। আমার বিদায় নেবার সময় হয়েচে। কিন্তু ঘুমন্ত বুড়োকে জাগাতেও সাহস হল না। না জানিয়েই বা যাই কী করে? আবার ভয় হল, বুড়োর ছবি দেখে ফেলেছি, একথা ও না জানে। যে বদরাগী আর খিটখিটে, কী জানি হয়তো মেরেই বসবে।

বাইরে আম গাছটার তলায় গিয়ে বসলুম। আধ ঘণ্টা পরে ঘরের মধ্যে শব্দ পেয়ে বুঝলাম বুড়ো উঠেছে। তখনই আমি আস্তে আস্তে পা টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

বুড়ো মাদুরের ওপর বসে ছবিখানা দেখছিল, চমকে উঠে পেছনে চেয়ে বললে, কে?

—আজ্ঞে আমি।

—ও, তুমি এখনও যাওনি?

—আপনি ঘুমুচ্ছিলেন, না দেখা করে—

—ঠিক ঠিক। তুমি বেশ ভালো ছেলে। ভালো ছেলে।

—তাহলে আমি যাই এখন?

—আমার ছবি দেখেছ?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—আচ্ছা এসো, দেখবে।

আমি দেখলুম অনেকক্ষণ ধরে।

বুড়ো বললে, কীরকম হয়েছে?

—খুব ভালো।

—ভালো লেগেচে?

—আজ্ঞে, তা আর বলতে! কখনো এমন দেখিনি।

—আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার। দাঁড়াও, কী খাবে সকালবেলা?

—আজ্ঞে কিছু না। আমি যাদের বাড়ি যাচ্ছি, সেখানে খাব।

—না না, তা হয় না। পান্তা ভাত হাঁড়িতে ছিল?

—আজ্ঞে না। সব খেয়েছি কাল দুজনে।

—নারকোল একটা নিয়ে এসো, কেটে দিই।

—আজ্ঞে আপনাকে কষ্ট দেব না। আমি খাব না কিছু।

বলেই হনহন করে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ি থেকে।

বুড়ো দেখি পেছনে ডাকছে, ও খোকা, শোনো! ও খোকা, যেয়ো না—

আমি পিছন ফিরে চেঁচিয়ে বলি, আজ্ঞে, আমি নারকোল খাব না।

সেইদিনই বিকালে বই নিয়ে আসবার পথে বুড়োর ওখানে যেতে বড়ো ইচ্ছে হল। বুড়োকে দেখবার জন্যই ঘরের জানালায় উঁকিঝুঁকি মারি।

বুড়োকে কিন্তু দেখতে পেলাম না। ঘুমুচ্চে নাকি?

ফিরে আসচি এমন সময় কে ডাকল, কে?

বললাম, আমি।

—শোনো খোকা, শোনো।

গেলাম। বুড়ো বালিশ ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে ছিল। আমায় বললে, আজ রাত্রে এখানে থাকো।

—থাকব না।

—কেন? থাকো। আজ তোমাকে নারকোল খাওয়াব, চিঁড়ে খাওয়াব।

কী স্নেহের সুর ওর কথার মধ্যে। সে রাতেও আমার থাকার ইচ্ছে ছিল সেখানে, কিন্তু আমার বাড়ির লোকের ভয় ছিল, না বলে এসেচি। আমি বললাম, মা বকবে।

বুড়ো আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, ঠিক ঠিক। মা রয়েচেন? তাহলে যাও। নারকোল খেয়ে যাবে না?

—আমি নারকোল কাটতে জানিনে।

—আমার হাতে ব্যথা, নইলে আমি তোমাকে নিজেই নারকোল কেটে দিতাম।

আমি চলে এলাম বটে কিন্তু বুড়োর কথা ভুলতে পারলাম না কতদিন। অনেক দিন কেটে গেল। বালক থেকে আমি হয়ে উঠেচি যুবক।

পাথুরেঘাটার এক বড়োলোকের বাড়ি যাতায়াত করি। সেখানে মস্ত বড়ো একখানা অয়েল পেন্টিং দেখে হঠাৎ চমকে উঠলাম। এই ছবি যার, তাকে আমি কোথায় দেখেচি? বাড়ির লোককে বললাম, ইনি কে?

তারা বললে, এঁকে চেনেন নাকি? ইনি বিখ্যাত চিত্রকর দুর্গাচরণ সান্যাল। এঁকে নিয়ে খবরের কাগজে হইচই হয় খুব।

—দুর্গাচরণ সান্যাল?

—নামকরা লোক। বড়ো বৈঠকখানায় যত অয়েল পেন্টিং দেখবেন সব ওঁর করা। দেড়-দু-হাজার টাকা নিতেন ছবি পিছু। সব বড়োলোক খদ্দের ছিল। এ ছবি তাঁর নিজের, নিজেই এঁকেছিলেন। মেজোবাবু বেঁচে থাকতে শিল্পীর নিজের ছবি অনেক টাকা খরচ করে আঁকিয়ে নেন। আপনি এঁকে চিনতেন?

—আমি কোথায় এঁকে দেখেচি ঠিক মনে করতে পারচিনে। ইনি থাকতেন কোথায়?

—থাকতেন কলকাতাতে। বরানগরে। শেস বয়সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এত টাকা রোজগার ফেলে বড়ো বড়ো মক্কেল ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন তার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। সে আজ বিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা। কেউ খুঁজে পায়নি। খবরের কাগজে হইচই হয় তাঁর অন্তর্ধান নিয়ে। অত নামকরা আর্টিস্ট! সে এক রহস্য সেকালকার।

আমার হঠাৎ মনে পড়ল। চিত্রশিল্পী দুর্গাচরণ সান্যালের রহস্য আমি জানি। সুখপুকুর ঘাটবাঁওড়ের সেই বুড়ো। সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রি, সেই অপূর্ব ছবি, আধ-আঁকা সেই ছবিখানা।

বামা

আমার যখন বাইশ-চব্বিশ বছর বয়েস তখন নানা দেশ বেড়ানোর একটা কাজ জুটে গেল আমার অদৃষ্টে। তখন আমি দৈব ঔষধের মাদুলি বিক্রি করে বেড়াতুম। চুঁচড়োর শচীশ কবিরাজের তরফ থেকে মাইনে ও রাহাখরচ পেতুম। অল্পবয়সে প্রথম চাকরি, খুব উৎসাহের সঙ্গেই করতুম।

আমাকে কাপড়চোপড় পরতে হত সাধু ও সাত্ত্বিক বামুনের মতো; ওটা ছিল ব্যাবসায়ের অঙ্গ। গিরিমাটির রঙে ছোপানো কাপড় পরনে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় মালা, হাতে থাকত একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তারই মধ্যে ও মাদুলি ও অন্যান্য ওষুধ থাকত।

বছর তিনেক সেই চাকরি করি, তারপর শরীরে সইল না বলে ছেড়ে দিলুম।

একবার যাচ্ছি বর্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর বলে একটা গ্রামে। এটা মাদুলি বিক্রির জন্যে নয়; মাখমপুরে শচীশ কবিরাজের শ্বশুরের বাড়ি। সেখানকার জমিজমার ওয়ারিশান দাঁড়িয়েছিলেন শচীশবাবু—শ্বশুরের ছেলেপুলে না থাকায়। আমাকে পাঠিয়েছিলেন পৌষ-কিস্তির সময় জমিজমার খাজনা যতটা পারি আদায় করে আনতে।

কিন্তু তাহলেও পরনে আমার গেরুয়া কাপড়, হাতে মাদুলি ও ওষুধ-ভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি সবই ছিল, যদি পথেঘাটে কিছু বিক্রি হয়ে যায়, কমিশনটা তো আমি পাব!

কখনো ও অঞ্চলে যাইনি। মেমারি স্টেশনে নেমে বেলা দুটোর সময়ে হাঁটচি তো হেঁটেই চলেচি, পথ আর ফুরোয় না। একজায়গায় একটা ছোটো বাজার পড়ল, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পথ হাঁটি।

গ্রামে গ্রামে ওষুধ বিক্রি করে বেশ কিছু রোজগারও করা গেল, দেরিও হল বিশেষ করে সেইজন্যে। আর একটা বাজার পড়ল। সেখানে দোকানদারদের কাছে শুনলুম, আমার গন্তব্যস্থানে পৌছুতে অন্তত রাত নটা বাজবে। কিন্তু সকলেই বললে, সন্ধের পরে আগে গিয়ে আর পথ হাঁটবেন না, ঠাকুরমশায়। এইসব দেশে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বড়ো ভয়, বিদেশি দেখলে মেরেধরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রায়ই বনের ধারে বড়ো বড়ো মাঠের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সাবধান, একটা দিঘি পড়বে মাঠের মধ্যে ক্রোশ তিনেক দূরে, জায়গাটা ভালো নয়...

বড়ো বড়ো মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, এমন সময় দূরে একটা তালগাছ-ঘেরা দিঘি দেখা গেল বটে। আমার বুক টিপটিপ করে উঠল। দিঘির ওপাশে সঞ্জয়পুর বলে একটা গ্রাম, সেখানেই রাত্রের জন্যে আশ্রয় নেওয়ার কথা বাজারে বলে দিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা তো হয়ে গেল তালদিঘির এদিকেই—অন্ধকার হবার দেরি নাই, কোথায় বা সঞ্জয়পুর, কোথায় বা কী?

মনে ভারী ভয় হল। কী করি এখন? সঙ্গে মাদুলি ও ওষুধ বিক্রির দরুন অনেক টাকা। পরক্ষণেই ভাবলাম, কিছু না পারি, দৌড়োতে তো পারব? না-হয় ব্যাগটাই যাবে—প্রাণ তো বাঁচবে।

ভয়ে ভয়ে দিঘির কাছাকাছি তো এলুম। বড়ো সেকেলে দিঘি, খুব উঁচু পাড়, পাড়ের দু-ধারে বড়ো বড়ো তালগাছের সারি। তার ধার দিয়েই রাস্তা। দিঘির পাড়ে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই। যে ভয় করেছিলুম দেখলুম সবই ভুয়ো। মানুষ মিথ্যে যে কেন এরকম ভয় দেখায়।

প্রকাণ্ড দিঘিটার পাড় ঘুরে যেমন তালবনের সারি ও দিঘির উঁচু পাড়কে পেছনে ফেলেচি, সামনেই দেখি ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরে একটা গ্রাম লি-লি করছে—নিশ্চয় ওটা সেই সঞ্জয়পুর।... বাঁচা গেল বাবা! কী ভয়টাই দেখিয়েছিল লোকে! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাছেই লোকের বসতি, গাঁয়ের গোরু বাছুর চরছে মাঠে—কেন এসব জায়গায় বিপদ থাকবে?

আমি এইরকম ভাবচি, এমন সময় তালপুকুরের ওদিকের পাড়ের আড়ালে যে পথটা, সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। বৃদ্ধ বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এই বয়সেও মাংসপেশি বেশ সবল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোটো একটি লাঠি।

বৃদ্ধ আমায় বললে, ঠাকুরমশায় কোথায় যাবেন?

—যাব মাখমপুর...

—মাখমপুর! সে যে এখনও তিন ক্রোশ পথ...কাদের বাড়ি যাবেন?

—শচীশ কবিরাজের বাড়ি।

—ঠাকুরমশায় কি কবিরাজমশায়ের গোমস্তা?

—গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে।

—এ অঞ্চলে আর কাউকে চেনেন?...মশাইয়ের নিজের বাড়ি কোথায়?

—আমি এদিকে কখনো আসিনি, কাউকে চিনিওনে। মাখমপুরেও নতুন যাচ্ছি...

—সেখানেও কেউ তাহলে আপনাকে চেনে না?

—নাঃ, কে চিনবে?

আমার এই কথায়, আমার যেন মনে হল বুড়ো একটু কী ভাবলে, তারপর আমায় বললে, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি...রাত্রে আজ দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন। আমরা জাতে বারুই, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবাড়া করে খাবেন...আসুন দয়া করে...

আমি বৃদ্ধের কথায় ভারী সন্তুষ্ট হলুম। সত্যিই তো সেকালের লোকেরা অন্যধরনের শিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করেই এদের তৃপ্তি। বৃদ্ধ এই প্রস্তাব না করলে রাঢ়-অঞ্চলের অজানা মেঠো পথ বেয়ে এই সুমুখ আঁধার রাতে আমার যেতেই তো হত মাখমপুরে, তিন ক্রোশ হেঁটে।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড়ো মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ি। বৃদ্ধের নাম নফরচন্দ্র দাস। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উঠতেই একটা কুকুর ঘেউঘেউ করে উঠল।

কুকুরের এই ডাকটা আমার ভালো লাগল না; এর আমি কোনো কারণ দিতে পারব না—কিন্তু এই কুকুরের চিৎকারে যেন একটা ছন্নছাড়া অমঙ্গলজনক অর্থ আছে—মঙ্গলসন্ধ্যায় কোনো গৃহস্থবাড়িতে আসিনি, যেন শ্মশানভূমিতে এসেচি...

বৃদ্ধের বাড়ি দেখে মনে হল বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ির উঠোনে সারি সারি তিনটে বড়ো বড়ো

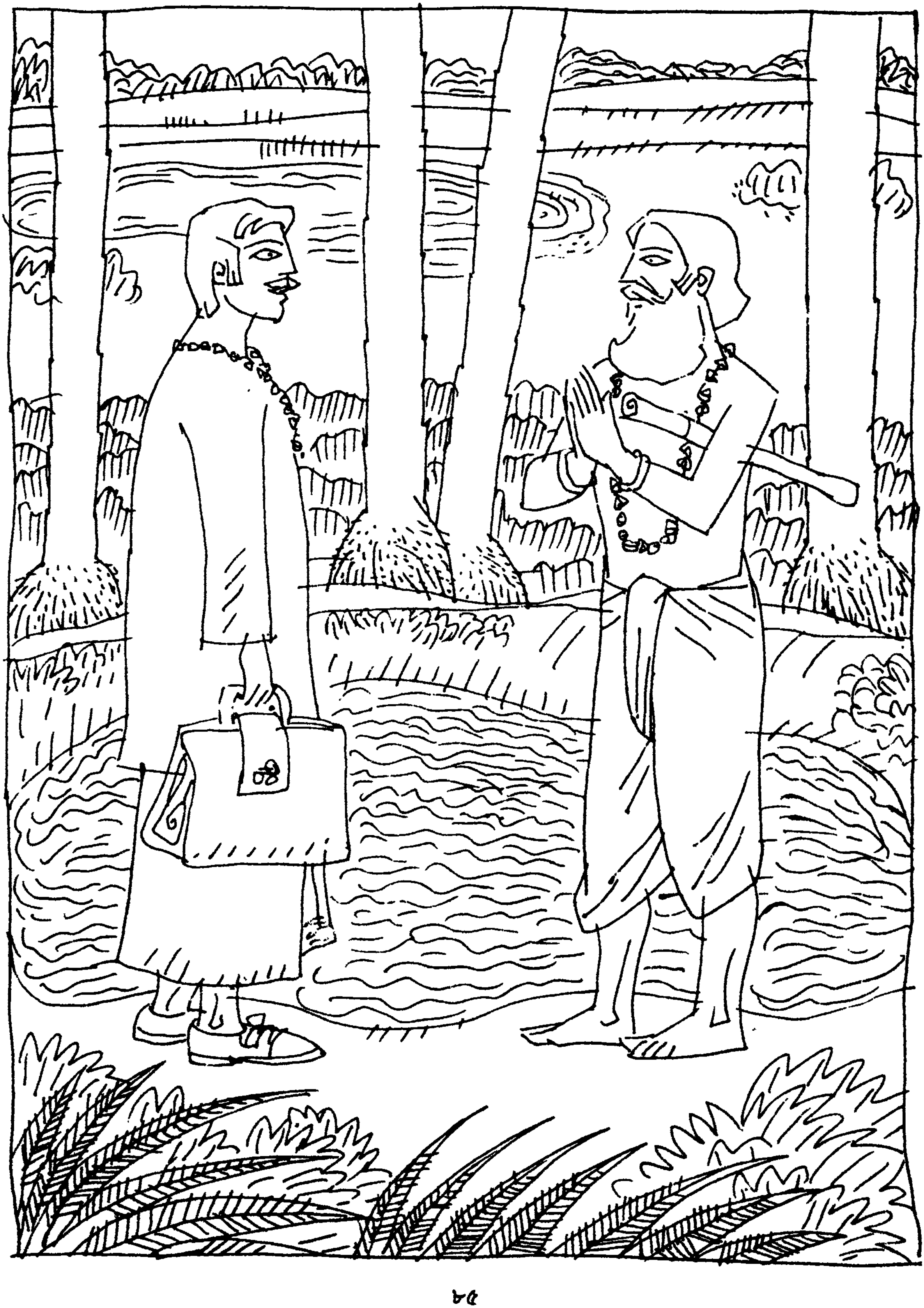

ধানের গোলা—গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে প্রায় কুড়ি-বাইশটা। অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড়ো বড়ো আটচালার ঘর। বাইরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে আর একখানা কুঠরি।

আমার কথাটা ভালো করে বুঝতে গেলে এই কুঠরিটার কথা আর একটু ভালো করে শুনতে হবে। কুঠরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটা কামরাও বলা যায় কারণ একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছনদিকের সঙ্গে সংলগ্ন; অথচ দোর বন্ধ করে দিলে বাইরের বাড়ির সঙ্গে এর সম্পর্ক চলে গিয়ে এটা ভেতরবাড়ির একখানা ঘরের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমায় বাসা দেওয়া হল এই কুঠরিতে। কুঠরির একপাশে ছোটো একটা চালা। সেখানে আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়েচে। হাত-মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে আমি বিশ্রাম করচি।

গৃহস্বামী এসে বললে, ঠাকুরমশায় রান্না চাপান, আর রাত করেন কেন?

আমি রান্নাচালায় বসে রান্না চড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি একটি বাড়ির বউ ভেতর থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে এসে আমার রান্নাচালার সামনে দিয়ে ঢুকল ও ঝাঁট দিতে লাগল।

কুঠরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে সেখান থেকে কুঠরিটার ভেতর দেখা যায়। আমি দু-একবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম বউটি ঝাঁট দিতে দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। দু-তিনবার বেশ ভালো করে লক্ষ করে মনে হল বউটি ইচ্ছে করেই আমার দিকে অমন করে চাইচে।

আমি দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলুম। ব্যাপার কী? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লির গৃহস্থবধূ—এমন ব্যবহার তো ভালো নয়? কী হাঙ্গামায় আবার পড়ে যাব রে বাবা। কর্তাকে কাছে বসিয়ে রাঁধতে রাঁধতে গল্প করব নাকি?

এমন সময় বউটি ঝাঁট শেষ করে চলে গেল। কিন্তু বোধ হয় পাঁচ মিনিট পরেই আবার এল। দেখে মনে হল সে যেন খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এবারও কুঠরির মধ্যে ঢুকে এটা ওটা সরাতে লাগল এবং আমার দিকে চাইতে লাগল, তারপর হঠাৎ রান্নাচালার দরজায় এসে চকিতদৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে আরও সরে এল এবং নিচুস্বরে বললে, ঠাকুরমশায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে—বলেই চট করে বাড়ির মধ্যে চলে গেল!

শুনে তো আর আমি নেই! হাতের খুন্তি হাতেই রইল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—আর সারা হাত-পা অবশ ও ঝিমঝিম করতে লাগল। বলে কী! দিব্যি গেরস্তবাড়ি, গোলাপালা, ঘরদোর—ডাকাত কীরকম?

কিন্তু পালাবই বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েচে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ বসে লোকজনের সঙ্গে কথা কইচে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো সন্দেহ করবে।

কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচি একেবারে—হাতে-পায়ে জোর নেই, কিছু ভাববারও শক্তি লোপ পেয়েচে। মিনিট পাঁচেক এমনিভাবে কাটল—এমন সময়ে দেখি সেই বউটি আবার কী একটা কাজে কুঠরির মধ্যে ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি কথা বলবার পূর্বেই আমি বললুম, তুমি যে হও, তুমি পরম দয়াময়ী—বলে দাও কোন পথে কীভাবে পালাব...

বউটি চাপা গলায় বললে, সেইজন্যেই এলুম। সব দেখে এলুম।

আমি বললুম, তবে উপায়!

মেয়েটি বললে, একটামাত্র উপায় আছে। তাও আমি ভেবে এসেচি। আমি এবাড়িতে আর ব্রহ্মহত্যা হতে দেব না—অনেক সহ্য করেচি, আর কত করব, না...দাঁড়ান ঠাকুরমশায়, আরেকবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।

মিনিট পাঁচেক পরে বউটি আবার এল, চকিতদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে বললে, শুনুন আমার উপায়—এই কথা কটা মনে রাখুন। মনে যদি রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারব।...আমার নাম বামা, আমি এবাড়ির মেজোবউ, আমার বাপের বাড়ির গ্রামের নাম কুসুমপুর, জেলা বর্ধমান, থানা রায়না—আমার বাপের নাম হরিদাস মজুমদার, জ্যাঠামশায়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার, আমরা দুই বোন, আমার দিদির নাম ক্ষান্তমণি, বিয়ে হয়েচে সামন্তপুর তেওটা, বর্ধমান জেলা। শ্বশুরের নাম দুর্লভ দাস—সবাই জাতে বারুই। আমার বাবা, জ্যাঠামশায় সব বেঁচে আছেন, কিন্তু মা নেই...

আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেতে বসেচে—যা বলে মেয়েটি তাই করে যাই। এতে কী হবে? বউটি কিন্তু এক-একবার বাড়ির মধ্যে যায়, আবার দু-মিনিটের জন্যে ফিরে এসে আমায় তালিম দিয়ে যায়—মনে আছে তো? জ্যাঠামশায়ের নাম কী?

আমি বললুম, হরিদাস মজুমদার...

—না—না, পাঁচকড়ি মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার...আমার দিদির নাম কী? শ্বশুরবাড়ি কোন গাঁয়?...

ক্ষান্তমণি। শ্বশুরবাড়ি হল—শ্বশুরবাড়ি...

—আপনি সব মাটি করলেন দেখচি! সামন্তপুর-তেওটা, বলুন...

—সামন্তপুর-তেওটা—শ্বশুরের নাম রামযদু দাস—দুর্লভরাম দাস...

অবশেষে মিনিট দশ-বারোর মধ্যে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এসেচে।

বউটি বললে, রান্না-খাওয়া করে নিন ঠাকুরমশায়, কোনো ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ির নামধাম যখন জানা হয়ে গেছে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেচি। এখন শুনুন, খাওয়াদাওয়ার পরেই শ্বশুরমশায়ের কাছে আমার বাপের বাড়ির পরিচয় দিয়ে বলবেন—আপনি তাদের গুরুবংশ, আমার নাম বলে জিজ্ঞেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েচে কোথায়? জানো নাকি? গলা যেন না কাঁপে, কোনোরকম সন্দেহ যেন না হয়...আমি চললুম, আবার আসব আপনি শ্বশুরকে বলবার পরে; কিন্তু দেরি করবেন না বেশি, বিপদ কখন হয় বলা যায় না।

রান্না-খাওয়া শেষ না করলেও তো সন্দেহ করতে পারে। রান্না-খাওয়া করতেই হল। রাত্রের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে এসেচে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহারাদির পর নিজের কুঠরিতে বসেচি, আর আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ির সবাই যেন খাঁড়ায়, রামদাতে শান দিচ্ছে, আমার গলাটি কাটবার জন্যে।

এই সময় গৃহস্বামী স্বয়ং আমার জন্যে পান নিয়ে এল। বললে, কী ঠাকুরমশায়, আহারদি হল? এখন দিব্যি করে শুয়ে পড়ুন। মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; রাত হয়েচে, আর দেরি করবেন না...

আমি বললুম, হ্যাঁ, একটা কথা বলি...আমাদের এক মন্ত্রশিষ্য, বাড়ি কুসুমপুর, থানা রায়না, নাম

পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম বামা—এদিকেই কোথায় বিয়ে হয়েচে। তারাও জাতে তোমাদের বারুই কিনা—তাই হয়তো চিনলেও চিনতে পার। মেয়েটির জ্যাঠা দুর্লভরাম—ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিল মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি খোঁজ করে একবার সেখানে যেতে, তা যখন এলুমই এ দেশে...

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেল, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, কুসুমপুরের হরিদাস মজুমদার? বামা?...আপনি তাদের চিনলেন কী করে?

বামার কথা স্মরণ করে গলা না কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে বললুম, আমি যে তাদের গুরুবংশ—আমার বাবার ওরা মন্ত্রশিষ্য কিনা।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, বসুন, আমি আসচি...

আমি একটা কুঠরির মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনও কিছু যায়নি। আর এরা যে গুরুদেবকেই রেহাই দেবে তা কে বলেচে?

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এল; পেছনে পেছনে সেই বধূটি, আর একজন ষণ্ডামার্কা গোছের যুবক এবং একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক—সম্ভবত বৃদ্ধের স্ত্রী।

বৃদ্ধ বললে, এই যে বামা, ঠাকুরমশায়। আমারই মেজোছেলের সঙ্গে...এই আমার মেজো ছেলে শম্ভু...গড় করো সব, গড় করো...মেজো বউমা, দেখো তো, চিনতে পার এঁকে?

চমৎকার অভিনেত্রী বটে বামা! অদ্ভুত অভিনয় করে গেল বটে।

ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে গলায় আঁচল দিয়ে। জীবনদাত্রী, দয়াময়ী বামা! আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়ল।

তারপর সে রাত্রি তো কেটে গেল। খাবার জল দেবার ছুতো করে এসে বামা আমায় আশ্বাস দিয়ে গেল। বললে, বিপদ কেটে গিয়েছে; আমার চোখে না পড়লে সর্বনাশ হত, ভিটেতে ব্রহ্মহত্যে হত। অনেক হয়েছে—এই কুঠরিতে—এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোঁতা...

আমার মনের অবস্থা বলবার নয়। বললুম, পুলিশ কি গাঁয়ের লোক কিছু টের পায় না—কিছু বলে না?

কে কী বলবে! এ ফাঁসুড়ে ডাকাতের গাঁ। সবাই এরকম। আগে জানলে কি বাবা এখানে বিয়ে দিতেন? বিয়ের পর সব ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। এখন আমার একটি সন্তান হয়েছে—এ পাপ-ভিটেয় বাস করলে তার অল্যাণ হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কী করবে? মাথার ওপর শ্বশুরমশায় রয়েচেন—পুরোনো ডাকাত, দাদারা রয়েচে...আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আর ভয় নেই...

সকাল হল। বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরু-প্রণামী দিলে। বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম, তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্বাদ করি চরিসুখী হও মা...

বামার মতো বুদ্ধিমতী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়েনি। কতকাল হয়ে গেল, এই বৃদ্ধবয়সেও সেই দয়াময়ী পল্লিবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

রঙ্কিণীদেবীর খড়্গ

জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়াই অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদের সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাহাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না, শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়।

আমার জীবনে একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার যুক্তিযুক্ত কারণ তখন বা আজ কোনোদিনই খুঁজিয়া পাই নাই—পাঠকদের কাছে তাই সেটি বর্ণনা করিয়াই আমি খালাস; তাঁহারা যদি সে রহস্যের কোনো স্বাভাবিক সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন, যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিব।

ঘটনাটা এইবার বলি।

কয়েক বছর আগেকার কথা। মানভূম জেলার চেরো নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে তখন মাস্টারি করি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, চেরো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনতর যে এখানে কিছুদিন বসবাস করিলে বাংলাদেশের একঘেয়ে সমতলভূমির কোনো পল্লি আর চোখে ভালো লাগে না। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালু সানুদেশ জুড়িয়া লম্বালম্বিভাবে সারা গ্রামের বাড়িগুলি অবস্থিত—সর্বশেষ সারির বাড়িগুলির খিড়কি দরজা খুলিলেই দেখা যায় পাহাড়ের উপরকার শাল, মহুয়া, কুরচি, বিল্ববৃক্ষের পাতলা জঙ্গল, একটা সুবৃহৎ বট গাছ ও তাহার তলায় বাঁধানো বেদি, ছোটো-বড়ো শিলাখণ্ড ও ভেলাকাঁটার ঝোপ।

আমি যখন প্রথম ওগ্রামে গেলাম তখন একদিন পাহাড়ের মাথায় বেড়াইতে উঠিয়া একজায়গায় শালবনের মধ্যে একটি পাথরের ভাঙা মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সঙ্গে ছিল আমার দুটি উপরের ক্লাসের ছাত্র—তাহারা মানভূমবাসী বাঙালি। একটা কথা—চেরো গ্রামে বেশিরভাগ অধিবাসী মাদ্রাজি, যদিও তাহারা বেশ বাংলা বলিতে পারে, অনেকে বাংলা আচার-ব্যবহারও অবলম্বন করিয়াছে। কী করিয়া মানভূম জেলার মাঝখানে এতগুলি মাদ্রাজি অধিবাসী আসিয়া বসবাস করিল, তাহার ইতিহাস আমি বলিতে পারি না।

মন্দিরটি কালো পাথরের এবং একটু অদ্ভুত গঠনের। অনেকটা যেন চাঁচড়া রাজবাড়ির দশমহাবিদ্যার মন্দিরের মতো ধরনটা—এঅঞ্চলে এরূপ গঠনের মন্দির আমার চোখে পড়ে নাই—তা ছাড়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও বিগ্রহশূন্য। দক্ষিণের দেওয়ালে পাথরের চাঁই কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, দরজা নাই, শুধু আছে পাথরের চৌকাঠ। মন্দিরের মধ্যে ও চারিপাশে বনতুলসীর ঘন জঙ্গল—সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে সেই পাথরের বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দির আমার মনে কেমন এক অনুভূতির সঞ্চার করিল। আশ্চর্যের বিষয়—অনুভূতিটা ভয়ের। ভাঙা মন্দির দেখিয়া মনে ভয় কেন হইল, একথা তারপর বাড়ি

ফিরিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছি। তবুও অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম ভালো করিয়া দেখিতে, একজন ছাত্র বাধা দিয়া বলিল, যাবনে না স্যার ওদিকে...

কেন?

—জায়গাটা ভালো না। সাপের ভয় আছে সন্ধেবেলা। তা ছাড়া লোকে বলে অনেকরকম ভয়ভীত আছে—মানে অমঙ্গলের ভয়। কেউ ওদিকে যায় না।

—ওটা কী মন্দির?

—ওটা রঙ্কিণী দেবীর মন্দির, স্যার। কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বুড়ো লোকেরাও কোনোদিন ওখানে পুজো হতে দেখেনি—মূর্তিও নেই বহুকাল। ওইরকম জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলেরও আগে থেকে।...চলুন স্যার, নামি।

ছেলে দুটো যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল নামিবার জন্য।

রঙ্কিণী দেবী বা তাহার মন্দির সম্বন্ধে দু-একজন বৃদ্ধ লোককে ইহার পর প্রশ্নও করিয়াছিলাম—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ করিয়াছি, তাহারা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় যেন, আমার মনে হইয়াছে রঙ্কিণী দেবী সংক্রান্ত কথাবার্তা বলিতেও তাহারা ভয় পায়।

আমিও আর সে বিষয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়িয়া দিলাম।

বছরখানেক কাটিয়া গেল।

স্কুলে ছেলে কম, কাজকর্ম খুব হালকা, অবসর সময়ে এগ্রামে ওগ্রামে বেড়াইয়া এঅঞ্চলের প্রাচীন পট, পুঁথি, ঘট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এ বাতিক আমার অনেকদিন হইতেই আছে। নূতন জায়গায় আসিয়া বাতিকটা বাড়িয়া গেল।

চেরো গ্রাম হইতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। এখানে খাড়া উঁচু একটা অদ্ভুত গঠনের পাহাড়ের মাথায় জয়চণ্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে। পৌষ মাস বড়ো মেলা বসে। বি.এন.আর লাইনের একটা ছোটো স্টেশনও আছে এখানে।

এই পাহাড়ের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক ঘর মানভূমপ্রবাসী ওড়িয়া ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাণ্ডা নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হইয়া গেল—তিনি বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক রকমের গল্প করিতেন। পট, পুঁথি, ঘট সংগ্রহের অবকাশে আমি জয়চণ্ডীতলা গ্রামে চন্দ্রমোহন পাণ্ডার নিকট বসিয়া তাঁহার মুখে এদেশের কথা শুনিতাম। চন্দ্র পাণ্ডা আবার স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টারও। এদেশে প্রচলিত কতরকম আজগুবি ধরনের সাপের, ভূতের, ডাকাতের ও বাঘের (বিশেষ করিয়া বাঘের—কারণ বাঘের উপদ্রব এখানে খুব বেশি) গল্প যে বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি এবং এইসব গল্প শুনিবার লোভে কত আষাঢ়ের ঘন বর্ষার দিন বৃদ্ধ পোস্টমাস্টারের বাড়িতে গিয়া যে হানা দিয়াছি, তাহার হিসাব দিতে পারিব না।

মানভূমের এইসব অরণ্য সভ্যজগতের কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত, এখনকার জীবনযাত্রাও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যতই অদ্ভুত ধরনের গল্প হউক, জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছায়ার শালবনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় সেগুলি শুনিবার সময় মনে হইত—এদেশে এরূপ ঘটিবে ইহা আর বিচিত্র কী? কলিকাতা বালিগঞ্জের কথা তো ইহা নয়।

কথায় কথায় চন্দ্র পাণ্ডা একদিন বলিলেন, চেরো পাহাড়ে রঙ্কিণী দেবীর মন্দির দেখেচেন?

আমি একটু আশ্চর্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম।

রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে এপর্যন্ত আমি আর কোনো কথা কাহারও মুখে শুনি নাই। সেইদিন সন্ধ্যায় আমার ছাত্রটির নিকট যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া।

বলিলাম, মন্দির দেখেচি, কিন্তু রঙ্কিণী দেবীর কথা জানবার জন্যে যাকেই জিজ্ঞেস করেচি সে-ই চুপ করে গিয়েচে কিংবা অন্য কথা পেড়েচে—এর কারণ কিছু বলবেন?

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, রঙ্কিণী দেবীর নামে সবাই ভয় খায়।

—কেন বলুন তো?

—মানভূম জেলায় আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করত। তাদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদের ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিণী দেবী হিন্দু দেব-দেবীর মতো নয়, অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর—আগে ওই মন্দিরে নরবলি হত—ষাট বছর আগেও রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরে নরবলি হয়েচে। অনেকে বিশ্বাস করে রঙ্কিণী দেবী অসন্তুষ্ট হলে রক্ষা নেই—অপমৃত্যু আর অমঙ্গল আসবে তাহলে। এরকম অনেকবার হয়েচে নাকি। একটা প্রবাদ আছে এ অঞ্চলে, দেশে মড়ক হবার আগে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়া রক্ত-মাখা দেখা যেত। আমি যখন প্রথমে এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা—তখন প্রাচীন লোকদের মুখে একথা শুনেছিলাম।

—রঙ্কিণী দেবীর বিগ্রহ দেখেছিলেন মন্দিরে?

—না, আমি এসে পর্যন্ত ওই ভাঙা মন্দিরই দেখচি। এখান থেকে কারা বিগ্রহটি নিয়ে যায়, অন্য কোনো দেশে। রঙ্কিণী দেবীর এসব কথা আমি শুনতাম ওই মন্দিরের সেবাইত বংশের এক বৃদ্ধের মুখে। তাঁর বাড়ি ছিল ওই চেরো গ্রামেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসি—তখন তাঁর বাড়ি অনেকবার গিয়েচি। দেবীর খাঁড়া রক্ত-মাখা হওয়ার কথাও তাঁর মুখে শুনি। এখন তঁদের বংশে আর কেউ নেই। তারপর চেরো গ্রামেও আর বহুদিন যাইনি—বয়েস হয়েচে, বড়ো বেশি কোথাও বেরুইনি।

—বিগ্রহ মূর্তি কী?

—শুনেছিলাম কালীমূর্তি। আগে নাকি হাতে সত্যিকার নরমুণ্ড থাকত অসভ্যদের আমলে। কত নরবলি হয়েচে তার লেখাজোখা নেই—এখনও মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঢিপি আছে—খুঁড়লে নরমুণ্ড পাওয়া যায়।

সাধে এদেশের লোক ভয় খায়! শুনিয়া সন্ধ্যার পরে জয়চণ্ডীতলা হইতে ফিরিবার পথে আমারই গা ছমছম করিতে লাগিল।

আরও বছর দুই সুখে-দুঃখে কাটিল। জায়গাটা আমার এত ভালো লাগিয়াছিল যে হয়তো সেখানে আরও অনেকদিন থাকিয়া যাইতাম—কিন্তু স্কুল লইয়াই বাঙালিদের সঙ্গে মাদ্রাজিদের বিবাদ বাধিল। মাদ্রাজিরা স্কুলের জন্য বেশি টাকাকড়ি দিত, তাহারা দাবি করিতে লাগিল কমিটিতে তাহাদের লোক বেশি থাকিবে—ইংরাজির মাস্টার একজন মাদ্রাজি রাখিতেই হইবে, ইত্যাদি। আমি ইংরাজি পড়াইতাম—মাঝে হইতে আমার চাকরি রাখা দায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের দেশে একটি হাই স্কুল হইয়াছিল, পূর্বে

একবার তাহারা আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ম্যালেরিয়ার ভয়ে যাইতে চাহি নাই—এখন বেগতিক বুঝিয়া দেশে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কারণে চেরো গ্রামের মাস্টারি আমায় ছাড়িতে হয় নাই। কীসের জন্য ছাড়িয়া দিলাম পরে সেকথা বলিব।

এই সময় একদিন চন্দ্র পাণ্ডা চেরো গ্রামে কী কার্য উপলক্ষে আসিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম আমার বাসায় একটু চা খাইতে হইবে। তাঁহার গোরুর গাড়ি সমেত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসাবাড়িতে আনিলাম।

বৃদ্ধ ইতিপূর্বে কখনো আমার বাসায় আসেন নাই; বাড়িতে ঢুকিয়াই চারিদিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, এই বাড়িতে থাকেন আপনি?

বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট্ট গাঁ, বাড়ি তো পাওয়া যায় না—আগে স্কুলের একটা ঘরে থাকতাম। বছরখানেক হল স্কুলের সেক্রেটারি রঘুনাথন এটা ঠিক করে দিয়েচেন।

পুরোনো আমলের পাথরের গাঁথুনির বাড়ি। বেশ বড়ো বড়ো তিনটি কামরা, একদিকে একটা সরু যাতায়াতের বারান্দা। জবরদস্ত গড়ন, যেন খিলজিদের আমলের দুর্গ কি জেলখানা—হাজার ভূমিকম্পেও এবাড়ির একটু চুন-বালি খসাইতে পারিবে না। বৃদ্ধ বসিয়া আবার বাড়িটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলাম বাড়িটার গড়ন তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, বলিলাম, সেকালের গড়ন খুব টন্‌কো—আগাগোড়া পাথরের।

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, না, সেজন্য নয়। আমি এই বাড়িতে প্রায় ত্রিশ বছর আগে যথেষ্ট যাতায়াত করতাম—এই বাড়িই হল রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের। ওদের বংশে এখন আর কেউ নেই। আপনি যে এবাড়িতে আছেন তা জানতাম না।...তা বেশ বেশ। অনেকদিন পরে বাড়িটাতে ঢুকলাম কিনা, আমার বড়ো অদ্ভুত লাগচে। তখন বয়েস ছিল ত্রিশ, আর এখন হল প্রায় যাট। তারপর অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। চা পান করিয়া বৃদ্ধ গোরুর গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

আরও বছরখানেক কাটিয়াছে। দেশের স্কুলে চাকুরির আশ্বাস পাইলেও আমি এখনও যাই নাই, কারণ এখানকার বাঙালি-মাদ্রাজি সমস্যা একরূপ মিটিয়া আসিয়াছে, আপাতত আমার চাকুরিটা বজায় রহিল বলিয়াই তো মনে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ।

পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে আমারই এক ছাত্রের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম—মধ্যে রবিবার পড়াতে শনিবার গোরুর গাড়ি করিয়া রওনা হই, রবিবার ও সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলা আবশ্যক বাসায় আমি একাই থাকি। স্কুলের চাকর রাখহরি আমার রাঁধে। এ কয়দিন স্কুলের ছুটি ছিল, রাখহরিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়াই রাখহরি বলিয়া উঠিল, এঃ বাবু, এ কীসের রক্ত! দেখুন...

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম। তাই বটে। বাহিরের দরজার চৌকাঠের ঠিক ভিতরদিক হইতেই রক্তের ধারা উঠান বাহিয়া যেন চলিয়াছে। একটানা ধারা নয়, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা অবিচ্ছিন্ন সারি। একেবারে টাটকা রক্ত—এইমাত্র সদ্য যেন কাহারও মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আমি তো অবাক। কীসের রক্তের ধারা এ! কোথা হইতেই বা আসিল, আজ দু-দিন তো বাসা বন্ধ ছিল—বাড়ির ভিতরের উঠানে রক্তের দাগ আসে কোথা হইতে—তাহার ওপর সদ্য তাজা রক্ত।

অবশ্য কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুরের কথা মনে পড়িল। এক্ষেত্রে পড়াই স্বাভাবিক। চাকরকে বলিলাম, দেখ তো রে, রক্তটা কোনদিকে যাচ্ছে—এ সেই বড়ো হুলো বেড়ালটার কাজ...

রক্তের ধারাটা গিয়াছে দেখা গেল সিঁড়ির নীচের চোরকুঠুরির দিকে। ছোট্ট ঘর, ভীষণ অন্ধকার এবং যত রাজ্যের ভাঙাচোরা পুরোনো মালে ভরতি বলিয়া আমি কোনোদিন চোরাকুঠুরি খুলি নাই। চোরাকুঠুরির দরজা পার হইয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে রক্তের ধারাটার গতি দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকাল ধরিয়া ঘরটা বাহির হইতে তালা বন্ধ, যদি বিড়ালের ব্যাপারই হয়, বিড়াল ঢুকিতেও তো ছিদ্রপথ দরকার হয়।

চোরাকুঠুরির তালা লোহার শিকের চাড় দিয়া খোলা হইল! আলো জ্বালিয়া দেখা গেল ঘরটায় পুরোনো, ভাঙা, তোবড়ানো টিনের বাকসো, পুরোনো ছেঁড়া গদি, খাটের পায়া, মরিচা-ধরা সড়কি, ভাঙা টিন, শাবল প্রভৃতি ঠাসা বোঝাই। ঘরের মেঝেতে সোজা রক্তের দাগ এক কোণের দিকে গিয়াছে—রাখহরি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, একী বাবু! এতে কী করে এমনধারা রক্ত লাগল...

তারপর সে কী একটা জিনিস হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখুন কাণ্ডটা বাবু...জিনিসটাকে হাতে লইয়া সে বাহিরে আসিতে তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

একখানা মরিচা-ধরা হাতলবিহীন ভাঙা খাঁড়া বা রাম দা—আগার দিকটা চওড়া ও বাঁকানো—বড়ো চওড়া ফলাটা তাজা রক্তে টুকটুকে রাঙা! একটু-আধটু রক্ত নয়, ফলাতে আগাগোড়া রক্ত মাখানো, মনে হয় যেন খাঁড়াখানা হইতে এখনই টপটপ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে!

সেই মুহূর্তে একসঙ্গে আমার অনেক কথা মনে হইল। দুই বৎসর পূর্বে চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শোনা সেই গল্প। রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের ভদ্রাসন বাড়ি এটা। পুরোনো জিনিসের গুদাম এই চোরকুঠুরিতে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়াখানা তাহারাই রাখিয়াছিল হয়তো।...মড়কের আগে বিগ্রহের খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার প্রবাদ।

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

মড়ক কোথায় ভাবিতে পারিতাম যদি সময় পাইতাম সন্দেহ করিবার। কিন্তু তাহা পাই নাই। পরদিন সন্ধ্যার সময় চেরো গ্রামে প্রথম কলেরা রোগীর খবর পাওয়া গেল। তিন দিনের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া মড়ক দেখা দিল—প্রথমে চেরো, তারপর পাশের গ্রাম কাজরা, ক্রমে জয়চণ্ডীতলা পর্যন্ত মড়ক বিস্তৃত হইল। লোক মরিয়া ধুলধাবাড় হইতে লাগিল। চেরো গ্রামের মাদ্রাজি বংশ প্রায় কাবার হইবার জোগাড় হইল।

মড়কের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশে পলাইয়া আসিলাম; তারপর আর কখনো চেরোতেই যাই নাই—গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বেই দেশের স্কুলের চাকুরিটা পাইয়াছিলাম।

সেই হইতে রঙ্কিণী দেবীকে মনে মনে ভক্তি করি। তিনি অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকে অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুল বোঝে।

উপন্যাস

অপুর কথা

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবড়ি। হরিহর সাধারণ অবস্থায় গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু-চারি ঘর শিষ্য-সেবকদের বার্ষিক প্রণামির বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিদাভাবে সংসার চালাইতে থাকে।

পূর্ব দিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাকরুন সকালবেলায় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার প্রতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু-একবার কী বলি কী বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাকরুন মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়ে ফেলিয়া খুকির দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না?—ওই দেখো।

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক, পিতি, তুই খা—

দুটো পাকা বড়ো বিচে-কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙিয়া ইন্দির ঠাকরুন তাহার হাতে দিল। এবার খুকির চোখ-মুখ উজ্জ্বল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও ঘর হইতে তাহার মা ডাকিল, আবার ওখানে গিয়ে ধন্না দিয়ে বসে আছে? উঠে আয় ইদিকে।

ইন্দির ঠাকরুন বলিল, থাক বউ—আমার কাছে বসে আছে, ও কিছু করছে না। থাক বসে—

তবু তাহার মা শাসনের সুরে বলিল, না, কেনই বা খাবার সময় ওরকম বসে থাকবে? ওসব আমি পছন্দ করিনে, চলে আয় বলছি উঠে—

খুকি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাকরুনের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড়ো দূরের। মামার বাড়ির সম্পর্কে কী রকমের বোন।

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না—তাহার নিজেরও এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার বিশ্বেশ্বরী। অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। চল্লিশ বছরের নিভিয়া যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে—এক মুহূর্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ-হইতে-চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।

হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনীবংশ চৌধুরীরা নিষ্কর ভূমিদান করিয়া যে কয়েকঘর ব্রাহ্মণকে সেকালে গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন, হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাহাদের একজন।

বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথসকল ঘোর বিপদসংকুল ঠগি, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগদি, বাউরি শ্রেণির লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান—লাঠি ও সড়কি চালানোতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালো মানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লিতে গৃহস্থ বাড়ি লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূল ভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষসঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বিরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীন বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকি চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড়ো পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরধারে প্রকাণ্ড বট গাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের

কার্যপ্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরনের। পথ-চলতি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত— মারিয়া ফেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না যে, দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। পুকুরের মধ্যে লাশ গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েরা পরবর্তী শিকারের উপর দিয়া এ বৃথা শ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহমুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে সেই বট গাছ আজও আছে, সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষিদের লাঙলের ফালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে। শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালকপুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকি শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন-আহারদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জ বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু আন্দাজ করিতে কীরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্তিক মাসের ছোটো দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে সূর্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতে তাঁহারা ঠ্যাঙাড়ের হাতে ধরা পড়েন।

দস্যুরা প্রথম ব্রাহ্মণের মাথায় এক লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চিৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ আর একজন বালক—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে, তাঁকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদাতা—বংশের একমাত্র পুত্র- -পিণ্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বিরু রায়ও নাকি সেদিনের দলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে-পায়ে পড়িয়া অন্তত পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অনুরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠান্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বিরু রায় বাটি চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশি দিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বাংলা ১২৩৮ সাল। বিরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুবাড়ি হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকিপুরের নীচের বড়ো নোনাগাং পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন-চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকির ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়িতে পূজা হইত। টাকির বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে

দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন দুই পরে সন্ধ্যার দিকে ধলচিতের বড়ো খাল ও ইছামতীর মোহনায় একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের জোগাড় হইতে লাগিল। বড়ো চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নেই। একস্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বিরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল। দুই দিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে। বিশেষত পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনাগাঙের জল চকচক করিতেছিল। হু হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি, আকাশ, জ্যোৎস্না মোহনার জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল। হঠাৎ কীসের শব্দ শুনিয়া দু-একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপট শব্দ, একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিয়াই তখনই থামিয়া যাইবার শব্দ। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কী দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতে কী যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে ডুব দিল। চরের সেদিকটা জনহীন—কিছু কাহারও চোখে পড়িল না।

কী ব্যাপার ঘটিয়াছে, কী হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকি দাঁড়ি মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বিরু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বিরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়াইতে বার হইয়াছে। দাঁড়ি মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল, এদেশের নোনাগাং সমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কাশবনের আড়ালের বালির চরে বৃহৎ কুমির শুইয়া ওত পাতিয়া ছিল—ডাঙা হইতে বিরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে-ওদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল। নৌকা ছাড়িয়া মাঝ নদীর গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বিরু রায় ঠেকিয়া শিখিলেন যে, সে অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়। বাড়ি আসিয়া বিরু রায় আর বেশি দিন বাঁচেন নাই।

দিনকতক পরে।

খুকি সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়িতে তার পিসিমা নাই, অদ্য দুই মাসের উপর হইল একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে কী ঝগড়াঝাঁটি হওয়ার পর রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোনো এক আত্মীয়বাড়িতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর এতদিন বড়ো অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবারও কোনো লোক নাই। ইদানিং মা কাল হইতে আঁতুড়ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সে কখন খায়, কখন শোয় তাহা কেহ বড়ো দেখে না।

খুকি শুইয়া শুইয়া যখন পর্যন্ত ঘুম না আসিল, ততক্ষণ পিসিমার জন্য কাঁদিল। তাহার পর কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুড়ুনির মা দাই বলিল, ও খুকি, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েছে দেখবা না?...ওমা, কাল রাত্তিরে এত চ্যাঁচামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল—কোথায় ছিলে তুমি? যা কাণ্ড হয়েছিল, কালপুরের পিরের দরগায় সিন্নি দেবানে—বড্ডো রক্ষে করেছেন রাত্তিরে।

খুকি এক দৌড়ে ছুটিয়া আঁতুড়ঘরের দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ায় গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাঠের বড়ো পুতুলের চেয়ে কিছু বড়ো জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—সেটিও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ ধোঁয়ায় ভালো দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতেই জীবটি চোখ মেলিয়া মিটমিট করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোটো হাত দুটি নাড়িয়া নাড়িয়া দুর্বল ভাবে ঈষৎ ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে খুকি বুঝিল রাত্রিতে বিড়ালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল, তাহা কি অবিকল বিড়ালছানার ডাক—দূর হইতে শুনিলে কিছু বুঝিবার জো নাই। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট্ট নিতান্ত খুদে ভাইটির জন্যে দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকির মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেড়ার ঠাকুরমা ও কুড়ুনির মা দাই বারণ করাতে সে ইচ্ছাসত্ত্বেও আঁতুড়ঘরে ঢুকিতে পারিল না।

খোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোটো মুখখানি। নীচের মাড়িতে মাত্র দুখানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন তখন সে সেই দুখানি মাত্র দুধে-দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে, বউমা তোমার খোকার হাসিটি বায়না করা। খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মতো এত হাসি শুরু করিবে যে, তাহার মা বলে—আচ্ছা খোকন আজ থামো বড্ড হেসেচ, আজ বড্ড হেসেচ—আবার কালকের জন্যে একটু রে. . দাও। মাত্র দুইটি কথা সে বলিতে শিখিয়াছে। মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে জে—জে—জে—জে এবং দুধে দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না—না—না ও বিশ্রি রকমের চিৎকার করিয়া কাঁদিতে শুরু করে। যাহা সামনে পড়ায় তাহারই উপর ওই নতুন দাঁত দুখানিরই জোর পরখ করিয়া দেখে—মাটির ঢেলা, এক টুকরো কাঠ, মায়ের আঁচল; দুধ খাওয়াইতে বসিলে এক-এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিনুকখানাকে মহাআনন্দে নতুন দাঁত দুখানি দিয়া জোরে কামড়াইয়া ধরে। তাহার মা খিলখিল করিয়া উঠিয়া বলে—ওকী, হাঁরে ও খোকা, ঝিনুকখানাকে কামড়ে ধল্লি কেন? ছাড় ছাড়—ওরে করিস কী—দুখানা দাঁত তো তোর মোটে সম্বল—ভেঙে গেলে তখন হাসবি কী করে শুনি? খোকা তবু ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতর আঙুল দিয়া অতি কষ্টে ঝিনুকখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

খুকির উপর সবসময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাখারি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে খোকাকে বসাইয়া রাখিয়া তাহার মা নিজের কাজ করে। খোকা কাটরার মধ্যে শুনানি-হওয়া ফৌজদারি মামলার আসামির মতো আটক থাকিয়া কখনো আপন মনে হাসে, অদৃশ্য শ্রোতাগণের নিকট দুর্বোধ্য ভাষায় কী বকে, কখনো বাখারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিলে—মায়ের ভিজা কাপড়ের শব্দ পাইতেই খোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিকে-ওদিকে চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া এক মুখ

হাসিয়া বাখারির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তার মা বলে, একী, ওমা, এই কাজল পরিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়িচাঁচা পাখি সেজে বলে আছে। দেখি, এদিকে আয়। জোর করিয়া নাকমুখ রগড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া খোকার রাঙা মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়—মহা আপত্তি করিয়া রাগের সহিত বলে জে—জে—জে—, তাহার মা শোনে না।

ইহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিতেই খোকা খলখল করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পালাইতে যায়। এক-একদিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্বজয়া বলে, খোকন বলে টু—উ—উ? দোলো তো খোকা? দোলে দোলে খোকন দোলে—! খোকা অমনি বসিয়া পড়িয়া সামনে পিছনে বেজায় দুলিতে থাকে ও মনের সুখে ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া গান ধরে—

জে—এ—এ—জে—এ—এই
জে—জে—জে—এ
জে—জে—জে—জে—জে

সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের বাঁশবাগানের ধারে নির্জন বাড়িখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ গীত ও অবোধ কলহাস্যে মুখরিত থাকে।

এক-একদিন যখন হরিহর বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছে—সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া গিয়া বলে, ওগো, ছেলেটাকে একটু ধরো না? মেয়েটা কোথায় বেরিয়েচে—ঠাকুরঝি গিয়েছে ঘাটে—ধরো দিকি একটু!—আমি নাইব, না ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাকলেই হবে? হরিহর বলে, উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড়ো ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তার চটিজুতার পাটিটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে! হরিহর জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে, আঃ দেখো বাধিয়ে গেল কাণ্ড, আছি একটা কাজ নিয়ে।

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখি আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে, জে—জে—জে—

হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারী মমতা হয়।

ও পাড়ার দাসীঠাকরুন আসিয়া হাসিমুখে বলিল, পয়সা দুটোর জন্যে এসেছিলাম বউ, ইন্দির পিসি কাল আমার কাছ থেকে একটা নোনা নিয়ে এল, বললে কাল গিয়ে দাম চেয়ে নিয়ে এসো—

সর্বজয়া ঘরের কাজকর্ম করিতেছিল, অবাক হইয়া বলিল, নোনা কিনে এনেছে তোমার কাছ থেকে?

দাসীঠাকরুন ঘোর ব্যাবসাদার মানুষ। সামান্য তেঁতুল, আমড়া হইতে একগাছি শাক পর্যন্ত পয়সা না লইয়া কাহাকেও দেয় না। দাসীর অসাময়িক ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিল, এনেচে কি না জিজ্ঞেস করো না তোমার ননদকে? সকালবেলা কি মিথ্যে বলতে এলাম দুটো পয়সার জন্যি? চার পয়সার কমে আমি দেব না—বললে বুড়োমানুষ খাবার ইচ্ছে হয়েছে—তা যাক দু-পয়সাতেই—

রাগে সর্বজয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। নোনার মতো ফল, যাহা কিনা অপর্যাপ্ত বনেজঙ্গলে যে গোরু বাছুরের পর্যন্ত খাইয়া অরুচি ধরিয়া যায়, তাহা আবার পয়সা দিয়া কিনিয়া খাইবার লোক যে পাড়াগাঁয়ে আছে, তাহা সর্বজয়ার ধারণায় আসে না।

ঠিক এইসময় ইন্দির বুড়ি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্বজয়া তাহার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, বলি হ্যাঁগা, তিন কাল গিয়েচে এককালে তো ঠেকেচে, যার বসে খাই তার পয়সার তো একটু দুঃখ দরদ করে চলতে হয়? নোনা গিয়েচে কিনতে? কোথা থেকে তোমায় বসিয়ে আজ নোনা, কাল দানা খাওয়াব? শখের পয়সা নিজে থেকে দিয়ে দাওগে যাও, পরের ওপর দিয়ে শখ করতে লজ্জা হয় না?

বুড়ির মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তা দে বউ—পাকা নোনাড়া, তা ভাবলাম নিই খেয়ে, কড়া দিনই বা বাঁচব? তা দিয়ে দে দুটো পয়সা—

সর্বজয়া চতুর্গণ চিৎকার করিয়া বলিল, বড়ো পয়সা সস্তা দেখেচ কিনা? নিজের ঘটি-বাটি আছে বিক্রি করে দাও গিয়ে পয়সা—

দুপুরের কিছু পূর্বে ইন্দির বুড়ি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঁ হাতে ছোটো একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটলি ডান হাতে পিতলের চাদরের ঘটিটা ঝুলানো, বগলে একটা পুরানো মাদুর, মাদুরের পাড় ছিঁড়িয়া কাটিগুলি ঝুলিতেছে।

খুকি বলিল, ও পিসি,—যাসনে—ও পিসি কোথায় যাবি? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া মাদুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল।...তুই চলে গেলে আমি কাঁদব পিসি—ঠিক—

সর্বজয়া ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, তা যাবে যাও, গেরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে, তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনথ সময়ে না খেয়ে চলে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যাণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো?...ওইরকম কুচক্কুরে মন না হলে কি আর এই দশা হয়?

বুড়ি ফিরিল না। খুকি কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বুড়ি গিয়া গ্রামের ওপাড়ার নবীন ঘোষালের বাড়ি উঠিল।

বৈকালে ওপাড়া হইতে কে আসিয়া বলিল, ও মা ঠাকরুন, তোমাদের বুড়ি বোধ হয় মরে যাচ্ছে, পালিতদের গোলার কাছে দুপুর থেকে শুয়ে আছে, রোদ্দুরে ফিরে যাচ্ছিল, আর যেতে পারেনি—একবার গিয়ে দেখে এসো। দাদাঠাকুর বাড়ি নেই? একবার পাঠিয়ে দেও না।

পালিতদের বড়ো মাচার তলায় গোলার গায়ে ইন্দির ঠাকরুন মরিতেছিল একথা সত্য। হরিহরের বাড়ি হইতে ফিরিলে তাহার গা কেমন করে, রৌদ্রে আর আগাইতে না পারিয়া এখানেই শুইয়া পড়ে। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব করিবার পরে বেশি বেলায় অবস্থা খারাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিতপাড়ার অনেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে, তা রদ্দুরে বেরুলেই বা কেন? সোজা রদ্দুরটা পড়েচে আজ; কেহ বলিতেছে, এখুনি সামলে উঠবে এখন, ভিরমি লেগেছে বোধ হয়।

বিশু পালিত বলিল, ভিরমি নয়। বুড়ি আর বাঁচবে না; হরিজ্যাঠা বোধ হয় বাড়ি নেই, খবর তো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতদূরে আসে কে?

শুনিতে পাইয়া দিনু চক্রবর্তীর বড়ো ছেলে ফণী, ব্যাপার কী দেখিতে আসিল। সকলে বলিল, দাও দাদাঠাকুর, ভগ্যিস এসে পড়েচ, একটুখানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি! দেখো তো কাণ্ড, বামুনপাড়া না কিছু না—কে একটু মুখে জল দেয়?

ফণী হাতের বৈচিকাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া বুড়ির মুখের কাছে বসিল। কুশী করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল, পিসিমা!

বুড়ি চোখ মেলিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল। তাহার মুখে কোনো উত্তর শুনা গেল না। ফণী আবার ডাকিল, কেমন আছেন পিসিমা? শরীর কি অসুখ মনে হচ্চে? পরে সে গঙ্গাজলটুকু মুখে ঢালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না। বিশু পালিত বলিল আর একবার দাও দাদাঠাকুর—

আর খানিকক্ষণ পরে ফণী বুড়ির চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল দুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সকালের অবসান হইয়া গেল।

ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর পর চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আসন্ন। দুই পাশে ঝোপে ঝোপে ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতী পূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইতেছিল।

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে

ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল, আবার পিছিয়ে পড়লে এরই মধ্যে? নাও এগিয়ে চলো।

ছেলেটা বলিল, বনের মধ্যে কী গেল বাবা? বড়ো বড়ো কান?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্যশিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল, কী দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড়ো বড়ো কান?

হরিহর বলিল, কী জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অবধি শুরু করেচ এটা কী, ওটা কী—কী গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি? নাও এগিয়ে চলো দিকি?

বালক বাবার কথায় আগে চলিল।

নবীন পালিত বলিল, বরং এক কাজ করো হরি, মাছ যদি ধরতে হয়, তবে বঁরশায় বিলে একদিন চলে যাওয়া যাক; পুবপাড়ার নেপাল পাড়ুই বাচ দিচ্চে, রোজ দেড মন দু-মন এইরকম পড়চে, পাঁচ সেরের নীচে মাছ নেই। শুনলাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথই জলে সাঁ সাঁ করে ঠিক যেন বকনা বাছুরের ডাক—বুঝলে?

সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেককেলে পুরোনো বিল, গহিন জল, দেখেছ তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা পদ্মগাছের জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি—যতক্ষণ ফরসা না হল ততক্ষণ তো মশাই নৌকোর ওপরে সকলে বসে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল—

বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা উৎসাহে পাশের এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল—ওই যাচ্চে, বাবা, ওই গেল বাবা বড়ো বড়ো কান, ওই—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল, উঁহু উঁহু কাঁটা কাঁটা কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল, আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখছি তুমি, একশোবার বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ওইজন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ করিয়া বাবার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী বাবা?

হরিহর বলিল, কী তা আমি দেখেছি—শুয়োর-টুয়োর হবে। নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

—শুয়োর না বাবা, ছোট্ট যে! পরে সে নিচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

—চলো চলো—হ্যাঁ। আমি বুঝতে পেরেছি, আর দেখাতে হবে না—চলো দিকি!...

নবীন পালিত বলিল, ও হল খরগোশ, খোকা, খরগোশ। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোশ থাকে, তাই। বালক বর্ণপরিচয়ে 'খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এরকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোশ!—জীবন্ত। একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়—ছবি না, কাঠের পুতুল না—

একেবারে কানখাড়া সত্যি—কাদের খরগোশ!—এইরকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে! জল-মাটির তৈরি নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কী করিয়া সম্ভব হইল, বালক তা কোনোমতে ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

হরিহরের ছেলে বলিল, নীলকণ্ঠ পাখি কই বাবা?

—এই দেখো এখন, বাবলা গাছে এখনই এসে বসবে—

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ির হইতে এতদূর আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ি, নিজেদের বাড়ির সামনেটা, বড়োজোর রানুদিদিদের বাড়ি ইহাই ছিল তার জগতের সীমা। কেবল এক-একদিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছা দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জ্বাল ঘরটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, মা, ওদিকে সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা! ওই মাঠের উপর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমির গাছের নীচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটাইত। ওধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ি ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নিচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রঙের ফলের থেলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হাঁ, হাঁ, হাত দিয়ো না, হাত দিয়ো না—আলকুশি আলকুশি। কী যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখচি। আর কোনোদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুলকে ফোসকা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে—তা তুমি কিছুতেই শুনবে না—

—হাত চুলকাবে, কেন বাবা?

—হাত চুলকুবে, বিষ বিষ—আলকুশি কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করবে, জ্বলবে এক্ষুনি—তখন তুমি চিৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে গিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল, এই এত রাত হল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে, না কিছু!

হরিহর বলিল, আঃ নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে—আলকুশির ফল ধরে টানতে যায়! পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল, কুঠির মাঠ দেখব, কুঠির মাঠ দেখব—কেমন হল তো কুঠির মাঠ দেখা!

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটি টিনের বাকসো আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাকসের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে,—একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের একটা টোল-খাওয়া টিনের

ভেঁপু-বাঁশি গোটাকতক কড়ি—এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ি হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেউ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে—একটা দু-পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল! দেখিতে ভালো বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু সে নিজের পুতুলের বাকসে রাখিয়া দিয়াছে! খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গা-যমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সেগুলি যত্নে বাকসে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি। এতগুলির জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশিটি কয়েকবার নাড়িয়াচাড়িয়া সেটির সম্বন্ধে বিগত কৌতূহল হইয়া তাহাকে একপাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও একপাশে পিঁজরাপোলের আসামির ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে তাক ঠিক হইতেছে কি না!

এমন সময় তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল, অপু ও অপু—। সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র অসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত! মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মতো লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল! পরে বলিল, কী রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল, আয় এদিকে—শোন—

দুর্গার বয়স দশ-এগারো হইল: গড়ন পাতলা, রং অপুর মতো অতটা ফরসা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথায় চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মতন চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল, কী রে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা! সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা! সুর নিচু করিয়া বলিল, মা ঘাট থেকে আসেনি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু—

দুর্গা চুপিচুপি বলিল, একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুশি জারাব—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল, কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল, পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটার তলায় পড়ে ছিল—আন দিকি একটু নুন আর তেল।

অপু দিদির দিকে হাসিয়া বলিল, তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে! আমার কাপড় যে বাসি!

—তুই যা না শিগগির করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েছে, শিগগির যা।

অপু বলিল, নারকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসব—তুই খিড়কি দোরে গিয়ে দেখ মা আসচে কি না! দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল, তেল-টেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি নইলে মা টের পাবে—তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল, বলিল, নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?

—অতগুলো বুঝি হল? এই তো ভারী বেশি—যা—আচ্ছা নে আর দুখানা—বা, দেকতে বেশ হয়েচে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেব তাহলে—

—লঙ্কা কী করে পাড়ব দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দেয়, আমি যে নাগাল পাইনে।

—তবে থাকগে যাক—আবার ওবেলা আনব এখন, পটলিদের ডোবার ধারের আম গাছটায় গুটি যা ধরেচে—দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে—

দুর্গাদের বাড়ির চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। বাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ি নাই! পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি।

হরিহরের বাড়িটাও অনেকদিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকে রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বনবিছুটি ও কালোমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে—ঘরে দোর-জানলার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কি দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল—দুগগা ও দুগগা—

দুর্গা বলিল, মা ডাকচে, যা দেখে আয়—ওখানা খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফেল—

পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, কী মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাব? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল। একটুখানি যদি কোনোদিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে—অত বড়ো মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দুখানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টোটো টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েচে।

—রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু, একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও। তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাইফরমাজ। ও দুর্গা—দেখ তো বাছুরটা হাঁক পাড়চে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত সুরে বলিল, চাল ভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল, উঃ, চিবানো যায় না। আম খেয়ে দাঁত যা টকে—

দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথে বন্ধ হয়ে গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল, আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল, ওকে জিজ্ঞেস করো না! আমি—এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে—তুমি যখন ডাকলে তখন তো—

স্বর্ণ গোয়ালিনি গাই দুইতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল, যা বাছুরটা ধরগে যা—ডেকে ডেকে সারা হল—কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তার পিঠে গুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল, লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল, আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে—আবার কোনোদিন আম দেব খেও—ছাই দেব—এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাব, এত বড়ো বড়ো গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়— দেব তোমায়? খেয়ো এখন। হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে।

অপুদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড়ো অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক দূরের কোনো দেশের কথা মনে হয়—কোন দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মার মুখে ওইসব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে।

এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনি শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড়ো কম লেখা আছে। ইহার প্রভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশা মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হালকা কোনো গাছের ডালকে অস্ত্র স্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে, তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কী, একেবারে দুশোটা বাণ দিলে মেরে। তারপর—ও—সে কী যুদ্ধ! কী যুদ্ধ! বাণের চোটে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধারা মার মুখে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালি সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না। তারপর অর্জুন করলেন কী, ঢাল তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ! দুর্যোধন এলেন—ভীম এলেন। বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেছে—আর কিছু দেখা গেল না।...মহাভারতের রথীগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন কিন্তু রক্তমাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, জয়লাভের পথ ক্রমশই কীরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?

গ্রীষ্মকালের দিনটা বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড়ো বিপদে পড়িয়াছেন—কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব, চক্ষের পলকমাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে—এমন সময় শেওড় বনের ওদিক হইতে

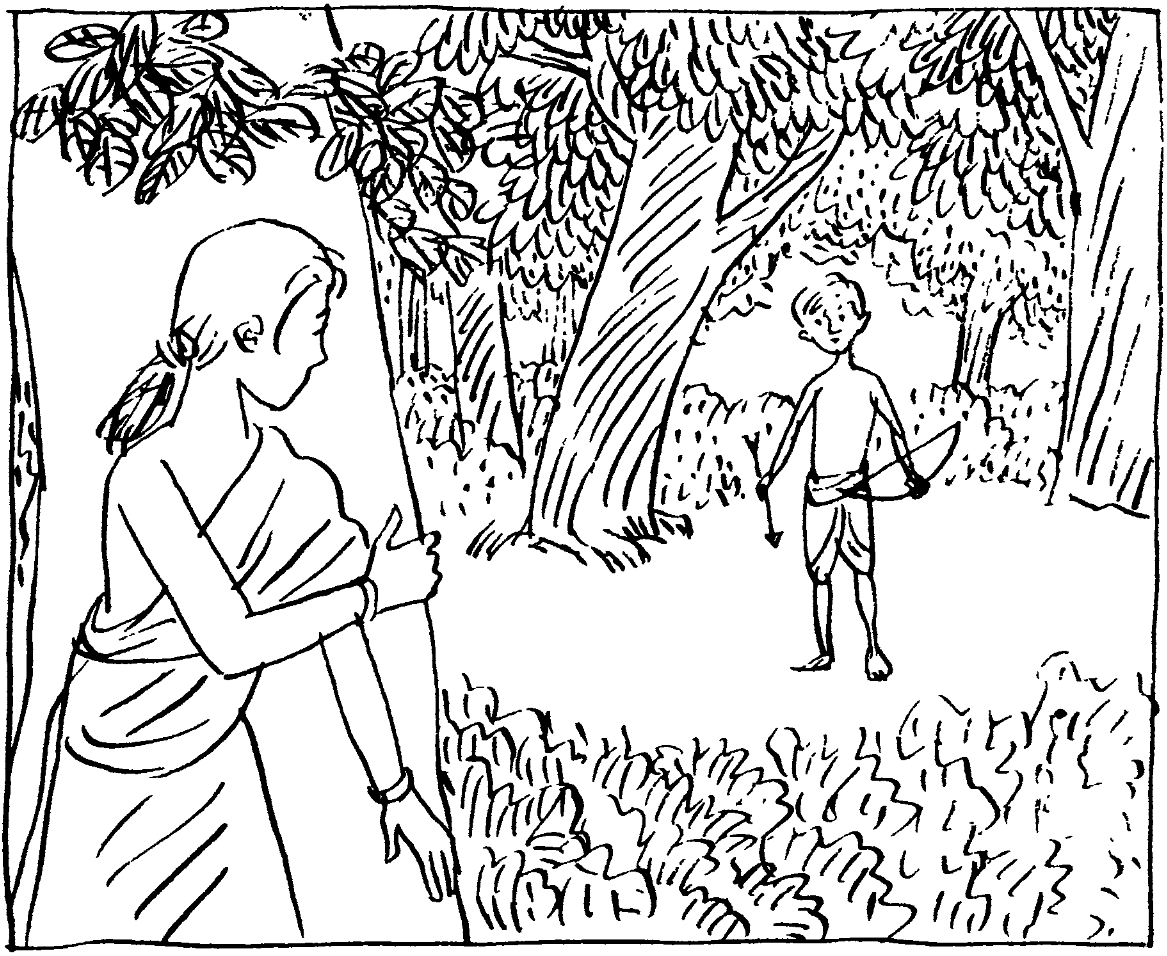

হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কীরে অপু? চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল, হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কী বকচিস বিড়বিড় করে, আর হাত পা নাড়াচ্ছিস? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাইয়ের কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল, পাগল!...কোথাকার একটা পাগল, কী বকছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জিতমুখে বার বার বলিতে লাগিল, যাঃ... বকছিলাম বুঝি?...

—আচ্ছা, যাঃ—

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, চলরে অপু, ওই কোথায় ডুগডুগি বাজচে, চল বাঁদর খেলাতে এসেছে ঠিক, শিগগির আয়—

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু বাটির বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া, বাঁদর নয়, ও পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। ও পাড়ায় তাহার দোকান, তা ছাড়া আবার গুড়ের ও ধানের ব্যবসাও করে। কিন্তু পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করতে পারে না, অল্পদিনেই ফেল মারিয়া বসে। তখন হয়তো মাথায় করিয়া হাটে হাটে আলু পটল,

কখনো পান বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। শেষে তাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন হয়তো সে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া জাত ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, আবার পাথুরে চুন মাথায় করিয়া বেড়াইতেছে। লোকে বলে একমাত্র মাছ ছাড়া এমন কোনো জিনিস নাই যাহা তাহাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায় নাই। কাল দশহারা, লোকে আজ হইতেই মুড়কি সন্দেশ কিনিয়া রাখিবে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও বাড়ি ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ির লোক কখনো কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা-অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি গিয়া মাথার চাঙারি নামাইতেই বাড়ির ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; ভুবন মুখুজ্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়িতে পাঁচ-ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নীচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁর নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুজ্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজো ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী সংসারে কর্ত্রী।

সেজোবউয়ের বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া খ্যাতি আছে।

সেজোবউ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কি, সন্দেশ, বাতাসা দশহারা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুজ্যের ছেলে-মেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজোবউ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে, খাও না! এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।

চিনিবাস চাঙারি মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ি চলিল। দুর্গা বলিল, আয় অপু চল দেখিগে টুনুদের বাড়ি—

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজোবউ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন, দেখতে পারিনে বাপু ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব—নিজের বাড়ি আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না, লোকের দোর দোর—যেমন মা তেমনি ছা—

ইহাদের বাটির বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল, চিনিবাসের ভারী তো খাবার। বাবার কাছ থেকে দেখিস রথের সময় চারটে পয়সা নেব—তুই দুটো, আমি দুটো। তুই আমি মুড়কি কিনে খাব—

খানিকটা পরে ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল, রথের আর কতদিন আছে রে দিদি?

এদিনের ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতাতে সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কী করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ির মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানের পেঁপেতলায় পুন্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে! উঠানে ছোট্ট চৌকোনা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মোটর ছড়াইয়া দিয়াছিল—ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—চারিদিকে কলার ছোটো বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আলপনা দিতেছে—পদ্মলতা—পাখি, ধানের শিষ, নতুন-ওঠা সূর্য।

দুর্গা বলিল, দাঁড়া, মন্তরটা বলে চল একজায়গায় যাব।

—কোথা রে, দিদি—

—চল না, নিয়ে যাব এখন, দেখিস এখন—

ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল গড়ের পুকুরে অনেক পানফল হয়ে আছে—ভোঁদার মা বলছিল, চল নিয়ে আসি—

গ্রামের একেবারে উত্তরাংশ চারিধারে বাঁশবন ও আগাছা এবং আম-কাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়া পথ। লোকালয় হইতে অনেক দূর গভীর বন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে মাঠের ধারে মজা পুকুরটা। কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারের বাড়ির চতুর্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে—কেবল এই খাতটাতে বারো মাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকুর। মজুমদারদের বাড়ির কোনো চিহ্ন এখন নাই।

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে কিন্তু কিনারার ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দুর্গা বলিল, অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি দেখ তো খুঁজে—তাই দিয়ে টেনে টেনে আনব। পরে সে পুকুরধারের ঝোপের শ্যাওড়া গাছ হইতে পাকা শ্যাওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল, এ দিদি, ও ফল খাসনি।—দূর, আশশ্যাওড়ার ফল কি খায় রে? ও তো পাখিতে খায়—

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে বলিল, আয় এদিকে— দেখ দিকি খেয়ে—মিষ্টি যেন গুড়— কে বলেছে খায় না? আমি তো কত খেইচি।

অপু কঞ্চি কুড়ানো রাখিয়া দিদির কাছে আসিয়া বলিল, খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি দিদি—

পরে সে খাইয়া, মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—এট্টু এট্টু তেতো যে দিদি—

—তা এট্টু তেতো থাকবে না? তা থাক, কেমন মিষ্টি বল দিকি। কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটাকতক পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।

খানিকটা পরে দুর্গা পুকুরের জলে একটু নামিয়া বলিল, কত লাল ফুল রয়েছে অপু। দাঁড়া তুলচি। জলে আরও নামিয়া সে দুইটা ফুলের লতা ধরিয়া টানিল—ডাঙায় ছুঁড়িয়া বলিল—ধর অপু। অপু বলিল, পানফল খুব তো জলে—ওখানে কী করে যাবি দিদি? দুর্গা একটা কঞ্চি দিয়া দূর জলের পানফলের গাছগুলো টানিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। বলিল, বড্ড গড়ানো পুকুর রে—গড়িয়ে যাচ্ছি ডুব জলে—নাগাল পাই কী করে? তুই এক কাজ কর, পেছন থেকে আমার আঁচল ধরে টেনে রাখ দিকি, আমি কঞ্চি দিয়ে পানফলের ঝাঁকাটা টেনে আনি।

বনের মধ্যে হলদে কী একটা পাখি ময়নাকাঁটা গাছের ডালের আগায় বসিয়া ল্যাজ নাচাইয়া ভারী চমৎকার শিস দিতেছিল। অপু চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কী পাখি রে দিদি?

—পাখি-টাখি এখন থাক— ধর দিকি বেশ করে আঁচলটা টেনে, গড়িয়ে যাব—জোর করে—

অপু পিছন হইতে আঁচল টানিয়া রইল। দুর্গা পায়ে পায়ে নামিয়া যতদূর যায় কঞ্চি আগাইয়া দিল। কাপড়চোপড় ভিজিয়া গেল তবু নাগাল আসে না—আরও একটুখানি নামিয়া আঙুলের আগায় মাত্র

কঞ্চিখানাকে ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিল। অপু টানিয়া ধরিয়া থাকিতে থাকিতে শক্তিতে আর কুলাইতেছে না দেখিয়া পিছন হইতে হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে আঁচল ঢিলা হওয়াতে দুর্গা জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল কিন্তু তখনই সামলাইয়া হাসিয়া বলিল, দূর, তুই যদি কোনো কাজের ছেলে—ধর ফের। অতি কষ্টে একটা পানফলের ঝাঁক কাছে আসিল—দুর্গা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল কতগুলো পানফল ধরিয়াছে। পরে ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, বড্ড কচি, এখনও দুধ হয়নি মধ্যে, আর একবার ধর তো। অপু আবার পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া রহিল। খানিকটা থাকিবার পর সে দিদির ঝাঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে টানের চোটে আবার দু-এক পা জলের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। পরে কাপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল, দূর!

ভাইবোনের কলহাস্য খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুরপ্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল। দুর্গা বলিল, এতটুকু যদি জোর থাকে তোর গায়ে, গাবের ঢেঁকি কোথাকার!

খানিকটা পরে দুর্গা জলে নামিয়া আরেকবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেছে, অপু ডাঙায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অপু পাশের একটা শ্যাওড়া গাছের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চ্যাচাইয়া বলিয়া উঠিল, দিদি, দেখ কী এখানে।...পরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কী তুলিতে লাগিল।

দুর্গা জল হইতে জিজ্ঞাসা করিল, কী রে? পরে সে উঠিয়া ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণ মাটি খুঁড়িয়া কী একটা বাহির করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল, দেখ দিদি, চকচক কচ্ছে—কী জিনিস রে?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল—গোলমতো একদিকে ছুঁচালো পল-কাটাকাটা চকচকে কী একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উলটাইয়া-পালটাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কী ভাবিয়া তাহার রুক্ষচুলে-ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কি না! চুপিচুপি বলিল, অপু, এটা বোধ হয় হিরে! চুপ কর, চ্যাচাসনি। পরে ভয়ে ভয়ে আর একবার চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে—মায়ের মুখে, দিদির মুখে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হিরামুক্তার অলংকারের ঘটা সে অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু হিরা জিনিসটা কীরকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হিরা দেখিতে মাছের ডিমের মতো হলদে, তবে নরম নয়—শক্ত।...

সর্বজয়া বাড়ি ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল—ছেলে-মেয়ে বাড়ির ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা চুপিচুপি বলিল, মা একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিলাম মা। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এইটে পোঁতা ছিল।

অপু বলিল, আমি দেখে দিদিকে বললাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল, দেখো দিকি কী এটা মা?

সর্বজয়া উলটাইয়া-পালটাইয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গা চুপিচুপি বলিল, মা, এটা ঠিক হিরে—নয়?

সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট নহে; সে সন্দিগ্ধসুরে জিজ্ঞাসা করিল, তুই কী করে জানলি হিরে?

দুর্গা বলিল, মজুমদারেরা বড়োলোক ছিল তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল—পিসি গল্প করত। এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রোদ্দুর লেগে চকচক করছিল,—এটা ঠিক মা হিরে।

সর্বজয়া বলিল, আগে উনি আসুন, ওঁকে দেখাই।

খানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ি ঢুকিল।

সর্বজয়া বলিল, ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো! দেখো তো এটা কী!

হরিহর হাতে লইয়া বলিল, কোথায় পেলে?

—দুগ্‌গা গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েছে। কী বলো দিকি?

হরিহর খানিকটা উলটাইয়া-পালটাইয়া দেখিয়া বলিল, কাচ, না হয়, পাথর-টাথর হবে—এতটুকু জিনিস, ঠিক বুঝতে পারচিনে।

সর্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দিল—কাচ হইলে তাহার স্বামী কি চিনিতে পারিত না? পরে সে চুপিচুপি যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল, হিরে নয় তো? দুগ্‌গা বলছিল মজুমদার বাড়ির গড়ে তো কত লোক কত কী কুড়িয়ে পেয়েছে। যদি হিরে হয়।

—হ্যাঁ হিরে যদি পথঘাটে পাওয়া যেত তবে আর ভাবনা কী ছিল? তুমিও যেমন। তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল—হয়তো হইতেও পারে। বলা যায় কি। মজুমদারেরা বড়োলোক ছিল। বিচিত্র কী যে, হয়তো তাহাদেরই গহনায় কোনোকালে বসানো ছিল, কী করিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে। কথায় বলে, কপালে না থাকলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না—শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মতো ঘটিবে?

সে বলিল, আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলিবাড়ি দেখিয়ে আনি।

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্বজয়া বার বার মনে মনে বলিতে লাগিল, দোহাই ঠাকুর, কত লোক তো কত কী কুড়িয়ে পায়। এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারে—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ো—দোহাই ঠাকুর। তাহার বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ি আসিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, বাবা এখনও বাড়ি ফেরেনি, হ্যাঁ মা?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া বলিল, হুঁ, তখনই আমি বললাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলি মশাইয়ের জামাই সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন—তিনি দেখে বললেন, এ একরকম বেলোয়ারি কাচ—ঝাড়লণ্ঠন ঝুলোনো থাকে। রাস্তাঘাটে যদি হিরে-জহরত পাওয়া যেত, তাহলে...তুমিও যেমন!

বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্নকাল।

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

অনেকক্ষণ হইতে মেঘ মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল! অপুদের বাড়ির সামনে বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়িটা

যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধুলা বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, খড়, চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটির বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়াইল—অপুও দিদির পিছু পিছু ছুটিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল, শিগগির ছোট, তুই বরং সিঁদুরকৌটো-তলায় থাক, আমি যাই সোনামুখীতলায়—দৌড়ে—দৌড়ে। ধুলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড়ো বড়ো গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছে—বাগানের শুকনা ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুকনা বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিলা গাছের শুঁয়ার মতো পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা উৎসাহে চিৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক-ওদিক ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পড়ল রে দিদি—ওই আর একটা রে দিদি। চিৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদি বা শোনা যায় ঠিক কোন জায়গা বরাবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাহাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল, এই দেখ, দিদি, কত বড়ো দেখ,—ওই একটা পড়ল—ওই ওদিকে—

এমন সময় হইহাই শব্দে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চ্যাঁচাইয়া বলিল, ও ভাই আয়, দুগ্‌গাদি অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখী তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল, আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচ?

পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল, সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখছিস টুনু? যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেব—

রানু বলিল, কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়োক—আমরাও কুড়োই।

—কুড়োবে বই কী। ও ওখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও। না, যাও দুগ্‌গাদি—আমাদের আমতলায় থাকতে দেব না। অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না—কিন্তু সেদিন ইহাদেরই কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল, অপু, আয় রে, চল। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল, আমরা সেই জায়গাই যাই অপু, এখানে থাকতে না দিলে বয়ে গেল—বুঝলি তো? এখানকার চেয়েও বড়ো বড়ো আম—তুই আমি মজা করে কুড়োব এখন—চলে আয়—এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সুমুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল। রানু বলিল, কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে। তুমি ভারী হিংসুক কিন্তু সতুদা। রানুর মনে দুর্গার চোখের চাহনি বড়ো ঘা দিল।

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানা মুদির দোকান করিতেন। এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের অভিভাবকদের বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, একটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বেপরোয়া ভাবে বেত চালাইয়া থাকেন, যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনোরূপ প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়াছিল, মা আসিয়া ডাকিল, অপু ওঠো শিগ্‌গির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে। কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট। হাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য নিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে, যাহারা দুষ্টু ছেলে মার কথা শোনে না, ভাই-বোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে কোনোদিন ওইরূপ করে নাই, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশি জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল, ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোকে বাড়ি নিয়ে যাব অপু। বসে বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো দুষ্টুমি কোরো না যেন। খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল! অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড়ো বড়ো ছেলে আপন আপন চাটাইয়ে বসিয়া নানারূপ কু-স্বর করিয়া কী পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোটো একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড়ো ছেলে তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কী লক্ষ করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া স্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কী করিতেছিল; একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম। অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা। সঙ্গে সঙ্গে তার স্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমশায়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের স্লেটে বড়ো বড়ো করিয়া বানান লিখিত লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন, ফনে স্লেটে ওসব কী হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই দুটি ছেলে অমনি স্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড়ো শক্ত। তিনি বলিলেন, এই সতে, ফনের স্লেটটা নিয়ে আয় তো। তাঁদের মুখে কথা শেষ হইতে না হইতেই বড়ো আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া স্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

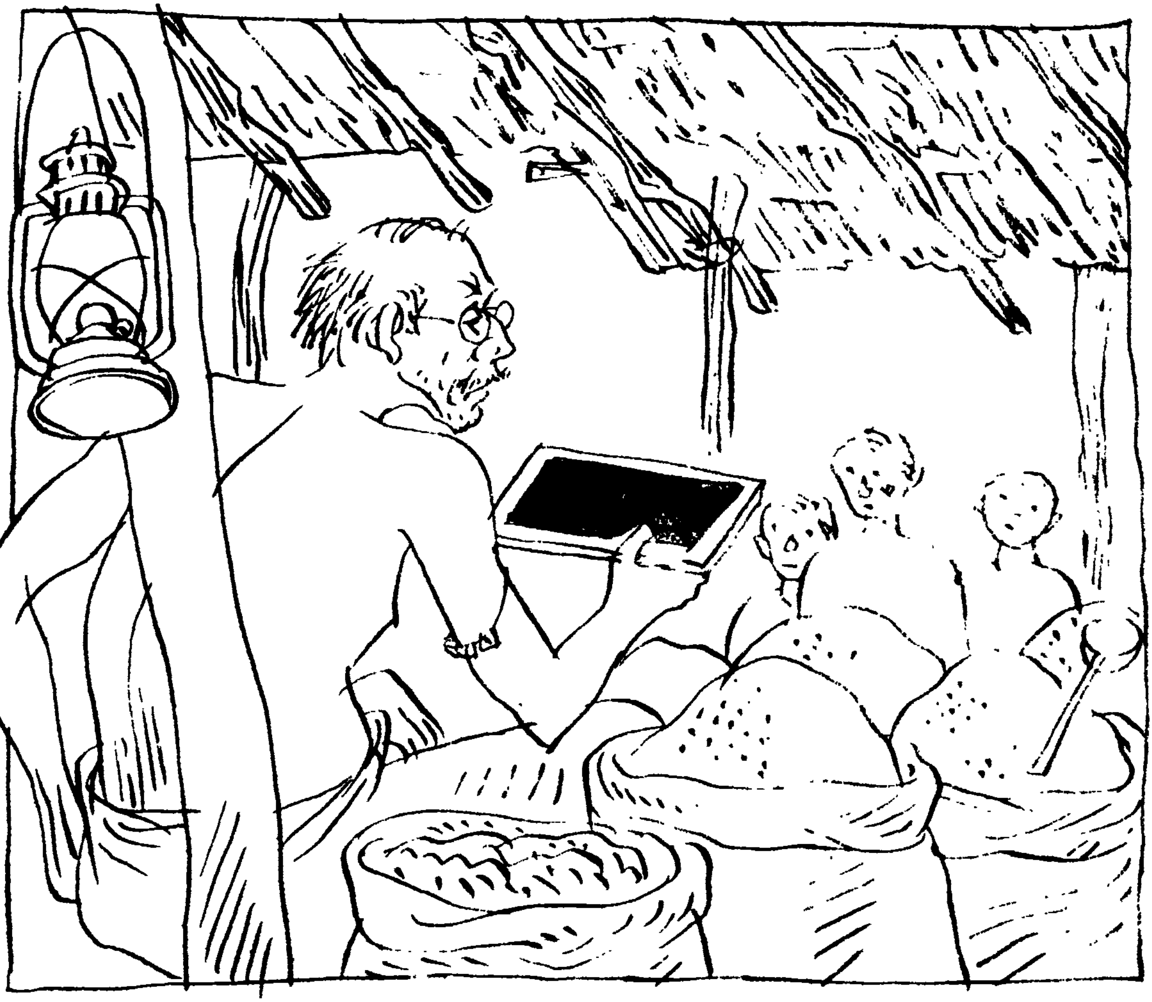

—হুঁ, এসব কী খেলা হচ্ছে স্লেটে? সতে, নিয়ে আয় তো দুজনকে কান ধরে।

যেভাবে বড়ো ছেলেটা ছোঁ মারিয়া স্লেট লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিপন্নমুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে অপুর হঠাৎ বড়ো হাসি পাইল। সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিকফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাসচ কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? আঁ? এটা কি নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কী, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে বেশ বড়ো দেখে!

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ওই ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভরতি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে-যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

গুরুমহাশয় একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া একখানা তালপাতা চাটাইয়ের ওপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা প্রায়ই গ্রামের দিনু পালিত

কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশি ভালো লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কীভাবে আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোলভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতের কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালিখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া পড়া। বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাং ডাকিতেছে—কী সুন্দর! বড়ো হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক-একদিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত গ্রামের ও পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যেকোনো গল্প হউক যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ।

এক-একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কীরকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ডি দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম! কোথাকার একজায়গায় একটা খুব ভালো খাবার পাওয়া যায়, সান্যাল মশায় নাম বলিলেন, প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারী হাসি পাইয়াছিল—বড়ো হইলে সে 'প্যাঁড়া' কিনিয়া খাইবে।

কোন দেশে সান্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশ্বত্থতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত, আচ্ছা কোন ফল তোমরা খাইতে চাও বলো। পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যেকোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত, যাও ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আম গাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন, ওসব মন্তর-তন্তরের খেলা আর কী! সেবার আমার এক মামা—

দিনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন, মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচ কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকৃষ্ট ভায়া তো খুব দেখেচ! কাঠের দড়ি-বাঁধা একধরনের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আসত। একশো বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েচে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সে আমরা তার সঙ্গে হাতের কবজির জোরে পেরে উঠতাম না। একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েছে উনিশ-কুড়ি বয়েস, চাকদা থেকে গঙ্গাচান করে গোরুর গাড়ি করে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ি—গাড়িতে আমি, আমার খুড়িমা, আর অনন্ত মুখুজ্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা হয়ে গেল, তখন ওসব দিকে কীরকম ভয়ভীতি ছিল, রাজকৃষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কি টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হল। আজকাল সেখানে নতুন গাঁ-খানা বসেছে?—ওই বরাবর এসে হল কী জানো? জন চারেক গুন্ডামাকোগোছের মিশকালো লোক এসে গাড়ির পেছন দিকের বাঁশ দু-দিক থেকে ধললে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে আর রা-টা নেই, কোনোরকমে গাড়ির মধ্যে বসে আছি, এদিকে তারাও গাড়ির বাঁশ ধরে সঙ্গে সঙ্গে

ই আসচে, বুধো গাড়োয়ান দেখি পিটপিট করে পেছন দিয়ে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ করে দিলে। বেশ, আছে। এদিকে গাড়ি একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্ছে, তখন সেই লোক কজন বললে, ওস্তাদজি, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বললে, সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতিমিনতির পর বুধো বললে, আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো আর এরকম করিসনি। তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেছে, ধরেই রয়েছে—আর ছাড়াবার সাধ্য নেই—চলেচে গাড়ির সঙ্গে। একেবারে পেরেক-আঁটা হয়ে গিয়েচে তা বুঝলে বাপু? মন্তর-তন্তরের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত।

অপু কাউকে একথা এখন বলে নাই—তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপিচুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ওই বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যে একখানা বইয়ের মধ্যেই অদ্ভুত কথাটার সন্ধান পাইয়াছি।

উঠানের উপর বাঁশঝাড়ের ছায়া তখন পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক দুপুরে সোনাডাঙার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের মতো একজায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাঁধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপিচুপি বইয়ের বাকসোটা লুকাইয়া খুলিল। অতীব আগ্রহের সহিত সে এ বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বইয়ের মধ্যে ভালো গল্প লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়ের মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ'।

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের পাঁধাই করা মলাটের নানাস্থানে চটি উঠিয়া গিয়াছে। এই পুরানো বইয়ের উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেইজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাকসো বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতে একদিন সে পড়িল বড়ো অদ্ভুত কথা। হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরের বইখানার মধ্যে একথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছে—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাকসোটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে, শকুনির বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা। এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্যে ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, উহা জোগাড় করিতে পারিবে এবং...কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হিরু নাপিতের কাঁঠালতলায় রাখালেরা গোরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ায় রাখালকে বলিল, তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেব।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ির সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রংয়ের ছোটো ছোটো ডিম বাহির করিয়া বলিল, এই দেখো ঠাকুর এনেচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাহির করিয়া বলিল, দেখি। পরে আহ্লাদের সহিত উলটাইয়া-পালটাইয়া বলিল, শকুনির ডিম। ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরিভুরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কম দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল! বলিল, দুটো পয়সা দেব আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেব, এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব। এই এত বড়ো বড়ো সোনাগেঁটে—দেখবি? দেখাব?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা জোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুইটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলো অপুর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অন্য সময়ে; কিন্তু আকাশে উড়িবার ইচ্ছা আমাদের কাছে কি আর বেগুনবিচি খেলা।

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাঁকে হাঁড়ি-কলসির পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে কী যেন ঠক করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, ওমা কীসের দুটো বড়ো বড়ো ডিম এখানে। এঃ পড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে—দেখছ কী পাখি ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা।

তাহার পর কী ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না. . . কান্না. . . হইহই কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে. . . ছেলেটার যে কী কাণ্ড, ওমা এমন করা তো কখনো শুনিনি—শুনেচ সেজো ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম মুখে পুরে নাকি মানুষে উড়তে পারে—ওই ওদের বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটা বদমাসের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কীসের ডিম এনে বলছে—এই নেও শকুনের ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কী বোকা সে আর তোমার কাছে কী বলব সেজো ঠাকুরঝি. . . কী করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি।

কিন্তু বেচারি সর্বজয়া কী করিয়া জানিবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত।

গ্রামে বারোয়ারি চড়ক পূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ি বাড়ি চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল, না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অন্যেয্য হয়েছে. . . এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা?

বৈদ্যনাথ বলিলেন, না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল। এরকম দলটি এ অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি। এবার পালপাড়ার বাজারে মহেশ স্যাকরার বালক কেত্তনের দল গাইবে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই—

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যেন নিশ্চিন্দিপুরবাসীগণের জীবন-মরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকেলেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চলকাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে, আমি বারোয়ারি তলায় যাব বাবা, সকলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি বসে বসে পড়ব। এক্ষুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে, পড়ো, পড়ো, এখন বসে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হলে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে। তখন না হয় যেও এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সব সময়ে আজকাল বিদেশে থাকে; অল্পদিনের জন্য বাড়ি আসিয়া ছেলেকে চোখ-ছাড়া করিতে মন চায় না। অভিমানে রাগে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্না-ভরা গলায় আবার শুভঙ্করী শুরু করে—মাস মাহিনা যার যতদিন তার পড়ে কত?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে যাইয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনি আনুপর্বিক বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে, দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে। বছরকারের দিনটা—তোমার ন-মাস বাড়িতে থাকা নেই বছরের আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তর্কালঙ্কার হয়ে উঠবে কিনা!

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে। ভালো বেহালাদার, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কখনো সে ভালো জিনিস শোনে না—উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে...মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বাড়িতে সেই কী লিখিতেছ—দিদি আসতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজ-পোশাক পরিয়া টাঙানো ঝাড়-ও কড়ির ডমের আলো সজ্জিত আসরে রাজা মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না। সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ায় কোনো লোক তো বাকি নাই। বাবা কেন এখানে...? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কী আর এ কী? কীসব সাজ! কীসব চেহারা!...

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে, খোকা বেশ দেখতে পাচ্ছ তো? ...তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে, বাবা দিদি এসেচে? ...চিকের মধ্যে বুঝি?

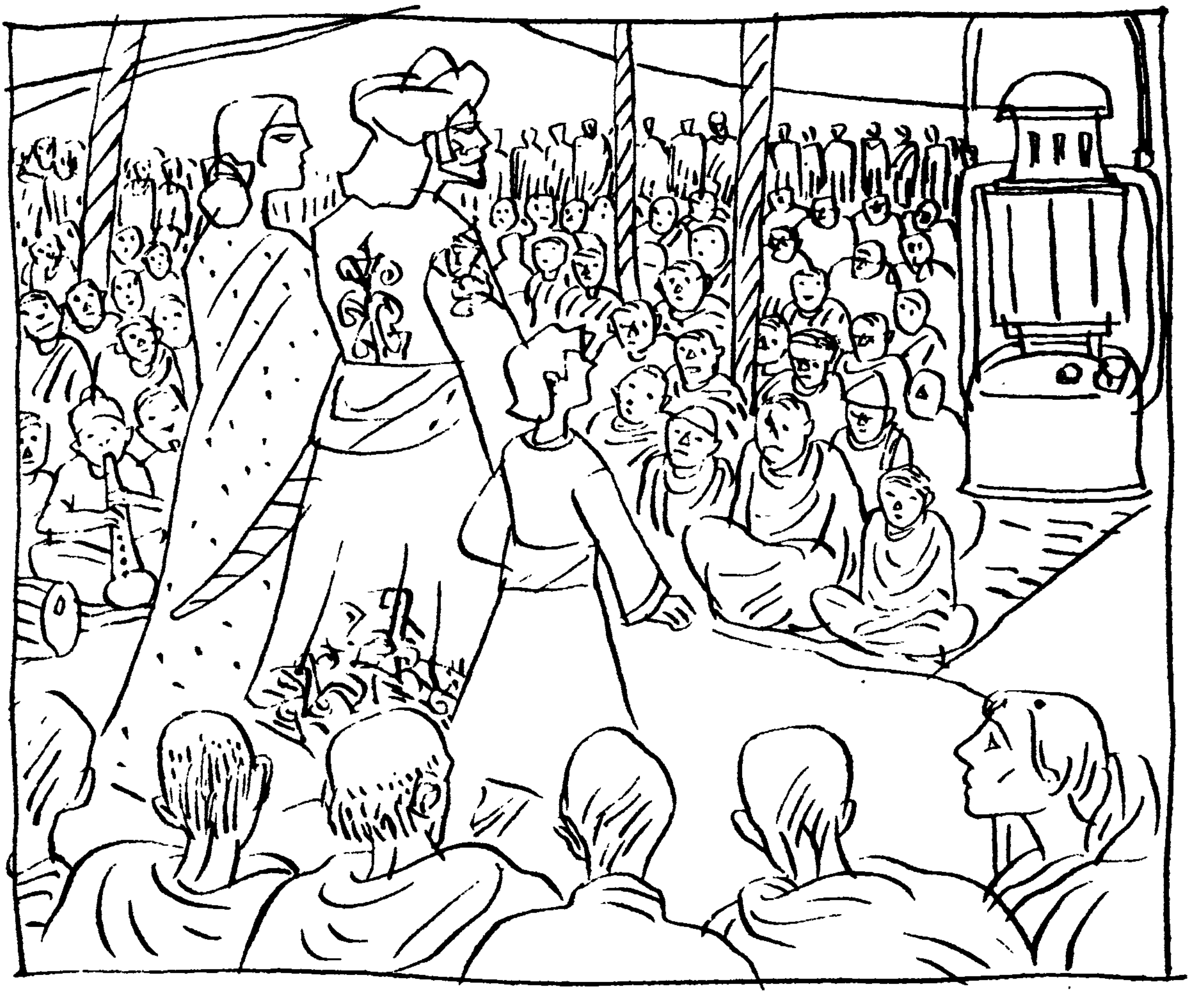

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালার সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্যে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন আর এক-এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোনো বনবাসগমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজসেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনো দেখে নাই!

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রানি? ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ নাই যে তাদের মুখের দিকে চায়, কেহ নাই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোটো ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দুরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বনকান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথিরে—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদে!

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী! যায় বুঝি ঝাড়গুলো গুঁড়ো হইয়া, নয় তো কোনো হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়। রব উঠে—ঝাড় সামলে, ঝাড় সামলে। কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া গেল—ধন্য বিচিত্রকেতু!

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় মজলিস বসে। সেদিন সেখানে নীলকুঠির ভূতের গল্প হইতে শুরু হইয়া পুরীর কোন মন্দিরের মাথায় পাঁচ মন ভারী চুম্বক পাথর বসানো আছে, যাহার আকর্ষণের বলে নিকটবর্তী সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া তীরবর্তী মগ্ন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায়—প্রকৃত আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো নানা আজগুবি কাহিনির বর্ণনা চলিতেছিল। সকলে সাগ্রহে শুনিতেছিলেন, কিন্তু রামময় হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—না ওঠা যাক, এরপর আর যাওয়া যাবে না—দেখচ না কাণ্ডখানা? একটা ঝটকা-টটকা না হলে বাঁচি, গতিক বড়ো খারাপ, চলো সব—

বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবার অমনি জোরে আসে, বৃষ্টির ছাঁটে চারিধারে ধোঁয়া ধোঁয়া।

হরিহর মোটে পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেই অনেকদিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খরচ আসবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস বলে দেখতে পাসনে, ডাকবাকসোটার কাছে বসে থাকবি—পিয়োন যেমন আসবে আর অমনি জিজ্ঞেস করবি—

অপু বলে, বা, আমি বুঝি বসে থাকিনে? কালও তো এল, পুঁটিদের চিটি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—জিজ্ঞেস করে এসো দিকি পুঁটিকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কী করে এল? আমি থাকিনে বই কী!

দুই-একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু হু পুবে হাওয়া, খানাডোবা সব থইথই করিতেছে—পথেঘাটে এক হাঁটু জল, দিন-রাত সোঁ সোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাধে—বাঁশের মাথা লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও ফাঁক নাই—মাঝে মাঝে আগেকার চেয়েও অন্ধকার করিয়া আসে—কালো কালো মেঘের রাশ হু-হু উড়িয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়েছে—দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন কৌশলী সেনানায়কের চালনায় জলস্থল আকাশ, একেবারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈন্য-সৈন্য, বাহিনীর পর বাহিনী অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী, অদৃশ্য রথী-মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে—প্রজ্জ্বলন্ত অত্যুগ্র দেববজ্র আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বিশাল কৃষ্ণচমূর এদিক-ওদিক পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া এই ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে—এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণছায়ায় পৃথিবী অন্তরীক্ষ অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে।

মহাঝড়!

তখনও ভালো করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী গোয়ালে গোরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়কিদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, নতুন বউ! সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল, ন'দি, একবার বটঠাকুরকে ডাকো দিকি। একবার শিগগির আমাদের বাড়িতে আসতে বলো—দুগ্‌গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, দুগ্‌গা! কেন কী হয়েছে দুগ্‌গার?

সর্বজয়া বলিল, কদিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্ছে আবার যাচ্ছে—ম্যালেরিয়া জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশি—তার ওপর কাল রাত্রে কীরকম কাণ্ড তো জানোই—একবার শিগগির বটঠাকুরকে—

তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী বলিলেন, ভয় কী বউ, দাঁড়াও আমি এক্ষুনি ডেকে দিচ্ছি—চলো আমি যাচ্ছি—কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালাখানা পড়ে গেল, বাবা কাল রাত্তিরের মতো কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি—শেষ রাত্রে সব উঠে গোরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কিনা। দাঁড়াও আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমণি মুখজ্যে তাহার বড়ো ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়িতে আসিলেন।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখুজ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কী হয়েছে বাবা অপু?—অপুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কীসব বকছিল জ্যেঠামশাই।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন, দেখি হাতখানা?...জ্বরটা একটু বেশি, আচ্ছা কোনো ভয় নেই—ফণি, তুমি একবার চট করে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে—একবার ডেকে নিয়ে আসবে। পরে তিনি ডাকলেন—দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়াশব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এঃ ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ? জল পড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েছে। তা বউমার লজ্জার কারণই বা কী—আমাদের ওখানে না হয় উঠলেই হত? হরিটারও কাণ্ডজ্ঞান আর হল না এ জীবনে—এই অবস্থায় এইরকম ঘরদোর, সারানোর একটা ব্যবস্থা না করে কী যে করচে, তাও জানিনে—চিরকালটা ওর সমান গেল—

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, ঘর সারাবে কী? খাবার নেই ঘরে, নইলে কি এরকম আতান্তরে ফেলে কী কেউ বিদেশে যায়? আহা রোগা মেয়েটা কাল সারারাত ভিজেচে—একটু গরম জল করতে দাও—ওই জানালাটা খুলে দাও তো ফণি। একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন—দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে, বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই। জ্বর বেশি হইয়াছে, মাথায় নিয়মিতভাবে জলপটি দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখুজ্যে দু-বেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড়বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতে দুর্গার জ্বর আবার বড়ো বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁ চিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভালো করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কী বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, বেলা কত রে?

অপু বলিল, এখনও অনেক আছে—রোদ্দুর উঠেছে আজ দেখচিস, দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রোদ্দুর রয়েচে।

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেকদিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারী আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল, শোন অপু—একটা কথা শোন—

—কীরে দিদি?

পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

—আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?

—দেখাব এখন—তুই সেরে উঠলে বাবাকে বলে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাব রেলগাড়ি করে—

সারাদিন-রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড়বৃষ্টি কোনোকালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে দারুণ শরতের রৌদ্র।

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুজ্যে অনেক দিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত সুর তাঁর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শিগ্‌গির—অপুদের বাড়ির দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্ছে—

ব্যাপার কী দেখতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্বজয়া মেয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে, ও দুগ্‌গা চা দিকি—ওমা ভালো করে চা দিকি—ও দুগ্‌গা—

নীলমণি মুখুজ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কী হয়েচে—সরো সরো সরো দিকি—আহা কীসব বাতাসটা বন্ধ করে দাঁড়াও?

সর্বজয়া ভাসুর সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, কী হল, মেয়ে অমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলে-মেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূর পারে কোন পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড়ো অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনি বলিলেন, ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কী। খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েচে আর অমনি হার্টফেল করে—ঠিক এরকম একটা কেস হয়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

হরিহর বাড়ির চিঠি পায় নাই। জীবিকার সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে সামান্য কিছু সুরাহা হইল। অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরিতেছে, অপুর জন্য পদ্মপুরাণ, দুর্গার জন্য শাড়ি-আলতা ও সংসারের কিছু টুকিটাকি কিনিয়া লইল।

অন্যান্য বার বাড়ি ফিরিলে সর্বজয়া খুশি হয়, ছেলে-মেয়েরা দৌড়াইয়া আসে। আজ তাহা হইল না। সর্বজয়া যেন অতিরিক্ত শান্ত, ছেলে-মেয়েদের দেখা নাই। হরিহর ঘরে ঢুকিতে বলিল, কই অপু, দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েছে?

সর্বজয়া আর কোনোমতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো? মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে—এতদিন কোথায় ছিলে?

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। শীতকাল শেষ হইতে চালিয়াছে।

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল, দেখো তো খোকা, কী বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, খবরের কাগজ? না বাবা?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারি ঘোষের শাশুড়ির নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু-টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল; স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোনোমতেই বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। —হ্যাঁ—খবরের কাগজ বটে। সেই বড়ো বড়ো অক্ষরে, 'বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা, সেই সব—যাহার জন্য বৎসর খানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মতো অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাকসোটার কাছে পিয়োনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবার হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত। খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কীসব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কী অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড়ো বড়ো পাতায়?

একদিন রানি বলিল, তোর খাতায় তুই কী লিখছিসরে?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, কোন খাতায়? তুমি কী করে—

—আমি তোদের বাড়ি সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি? তুই ছিলিনে, খুড়িমার সঙ্গে কতক্ষণ বসে কথা বললাম। কেন, খুড়িমা তোকে বলেনি? তাই দেখলাম তোর বইয়ের দপ্তরে তোর সেই রাঙা খাতাখানায় কীসব লিখছিস—আমার মনে রয়েচে, আর দেবী সিং না কী একটা—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, ও একটা গল্প।

—কী গল্পরে? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রানি একখানা ছোটো বাঁধানো খাতা অপুর হাতে দিয়া বলিল, এতে তুই আমাকে একটা গল্প লিখে দিস—একটা বেশ ভালো দেখে। দিবি তো? অতসী বলছিল তুই ভালো লিখতে পারিস নাকি! লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাব।

অপু রাত্রে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে, আর একটা পলা তেল দাও না মা। এইটুকুই লিখে রাখি আজ। তাহার মা বলে, আজ রাত্তিরে আর পড়ো না—মোটে দু-পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধব কী দিয়ে। এইখানে রাঁধছি, এই আলোতে বসে পড়ো। অপু ঝগড়া করে। মা বলে, এঃ ছেলের রাত্তিরে যত লেখাপড়ার চাড়—সারাদিন চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই। সকালে করিস কী? যা, তেল দেব না।

চার-পাঁচদিন পরে সে রানির হাতে খাতা ফিরাইয়া দিল। রানি আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল, লিখেছিস?

অপু হাসি হাসি মুখে বলিল, দেখো না খুলে।

রানি দেখিয়া খুশির সুরে বলিল, ওঃ অনেক লিখেচিস যে রে। দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই।

অতসী দেখিয়া বলিল, অপু লিখেচে না আর কিছু—ইস! এসব বই দেখে লেখা।

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল, ইঃ, বই দেখে, বই? আমি তো গল্প বানাই—পটুকে জিজ্ঞেস করো অতসীদি। ওকে বিকেলে গাঙের ধারে বসে বসে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

রানি বলিল, না ভাই, ও লিখেছে আমি জানি। ও ওইরকম লিখে যাত্রার পালা লিখেছিল খাতায়, আমায় পড়ে শোনালে। পরে অপুকে বলিল, নাম লিখে দিসনি তোর? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন। 'সচিত্র যৌবনে-যোগিনী' নাটকের ধরনে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কীরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই; দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলেও রানুদি— বিশেষ করিয়া অতসীদি তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতে ফেরত দিয়াছে।

মাসখানেক পরে একদিন মাছ ধরিতে গিয়া একটা বড়ো সরপুঁটি মাছ কী করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

লোভ পাইয়া সে জায়গাটা আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

ক্রমে বেলা যায়; নদীর ধারের মাঠে আবার সেই অপূর্ব নীরবতা, ওপরের দেয়াড়ির মাঠের পরে সুদূরপ্রসারী সবুজ উলুবনে কাশঝোপে, কদম-শিমুল গাছের মাথায় আবার তাহার শৈশব পুলকের শুভমুহূর্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথি—বৈকালের মিলাইয়া যাওয়া শেষ রোদ।

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিলখিল করিয়া সামনে আসিয়া বলিল, তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনি অপুদা; তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধরতে এইছিস, তাই এলাম। মাছ হয়নি?...একটাও না? চল বরং একখানা নৌকো খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি?

কদমতলায় সায়েবের ঘাটে অনেক দূরদেশ হইতে নৌকো আসে, দুজনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাকে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠান্ডা আর্দ্র গন্ধ উঠিতেছে, কলমি শাকের দামে জলটিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে ধারে চাষিরা পটল খেতে নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চাল-পোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাংশালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পুব আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল, অপুদা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের! অপু বলিল, সেটা নয়। বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি খুব ভালো গানের। সেইটে গাইব, আর এট্টু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েচে—এখানে না।

—তুই ভারী লাজুক অপুদা! কোথায় লোক রয়েচে কতদূরে, আর তোর গান গাইতে—ধর, ধর সেইটে!

খানিকটা গিয়া অপু গান শুরু করে। হঠাৎ পটু ঈশান কোণের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, ও অপুদা কীরকম মেঘ উঠেছে দেখেচিস, এখুনি ঝড় এল বলে—নৌকো ফেরাবি?

অপু বলিল, হোকগে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে, গান গাইতে লাগে ভালো, চল আরও যাই।

দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া, দোলাইয়া, ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

পটু বলিল, বড্ড মুখোর বাতাস অপুদা। আর নৌকা যাবে না। কিন্তু যদি উলটে যায়? ভাগ্যিস সুনীলকে সঙ্গে করে আনিনি।

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায়নি, সে জাগিয়াছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া মায়ের সঙ্গে বাবার যেসব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এদেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এদেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা আগ্রহ প্রকাশ করিল, সেসব সোনার দেশে কখনো কাহারো অভাব নাই—দুঃখ এদেশে বারো মাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পারিলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই, শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড়ো তক্তপোশ, সিন্দুক, পিঁড়ি, ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তা দরে কিনিয়া লইয়া গেল।

রানি কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ি আসিল। অপুকে বলিল, হাঁরে অপু তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল, সত্যি রানুদি, জিজ্ঞেস করো মাকে—

তবুও রানি বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রানি অবাক হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠোনে ডাকিয়া বলিল, কবে যাবি রে?

—সামনের বুধবারের পরের বুধবারে।

—আসবিনে আর কখনো? রানির চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল; তুই যে বলিস নিশ্চিন্দপুর আমাদের বড়ো ভালো গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কী করে?

অপু বলিল, আমি কী করব, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা। বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাব রানুদি। বড়ো হল হয়তো আবার দেখা হবে। রানি বলিল, আমার খাতাতে গল্পটাও শেষ করে দিলিনে, খাতায় নাম সইও করে দিলিনে, তুই বেশ ছেলে তো অপু।

চোখের জল চাপিয়া রানি দ্রুতপদে বাটির বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রানুদি মিছামিছি কেন রাগ করে। সে কি নিজের ইচ্ছাতেই দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কথা হইল। পটু কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল, তোর জন্যে নিজে জলে নেবে কত কষ্টে শ্যাওলা সরিয়ে ফুট কাটলাম, একদিন মাছ ধরবিনে তাতে?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

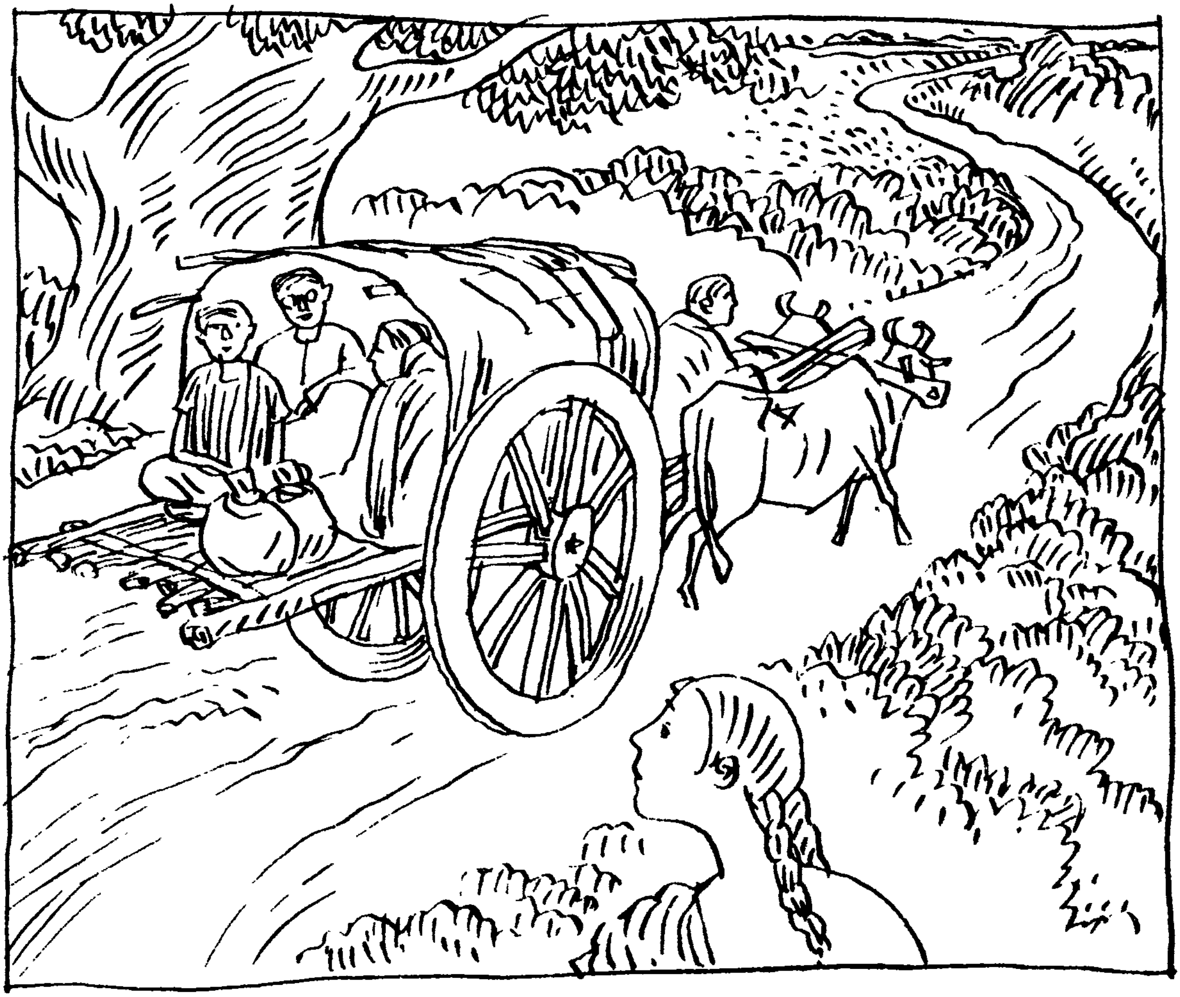

পরদিন দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হিরু গাড়োয়ানের গোরুর গাড়ি রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে, কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ প্রচুর বৈশাখী মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছপালার পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ির পেছনে পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল বলিল, অপুদা, এবার বারোয়ারিতে ভালো যাত্রাদলের বায়না হয়েছে, তুই শুনতে পেলিনে এবার। অপু বলিল, তুই পালার কাগজ একখানা বেশি করে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি—

আবার সে চড়কের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্নস্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইতেছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে।

গ্রামের শেষ বাড়ি হইতেই আতুরি বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড়ো খেজুর বাগানের পাশ দিয়া গাড়ি গিয়া একেবারে আষাঢু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা!

ক্রমে রৌদ্র পড়িল—গাড়ি তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে দিয়া যাইতেছিল। হরিহর মাঠের মধ্যেই একটা বড়ো বটগাছ দেখাইয়া কহিল, এই দেখো ঠাকুরঝি পুকুরের ঠ্যাঙাড়ে বট গাছ। সর্বজয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিল। পথ হইতে অল্প দূরেই একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বট গাছটা চারিধারে ঝুরি গাড়িয়া বসিয়া আছে।

হরিহর দূরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ওই হল ধঞ্চে পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে—ওইখানে বনবিবির দরগাতলায় শ্রাবণ মাসে বারী মেলা হয়, এমন সস্তা কুমড়ো আর কোথাও মেলে না।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু গাড়ি দেখিবার জন্যে প্লাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসিও লোকজনকে হটাইয়া দিতেছিল।

কত বড়ো ট্রেনখানা! কী ভয়ানক শব্দ! হবিবপুরের বউটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল।

গাড়িতে হইহই করিয়া মোটঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ির মেঝেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখান, জানালা দরজা সব হুবহু! এই ভারী গাড়িখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কী জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ি আর চলিবে না। তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একঝোলা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ি চড়িল না সে থাকিবে কী করিয়া? হিরু গাড়োয়ান ফটকে দাঁড়াইয়া গাড়ির দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ি চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব দুলনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়ার স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ করিয়া দাঁড়ইয়া থাকা হিরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ি বাইরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছগুলো সট সট করিয়া দু-দিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ি! উঃ মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে। ঝোপঝাড়, গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি ছোটখাটো চাষিদের সব রব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ির তলায় জাঁতা পেশার মতো একটানা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কী শব্দ!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে।

অনেকদিন আগের সে দিনটা।

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে খুঁজিতে মাঠ জল ভাঙিয়া উর্ধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল। সেদিন—আর আজ?

ওই যেখানের আকাশের তলে আষাঢ়-দুর্গাপুরের সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিক যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া নোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে।...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথেঘাটে বাঁশবনে আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ির গৃহকোণে—আজ কিন্তু সত্য সত্যই দিদির সহিত চিরকালের জন্য ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!...

তাহার যেন মনে হয়, দিদিকে আর কেহ ভালোবাসিত না, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল! তাহা দুঃখ নয় শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কী সে জানে না। কত কী মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে...আতুরি ডাইনি...নদীর ঘাট...তাহাদের কোঠাবাড়িটা, চালতেতলার পথ...রানুদি...কত বৈকালে কত দুপরে...কতদিনের কত হাসিখেলা... পটু...দিদির মুখ—দিদির কত না-মেটা সাধ...

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে...

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল—আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে।

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু তখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকে, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জ বেষ্টিত কোনো পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল-সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া দেখিতে পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মতো মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এইসব সময়েই তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কঠোর অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ের কথা—অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগ্‌ন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

কাশী যাইবার পর বৎসর মাঘ মাসে হরিহর জ্বরে পড়িল! সামান্য জ্বর। দেখিতে দেখিতে অসুখ ঘোরাল হইয়া উঠিল। হাতের টাকা পয়সা দেখিতে দেখিতে খরচ হইয়া গেল। দোতলার নন্দবাবু সাহায্য না করিলে সর্বজয়াকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু এত করিয়াও কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন ঘোর শীতের রাত্রে হরিহর মারা গেল।

সর্বজয়া অথৈ জলে পড়িল। দেখিবার কেউ নাই। খাইবার সংস্থান নাই—অপুর নিষ্পাপ সরল মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার বুক কী এক আশংকায় সংকুচিত হইয়া আসে। এমন বিপদে সে আর কখনো পড়ে নাই। কাহার উপর সে ভরসা করিবে?

মাসখানেক পরে কেদার ঘাটের এক ভদ্রলোক তাঁহার পরিচিত এক ধনী পরিবারের কাজের জন্য একজন ব্রাহ্মণকন্যার খোঁজ করিতেছিলেন। সর্বজয়ার সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহাদেরই সেখানে পাঠাইতে রাজি হইলেন। সর্বজয়া অকুল সমুদ্রে কূল পাইয়া গেল।

সর্বজয়া রাঁধুনি হিসাবে কাজে ভরতি হইল। এত বড়ো কাণ্ডকারখানা সে পূর্বে কখনো দেখে নাই। দুই বেলায় তিন সের তেলের খরচ। তাহার সংসারের অভিজ্ঞতা লইয়া সে অবাক হয়।

অপু সুখে-দুঃখে মানুষ হইতে লাগিল। রাঁধুনির ছেলে বলিয়া কেহ তাহাকে খুব একটা আমল দেয় না, কেবল মেজো বউরানির মেয়ে লীলার সহিত তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। সে তাহাকে ছবির বই দেখাইত, নিজের দুধ হইতে ভাগ দিত—তাহাদের ঘরে আসিয়া গল্প করিত। প্রায় সমবয়সী দুইজনের ভিতর কোনো বাধার প্রাচীর ছিল না। অপুর মতোই লীলাও বই পড়িতে খুব ভালোবাসে। অপু লেখে শুনিয়া লীলা তাহাকে একটা ঝরনা কলম একেবারে দিয়া দিল। অপু ভারী খুশি হইল। মেজো বউরানি কলিকাতায় থাকেন। কিছুদিন পরে লীলা কলিকাতায় চলিয়া গেল।

নিশ্চিন্দিপুরের জন্য অপুর প্রাণ কেমন করে।—এখানে আর থাকিতে ইচ্ছা করে না। তাহার ভিটায় এতদিন বুঝি জঙ্গল গজাইয়া গেল। এমন সুন্দর পাখি-ডাকা মায়াময় বৈকালগুলি কি বৃথাই বহিয়া যাইবে? কোনোদিন কি তারা নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিবে না?

সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর, আমাকে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়ে দাও। আর কিছু আমি চাইনে।

সেদিন সে স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের ঘরটাতে ঢুকিতেই তাহার মা বলিল, অপু, আগে খাবার খেয়ে নে। আজ একখানা চিঠি এসেছে, দেখাচ্ছি।

অপু বিস্মিতমুখে বলিল, চিঠি? কোথায়? কে দিয়েছে মা?

কাশীতে তাহার বাবার মৃত্যুর পর হইতে এপর্যন্ত আজ আড়াই বৎসরের উপর এবাড়িতে তাহারা আসিয়াছে, কই কেউ তো একখানা পোস্টকার্ডে একছত্র লিখিয়া তাহাদের খোঁজ করে নাই? লোকের যে পত্র আসে একথা তাহারা তো ভুলিয়াই গিয়াছে।

সে বলিল, কই দেখি?

পত্র—তা আবার খামে। খামটার উপর মায়ের নাম লেখা। সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খাম হইতে বাহির করিয়া অধীর আগ্রহের সহিত সেখানাকে পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ করিয়া বুঝিতে না পারার দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ভবতারণ চক্রবর্তী কে মা?—পরে পত্রের উপরকার ঠিকানাটা আর একবার দেখিয়া বলিল, কাশী থেকে লিখেচে?

সর্বজয়া বলিল, তুই তো ওঁকে নিশ্চিন্দপুরে দেখেচিস। সেই সেবার গেলেন, দুগ্‌গাকে পুতুলের বাকসো কিনে দিয়ে গেলেন, তুই তখন সাত বছরের মনে নেই তোর? তিনদিন ছিলেন আমাদের বাড়ি।

—জানি মা, দিদি বলত তোমার জ্যাঠামশায় হন—না? তা এতদিন তো আর কোনো—

—আপন নয়, দুর সম্পর্কের। জ্যাঠামশায় তো দেশে বড়ো একটা থাকতেন না, কাশী-গয়া ঠাকুর দেবতার জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। এখনও বেড়ান। ওঁদের দেশ হচ্ছে মনসাপোতা, আড়ংঘাটার কাছে। সেখান থেকে ক্রোশ দুই— সেবার আড়ংঘাটার যুগল দেখতে গিয়ে ওঁদের বাড়ি গিয়াছিলাম দু-দিন। বাড়িতে মেয়ে-জামাই থাকত। সে মেয়ে-জামাই তো লিখেচেন মারা গিয়েছে—ছেলেপিলে কাবুর নেই—

অপু বলিল, হ্যাঁ, তাই তো লিখচেন। নিশ্চিন্দপুরে গিয়ে আমাদের খোঁজ করেচেন। সেখানে শুনেচেন

কাশী গিইচি তারপর কাশীতে গিয়ে আমাদের সব খবর জেনেচেন। এখানকার ঠিকানা নিয়েচেন বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল, আমি দুপুরবেলা খেয়ে একটু গড়াই। খেমি ঝি বললে, তোমার একখানা চিঠি আছে। হাতে নিয়ে দেখি আমার নাম—আমি তো অবাক হয়ে গেলাম—তারপর খুলে পড়ে দেখি এই—নিতে আসবেন লিখেচেন শিগ্‌গির। দেখ দিকি কবে আসবেন লেখা আছে কিছু?

অপু বলিল, বেশ হয়, না মা? এদের এখানে একদণ্ডও ভালো লাগে না। তোমার খাটুনিটা কমে—সেই সকালে উঠে রান্নাবাড়ি ঢোকা, আর দুটো তিনটে—

ব্যাপারটা এখনও সর্বজয়া বিশ্বাস করে নাই। আবার গৃহ মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে, নিজের মনোমতো ঘর গড়া চলিবে। বড়োলোকের বাড়ির এ রাঁধুনিবৃত্তি—এ ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার কি এতদিনে—বিশ্বাস হয় না, অদৃষ্ট তেমন নয় বলিয়া ভয় করে!

দুপুরের পর সে মায়ের পাতে ভাত খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় দুয়ারের সামনে কাহার ছায়া পড়িল। চাহিয়া দেখিয়া সে ভাতের গ্রাস আর মুখে তুলিতে পারিল না।

লীলা।

পরক্ষণেই লীলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল; কিন্তু অপুর দিকে চাহিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। অপুকে যেন আর চেনা যায় না—সে তো দেখিতে বরাবরই সুন্দর, কিন্তু এই দেড় বৎসর কী হইয়া উঠিয়াছে সে? কী গায়ের রং, কী মুখের শ্রী, কী সুন্দর স্বপ্ন-মাখা চোখ দুটি! লীলার যেন একটু লজ্জা হইল। বলিল, উঃ! আগের চেয়ে মাথাতে কত বড়ো হয়ে গিয়েচ।

লীলা তক্তপোশের কোণে বসিয়া পড়িল। বলিল, আমি আমার কথা কিছু বলব না আগে—আগে তোমার কথা বলো। তোমার মা ভালো আছেন? তুমিও তো পড়ো—না?

—আমি এবারে মাইনোর ক্লাসে উঠব—পরে একটু গর্বিত মুখে বলিল, আর বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেচি, প্রাইজ দিয়েচে!

লীলা অপুর দিকে চাহিল। বেলা তিনটার কম নয়। এত বেলায় সে খাইতে বসিয়াছে? বিস্ময়ের সুরে বলিল, এখন খেতে বসেচ, এত বেলায়?

অপুর লজ্জা হইল। সে সকালে সরকারদের ঘরে বসিয়া খাইয়া স্কুলে যায়—শুধু ভাত ডাল, তাও শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর বেগার-শোধ ভাবে দিয়া যায়, খাইয়া পেট ভরে না, স্কুলেই ক্ষুধা পায়, সেখান হইতে ফিরিয়া মায়ের পাতে ভাত ঢাকা থাকে, বৈকালে তাহাই খায়। আর ছুটির দিন বলিয়া সকালেই মায়ের পাতে খাইতে বসিয়াছে।

অপু ভালো করিয়া উত্তর দিতে পারিল না বটে, কিন্তু লীলা ব্যাপারটা কতক না বুঝিল এমন নহে। ঘরের হীন আসবাবপত্র, অপুর হীন বেশ—অবেলায় নিরুপকরণ দুটি ভাত সাগ্রহে খাওয়া—লীলার কেমন যেন মনে বড়ো বিঁধিল। সে কোনো কথা বলিল না।

অপু বলিল, তোমার সব বই এনেচ এখানে? দেখাতে হবে আমাকে। ভালো গল্প কি ছবির বই নেই?

লীলা বলিল, তোমার জন্যে কিনে এনেচি আসবার সময়। তুমি গল্পের বই ভালোবাসো বলে একখানা 'সাগরের কথা' এনেচি, আরও দু-তিনখানা এনেচি। আনচি, তুমি খেয়ে ওঠো।

একটু পরে লীলা অনেক বই আনিল। অপুর মনে হইল, লীলা কেমন করিয়া তাহার মনের কথাটি

জানিয়া সে যাহা পড়িতে জানিতে ভালোবাসে সেই ধরনের বইগুলি আনিয়াছে। 'সাগরের কথা' বইখানিতে অদ্ভুত গল্প। সাগরের তলায় বড়ো বড়ো পাহাড় আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, প্রবাল নামক এক প্রকার প্রাণী আছে, দেখিতে গাছপালার মতো—কোথায় এক মহাদেশ নাকি সমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া আছে—এইসব।

এতক্ষণ পরে অপুর মনে পড়িল লীলা স্কুলে পড়ে, কোন ক্লাসে পড়ে সেকথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বলিল, তোমাদের কী ইস্কুল? এবার কোন ক্লাসে পড়চ?

—এবার মাইনর সেকেন্ড ক্লাসে উঠেচি—গিরীন্দ্রমোহিনী গার্লস স্কুল, আমাদের বাড়ির পাশেই—

অপু বলিল, জিজ্ঞেস করব?

লীলা হাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

অপু বলিল, আচ্ছা বলো—চট্টগ্রাম কর্ণফুলির মোহনায়—কী ইংরেজি হবে?

লীলা ভাবিয়া বলিল, চিট্টাগং ইজ অন দি মাউথ অফ দি কর্ণফুলি।

অপু বলিল, কজন মাস্টার তোমাদের সেখানে?

—আটজন, হেড মিস্ট্রেস এন্ট্রান্স পাশ, আমাদের গ্রামার পড়ান। পরে সে বলিল, মা'র সঙ্গে দেখা করবে না?

—এখন যাব, না একটু পরে যাব। বিকেলে যাব এখন, সেই ভালো।—তাহার পরে সে একটু থামিয়া বলিল, তুমি শোনোনি লীলা, আমরা যে এখান থেকে চলে যাচ্চি।

লীলা আশ্চর্য হইয়া অপুর দিকে চাহিল। বলিল, কোথায়?

—আমার এক দাদামশাই আছেন, তিনি এতদিন পরে আমাদের খোঁজ পেয়ে তাঁদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেচেন।

অপু সংক্ষেপে সব বলিল।

লীলা বলিয়া উঠিল, চলে যাবে? বাঃ রে!

হয়তো সে কী আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, যাওয়া না-যাওয়ার উপর অপুর তো কোনো হাত নেই, কোনো কথাই এক্ষেত্রে বলা চলিতে পারে না।

খানিকক্ষণ কেহই কথা বলিল না।

বৈকালে সর্বজয়ার জ্যাঠামশাই ভবতারণ চক্রবর্তী আসিলেন। অপুকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ঠিক করিলেন, দুই দিন পরে পরের বুধবারের দিন লইয়া যাইবেন।

সকালের রৌদ্র ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উলা স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে মনসাপোতা যাইবার সুবিধা। ভবতারণ চক্রবর্তী পূর্ব হইতেই পত্র দিয়া গোরুর গাড়ি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাল রাত্রে একটু কষ্ট হইয়াছিল। এক্সপ্রেস ট্রেনখানা দেরিতে পৌঁছানোর জন্য ব্যান্ডেল হইতে নৈহাটির গাড়িখানা পাওয়া যায় নাই। ফলে বেশি রাত্রে নৈহাটিতে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সারারাত্রি জাগরণের ফলে অপু কখন ঘুমাইয়াছিল সে জানে না। চক্রবর্তী মহাশয়ের ডাকে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল একটা স্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ি লাগিয়াছে। সেখানেই তাদের নামিতে হইবে। কুলিরা ইতিমধ্যে তাহাদের কিছু জিনিসপত্র নামাইয়াছে।

গোরুর গাড়িতে উঠিয়া চক্রবর্তী মহাশয় অনবরত তামাক টানিতে লাগিলেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইবে, একহারা পাতলা চেহারা মুখে দাড়িগোঁফ নাই, মাথায় চুল পাকা। বলিলেন, জয়া, ঘুম পাচ্ছে না তো?

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল, আমি তো নৈহাটিতে ঘুমিয়ে নিইচি আধঘণ্টা, অপুও ঘুমিয়েচে। আপনারই ঘুম হয়নি—

আরও খানিক গিয়া গাড়ি দাঁড়াইল। ছোটো উঠানের সামনে একখানি মাঝারি গোছের চালাঘর, দুখানা ছোট্ট দোচালা ঘর, উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ও একপাশে একটা পাতকুয়া। বাড়ির পিছনে এটা তেঁতুল গাছ—তাহার ডালপালা বড়ো চালাঘরখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সামনে উঠানটা বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা। চক্রবর্তী মহাশয় গাড়ি হইতে নামিলেন। অপু মাকে হাত ধরিয়া নামাইল।

চক্রবর্তী মহাশয় আসিবার সময় যে তেলিবাড়ির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈকালের দিকে তাদের বাড়ির সকলে দেখিতে আসিল। তেলিগিন্নি খুব মোটা, রং বেজায় কালো। সঙ্গে চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে, দুটি পুত্রবধূ। প্রায় সকলেরই হাতে মোটা মোটা সোনার অনন্ত দেখিয়া সর্বজয়ার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল, ঘরের ভিতর হইতে দুখানা কুশাসন বাহির করিয়া আনিয়া সলজ্জ ভাবে বলিল, আসুন আসুন, বসুন।

তেলিগিন্নি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলে ছেলে-মেয়ে ও পুত্রবধূরাও দেখাদেখি তাহাই করিল। তেলিগিন্নি হাসিমুখে বলিল, দুপুরবেলা এলেন মা-ঠাকরুন, একবার বলি যাই। এই যে পাশেই বাড়ি, তা আসতে পেলাম না। মেজোছেলে এল গোয়াড়ি থেকে—গোয়াড়িতে দোকান আছে কিনা। মেজো বউমার মেয়েটা ন্যাওটো, মা দেখতে ফুরসত পায় না, দুপুরবেলা আমাকে একেবারে পেয়ে বসে—ঘুম পাড়াতে বেলা দুটো। ঘুংরি কাশি, গুপি কবরেজ বলেছে ময়ূরপুচ্ছ পুড়িয়ে মধু দিয়ে খাওয়াতে। তাই কি সোজাসুজি পুড়ুলে হবে মা, চৌষট্টি ফইজত—কাঁসার ঘটির মধ্যে পোরা, তা ঘুঁটের জাল করো, তা ধিমে আঁচে চড়াও—হ্যাঁরে হাজিরা, ভোঁদা গোয়াড়ি থেকে কাল মধু এনেছে কি না জানিস?

এইসময় অপু বাড়ির উঠানে ঢুকিল. সে আসিয়াই গ্রামখানা বেড়াইয়া দেখিতে বাহিরে গিয়াছিল। তেলিগিন্নি বলিল, কে মা ঠাকুরুন? ছেলে বুঝি? এই এক ছেলে? বাঃ চেহারা যেন রাজপুত্তর।

অপু পাশ কাটাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেছিল, তাহার মা বলিল, দাঁড়া না এখানে। ভারী লাজুক ছেলে মা—এখন ওইটুকুতে দাঁড়িয়েছে—আর এক মেয়ে ছিল, তা—সর্বজয়ার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। গিন্নি ও বড়ো পুত্রবধূ একসঙ্গে বলিল, নেই, হ্যাঁ মা?

ছোটোবউ বলিল, কত বয়সে গেল মা?

—এই তেরোয় পড়েই—ভাদ্রমাসে তেরোয় পড়ল, আশ্বিন মাসের ৭ই—দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেল।

তেলিগিন্নি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, আহা মা, তা কী করবে বলো, সংসারে থাকতে গেলে সবই...

সকলের তাগিদে শিগ্রই অপু পূজার কাজ আরম্ভ করিল—দুটি-একটি করিয়া কাজকর্ম আরম্ভ হইতে হইতে ক্রমে এপাড়ায় ওপাড়ায় অনেক বাড়ি হইতে লক্ষ্মীপূজায় মহাকালপূজায় তাহার ডাক আসে। অপু মহা উৎসাহে প্রাতঃস্নান করিয়া উপনয়নের চেলির কাপড় পরিয়া নিজের টিনের বাকসের বাংলা নিত্যকর্ম পদ্ধতিখানা হাতে লইয়া পূজা করিতে যায়।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপু একদিন মাকে বলিল যে, সে স্কুলে পড়িতে যাইবে।

সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোন ইস্কুলে রে?

—কেন, এই তো আড়বোয়ালেতে বেশ ইস্কুল রয়েচে।

—সে তো এখান থেকে আসতে চার ক্রোশ পথ। সেখেনে যাবি হেঁটে পড়তে?

দুই-একদিনের মধ্যে সে মায়ের কাছে কথাটা আবার তুলিল। এইবার শুধু তোলা নয়, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল। আড়বোয়ালের স্কুল দুই ক্রোশ দূরে, তাই কী! সে খুব হাঁটিতে পারিবে এটুকু। সে বুঝি চিরকাল এইরকম চাষা গাঁয়ে বসিয়া বসিয়া ঠাকুর পূজা করিবে? বাহিরে যাইতে পারিবে না বুঝি!

তবু আরও দুই মাস কাটিল। স্কুলের পড়াশোনা সর্বজয়া বোঝে না, সে যাহা বোঝে তাহা পাইয়াছে। তবে আবার ইস্কুলে পড়িয়া কী লাভ? বেশ তো সংসার গুছাইয়া উঠিতেছে। আর বছর কয়েক পরে ছেলের বিবাহ—তারপরই একঘর মানুষের মতো মানুষ।

সর্বজয়ার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু অপুর তাহা হয় নাই। তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না—শ্রাবণের প্রথমে সে আড়বোয়ালের মাইনর স্কুলে ভরতি হইয়া যাতায়াত শুরু করিল।

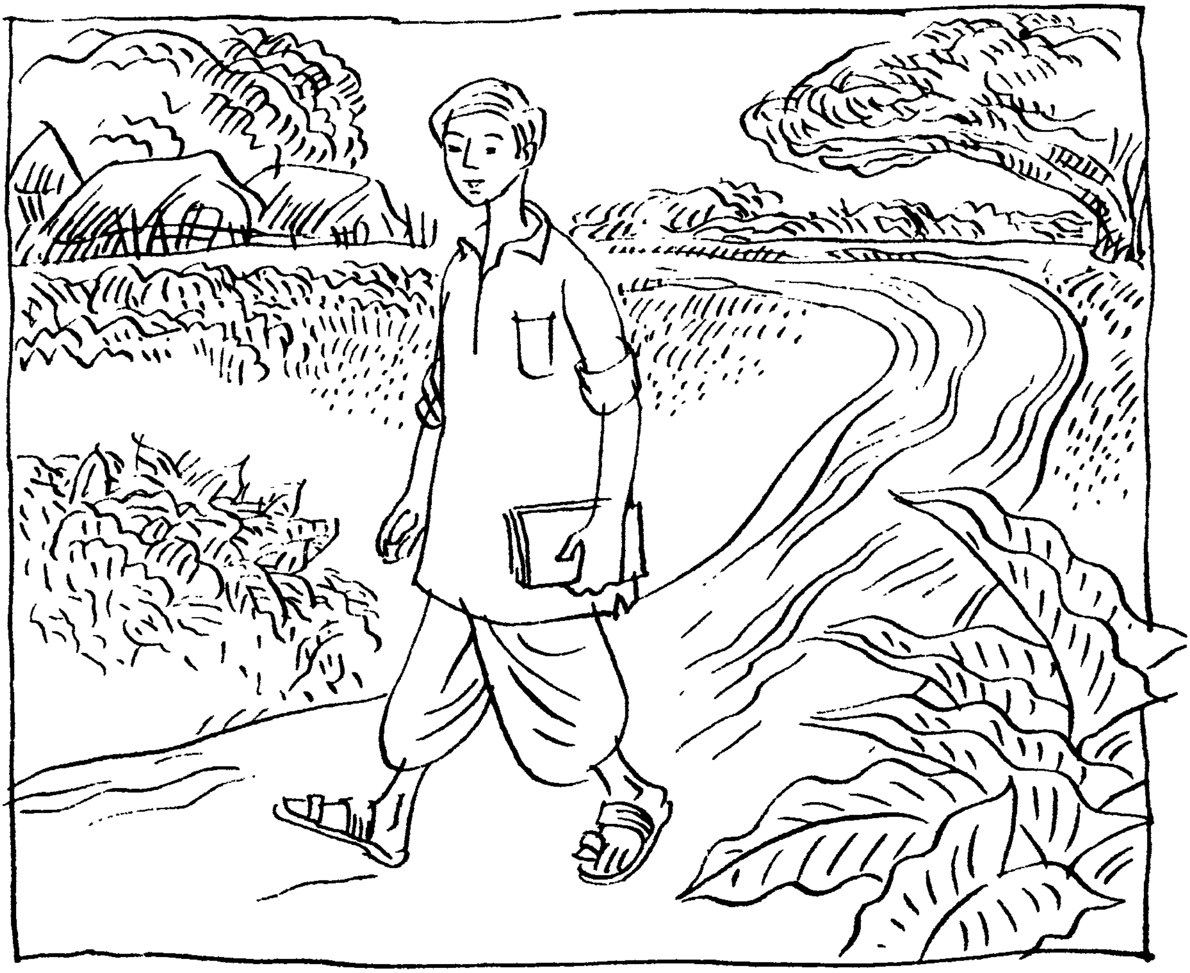

এই পথের কথা সে জীবনে কোনোদিন ভোলে নাই—এই একটি বৎসর ধরিয়া কী অপরূপ আনন্দ পাইয়াছিল—প্রতিদিন সকালে-বিকেলে এই পথ হাঁটিবার সময়টাতে।...নিশ্চিন্দপুর ছাড়িয়া অবধি এত আনন্দ আর হয় নাই। সেদিন সে স্কুলে গিয়া দেখিল স্কুলসুদ্ধ লোক বেজায় সন্ত্রস্ত। মাস্টাররা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন। স্কুলঘর গাঁদা ফুলের মালা দিয়া সাজানো হইতেছে, তৃতীয় পণ্ডিতমহাশয় খামোকা একটা সুবৃহৎ সিঁড়িভাঙা ভগ্নাংশ করিয়া নিজের বোর্ড পুরাইয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ আজ স্কুলঘরের বারান্দা ও কম্পাউন্ড এত সাফ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, যাহারা বারো মাস এস্থানের সহিত পরিচিত, তাহাদের বিস্মিত হইবার কথা।

অপু শুনিল একটার সময় ইন্সপেক্টর আসিবেন স্কুল দেখিতে। ইন্সপেক্টর আসিলে, কী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তৃতীয় পণ্ডিতমহাশয় ক্লাসের ছেলেদের সে বিষয়ে তালিম দিতে লাগিলেন।

বারোটার কিছু পূর্বে একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া স্কুলের সামনে থামিল। হেডমাস্টার তখনও ফাইল দুরস্ত শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই বোধ হয়—তিনি এত সকালে ইন্সপেক্টর আসিয়া পড়াটা প্রত্যাশা করেন নাই, জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গাড়ি দেখিতে পাইয়াই উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটিলেন। তৃতীয় পণ্ডিতমহাশয় হঠাৎ তড়িৎপৃষ্ঠ ভেকের মতো সজীব হইয়া উঠিয়া তারস্বরে ও মহা উৎসাহে (অন্যদিন এই সময়টাই তিনি ক্লাসে বসিয়া মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাটুকু উপভোগ করিয়া থাকেন) দ্রব পদার্থ কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। পাশের ঘরে সেকেন্ড পন্ডিতমহাশয়ের হুঁকোর শব্দ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল। শিক্ষক বলিলেন, মতি তোমরা অবশ্যই কমলালেবু দেখিয়াছ, পৃথিবীর আকার—এই হরেন,—কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার—

হেডমাস্টারের পিছনে পিছনে ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিলেন। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর হইবে, বেঁটে, গৌরবর্ণ, সাটিন জিনের লম্বা কোট গায়ে, সিল্কের চাদর গলায়, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতা, চোখে চশমা। গলার স্বর ভারী! প্রথমে তিনি অফিসঘরে ঢুকিয়া খাতাপত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখার পরে বাহির হইয়া হেডমাস্টারের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে আসিবার পালা। তৃতীয় পন্ডিতমহাশয় গলার সুর আর এক গ্রাম চড়াইলেন।

ইন্সপেক্টর এক-এক করিয়া বাংলা রিডিং পড়িতে বলিলেন। পড়িতে উঠিয়াই অপুর গলা কাঁপিতে লাগিল। শেষের দিকে তাহার পড়া বেশ ভালো হইতেছে বলিয়া তাহার নিজেরই কানে ঠেকিল। পরিষ্কার সতেজ বাঁশির মতো গলা৷ রিনরিনে মিষ্টি।

—বেশ, বেশ রিডিং। কী নাম তোমার?

তিনি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তারপর সবগুলি ক্লাস একে একে ঘুরিয়া আসিয়া অফিসঘরে ডাব ও সন্দেশ খাইলেন। তৃতীয় পন্ডিতমহাশয় অপুকে বলিলেন, তুই হাতে করে এই ছুটির দরখাস্তটা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, তোকে খুব পছন্দ করেছেন, যেমন বাইরে আসবেন, অমনি দরখাস্তখানা হাতে দিবি—দু-দিন ছুটি চাইবি—তোর কথায় হয়ে যাবে—এগিয়ে যা।

ইন্সপেক্টর চলিয়া গেলেন। তাহার গাড়ি কিছুদূর যাইতে না যাইতে ছেলেরা সমস্বরে কলরব

করিতে করিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হেডমাস্টার ফণীবাবু অপুকে বলিলেন, ইন্সপেক্টরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন তোমার ওপর। বোর্ডের এগ্‌জামিন দেওয়াব তোমাকে দিয়ে—তৈরি হও, বুঝলে?

মাস কয়েক কাটিয়া গেল। সকালবেলা স্কুলের ভাত চাহিতে গিয়া অপু দেখিল রান্না চড়ানো হয় নাই। সর্বজয়া বলিল, আজ যে, কুলুইচণ্ডী পুজো—আজ স্কুলে যাবি কী করে!...ওরা বলে গিয়েচে ওদের পুজোটা সেরে দেওয়ার জন্যে—পুজোবারে কি আর স্কুলে যেতে পারবি? বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই বই কী? আমি পুজো করতে গিয়ে স্কুল কামাই করি আর কি! আমি ওসব পারব না, পুজোটুজো আমি আর করব কী করে? রোজই তো পুজো লেগে থাকবে আর আমি বুঝি রোজ রোজ—তুমি ভাত নিয়ে এসো, আমি ওসব শুনছিনে—

—লক্ষ্মী বাবা আমার। আচ্ছা আজকের দিনটা পুজোটা সেরে নে। ওরা বলে গিয়েছে ওপাড়াসুদ্ধ পুজো হবে। চাল পাওয়া যাবে এক ধামার কম নয়, মানিক আমার কথা শোনো, শুনতে হয়।

অপু কোনোমতেই কথা শুনিল না। অবশেষে না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। সর্বজয়া ভাবে নাই যে, ছেলে সত্যসত্যই তাহার কথা ঠেলিয়া না খাইয়া স্কুলে চলিয়া যাইবে। যখন সত্যই বুঝিতে পারিল তখন তাহার চোখের জল বাধা মানিল না। ইহা সে আশা করে নাই।

অপু স্কুলে পৌঁছিতেই হেডমাস্টার ফণীবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাক দিলেন। ফণীবাবুর ঘরে স্থানীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট-অফিস, ফণীবাবুই পোস্টমাস্টার। তিনি তখন ডাকঘরে কাজ করিতেছিলেন! বলিলেন, এসো অপূর্ব, তোমার নম্বর দেখবে? আজ ইন্সপেক্টর অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েচে—বোর্ডের এগ্‌জামিনে তুমি জেলায় প্রথম হয়েচ—পাঁচ টাকার একটা স্কলারশিপ পাবে যদি আরও পড়ো তবে। পড়বে তো?

এই সময় তৃতীয় পণ্ডিতমহাশয় ঘরে ঢুকিলেন। ফণীবাবু বলিলেন, ওকে সেকথা এখন বললাম পণ্ডিতমশাই! জিজ্ঞেস করছি আরও পড়বে তো?

তৃতীয় পণ্ডিত বলিলেন, পড়বে না, বাঃ! হিরের টুকরো ছেলে, স্কুলের নাম রেখেছে। ওরা যদি না পড়ে তো পড়বে কে, কেষ্ট তেলির ব্যাটা গোবর্ধন? কিচ্ছু না, আপনি ইন্সপেক্টর অফিসে লিখে দিন যে ও হাইস্কুলে পড়বে, ওর আবার জিজ্ঞেসটা কী?—ওঃ, সোজা পরিশ্রম করিচি মশাই ওকে ভগ্নাংশটা শেখাতে?

প্রথমটা অপু ভালো করিয়া কথাটা বুঝিতে পারিল না। পরে যখন বুঝিল তখন তাহার মুখে কথা জোগাইল না। হেডমাস্টার একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিলেন এইখানে একটা নাম সই করে দাও তো। আমি কিন্তু লিখে দিলাম যে, তুমি হাইস্কুলে পড়বে। আজই ইন্সপেক্টর অফিসে পাঠিয়ে দেব।

মাসখানেক পরে বৃত্তি পাওয়ার খবর কাগজে পাওয়া গেল।

যাইবার পূর্বদিন বৈকালে সর্বজয়া ব্যস্তভাবে ছেলের জিনিসপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। ছেলে কখনো একা বিদেশে বাহির হয় নাই। নিতান্ত আনাড়ি, ছেলেমানুষ ছেলে। কত জিনিসের দরকার হইবে,

কে থাকিবে তখন সেখানে সে মুখে মুখে সব অভাব জোগাইয়া ফিরিবে, সব জিনিস হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবে। খুঁটিনাটি—একখানা কাঁথা পাতিবার, একখানি গায়ের—একটি জল খাইবার গ্লাস, ঘরের তৈরি এক শিশি সরের ঘি, এক পুঁটুলি নারিকেল নাড়ু, অপু ফুলকাটা একটা মাঝারি জামবাটিতে দুধ খাইতে ভালোবাসে—সেই বাটিটা, ছোটো একটা বোতলে মাখিবার চই-মিশানো নারিকেল তৈল, আরও কত কী। অপুর মাথায় বালিশের পুরানো ওয়াড় বদলাইয়া নূতন ওয়াড় পরাইয়া দিল। দধি যাত্রায় আবশ্যকীয়। দই একটা ছোটো পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল। ছেলেকে কী করিয়া বিদেশে চলিতে হইবে সে বিষয়ে সহস্র উপদেশ দিয়াও তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। ভাবিয়া দেখিয়া যেটি বাদ দিয়াছে মনে হয় সেটি তখনই আবার ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল।

—যদি কেউ মারে টারে, কত দুষ্টু ছেলে তো আছে, অমনি মাস্টারকে বলে দিবি—বুঝলি? রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িসনে যেন ভাত খাবার আগে! এ তো বাড়ি নয় যে কেউ তোকে ওঠাবে—খেয়ে তবে ঘুমুবি—নয়তো তাদের বলবি, যা হয়েছে তাই দিয়ে ভাত দাও, বুঝলি তো?

যাত্রার পূর্বে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দধির ফোঁটা অপুর কপালে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, বাড়ি আবার শিগ্‌গির আসবি কিন্তু, তোদের ইতুপুজোর ছুটি দেবে তো?

—হ্যাঁ, ইস্কুলে বুঝি ইতুপুজোয় ছুটি হয়? তাতে আবার বড়ো ইস্কুল। সেই আবার আসব গরমের ছুটিতে।

ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় উচ্ছ্বসিত চোখের জল বহু কষ্টে সর্বজয়া চাপিয়া রাখিল।

অপু মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া ভারী বোঁচকাটা পিঠে ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

সবে ভোর হইয়াছে। দেওয়ানপুর গবর্নমেন্ট মডেল ইন্‌স্টিটিউশনের ছেলেদের বোর্ডিং ঘরের সব দরজা এখনও খুলে নাই। কেবল স্কুলের মাঠে দুইজন শিক্ষক পায়চারি করিতেছেন। সম্মুখের রাস্তা দিয়ে এত ভোরেই গ্রাম হইতে গোয়ালারা বাজারে দুধ বেচিতে আসিতেছিল। একজন শিক্ষক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, দাঁড়াও, ও ঘোষের পো, কাল দুধ দিয়ে গেলে তা নিছক জল, আজ দেখি কেমন দুধটা।

অপর শিক্ষকটি পিছু পিছু আসিয়া বলিল, নেবেন না সত্যেনবাবু, একটু বেলা না গেলে ভালো দুধ পাওয়া যায় না। আপনি নতুন লোক এসব জায়গায় গতিক জানেন না, যার-তার কাছে দুধ নেবেন না—আমার জানা গোয়ালা আছে, কিনে দেব বেলা হলে।

বোর্ডিং বাড়ির কোণের ঘরে দরজা খুলিয়া একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল ও দূরের করোনেশন ক্লক টাওয়ারের ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সত্যেনবাবুর সঙ্গী শিক্ষকটির নাম রামপদবাবু। তিনি ডাকিয়া বলিলেন, ওরে সমীর, ওই যে ছেলেটি এবার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে, সে কাল রাত্রে এসেছে না?

ছেলেটি বলিল, এসেছে স্যার, ঘুমুচ্ছে এখনও। ডেকে দেব?—পরে সে জানলার কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ব, ও অপূর্ব।

ছিপছিপে পাতলা চেহারা চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের একটি খুব সুন্দর ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে

বাহির হইয়া আসিল। রামপদবাবু বলিলেন, তোমার নাম অপূর্ব? ও!—এবার আড়বোয়ালের স্কুল থেকে স্কলারশিপ পেয়েছ? বাড়ি কোথায়? ও! বেশ, বেশ, আচ্ছা স্কুলে দেখা হবে।

একটু বেলা হইলে সে স্কুলবাড়ি দেখিতে গেল। কাল অনেক রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। রাত্রের অন্ধকারে আবছায়া দেখিতে পাওয়া সাদা রঙের প্রকাণ্ড স্কুল বাড়িটা তাহার মনে একটা আনন্দ ও রহস্যের সঞ্চার করিয়াছিল।

এই স্কুলে সে পড়িতে যাইবে। কতদিন শহরে থাকিতে তাহাদের ছোটো স্কুলটা হইতে বাহির হইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিতে পাইত—হাইস্কুলের প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডে ছেলেরা সকলেই একধরনের পোশাক পরিয়া ফুটবল খেলিতেছে। তখন কতদিন মনে হইয়াছে এত বড়ো স্কুলে পড়িতে যাওয়া কি তাহার ঘটিবে কোনোকালে—এসব বড়োলোকের ছেলেদের জন্য! এতদিনে তাহার আশা পূর্ণ হইতে চলিল।

সাড়ে দশটায় ক্লাস বসিল! প্রথম বইখাতা হাতে ক্লাসরুমে ঢুকিবার সময় তাহার বুক আগ্রহের ঔৎসুক্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল। বেশ বড়ো ঘর, নিচু চৌকির উপর মাস্টারের চেয়ার পাতা—খুব বড়ো ব্লাকবোর্ড। সব ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁতভাবে সাজানো। চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, ডেস্ক সব ঝকঝক করিতেছে, কোথাও একট ময়লা বা দাগ নাই।

মাস্টার ক্লাসে ঢুকিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ নিয়ম পূর্বে সে যেসব স্কুলে পড়িত সেখানে দেখে নাই। কেউ স্কুলে পরিদর্শন করিতে আসিলে দাঁড়াইবার কথা মাস্টার শিখাইয়া দিতেন। সত্য সত্যই এতদিন পরে সে বড়ো স্কুলে পড়িতেছে বটে!...

জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল পাশের ক্লাসরুমের একজন কোট-প্যান্টপরা মাস্টার বোর্ডে কী লিখিতে দিয়া ক্লাসের এদিক-ওদিক পায়চারি করিতেছেন—চোখে চশমা, আধপাকা দাড়ি বুকের উপর পড়িয়াছে, গম্ভীর চেহারা। সে পাশের ছেলেকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, উনি কোন মাস্টার ভাই?

ছেলেটি বলিল, উনি মি. দত্ত, হেডমাস্টার—ক্রিশ্চান, খুব ভালো ইংরিজি জানেন।

অপূর্ব শুনিয়া নিরাশ হইল যে, তাহাদের ক্লাসে মি. দত্তের কোনো ঘণ্টা নাই! থার্ডক্লাসের নীচে কোনো ক্লাসে নাকি নামেন না।

পাশেই স্কুলের লাইব্রেরি, ন্যাপ্‌থালিনের গন্ধ ভরা পুরানো বইয়ের গন্ধ আসিতেছিল। ভাবিল এ ধরনের ভরপুর লাইব্রেরির গন্ধ কি কখনো ছোটোখাটো স্কুলে পাওয়া যায়!

ঢং ঢং করিয়া ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে—আড়বোয়ালের স্কুলের মতো একখণ্ড রেলের পাটির লোহা বাজায় না, সত্যিকারের ঘণ্টা—কী গম্ভীর আওয়াজটা!

টিফিনের পরের ঘণ্টায় সত্যেনবাবুর ক্লাস! চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, ইহার মুখ দেখিয়া অপুর মনে হইল ইনি ভারী বিদ্বান, বুদ্ধিমানও বটে। প্রথমদিনই ইঁহার উপর কেমন ধরনের শ্রদ্ধা তাহার গড়িয়া উঠিল! সে শ্রদ্ধা আরও কেমন বাড়িয়া গেল ইহার মুখের ইংরেজি উচ্চারণে।

একদিন একটা বড়ো মজা হইল! সত্যেনবাবু ক্লাসে আসিয়া বাংলা হইতে ইংরেজি করিতে দিয়াছেন, এমন সময় হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকিতেই সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। হেডমাস্টার বইখানা সত্যেনবাবুর হাত

হইতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, আচ্ছা, এই যে এতে ভিক্টর হিউগো কথাটা লেখা আছে, ভিক্টর হিউগো কে ছিলেন জানো? ক্লাস নীরব। এ নাম কেহ জানে না। পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছেলে, কেহ নামও শোনে নাই—

—কে বলতে পার—তুমি—তুমি!

ক্লাসে সুচ পড়িলে তাহার শব্দ শোনা যায়।

অপুর অস্পষ্ট মনে হইল নামটা—যেন তাহার নিতান্ত অপরিচিত নয়, কোথাও যেন পাইয়াছে ইহার আগে! কিন্তু তাহার পালা আসিল ও চলিয়া গেল, তাহার মনে পড়িল না। ওদিকের বেঞ্চিটা ঘুরিয়া যখন প্রশ্নটা তাহার সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে সেই পুরাতন 'বঙ্গবাসী'গুলোর মধ্যে কোথায় সে একথাটা পড়িয়াছে—বোধ হয় সেই 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে হইবে—তাহার মনে পড়িয়াছে! পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ফরাসি দেশের লেখক, খুব বড়ো লেখক। প্যারিসে তাঁর পাথরের মূর্তি আছে পথের ধারে।

হেডমাস্টার বোধ হয় এ ক্লাসের নিকট এভাবে উত্তর আশা করেন নাই, তাহার দিকে চশমা-আঁটা জ্বলজ্বলে চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই অপু অভিভূত ও সংকুচিত অবস্থায় চোখ নামাইয়া লইল। হেডমাস্টার বলিলেন, আচ্ছা বেশ। পথের ধারে নয়, বাগানের মধ্যে মূর্তিটা আছে, বসো সব।

সত্যেনবাবু তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ছুটির পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। ছোটোখাটো বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একাই থাকেন। স্টোভ জ্বালিয়া চা ও খাবার করিয়া তাহাকে দিলেন ও নিজে খাইলেন। বলিলেন, আর একটু করে গ্রামারটা পড়বে—আমি তোমাকে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেব।

একদিন হেডমাস্টারের অফিসে তাহার ডাক পড়িল। হেডমাস্টার ডাকিতেছেন শুনিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে ভয়ে অফিসঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া দেখিল, আর একজন সাহেবি পোশাক পরা ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। হেডমাস্টারের ইঙ্গিতে সে ঘরে ঢুকিয়া দুজনার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি ইংরাজিতে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও সামনের একখানা পাতার উপর ঝুঁকিয়া কী দেখিয়া লইয়া একখানি ইংরেজি বই তাহার হাতে দিয়া ইংরাজিতে বলিলেন, এই বইখানা তুমি পড়তে নিয়েছিলে?

অপু দেখিল, বইখানা The World of Ice, মাসখানেক আগে লাইব্রেরি হইতে পড়িবার জন্য সে লইয়াছিল। সবটা ভালো বুঝিতে পারে নাই; সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ইয়েস—

হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, ইয়েস স্যার!

অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিতেছিল, থতমত খাইয়া বলিল, ইয়েস স্যার—

ভদ্রলোকটি পুনরায় ইংরেজিতে বলিলেন, স্লেজ কাকে বলে?

অপু ইহার আগে কখনো ইংরেজি বলিতে অভ্যাস করে নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া ইংরেজিতে বানাইয়া বলিল, এক ধরনের গাড়ি কুকুরে টানে। বরফের উপর দিয়া যাওয়ার কথাটা মনে আসিলে হঠাৎ সে ইংরেজি করিতে পারিল না।

—অন্য গাড়ির সঙ্গে স্লেজের পার্থক্য কী?

অপু প্রথমে বলিল, স্লেজ হ্যাজ—তারপরই তাহার মনে পড়িল—আর্টিক্‌ল সংক্রান্ত কোনো গোলযোগ এখানে উঠিতে পারে। এ'বা দি' কোনটা বলিতে হইবে তাড়াতাড়ি মাথায় ভাবিবার সময় না পাইয়া সোজাসুজি বহুবচনে বলিল, স্লেজেস হ্যাভ নো হুইলস্—

—আরোরা বোরিয়ালিস কাহাকে বলে?

অপুর চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাইল। মাত্র দিন কতক আগে সত্যেনবাবুর কী একখানা ইংরেজি বইতে সে ইহার ছবি দেখিয়াছিল। সে জায়গাটা পড়িয়া মানে না বুঝিলেও একথাটা খুব গালভরা বলিয়া সত্যেনবাবুর নিকট উচ্চারণ জানিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বলিল, আরোরা বোরিয়ালিস ইজ এ কাইন্ড অব এ্যাটমোস্‌ফেরিক ইলেক্‌ট্রিসিটি—

ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিল, আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলিতেছেন আন্‌-ইউজুয়াল ফর এ বয় অফ ফোর্থ ক্লাস। কী নাম বললেন? এ স্ট্রাইকিংলি হ্যান্ডসাম বয়—বেশ বেশ।

অপু পরে জানিয়াছিল তিনি স্কুল বিভাগের বড়ো ইন্সপেক্টর, না বলিয়া হঠাৎ স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন।

কম্পাউন্ডে নামিয়া লাইব্রেরির কোণটা দিয়া যাইতে যাইতে সে হঠাৎ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল! একজন বেঁটেমতো লোক ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া স্কুলের কেরানি ও বোর্ডিংয়ের বাজার সরকার গোপনীয় দত্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছে।

অপু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল! লোকটাকে দেখিতে অবিকল তাহার বাবার মতো।

কতদিন সে বাবার মুখ দেখে নাই। আজ চার বৎসর!

উদগত চোখের জল চাপিয়া জবাতলায় গিয়া সে গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিল।

অন্যমনস্ক ভাবে বইখানা সে উলটাইয়া যায়। তাহার প্রিয় সেই তিন-রঙা ছবিটা বাহির করিল, পাশের পৃষ্ঠায় সেই পদ্যটা।

For my home is in distant Bingen, Fair Bingen on the Rhine....!

মাকে অপু দেখে নাই আজ পাঁচ মাস! সে আর থাকিতে পারে না...বোর্ডিং তাহার ভালো লাগে না, স্কুল আর ভালো লাগে না, মাকে না দেখিয়া আর থাকা যায় না।

এইসব সময়ে এই নির্জন অপরাহ্ণগুলিতে নিশ্চিন্দিপুরের কথা কেমন করিয়া তাহার মনে পড়িয়া যায়।

দেয়ানপুর স্কুলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হয়। খরচপত্র করিয়া কোথাও যাইতে হইল না। পরীক্ষার পর হেডমাস্টার মি. দত্ত অপুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, বাড়ি যাবে কবে?

এই কয় বৎসরে হেডমাস্টারের সঙ্গে তাহার কেমন একটা নিবিড় সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, দুজনের কেহই এতদিন জানিতে পারে নাই সে বন্ধন কতটা দৃঢ়।

অপু বলিল, সামনের বধুবার যাব ভাবছি।

—পাশ হলে কী করবে ভাবছ? কলেজে পড়বে তো?

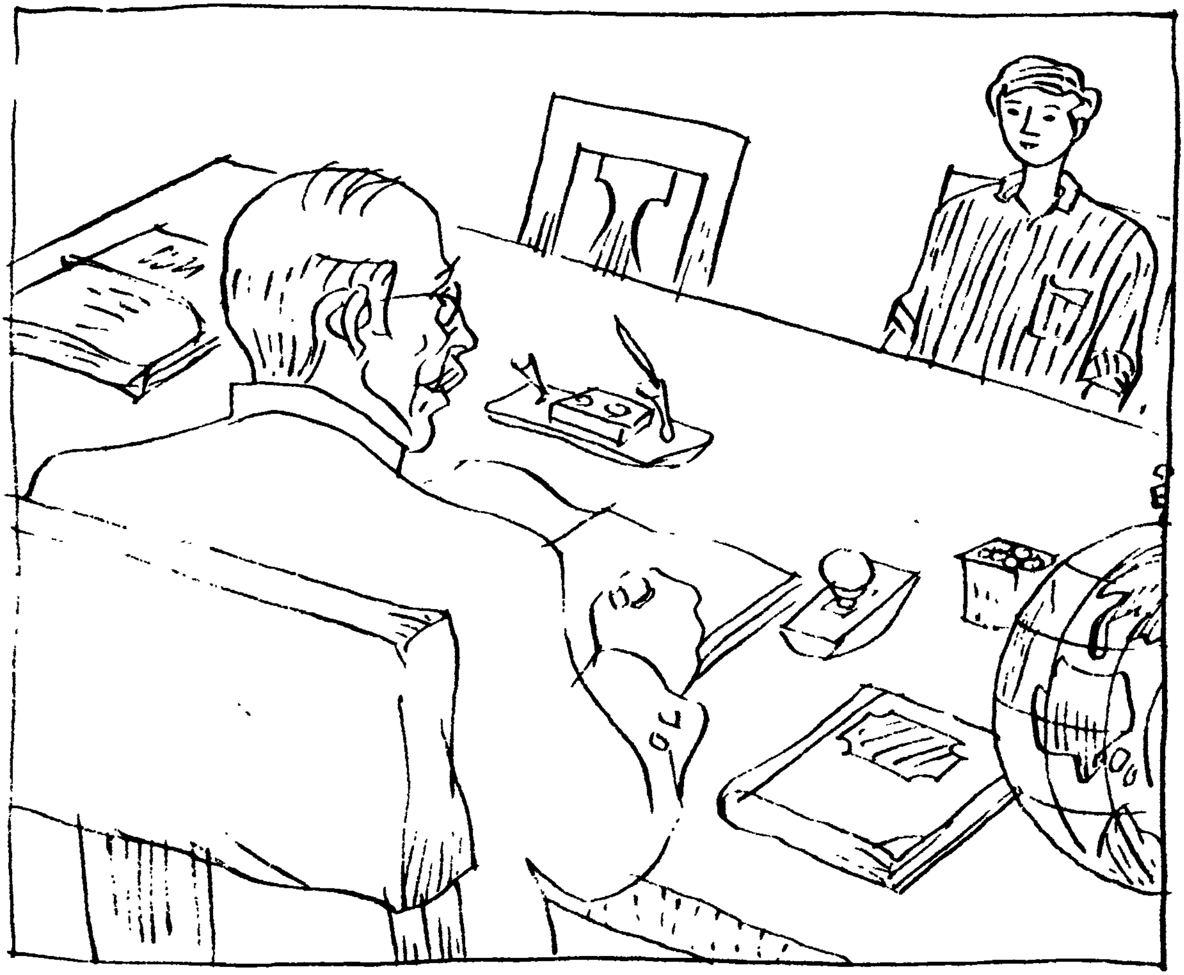

—কলেজে পড়বার খুব ইচ্ছে, স্যার।

—যদি স্কলারশিপ না পাও?

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে।

হেডমাস্টারের মনে হইল—তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর শিক্ষক-জীবনে এরকম আর কোনো ছেলের সংস্পর্শে তিনি কখনো আসেন নাই। —ভাবময় স্বপ্নদর্শী বালক, জগতে সহায়হীন, সম্পদহীন। হয়তো একটু নির্বোধ, একটু অপরিণামদর্শী—কিন্তু উদার, সরল, নিষ্পাপ, জ্ঞানপিপাসু ও জিজ্ঞাসু। মনে মনে তিনি বালকটিকে বড়ো ভালোবাসিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে এই একটি আসিয়াছিল, চলিয়া গেল। ক্লাসে পড়াইবার সময় ইহার কৌতূহলী ডাগর চোখ ও আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজির ঘণ্টায় কত নতুন কথা, কত গল্প, ইতিহাসের কাহিনি বলিয়া যাইতেন—ইহার নীরব, জিজ্ঞাসু চোখ দুটি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ জোর করিয়া পাঠ আদায় করিয়া লইয়াছে, সেরূপ আর কেহ পারে নাই, সে প্রেরণা সহজলভ্য নয়, তিনি তাহা জানেন।

গত চার বৎসরের স্মৃতি-জড়ানো দেওয়ানপুর হইতে বিদায় লইবার সময়ে অপুর মন ভালো ছিল না। দেবব্রত বলিল, তুমি চলে গেলে অপূর্বদা, এবার পড়া ছেড়ে দেব।

বাড়িতে অপু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিল। কলিকাতায় যদি পড়িতে যায় স্কলারশিপ না পাইলে কি কোনো অসুবিধা হইবে? সর্বজয়া কখনো জীবনে কলিকাতা দেখে নাই—সে কিছু জানে না। পড়া তো অনেক হইয়াছে আর পড়বার দরকার কী?—অপুর মনে কলেজে পড়িবার ইচ্ছা খুব প্রবল। কলেজে পড়িলে মানুষ বিদ্যার জাহাজ হয়। সবাই বলিবে কলেজের ছেলে।

মাকে বলিল, না-ই যদি স্কলারশিপ পাই, তাই বা কী? একরকম করে হয়ে যাবে—রমাপতিদা বলে কত গরিবের ছেলে কলকাতায় পড়ছে, গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই নাকি সুবিধা হয়ে যাবে, ও আমি করে নেব মা—

বিছানায় শুইয়া সারারাত্রি সে ছটফট করিতে লাগিল। বাড়ির পিছনের তেঁতুল গাছের ডালপালা অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে, ভোর আর কিছুতেই হয় না। হয়তো তাহার কলিকাতা যাওয়া ঘটিবে না, কলেজে পড়া ঘটিবে না, কত লোক হঠাৎ মারা গিয়াছে, এমনি হয়তো সেও মরিয়া যাইতে পারে। কলিকাতা না দেখিয়া কলেজে অন্তত কিছুদিন পড়ার আগে যেন সে না মরে!—দোহাই ভগবান।

কলিকাতায় সে কাহাকেও চেনে না, কোথায় গিয়া উঠিবে ঠিক জানা নাই, পথঘাটও জানা নাই। মাসকতক আগে দেবব্রত তাহাকে নিজের এক মেসোমশায়ের কলিকাতার ঠিকানা দিয়া বলিয়াছিল, দরকার হইলে এই ঠিকানায় গিয়া তাহার নাম করিলেই তিনি আদর করিয়া থাকিবার স্থান দিবেন। ট্রেনে উঠিবার সময়ে অপু সে কাগজখানা বাহির করিয়া পকেটে রাখিল। রেলের পুরানো টাইম-টেবিলের পিছন হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা কলিকাতা শহরের নকশা তাহার টিনের তোরঙ্গটার মধ্যে অনেকদিন আগে ছিল সেখানাও বাহির করিয়া বসিল।

ইহার পূর্বেও অপু শহর দেখিয়াছে, তবুও ট্রেন হইতে নামিয়া শিয়ালদহ স্টেশনের সম্মুখে বড়ো রাস্তায় একবার আসিয়া দাঁড়াইতেই যে অবাক হইয়া গেল। এরকম কাণ্ড সে কোথায় দেখিয়াছে! ট্রামগাড়ি ইহার নাম? আর এক রকমের গাড়ি নিঃশব্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছে, অপু কখনো না দেখিলেও মনে মনে আন্দাজ করিল, ইহারই নাম মোটরগাড়ি। সে বিস্ময়ের সহিত দু-একখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল; স্টেশনের অফিসঘরে সে মাথার উপর একটা কী চাকার মতো জিনিস বনবন বেগে ঘুরিতে দেখিয়াছে; সে আন্দাজ করিল উহাই ইলেকট্রিক পাখা।

যে ঠিকানা বন্ধু দিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে এক মহা মুশকিলের ব্যাপার, পকেটে রেলের টাইম-টেবিলের মোড়ক হইতে সংগ্রহ করা কলিকাতার যে নকশা ছিল তাহা মিলাইয়া হ্যারিসন রোড খুঁজিয়া বাহির করিল। জিনিসপত্র তাহার এমন বেশি কিছু নহে, বগলে ছোটো বিছানাটি ও ডান হাতে ভারী পুঁটুলিটা ঝুলাইয়া পথ চলিতে চলিতে সামনে পাওয়া গেল আমহার্স্ট স্ট্রিট। তাহার পরে আরও খানিক ঘুরিয়া সে পঞ্চানন দাসের গলি বাহির করিল।

অখিলবাবু সন্ধ্যার আগে আসিলেন, কালো নাদুসনুদুস চেহারা, অপুর পরিচয় ও উদ্দেশ্য শুনিয়া খুশি হইলেন ও খুব উৎসাহ দিলেন। ঝিকে ডাকাইয়া তখনই খাবার আনাইয়া অপুকে খাইতে দিলেন, সারাদিন খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, নিজে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য আসনখানি মেসের ছাদে পাতিয়াও আহ্নিক করিতে ভুলিয়া গেলেন! সন্ধ্যার সময় অপু মেসের ছাদে শুইয়া পড়িল। সারাদিন বেড়াইয়া সে বড়ো ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অখিলবাবুর মেসে খাইয়া অপু ইহার-উহার পরামর্শমতো নানাস্থানে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল, কোথাও বা থাকিবার স্থানের জন্য, কোথাও বা ছেলে পড়াইবার সুবিধার জন্য কাহারও কাছে বা কলেজে বিনা বেতনে ভরতি হইবার যোগাযোগের জন্য। এদিকে কলেজে ভরতি হইবার সময়ও চলিয়া যায়, সঙ্গে যে কয়েকটা টাকা ছিল তাহা পকেটে লইয়া একদিন সে ভরতি হইতে বাহির হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে সে ইচ্ছা করিয়া ঘেঁষিল না, সেখানে সবদিকেই খরচ অত্যন্ত বেশি। মেট্রোপলিটান কলেজ গলির ভিতর, বিশেষত পুরানো ধরনের বলিয়া সেখানেও ভরতি হইতে ইচ্ছা হইল না। মিশনারিদের কলেজ হইতে একদল ছেলে বাহির হইয়া সিটি কলেজে ভরতি হইতে চলিয়া ছিল, তাহাদের দলে মিশিয়া গিয়া কেরানির নিকট হইতে কাগজ চাহিয়া নাম লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটার গড়ন ও আকৃতি তাহার কাছে এত খারাপ ঠেকিল যে, কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবশেষে রিপন কলেজের বাড়ি তাহার কাছে বেশ ভালো ও উঁচু মনে হইল। ভরতি হইয়া সে আরেকটি ছেলের সঙ্গে ক্লাসরুমগুলি দেখিতে গেল। ক্লাসে ইলেকট্রিক পাকা। কী করিয়া খুলিতে হয়? তাহার সঙ্গী দেখাইয়া দিল। সে খুশির সহিত তাহার নীচে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, এত হাতের কাছে ইলেকট্রিক পাখা পাইয়া বার বার পাখা খুলিয়া বন্ধ করিযা দেখিতে লাগিল।

মাসের শেষে অখিলবাবু, অপুর জন্য একটা ছেলে পড়ানো ঠিক করিয়া দিলেন, দুই বেলা একটা ছোটো ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়াইতে হইবে; মাসে পনেরো টাকা।

অখিলবাবুর মেসে পরের বিছানায় শুইয়া থাকা তাহার পছন্দ হয় না। কিন্তু কলেজ হইতে ফিরিয়া পথে কয়েকটি মেসে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, পনেরো টাকা মাত্র আয়ে কোনো মেসে থাকা চলে না। তাহার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিলিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত, নিজেরাই রাঁধিয়া খাইত, অপুকে তাহারা লইতে রাজি হইল।

যে তিনটি ছেলে একসঙ্গে ঘর ভাড়া করিয়া থাকে, তাহাদের সকলেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইহাদের মধ্যে সুরেশ্বরের আয় কিছু বেশি। এম.এ. ক্লাসের ছাত্র, চল্লিশ টাকার টিউশনি আছে। জানকী যেন কোথায় ছেলে পড়াইয়া কুড়ি টাকা পায়। নির্মলের আয় আরও কম। সকলের আয় একত্র করিয়া যে মাসে যাহা অকুলান হয়, সুরেশ্বর নিজেই তাহা দিয়া দেয়, কাহাকেও বলে না। অপু প্রথমে তাহা জানিত না, মাস দুই থাকিবার পর তাহার সন্দেহ হইল প্রতিমাসে সুরেশ্বর পাঁচিশ-ত্রিশ টাকা দোকানের দেনা শোধ করে, অথচ কাহারও নিকট চায় না কেন? সুরেশ্বরের কাছে একদিন কথাটা তুলিলে, সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বেশি এমন কিছু দেয় না, যদিও বা দেয়—তাহাতেই বা কী? তাহাদের যখন আয় বাড়িবে তখন তাহারাও অনায়াসে দিতে পারিবে, কেহ বাধা দিবে না তখন।

নির্মল রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ে খুব শক্তি, সুগঠিত মাংসপেশী, চওড়া বুক। অপুর মতো বয়স। হাতের ভিতর একটা কাগজের ঠোঙা দেখাইয়া বলিল—নতুন মটরশুঁটি লঙ্কা দিয়ে ভেজে—

অপু হাত হইতে ঠোঙাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, দেখি? পরে হাসিমুখে বলল, সুরেশ্বরদা, স্টোভ ধরিয়ে নিন—আমি মুড়ি আনি—ক-পয়সার আনব? এক-দুই-তিন-চার—

—আমার দিকে আঙুল দিয়া গুনো না ওরকম—

অপু হাসিয়া নির্মলের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, তোমার দিকেই আঙুল বেশি করে দেখাব—তিন-তিন-তিন—

নির্মল তাহাকে ধরিতে যাইবার পূর্বে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুরেশ্বর বলিল, একরাশ বই এনেছে কলেজের লাইব্রেরি থেকে—এতও পড়তে পারে—মায় মম্‌সেনের রোমের হিস্ট্রি এক ভল্যুম—

পূজার কিছু পূর্বে অপুদের বাসা উঠিয়া গেল। খরচে আয়ে অনেকদিন হইতে কুলাইতে ছিল না, সুরেশ্বরের ভালো টিউশনিটা হঠাৎ হাতছাড়া হইল—কে বাড়তি খরচ চালায়? নির্মল ও জানকী অন্য কোথায় চলিয়া গেল, সুরেশ্বর গিয়া মেসে উঠিল। অপুর যে মাসিক আয়, কলেজের মাহিনা দিয়া তাহা হইতে বারো টাকা বাঁচে—কলিকাতা শহরে বারো টাকায় যে কিছুতেই চলিতে পারে না অপুর সে জ্ঞান এতদিনেও হয় নাই। সুতরাং সে ভাবিল বারো টাকাতেই চলিবে, খুব চলিবে। বারো টাকা কী কম টাকা! কিন্তু বারো টাকা আয়ও বেশিদিন রহিল না, একদিন পড়াইতে গিয়া শুনিল ছেলের শরীর খারাপ বলিয়া ডাক্তার হাওয়া বদলাইতে বলিয়াছে, পড়াশুনা এখন বন্ধ থাকিবে। এক মাসের মাহিনা তাহার বাড়তি দিয়া জবাব দিল।

টাকা কয়টি পকেটে করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া অপু আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ফুটপাথ বাহিয়া চলিল। সুরেশ্বরের মেসে সে জিনিসপত্র রাখিয়া গিয়াছে, সেইখানেই গেস্ট-চার্জ দিয়া খায়, রাতে মেসের বারান্দাতে শুইয়া থাকে। টাকা যাহা আছে মেসের দেনা মিটাইতে যাইবে। সামান্য কিছু হাতে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পর?

সুরেশ্বরের মেসে আসিয়া নিজের নামে একখানি পত্র ডাকবাকসে দেখিল। হাতের লেখাটা সে চেনে না—খুলিয়া দেখিল চিঠিখানা মায়ের, কিন্তু অপরের হাতে লেখা। হাতে ব্যথা হইয়া মা বড়ো কষ্ট পাইতেছে, অপু কি তিনটি টাকা পাঠাইয়া দিতে পারে? মা কখনো কিছু চায় না, মুখ বুজিয়া সকল দুঃখ সহ্য করেন, সে-ই বরং দেয়ানপুরে থাকিতে নানা ছলছুতায় মাঝে মাঝে কত টাকা মায়ের কাছ হইতে লইয়াছে। হাতে না থাকিলেও তেলিবাড়ি হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া মা জোগাড় করিয়া দিতেন। খুব কষ্ট না হইলে কখনো মা তাহাকে টাকার জন্য লেখেন নাই।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুনিয়া দেখিল সাতাশটি টাকা আছে। মেসের দেনা সাড়ে পনেরো টাকা বাদে সাড়ে এগারো টাকা থাকে। মাকে কত টাকা পাঠানো যায়? মনে মনে ভাবিল তিনটে টাকা তো চেয়েছেন, আমি দশ টাকা পাঠিয়ে দিই। মনিঅর্ডার পিওন যখন টাকা নিয়ে যাবে, মা ভাববেন, বুঝি তিন টাকা কিংবা হয়তো দু-টাকার মনিঅর্ডার—জিজ্ঞেস করবেন, কত টাকা? পিওন যেই বলবে দশ টাকা, মা অবাক হয়ে যাবেন। মাকে তাক লাগিয়ে দেব—ভারী মজা, বাড়িতে গেলে মা শুধু সেই গল্পই করবেন দিনরাত—

অপ্রত্যাশিত টাকা প্রাপ্তিতে মায়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা কল্পনা করিয়া অপু ভারী খুশি হইল। বউবাজার পোস্ট অফিস হইতে টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া সে ভাবিল—বেশ হল! আহা মাকে কেউ কখনো দশ টাকার মনিঅর্ডার একসঙ্গে পাঠায়নি—টাকা পেয়ে খুশি হবেন। আমার তো রইল এখন দেড় টাকা, তারপর একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবেই!

কলেজে একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। সেও গরিবের ছাত্র, ঢাকা জেলায় বাড়ি, নাম প্রণব মুখার্জি। খুব লম্বা, গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। কলেজ লাইব্রেরিতে এক সঙ্গে বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে দুজনের আলাপ। এমন সব বই দুজনে লইয়া যায়, যাহা সাধারণ ছাত্রেরা পড়ে না, নামও জানে না। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেকে মম্‌সেন লইতে দেখিয়া প্রণব তাহার দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

অপু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, প্রণবের পড়াশুনা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি। অনেক গ্রন্থকারেরও নামও সে কখনো শোনে নাই; নিট্‌শে, এমার্সন, টুর্গেনেভ ব্রেখ্‌ড়্—প্রণবের কথায় সে ইহাদের বই পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই উৎসাহে সে পুনরায় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত গিবন শুরু করিল, ইলিয়ডের অনুবাদ পড়িল।

অপুর পড়াশুনার কোনো বাঁধাবাঁধি বাতিক নাই। যখন যাহা ভালো লাগে, কখনো ইতিহাস, কখনো নাটক, কখনো কবিতা, কখনো প্রবন্ধ কখনো বিজ্ঞান! প্রণব নিজে অত্যন্ত সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয়, সে বলিল ওতে কিছু হবে না, ওরকম পড়ো কেন?

অপু চেষ্টা করিয়াও পড়াশুনায় শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না। লাইব্রেরি ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু বড়ো বড়ো বইয়ে ভরা আলমারির দৃশ্য তাহাকে দিশাহারা করিয়া দেয়। সকল বই খুলিয়া দেখিতে সাধ যায়—Gases of the Atmosphere—স্যার উইলিয়াম র‍্যামজের। সে পড়িয়া দেখিবে কী কী গ্যাস! Extinct Animals—ই. রে ল্যাকাস্টার, জানিবার তাহার ভয়ানক আগ্রহ! Words Around Us—প্রক্টর! উঃ, বইখানা না পড়িলে রাতে ঘুম হইবে না! প্রণব হাসিয়া বলে, দূর! ও কি পড়া? তোমার তো পড়া নয়, পড়া পড়া খেলা—

এত বড়ো লাইব্রেরি, এত বই! নক্ষত্রজগৎ হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীর জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ আণুবীক্ষণিক প্রাণীকুল ইতিহাস সংক্রান্ত সব বই। তাহার অধীর উৎসুক মন চায় এই বিশ্বের সব কথা জানিতে। বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক—একবার বইগুলি খুলিয়া দেখিতেও সাধ যায়। লুপ্ত প্রাণীকুল সম্বন্ধে খানকতক ভালো বই পড়িল—অলিভার লজের Pioneers of Science—বড়ো বড়ো নীহারিকাদের ফটো দেখিয়া মুগ্ধ হইল। নিট্‌শে ভালো বুঝিতে না পারিলেও দু-তিনখানা বই পড়িল। টুর্গেনেভ এক-একবারে শেষ করিয়া ফেলিল বারোখানা না ষোলোখানা বই। চোখের সামনে টুর্গেনেভ এক নতুন জগৎ খুলিয়া দিয়া গেল—কী অপূর্ব হাসি-অশ্রু মাখানো কল্পলোক।

সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই, উঠানে তেলিবাড়ির বউ দাঁড়াইয়া কী গল্প করিতেছিল, দূর হইতে অপুকে আসিতে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, কে আসছে বলুন তো মা ঠাকরুন? সর্বজয়ার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অপু নয় তো—অসম্ভব—সে এখন কেন—

পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অপুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল, সর্বজয়ার চোখের জলে তাহার জামার হাতাটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন নিজের অপেক্ষা মাথায় ছোটো, দুর্বল ও অসহায় বলিয়া অপুর মনে হইতে লাগিল। তপঃকৃশা শবরীর মতো ক্ষীণাঙ্গী, আলুথালু, অর্ধরুক্ষ চুলের গোছা একদিকে পড়িয়াছে, মুখের চেহারা এখনও সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখাবলি এখনও

অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবারে মায়ের চুল পাকিয়াছে, কানের পাশেও চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সবল দৃঢ় বাহুবেষ্টনে, সরলা, চিরদুঃখিনী মাকে সংসারের সহস্র দুঃখ বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপুর ইচ্ছা যায়। এ ভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল, ইতিপূর্বে কখনো হয় নাই।

বড়ো-বউ একপাশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে অপুকে ছোটো দেখিয়াছে, এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না। সর্বজয়া বলিল, এবার ও এসেছে বউমা, এবার কালই কিন্তু—

অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী খুড়িমা কাল কী?

বড়ো বউ হাসিয়া বলিল, দেখো কাল—আজ বলব না তো!

খিচুড়ি খাইতে ভালোবাসে বলিয়া সর্বজয়া অপুকে রাত্রে খিচুড়ি রাঁধিয়া দিল; পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল, এই সাত-আট দিন পর আজ মায়ের কাছে। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ রে, সেখানে খিচুড়ি খেতে পাস?

অপুর শৈশবে তাহার মা শত প্রতারণার আবরণে নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাহাদের শিশুচক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিত, এখন আবার অপুর পালা। সে বলিল, হুঁ, বাদলা হলেই খিচুড়ি হয়।

—কী ডালের করে?

—মুগের বেশি, মসুরিরও করে, খাঁড়ি মসুরি।

—সকালে জলখাবার খেতে দেয় কী কী?

অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের কথা এক কাল্পনিক বিবরণ খুব উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ, চা, এক-একদিন লুচিও দেয়! খাওয়ার বেশ সুবিধা।

টুইশনি কোনকালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু সেকথা মাকে জানায় নাই; সর্বজয়া বলিল, হ্যাঁ রে, তুই যে মেয়েটিকে পড়াস—তাকে কী বলে ডাকিস? খুব বড়োলোকের মেয়ে না?

—তার নাম ধরেই ডাকি—

—দেখতে শুনতে বেশ ভালো?

—বেশ দেখতে—

—হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না? বেশ হয় তাহলে—

অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল, তারা হল বড়োলোক—আমার সঙ্গে—তা কি কখনো—তোমার যেমন কথা!

সর্বজয়ার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস অপুর মতো ছেলে পাইলে লোকে এখনি লুফিয়া লইবে। অপু ভাবে, তবুও তো মা আসল কথা কিছুই জানে না। টুইশনি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায়?

সর্বজয়া বলে, একটা সাধ আছে অপু, বট্‌ঠাকুরের দরুন নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস ভুবন মুখুজ্যেদের কাছ থেকে, তবে—

সামান্য সাধ, সামান্য আশা। কিন্তু যার সাধ, যার আশা, তার কাছে তা ছোটোও নয় সামান্যও নয়।

মায়ের ব্যথা কোনখানে অপুর তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। মায়ের ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া বাস করা—সে অপু জানে। সর্বজয়া বলে, তুই মানুষ হলে, তোর একটা ভালো চাকরি হলে তোর বউ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করব। বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস—বড়ো ইচ্ছে হয়।

অপুর কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মা আর বেশিদিন বাঁচিবে না। মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে, এবার কেবল অসুখে ভুগিতেছে। মুখে সান্ত্বনা, যত আশার কথা বলা—সব বলে। জানালার ধারে তক্তপোশে দুপুরের পর মা একটু ঘুমাইয়া পড়ে। অনেক বেলা পড়িয়া যায়। অপু কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে, গা যে তোমার বেশ গরম, দেখি!

সবর্জয়া সেসব কথা উড়াইয়া দেয়। এ গল্প ও গল্প করে। বলে, হ্যাঁ রে, অতসীর মা আমার কথা-টথা কিছু বলে।

অপু মনে মনে ভাবে—মা আর বাঁচবে না বেশিদিন। কেমন যেন—কেমন— কী করে থাকব মা মারা গেলে?

অনেক বেলা পড়িয়া যায়—

জানালার পাশেই একটা আতা গাছ। আতা ফুলের মিষ্টি ভুরভুরে গন্ধ বৈকালের বাতাসে। একটু পোড়ো জমি। এক ঢিবি সুরকি। একটা চারা জামরুল গাছ! পুরানো বাড়ির দেওয়ালের ধারে ধারে বনমূলার গাছ। কন্টিকারির ঝাড়! একটা জায়গা কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া সর্বজয়া শাকের খেত করিয়াছে।

একটা অদ্ভুত ধরনের মনের ভাব হয় অপুর। কেমন এক ধরনের গভীর বিষাদ...মায়ের এইসব ছোটোখাটো আশা, তুচ্ছ সাধ—কত নিষ্ফল। ... মা কি ওই শাকের খেতের শাক খাইতে পারিবে? কালীঘাটের কালীদর্শন করিবে, জ্যাঠাইমার বাসায় থাকিয়া। ... নিশ্চিন্দিপুরের আমবাগান—

এক ধরনের নির্জনতা সঙ্গীহীনতার ভাব ... মায়ের উপর গভীর করুণা...রাঙা রোদ মিলাইতেছে চারা জামরুল গাছটাতে...সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। ছাতারে ও শালিক পাখির দল কিচমিচ ও ঝটাপাটি করিতেছে!...

অপুর চোখে জল আসিল। কী অদ্ভুত নির্জনতা মাখানো সন্ধ্যাটা! মুখে হাসিয়া সস্নেহে মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, আচ্ছা মা বড়ো বউয়ের সঙ্গে বাজি রেখেছিল কী নিয়ে—বলো না—বললে না তো সেদিন?—

ছুটি ফুরাইলে অপু বাড়ি হইতে রওনা হইল।

স্টেশনে আসিয়া কিন্তু ট্রেন পাইল না, গহনার নৌকা আসিতে অত্যন্ত দেরি হইয়াছে, ট্রেন আধঘণ্টা পূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সর্বজয়া ছেলের বাড়ি হইতে যাইবার দিনটাতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য কাপড়, বালিশের ওয়াড় সাজিমাটি দিয়া সিদ্ধ করিয়া বাঁশবনের ডোবার জলে কাচিতে নামিয়াছে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু বাড়ির দাওয়ায় জিনিসপত্র নামাইয়া ছুটিয়া ডোবার ধারে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল—মা!...

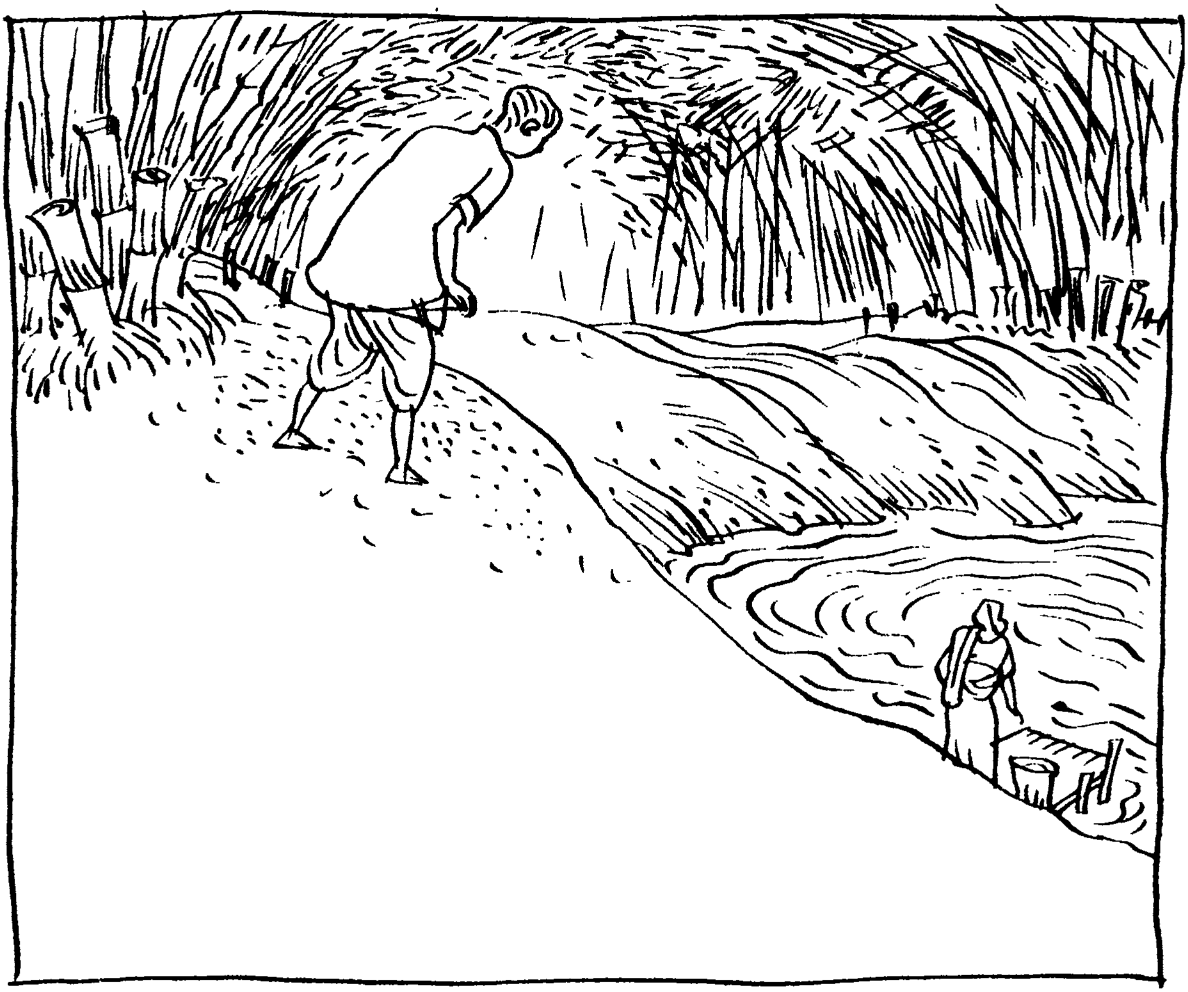

সর্বজয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য দুপুর হইতে কাপড় সিদ্ধ লইয়া ব্যস্ত আছে, চমকিয়া পিছন দিকে চাহিয়া আনন্দ মিশ্রিত সুরে বলে, তুই! যাওয়া হল না?

অপু হাসিমুখে বলে, গাড়ি পাওয়া গেল না—এসো বাড়ি—

বাঁশবনের ছায়ায় মায়ের মুখে সেদিন যে অপূর্ব আনন্দের ও তৃপ্তির ছাপ পড়িয়াছিল, অপু কোনো দিন তাহা দেখে নাই—বহুকাল পর্যন্ত মায়ের এ মুখখানা তাহার মনে ছিল।

পরদিন সে কলকাতায় ফিরিল।

কলেজ সেইদিনই প্রথম খুলিয়াছে প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা বাহির হইয়াছে, নোটিশ বোর্ডের কাছে রথযাত্রার ভিড়—সে অধীর আগ্রহে ভিড় ঠেলিয়া নিজের নামটা আছে কি না দেখিতে গেল।

আছে। দু-তিন বার বেশ ভালো করিয়া দেখিল। আরও আশ্চর্য এই যে পাশেই যেসব ছেলে পাশ করিয়াছে অথচ বেতন বাকি থাকার দরুন প্রমোশন পায় নাই, তাহাদের একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অপুর নাম নাই, অথচ অপু জানে তাহারই সর্বাপেক্ষা বেশি বেতন বাকি।

সে ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ভিড়ের বাহিরে আসিল। কেমন করিয়া এরূপ অসম্ভব সম্ভব, নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও তখন কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

দু-তিন দিন পরে তাহার এক সহপাঠী নিজের প্রমোশন বন্ধ হওয়ার কারণ জানিতে অফিসঘরে কেরানির কাছে গেল, সে-ও গেল সঙ্গে। হেড ক্লার্ক বলিল, একি ছেলের হাতে মোয়া হে ছোকরা! কত রোল? পরে একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, এই দেখো রোল টেন—লাল কালির মার্কা মারা রয়েছে...দু-মাসের মাইনে বাকি—মাইনে শোধ না দিলে প্রমোশন দেওয়া হবে না, প্রিন্সিপালের কাছে যাও, আমি আর কী করব?

অপু তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল—তাহার রোল নম্বর কুড়ি—একই পাতায়। দেখিল অনেক ছেলের নামের সঙ্গে কালিতে 'ডি' লেখা আছে অর্থাৎ ডিফল্টার—মাহিনা দেয় না। সঙ্গে সঙ্গে নামের উলটোদিকে মন্তব্যের ঘরে কোন কোন মাসের মাহিনা বাকি তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহার নামটাতে কোনো কিছু দাগ বা আঁচড় নাই—একেবারে পরিষ্কার মুক্তার মতো হাতের লেখা জ্বলজ্বল করিতেছে—রায় অপূর্বকুমার—লাল কালির একটা বিন্দু পর্যন্ত নাই...

ঘটনা হয়তো খুবই সামান্য, কিছুই না—হয়তো একটা সম্পূর্ণ কলমের ভুল, না হয় কেরানির হিসাবের ভুল, কিন্তু অপুর মনে ঘটনাটা গভীর রেখাপাত করিল।

সর্বজয়ার এরকম কোনোদিন হয় নাই। অপু চলিয়া যাওয়ার দিনটা হইতে বৈকালে তাহার মন এত হু হু করিতে লাগিল, যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস অবস্থা। কত কথা, সারা জীবনের কত ঘটনা, কত আনন্দ ও অশ্রুর ইতিহাস একে একে মনে আসিয়া উদয় হয়। গত এক মাস ধরিয়া এসব কথা মনে হইতেছে। নির্জনে বসিলেই বেশি করিয়া...। ছেলেবেলায় বুধি বলিয়া গাই ছিল বাড়িতে ... বাল্যসঙ্গিনী হিমিদি...দুজনে একসঙ্গে দো-পেটে গাঁদাগাছ পুঁতিয়া জল দিত। একদিন হিমিদি ও সে বন্যার জলে মাঠে ঘড়া বুকে সাঁতার কাটিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল আর একটু হইলেই—

রাত্রে খুব পরিষ্কার আকাশে ত্রয়োদশীর প্রকাণ্ড বড়ো চাঁদ উঠিয়াছে। জীবনে এই প্রথম সর্বজয়ার একা থাকিতে ভয় ভয় করিতে লাগিল। খানিক রাত্রে একবার যেন মনে হইল, সে জলের তলায় পড়িয়া আছে, নাকে মুখে জল ঢুকিয়া নিশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে ... একেবারে বন্ধ। সে ভয়ে এক গা ঘামিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল। সে কি মরিয়া যাইতেছে? এই কি মৃত্যু?—সে এখন কাহাকে ডাকে? জীবনে সর্বপ্রথম এই তাহার জীবনের ভয় হইল—ইহার আগে কখনো তো এমন হয় নাই! পরে নিজের ভয় দেখিয়া তাহার আর একদফা ভয় হইল। ভয় কীসের? না—না—মৃত্যু, সে এরকম নয়। ও কিছু না।

সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—একজনের কথাই মনে হয়...অপু...অপু—অপুকে ফেলিয়া সে থাকিতে পারিতেছে না ... অসম্ভব। ... বিস্ময়ের সহিত দেখিল ... সে নিজে অনেকক্ষণ কাঁদিতেছে। এতক্ষণ তো টের পায় নাই। আশ্চর্য—চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে যে!

জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় না...কেমন একটা আনন্দ...আকাশটা, পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে...টুপ...টুপ...টুপ... টাপ...।

আবার কান্না পায়; জ্যোৎস্নার আলোয় জানালার গরাদ ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে? সর্বজয়ার দৃষ্টি পাশের জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল...বিস্ময়ে, আনন্দে রোগশীর্ণ মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল...অপু দাঁড়াইয়া আছে।...এ অপু নয়...সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট অপু...এতটুকু অপু...নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চিত্র, জ্যোৎস্না রাতে ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িত যাহার ফুলের কুঁড়ির মতো দন্তহীন কচি মুখে সেই অপু...ওর ছেলেমানুষ খঞ্জন পাখির মতো ডাগর ডাগর চোখের নীল চাহনি...চুল কোঁকড়া কোঁকড়া মুখচোরা, ভালোমানুষ... লাজুক বোকা...জগতের ঘোরপ্যাঁচ কিছুই একেবারে বোঝে না...কোথায় যেন সে যায়...নীল আকাশ বহিয়া বহু দূরে...বহু দূরের দিকে, সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে...যায়...যায়, ...যায় যায়...মেঘের ফাঁকে যাইতে মিলাইয়া যায়...

বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে। ...কিন্তু তার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে—এতই সুন্দর...

কী হাসি? কী মিষ্টি হাসি ওর মুখের!...

পরদিন সকালে তেলিবাড়ির বড়ো বউ আসিল। দরজায় রাত্রে খিল দেওয়া হয় নাই, খোলাই আছে, বড়ো বউ আপন মনে বলিল, রাত্রে দেখছি মা ঠাকরুনের অসুখ বেড়েছে, খিলটাও দিতে পারেননি।

...বিছানার উপর যেন সর্বজয়া ঘুমাইতেছে! তেলিবউ একবার ভাবিল—ডাকিবে না—কিন্তু পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া উঠাইতে গেল। সর্বজয়া কোনো সাড়া দিলেন না, নড়িলেনও না। বড়ো-বউ আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কী ভাবিয়া নিকটে আসিয়া ভালো করিয়া দেখিল।

পরক্ষণেই সে সব বুঝিল।

সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দমিশ্রিত—এমনকী মায়ের মৃত্যুসংবাদ প্রথম যখন সে তেলিবাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিশ্বাস...একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস—অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাব তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কী? সে চায় কী! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবন পথের বাধা?—কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন? তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালোবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যুসংবাদটা প্রথমে যে একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। তাহার পর সে বাড়ি রওনা হইল। উলা স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। এই প্রথম এ পথে সে যাইতেছে—যেদিন মা নাই। গ্রামে ঢুকিবার কিছু আগে আধমজা কোদলা নদী, এ সময়ে হাঁটিয়া পার হইয়া যায়—এরই তীরে কাল মাকে সবাই দাহ করিয়া গিয়াছে! বাড়ি পৌঁছিল বৈকালে। এই সেদিন বাড়ি হইতে গিয়াছে, মা তখনও ছিলেন—ঘরে তালা দেওয়া, চাবি কাহাদের কাছে? বোধ হয় তেলিবাড়ির ওরা লইয়া গিয়াছে। ঘরের পৈঠায় অপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উঠোনের বাহির আগাড়ের কাছে এক জায়গায় পোড়া খড় জড়ো করা। সেদিকে চোখ পড়িতে অপু শিহরিয়া উঠিল—সে বুঝিয়াছে—মাকে যাহারা সৎকার করিতে গিয়াছিল, দাহ অন্তে তাহারা কাল এখানে আগুন ছুঁইয়া নিমপাতা খাইয়া শুদ্ধ হইয়াছে—প্রথাটা অপু জানে—মা মারা গিয়াছেন এখনও অপুর বিশ্বাস হয় নাই!—একুশ বৎসরের বন্ধন,

মন এক মুহূর্তে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে নাই—কিন্তু পোড়া খড়গুলোতে নগ্ন, রূঢ়, নিষ্ঠুর সত্যটা—মা নাই! মা নাই।—বৈকালের কী রূপ! নির্জন, নিরালা, কোনো দিকে কেহ নাই, উদাস পৃথিবী, নিস্তব্ধ বিরাগী রাঙা রোদভরা আকাশটা!...অপু অর্থহীন দৃষ্টিতে পোড়া খড়গুলার দিকে চাহিয়া রহিল!...

কিন্তু মায়ের গায়ের কাঁথাখানা উঠানের আলনায় মেলিয়া দেওয়া কেন? কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল...সঙ্গেই তো যাওয়ার কথা। অনেক দিনের নিশ্চিন্দিপুরের আমলেব, মায়ের হাতে সেলাই করা, কলকা-কাটা রাঙা সূতার কাজ। কতক্ষণ সে বসিয়াছিল জানে না, রোদ প্রায় পড়িয়া আসিল। তেলিবাড়ির বড়ো ছেলে নাদুর ডাকে চমক ভাঙিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্লান হাসিয়া বলিল, এই যে, আমার ঘরের চাবিটা তোমাদের বাড়ি?

নাদু বলিল, কখন এলে, এখানে বসে একলাটি—বেশ তো দাদাঠাকুর—এসো আমাদের বাড়ি। অপু বলিল, না ভাই, তুমি চাবিটা নিয়ে এসো—ঘরের মধ্যে দেখি জিনিসগুলোর কী অবস্থা। চাবি দিয়া নাদু চলিয়া গেল।—ঘর খুলে দেখো, আমি আসছি এখুনি। অপু ঘরে ঢুকিল। তক্তপোশের উপর বিছানা নাই, বালিশ, মাদুর কিছু নাই—তক্তপোশটা পড়িয়া আছে—তক্তপোশের তলায় একটা পাথরের খোরায় কী ভিজানো—খোরাটা হাতে তুলিয়া দেখিল। চিরতা না নিমছাল কী ভিজানো—মায়ের ওষুধ!

বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে বলিল, ঘরের মধ্যে কে?

অপু খোরাটা তক্তপোশের কোণে নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে দাওয়ায় আসিল। নিরুপমাদিদি—নিরুপমাও অবাক—গালে আঙুল দিয়া বলিল, তুমি! কখন এলে ভাই? কই কেউ তো বলেনি!

অপু বলিল, না, এই তো এলাম,—এই এখনও আধঘণ্টা হয়নি।

নিরুপমা বলিল, আমি বলি রোদ পড়ে গিয়েছে, কাঁথাটা কেচে মেলে দিয়ে এসেছি বাইরে, যাই কাঁথাখানি তুলে রেখে আসি কুণ্ডুদের বাড়ি। তাই আসছি—

অপু বলিল, কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল না, নিরুদি?

—কোথায়? পরশু রাতে তো তাঁর—পরশু বিকালে বড়ো বউকে বলেছেন, কাঁথাখানা সরিয়ে রাখো মা—ও আমার অপুর জন্যে, বর্ষাকালে কলকাতা পাঠাতে হবে—সেই পুরানো তুলোজমানো কালো কম্বলটা ছিল...সেইখানা গায়ে দিয়েছিলেন—তিনি আবার প্রাণ ধরে তোমার কাঁথা নষ্ট করবেন?... তাই কাল যখন ওরা তাঁকে নিয়ে থুয়ে গেল তখন ভাবলাম রোগীর বিছানায় তো ছিল কাঁথাখানা, জলকাচা করে রোদে দিই—কাল আর পারিনি—আজ সকালে ধুয়ে আলনায় দিয়ে গেলাম—তা এসো—আমাদের বাড়ি—ওসব শুনব না—মুখ শুকনো—হবিষ্যি হয়নি? এসো—

নিরুপমার আগে আগে সে কলের পুতুলের মতো তাদের বাড়ি গেল। সরকার মহাশয় কাছে ডাকিয়া বসাইয়া অনেক সান্ত্বনার কথা বলিলেন।

নিরুদি কী করিয়া মুখ দেখিয়া বুঝিল খাওয়া হয় নাই! নাদুও তো ছিল—কই কোনো কথা তো বলে নাই?

সব মিটিয়া গেলে সে কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিল, সর্বজয়ার জাঁতিখানা, সর্বজয়ার হাতে সই করা খান-দুই মনিঅর্ডারের রসিদ চালের বাতায় গোঁজা ছিল—সেগুলি, সর্বজয়ার নখ কাটিবার নরুনটা পুঁটলির মধ্যে বাঁধিয়া লইল। দোরের পাশে, ঘরের কোণে সেই তাকটা—আসিবার সময় সেদিকে নজর পড়িল। আচার ভরা ভাঁড়, আমসত্ত্বের হাঁড়িটা, কুলচুর, মায়ের গঙ্গাজলের পিতলের ঘটি, সবই

পড়িয়া আছে—সে যত ইচ্ছা খুশি খাইতে পারে, যাহা খুশি ছুঁইতে পারে, কেহ বকিবার নাই, বাধা দেবার নাই। তাহার প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে মুক্তি চায় না—অবাধ অধিকার চায় না—তুমি এসে শাসন করো, এসব ছুঁতে দিয়ো না—হাত দিতে দিয়ো না—ফিরে এসো মা—ফিরে এসো—

সর্বজয়া মারা যাইবার পর হইতেই অপুর জীবনে দ্রুত অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল। বিভিন্ন কারণে তাহার বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া হইল না। বহুদিন কষ্টদুঃখের সহিত ঘোর সংগ্রামের পর সে কোনো একটি সংবাদপত্রের অফিসে চাকুরি পাইল। এই অবস্থায় একদিন তাহার কলেজের প্রিয় বন্ধু প্রণবের সহিত দেখা হইয়া গেল। অপু প্রণবকে লইয়া রেস্তোরাঁয় ঢুকিল গল্প করিতে। চা খাইতে খাইতে প্রণব বলিল তাহার গ্রামের বাড়িতে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার মামাতো বোনের বিবাহ হইবে। সে যাইতেছে। অপু তো গ্রাম দেখিতে ভালোবাসে, অপু কি তাহার সঙ্গে যাইবে দেখিতে?

অপু রাজি হইল। বিবাহের রাত্রে ঘটিল এক আশ্চর্য ঘটনা। অনেক রাত্রে যখন নৌকাযোগে পাত্র আসিয়া পৌঁছিল, দেখা গেল সে বদ্ধ পাগল। প্রণবের মামিমা কিছুতেই উন্মাদের হাতে কন্যাদানে সম্মত হইলেন না। প্রভাত হইলে আর মেয়েটির কখনো বিবাহ দেওয়া যাইবে না। ফলে সকলের একান্ত অনুরোধে সেই রাত্রেই অপু প্রণবের মামাতো বোন অপর্ণাকে বিবাহ করিল।

প্রথমে কিছুদিন বাপের বাড়িতে রাখিবার পরে অপু অপর্ণাকে কলিকাতার বাসায় লইয়া আসিল। ছোটো বাসা, কিন্তু অপর্ণা তাহাকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া সংসার পাতিয়া বসিল। দিন বেশ কাটিতেছিল। নতুন সংসার করিয়া অপুও খুশি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার এক দুর্ঘটনা ঘটিল। সন্তান হইবার জন্য বাপের বাড়ি গিয়া অপর্ণা মারা গেল। তাহার শিশুপুত্রটি মামাবাড়িতে মানুষ হইতে লাগিল। অপুও অপর্ণার শোকে কেমন যেন হইয়া গেল। দু-একবার নিজের পুত্র কাজলকে দেখিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু লইয়া আসে নাই। কাজল দাদামশায়ের কাছেই রহিল।

অপু ছয়-সাত বৎসর সমস্ত ভারতে ঘুরিল; মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে কাজ করিল। এরই ফাঁকে ফাঁকে সে নিজের অপূর্ব মায়াময় শৈশব ও তাহার জীবন লইয়া একটি উপন্যাস লিখিল। উপন্যাসটি ছাপাইবার ব্যবস্থা করা দরকার, ছেলেকেও খুব দেখিতে ইচ্ছা করে! ছেলেকে এবার সে নিজের কাছে আনিয়া রাখিবে। অপু কলিকাতায় ফিরিল।

ভাদ্রমাসের শেষের দিক। দাদামহাশয়ের বৈকালিক মিছরির পানা খাওয়ার শ্বেতপাথরের গেলাসটা কাজলের বড়ো মামিমা মাজিয়া ধুইয়া উপরের ঘরের বাসনের চৌকিতে রাখিতে তাহার হাতে দিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় কেমন করিয়া গেলাস হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া ভাঙিয়া গেল। কাজলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল তাহার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের গতি যেন মিনিট খানেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। যাঃ সর্বনাশ। দাদামহাশয়ের মিছরিপানার গেলাসটা যে! সে দিশেহারা অবস্থায় টুকরাগুলো তাড়াতাড়ি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিল; পরে অন্য জায়গায় ফেলিয়া দিলে পাছে কেহ টের পায়, তাই তাড়াতাড়ি আরব্য উপন্যাস যাহার মধ্যে আছে সেই বড়ো কাঠের সিন্দুকটার পিছনে গোপনে রাখিয়া দিল। এখন সে কী করে। কাল যখন গেলাসের খোঁজ পড়িবে বিকালবেলা, তখন সে কী জবাব দিবে?

কাহারও কাছে ওকথা বলিল না, বাকি দিনটুকু ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিল না। একজায়গায় বসিতে পারে না, উদ্বিগ্ন মুখে ছটফট করিয়া বেড়ায়। ওইরকম একটা গেলাস আর কোথাও পাওয়া যায় না? একবার সে এক খেলুড়ে বন্ধুকে চুপিচুপি বলিল, ভাই তো-তোদের বাড়ি একটা পাথরের গে-গেলাস আছে।

কোথায় সে এখন পায় একটা শ্বেতপাথরের গেলাস? রাত্রে একবার তাহার মনে হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। কলিকাতা কোন দিকে? সে বাবার কাছে চলিয়া যাইবে কলিকাতায়—কাল বৈকালের পূর্বেই।

কিন্তু রাত্রে পালানো হইল না। নানা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিল। দুই-তিন বার কাঠের সিন্দুকটার পিছনে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল, গেলাসের টুকরাগুলা সেখান হইতে কেহ বাহির করিয়াছে কি না। বড়ো মামিমার সামনে আর যায় না, পাছে গেলাসটা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। দুপুরের কিছু পর বাড়ির রাস্তা দিয়া কে একজন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নাটমন্দিরের বেড়ার কাছে ছুটিয়া দেখিতে গেল—কিন্তু সাইকেল দেখা তাহার হইল না। নদীর বাঁধাঘাটে কাহাদের একখানা ডিঙিনৌকা লাগিয়াছে, একজন ফর্সা চেহারার লোকে একটি ছড়ি ও ব্যাগ হাতে ডিঙি হইতে নামিয়া ঘাটের সিঁড়িতে পা দিয়া মাঝির সঙ্গে কথা কহিতেছে—কাজল অবাক হইয়া ভাবিতেছে, লোকটা কে,

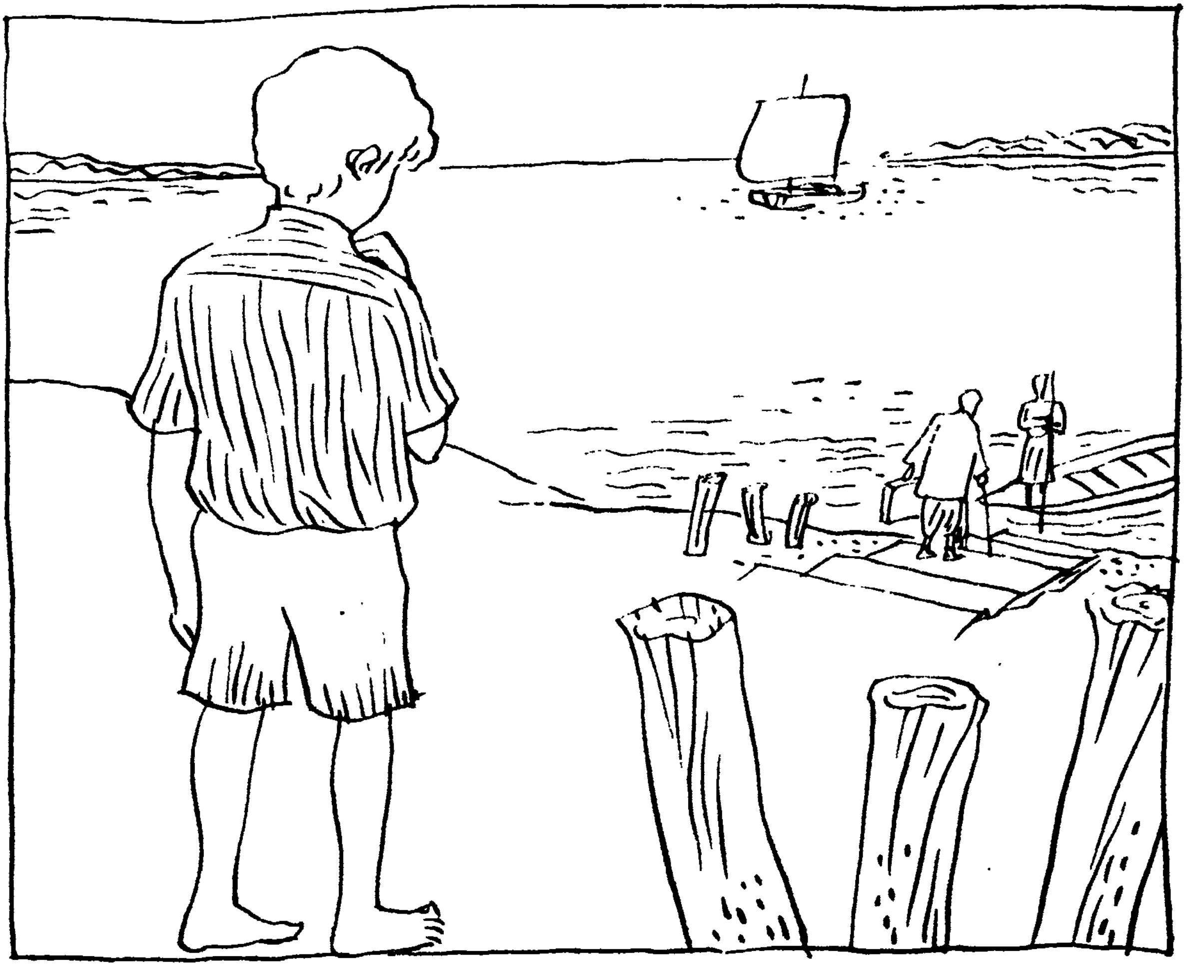

এমন সময় লোকটা মাঝির সঙ্গে কথা শেষ করিয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে কাজল অল্পক্ষণের জন্য চোখে যেন ধোঁয়া দেখিল, পরক্ষণেই সে নাটমন্দিরের বেড়া গলাইয়া বাহিরের নদীর ধারের রাস্তাটা বাহিয়া বাঁধা ঘাটের দিকে ছুটিল। যদিও অনেক বছর পরে দেখা তবুও কাজল চিনিয়াছে লোকটিকে—তাহার বাবা।

অপু খুলনার স্টিমার ফেল করিয়াছে! নতুবা সে কাল রাত্রেই এখানে পৌঁছিত। সে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতেছিল, পরশু ভোরে নৌকা এখানে আসিয়া তাহাকে বরিশালের স্টিমার ধরাইয়া দিতে পারিবে কি না। কথা শেষ করিয়াই ফিরিয়া চাহিল। সে দেখিল একটি ছোট্টো সুশ্রী বালক ঘাটের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। পরক্ষণেই সে চিনিল। আজ সারা পথ, নৌকায় সে ছেলের কথা ভাবিয়াছে, না জানি সে কত বড়ো হইয়াছে, কেমন দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে না মনে রাখিয়াছে! ছেলের আগেকার চেহারা তাহার মনে ছিল না। এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া সে যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইল—তাহার সেই তিন বছরের ছোট্ট খোকা এমন সুদর্শন লাবণ্যভরা বালকে পরিণত হইল কবে?

সে হাসিমুখে বলিল, কি রে খোকা, চিনতে পারিস?—কাজল ততক্ষণে আসিয়া অসীম নির্ভয়তার সহিত তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—ফুলের মতো মুখটি উঁচু করিয়া হাসিভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না বই কী? আমি বেড়ার ধার থেকে দেখেই ছুট দিইছি—এতদিন আসনি কে-কেন বাবা?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। এতদিন তো ভুলিয়া ছিল, তা আজ এইমাত্র—হঠাৎ দেখিবামাত্রই অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। কী আশ্চর্য, এই ক্ষুদ্র বালকটি তাহারই ছেলে, জগতে নিতান্ত অসহায় হাত-পা হারা অবোধ—জগতে সে ছাড়া ওর আর কেউ তো নাই! কী করিয়া এতদিন সে ভুলিয়া ছিল।

কাজল বলিল, ব্যাগে কী বাবা?

—দেখবি? চল দেখাব এখন। তোর জন্যে কেমন পিস্তল আছে, একসঙ্গে দুম দুম আওয়াজ হয়, ছবির বই আছে দুখানা, কেমন একটা রবারের বেলুন—

—তো-তো তোমাকে একটা কথা বলব বাবা? তো-তোমার একটা পাথরের গে-গেলাস আছে?

—পাথরের গেলাস? কেন রে, পাথরের গেলাস কী হবে?

কাজল চুপিচুপি বাবাকে গেলাস ভাঙার কথা সব বলিল। বাবার কাছে কোনো ভয় হয় না। অপু হাসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, আচ্ছা চল কোনো ভয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে কাজলের সব ভয়টা কাটিয়া গেল, একজন অসীম শক্তিধর বজ্রপাণি দেবতা যেন হঠাৎ বাহুদ্বয় মেলিয়া তাহাকে অভয়দান করিয়াছে—মাভৈঃ।

রাত্রে কাজল বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা?

অপুর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় এখন নিজেরই অচল। সে ভুলাইবার জন্য বলিল, আচ্ছা হবে, হবে! শোন একটা গল্প বলি খোকা। কাজল চুপ করিয়া গল্প শুনিল। বলিল, নিয়ে যাবে তো বাবা? এখানে সবাই বকে, মারে বাবা। তুমি নিয়ে চলো তোমার কত কাজ করে দেব।

অপু হাসিয়া বলে, কাজ করে দিবি? কী কাজ করে দিবি রে খোকা?

তারপর সে ছেলেকে গল্প শোনায়, একবার চাহিয়া দেখে, কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খানিক রাত্রি পর্যন্ত সে একখানা বই পড়িল, পরে আলো নিবাইবার পূর্বে ছেলেকে ভালো করিয়া শোয়াইতে গেল। ঘুমন্ত অবস্থায় বালককে কী অদ্ভুত ধরনের অবোধ অসহায়, দুর্বল ও পরাধীন মনে হইল অপুর! কী অসহায় ও পরাধীন। সে ভাবে এই যে ছেলে, পৃথিবীতে এ তো কোথাও ছিল না, যাচিয়াও তো আসে নাই—অপর্ণা ও সে দুজনে যে উহাকে কোন অনন্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার পর সংসারে আনিয়া অবোধ নিষ্পাপ বালককে একা এভাবে সংসার ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে? কিন্তু এখন কোথায়ই বা লইয়া যায়?

প্রাচীন গ্রিসের এক সমাধির উপর সেই যে স্মৃতিফলকটির কথা সে পড়িয়াছিল ফ্রেডারিক হ্যারিসনের বই-এ।

The child of ten years
Philip, his father laid here
His great hope, Nikoteles.

সে দূর কালের ছোট্ট বালকটির সুন্দর মুখ, সুন্দর রং দেবশিশুর মতো সুন্দর দশ বৎসরের বালক নিকোটিলিসকে আজ রাত্রে যেন নির্জন প্রান্তরে খেলা করিতে দেখিতে পাইতেছে—সোনালি চুল, ডাগর ডাগর চোখ। তাহার স্নেহস্মৃতি গ্রিসের নির্জন প্রান্তরের সমাধিক্ষেত্রের বুকে অমর হইয়া আছে। শত শতাব্দী পূর্বে সেই বিরহী পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে সে যেন আজ নিজের নাড়ির যোগ অনুভব করিল। মনে হইল, মানুষ সব কালে, সব অবস্থায় এক, এক।

কিংবা...দেবতার মন্দিরদ্বারে আরোগ্যকামী বহু যাত্রী জড়ো হইয়াছে নানা দিকদেশ হইতে...ছোটো ছেলেটির গরিব বাবা তাহাকে আনিয়াছে—ছেলেটি অসুখে ভোগে, রুগ্ন, স্বপ্নে দেবতা আসিয়া বলিলেন, যদি তোমার রোগ সারিয়ে দিই, আমায় কী দেবে ইউফেনিস? উঃ, সত্যি। অসুখ সারিলে সে বাঁচে। ছেলেটি উৎসাহের সুরে বলিল—দশটা মার্বেল আমার আছে, সব কটাই দিয়ে দেব—দেবতা খুশির সুরে বলিলেন—স—ব—ক—টা! বলো কী? বেশ বেশ, রোগ সারিয়ে দেব তোমার!

বাৎসল্যরসের এমন গভীর অনুভূতি জীবনে তাহার এই প্রথম—

স্ত্রীর গহনা বেচিয়া বই-ছাপাইয়া ফেলিল পুজোর পরেই!

কাজলকে সে কলিকাতায় লইয়া আসিল। পরদিন বৈকালের ট্রেনে সন্ধ্যার পর গাড়িখানা শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকিল! এত আলো, এত বাড়িঘর, এত গাড়িঘোড়া—কী কাণ্ড এসব! কাজল বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। সে শুধু বাবার হাত ধরিয়া চারিদিকে ডাগর চোখে চাহিতে চাহিতে চলিল।

হ্যারিসন রোডের বড়ো বড়ো বাড়িগুলা দেখাইয়া একবার সে বলিল, ওগুলো কাদের বাড়ি, বাবা? অত বাড়ি?

বাবার বাসায় ঢুকিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া সে গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া বড়ো রাস্তাটার গাড়িঘোড়া

দেখিতে লাগিল। অবাক জলপান জিনিসটা কী? বাবার দেওয়া দুটো পয়সা কাছে ছিল, এক পয়সার অবাক-জলপান কিনিয়া খাইয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এমন অপূর্ব জিনিস সে জীবনে আর কখনো খায় নাই। চাল ছোলা ভাজা সে অনেক খাইয়াছে। কিন্তু মশলা দিয়া ইহারা তৈরি করে এই অবাক জলপান?

অপু তাহাকে ডাকিয়া বাসার মধ্যে লইয়া গেল—এরকম একলা কোথাও যাসনে খোকা। হারিয়ে যাবি কী...কী হবে। যাওয়ার দরকার নেই।

কাজলের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। আর দাদামশায়ের বকুনি খাইতে হইবে না, একা গিয়া দোতলার ঘরে রাত্রিতে শুইতে হইবে না, মামিদের ভয়ে পাতের প্রত্যেক ভাতটি খুঁটিয়া গুছাইয়া খাইতে হইবে না। একটি ভাত পাতের নীচে পড়িয়া গেলে বড়ো মামিমা বলিত, পেয়েছ পরের, দেদার ফেলো আর ছড়াও —বাবার অন্ন তো খেতে হল না কখনো!

ছেলেমানুষ হইলেও সবসময় এই খাবার খোঁটা কাজলের মনে বড়ো বাজিত।

পরের দিন কাজল চিড়িয়াখানা দেখিল, গড়ের মাঠ দেখিল। মিউজিয়ামে অধুনালুপ্ত সেকালের কচ্ছপের প্রস্তরীভূত বৃহৎ খোলা দুটি দেখিয়া সে অনেকক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া কী ভাবিল। পরে অপু ফিরিয়া যাইতেছে, কাজল বাবার কাপড় ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া বলিল, শোনো বাবা!—কচ্ছপ দুটোর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, আচ্ছা এ দুটোর মধ্যে যদি যুদ্ধ হয় তবে কে জেতে বাবা? অপু গম্ভীর ভাবে ভাবিয়া ভাবিয়া বলে, ওই বাঁ দিকেরটা জেতে—কাজলের মনের দ্বন্দ্ব দুর হয়।

কিন্তু গোলদিঘিতে মাছের ঝাঁক দেখিয়া সে সকলের অপেক্ষা খুশি। এত বড়ো মাছ এত একসঙ্গে। মেলা ছেলেমেয়ে মাছ দেখিতে জুটিয়াছে, বৈকালে সেও বাবার কথায় এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া জলে ছড়াইয়া দিয়া অধীর আগ্রহে মাছের খেলা দেখিতে লাগিল। তুমি ছিপে ধরবে বাবা, কত বড়ো বড়ো মাছ? অপু বলিল, চুপ চুপ—ও মাছ ধরতে দেয় না!

ফুটপাতে একজন ভিখারি বসিয়া! কাজল ভয়ের সুরে বলিল, শিগগির একটা পয়সা দাও বাবা, নইলে ছুঁয়ে দেবে—তাহার বিশ্বাস কলিকাতার যেখানে যত ভিখারি বসিয়া আছে ইহাদের পয়সা দিতেই হইবে, নতুবা ইহারা আসিয়া ছুঁইয়া দিবে, তখন তোমাকে বাড়ি ফিরিয়া স্নান করিতে হইবে, সন্ধেবেলা কাপড় ছাড়িতে হইবে—সে এক মহা হাঙ্গামা।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপুর চাকরিটা গেল। অর্থের এমন কষ্ট সে অনেকদিন ভোগ করে নাই। ভালো স্কুলে দিতে না পারিয়া সে ছেলেকে কর্পোরেশনের ফ্রি স্কুলে ভরতি করিয়া দিল। ছেলেকে দুধ পর্যন্ত দিতে পারে না, ভালো কিছু খাওয়াইতে পারে না। বইয়ের বিশেষ কিছু আয় নাই। হাত এদিকে একেবারে কপর্দকশূন্য।

কাজলের মধ্যে অপু একটা পৃথক জগত দেখিতে পায়। দুটা টিনের চাকতি, গোটা দুই মার্বেল, একটা কল-টেপা খেলনা মোটর গাড়ি, খান দুই বই হইতে যে মানুষ কীসে এত আনন্দ পায় অত—তাহা বুঝিতে পারে না। চঞ্চল ও দুষ্টু ছেলে—পাছে হারাইয়া যায় এই ভয়ে অপু তাহাকে মাঝে মাঝে ঘরে চাবি

দিয়া রাখিয়া নিজের কাজে বাহির হইয়া যায়—এক-একদিন চার-পাঁচ ঘণ্টা হইয়া যায়—কাজলের কোনো অসুবিধা নাই—সে রাস্তার ধারের জানালাটায় দাঁড়াইয়া পথের লোকজন দেখিতেছে—না হয়, বাবার বইগুলো নাড়িয়া-চাড়িয়া ছবি দেখিতেছে—মোটের উপর বেশ আনন্দেই আছে।

একদিন কাজল লাজুক মুখে বলিল, বাবা একটা কথা বলব?

—কী?

—নাঃ বাবা—বলব না—

—বল না কী?

কাজল সরিয়া আসিয়া চুপিচুপি লাজুক সুরে বলিল, তুমি মদ খাও বাবা?

অপু বিস্মিত হইয়া বলিল, মদ...কে বলেছে তোকে?

—সেই যে সেদিন খেলে? সেই রাস্তার মোড়ে একটা দোকান থেকে? পান কিনলে আর সেই যে—

অপু প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল—পরে বুঝিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, দূর বোকা, সে হল লেমনেড—সেই পানের দোকানে তো?...তোর ঠান্ডা লেগেছিল বলে তোকে দিইনি!... খাওয়াব তোকে একদিন, ও একরকম মিষ্টি শরবত। দূর—

কাজলের কাছে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া সে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল যে এখানে মোড়ে মোড়ে মদের দোকান—পান ও মদ একসঙ্গে বিক্রয় হয় প্রায় সর্বত্র। সোডা লেমনেড সে কখনো দেখে নাই ইহার আগে, জানিত না—কী করিয়া সে ধরিয়া লইয়াছে বোতলে ওগুলো মদ। তাই তো সেদিন বাবাকে খাইতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে—এতদিন লজ্জায় বলে নাই। সেই দিনই অপু তাহাকে লেমনেড খাওয়াইয়া তাহার ভ্রম ঘুচাইয়া দিল।

কাজল এই কয়মাসেই বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে। বাড়িতেই পড়ে। অনেক সময় নিজের বই রাখিয়া বাবার বইগুলির পাতা উলটাইয়া দেখে। আজকাল বাবা কী কাজে সর্বদাই বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইজন্য বাবার কাজও সে অনেক করে।

এই সময়ে অপুর হঠাৎ অসুখ হইল। সকালে অন্যদিনের মতো আর বিছানা হইতে উঠিতেই পারিল না—বাবা সকালে উঠিয়া মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খায়—কাজলের মনে হয় সব ঠিক আছে—কিন্তু আজ বেলা দশটা বাজিল, বাবা এখনও শুইয়া—জগৎটা আর যে স্থিতিশীল নয়, নিত্য নয়—সব কী যেন হইয়া গিয়াছে। সেই রোদ উঠিয়াছে, কিন্তু রোদের চেহারা অন্যরকম, গলিটার চেহারা অন্যরকম, কিছু ভালো লাগে না, বাবার অসুখ এই প্রথম, বাবাকে আর কখনো সে অসুস্থ দেখে নাই—কাজলের ক্ষুদ্র জগতে সব যেন ওলটপালট হইয়া গেল। সারাদিনটা কাটিল, বাবার সাড়া নাই, সংজ্ঞা নাই, জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া। কাজল পাঁউরুটি কিনিয়া খাইল। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। কাজল পরমানন্দ পানওয়ালার দোকান হইতে তেল পুরিয়া আনিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া দিল। বাবা তখনও সেইরকমই শুইয়া। কাজল অস্থির হইয়া উঠিল—তাহার কোনো অভিজ্ঞতা নাই। কী এখন সে করে? দু-একবার বাবার কাছে গিয়া ডাকিল, জ্বরের ঘোরে বাবা একবার বলিয়া উঠিল, স্টোভটা নিয়ে আয়, ধরাই খোকা—স্টোভটা—

অর্থাৎ সে স্টোভটা ধরাইয়া কাজলকে রাঁধিয়া দিবে।

কাজল ভাবিল, বাবাও তো সারাদিন কিছু খায় নাই—স্টোভ ধরাইয়া বাবাকে সাগু তৈরি করিয়া

দিবে। কিন্তু স্টোভ সে ধরাইতে জানে না, কী করে এখন? স্টোভটা ঘরের মেঝেতে লইয়া দেখিল তেল নাই। আবার পরমানন্দের দোকানে গেল। পরমানন্দকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পাশেই একজন নতুন পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিসপেনসারি। ডাক্তারটি একেবারে নতুন। একা ডাক্তারখানায় বসিয়া কড়ি-বড়গা গুণিতেছিল। তিনি তাহাদের সঙ্গে বাসায় আসিলেন, অপুকে ডাকিয়া তাহার হাত ও বুক দেখিলেন, কাজলকে ঔষধ লইবার জন্য ডাক্তারখানায় আসিতে বলিলেন। অপু তখন একটু ভালো— সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ক্ষীণসুরে বলিল, ও পারবে না, রাত্তিরে এখন থাক, ছেলেমানুষ এখন থাক,—

এইসবের জন্য বাবার উপয় রাগ হয় কাজলের। কোথায় সে ছেলেমানুষ। সে বড়ো হইয়াছে। কোথায় সে না যাইতে পারে, বাবা পাঠাইয়া দেখুক দিকি সে কেমন পারে না। বিশেষত অপরের সামনের তাহাকে কচি বলিলে, ছেলেমানুষ বলিলে, আদর করিলে বাবার উপর তাহার ভারী রাগ হয়।

বাবার সামনে স্টোভ ধরাইতে গেলে কাজল জানে বাবা বারণ করিবে, বলিবে, উঁহু করিসনে খোকা, হাত পুড়িয়ে ফেলবি। সে সরু বারান্দাটার এক কোণে স্টোভটা লইয়া গিয়া কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও সেটা জ্বালিতে পারিল না। অপু একবার বলিল, কী কচ্ছিস ও খোকা, কোথায় গেলি ও খোকা? আঃ বাবার জ্বালায় অস্থির। ঘরে আসিয়া বলিল, বাবা কী খাবে? মিছরি আর বিস্কুট কিনে আনব? অপু বলিল, না না, সে তুই পারবিনে। আমি খাব না কিছু। লক্ষ্মী বাবা, কোথাও যেয়ো না ঘর ছেড়ে, রাত্তিরে কি কোথাও যায়? হারিয়ে যাবি—

হ্যাঁ, সে হারাইয়া যাইবে? ছাড়িয়া দিলে সে সব জায়গায় যাইতে পারে, পৃথিবীর সর্বত্র একা যাইতে পারে, বাবার কথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

দেড় মাস হইল অপু সারিয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালে যাইতে হয় নাই। এই গলিরই মধ্যে বাঁড়ুজ্যেরা বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, তাঁহাদের এক ছেলে ভালো ডাক্তার। তিনি অপুর বাড়িওয়ালার মুখে শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন, ইনজেক্‌শনের ব্যবস্থা করিলেন, শুশ্রূষার লোক দিলেন, কাজলকে নিজের বাড়ি হইতে খাওয়াইয়া আনিলেন। উহাদের বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়া গিয়াছে।

চৈত্রের প্রথম। চাকুরি অনেক খুঁজিয়া মিলিল না। তবে আজকাল লিখিয়া কিছু আয় হয়।

সকালে একদিন অপু মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কাজলকে পড়াইতেছিল। একজন কুড়ি-বাইশ বছরের চশমা পরা ছেলে দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ্ঞে আসতে পারি? আপনারই নাম অপূর্ববাবু? নমস্কার।

—আসুন, বসুন বসুন। কোত্থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, আমি ইউনিভারসিটিতে পড়ি। আপনার বই পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সবাই এত মুগ্ধ হয়েছে, তাই আপনার ঠিকানা নিয়ে—

অপু খুব খুশি হইল—বই পড়িয়া এত ভালো লাগিয়াছে যে, বাড়ি খুঁজিয়া দেখা করিতে আসিয়াছে একজন শিক্ষিত তরুণ যুবক। এ তার জীবনে এই প্রথম। ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে ইয়ে, এই ঘরটাতে আপনি থাকেন বুঝি?

অপু একটি সংকুচিত হইয়া পড়িল, ঘরের আসবাবপত্র অতি হীন, ছেঁড়া মাদুরে পিতাপুত্রে বসিয়া পড়িতেছে; খানিকটা আগে কাজল ও সে দুজনে মুড়ি খাইয়াছে, মেঝের খানিকটাতে তার চিহ্ন। সে

ছেলের ঘাড়ে সব দোষটা চাপাইয়া দিয়া সলজ্জ সুরে বলিল, তুই এমন দুষ্টু হয়ে উঠছিস খোকা, রোজ রোজ তোকে বলি খেয়ে অমন করে ছড়াবিনে—তা তোর—আর বাটিটা অমন দোরের গোড়া—

কাজল এ অকারণ তিরস্কারের হেতু না বুঝিয়া কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল, আমি কই বাবা, তুমিই তো বাটিটাতে মুড়ি—

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাম, লেখ, বানানগুলো লিখে ফেল—

যুবকটি বলিল, আমাদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে খুব আলোচনা—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওবেলা বাড়িতে থাকবেন? 'বিভাবরী' কাগজের এডিটার শ্যামাচরণবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আমি—আরও তিন-চারজন সেই সঙ্গে আসব।—তিনটে? আচ্ছা, তিনটেতেই ভালো! আরও খানিক কথাবার্তার পর যুবক বিদায় লইলে অপু ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল,—উস্-স্-স্ খোকা। ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না বাবা—

—না বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার রাগ করো না। কিন্তু কী করা যায় বলতো?

—কী বাবা?

—তুই এক্ষুনি ওঠ, পড়া থাক এবেলা, এই ঘরটা ঝেড়ে বেশ ভালো করে সাজাতে হবে—আর ওই তোর ছেঁড়া জামাটা তক্তপোশের নীচে লুকিয়ে রাখ দিকি। ওবেলা 'বিভাবরী'র সম্পাদক আসবে।

—'বিভাবরী' কী বাবা?

'বিভাবরী' কাগজ রে পাগল, কাগজ—দৌড়ে যা তো পাশের বাসা থেকে বালতিটা চেয়ে নিয়ে আয় তো!

বৈকালের দিকে ঘরটা একরকম মন্দ দাঁড়াইল না, তিনটের পরে সবাই আসিলেন। শ্যামাচরণবাবু বলিলেন, আপনার বইটার কথা আমার কাগজে যাবে আসছে মাসে। ওটাকে আমিই আবিষ্কার করেছি মশাই! আপনার লেখা গল্পটল্প দিন না।

পরের মাসে 'বিভাবরী' কাগজে তাহার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার গল্পটাও বাহির হইল। শ্যামাচরণবাবু ভদ্রতা করিয়া পঁচিশটা টাকা গল্পের মূল্যস্বরূপ লোক মারফত পাঠাইয়া দিয়া আরেকটা চাহিয়া পাঠাইলেন।

অপু ছেলেকে প্রবন্ধটি পড়িতে দিয়া নিজে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া শুনিতে লাগিল। কাজল খানিকটা বলিল, বাবা এতে তোমার নাম লিখেছে যে। অপু হাসিয়া বলিল, দেখেছিস খোকা, লোকে কত ভালো বলেছে আমাকে? তোকেও একদিন ওইরকম বলবে, পড়াশুনো করবি ভালো করে, বুঝলি?

দোকানে গিয়া শুনিল 'বিভাবরী'তে প্রবন্ধ বাহির হইবার পরে খুব বই কাটিতেছে—তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্থান হইতে তিনখানি পত্র আসিয়াছে। বইখানার অজস্র প্রশংসা।

একদিন কাজল বসিয়া পড়িতেছে, সে ঘরে ঢুকিয়া হাত দুখানা পিছনের দিকে লুকাইয়া বলিল, খোকা বল তো হাতে কী? কথাটা বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল, শৈশবে একদিন তাহার বাবা—সেও এমনি বৈকাল বেলাটা—তাহার বাবা এইভাবেই, ঠিক এই কথা বলিয়াই খবরের কাগজের মোড়কটা তাহার হাতে দিয়াছিল! জীবনের চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কী অদ্ভুত ভাবেই আবর্তিত হইতেছে, চিরযুগ ধরিয়া। কাজল ছুটিয়া গিয়া বলিল, কী বাবা দেখি?—পরে বাবার হাত হইতে জিনিসটা লইয়া দেখিয়া বিস্মিত ও

পুলকিত হইয়া উঠিল। অজস্র ছবিওয়ালা আরব্য উপন্যাস! দাদামশায়ের বইয়ে তো এত রঙিন ছবি ছিল না? নাকের কাছে ধরিয়া দেখিল কিন্তু তেমন পুরানো গন্ধ নাই, সেই এক অভাব।

অনেকদিন পরে হাতে পয়সা হওয়াতে সে নিজের জন্য একরাশ বই ও ইংরেজি ম্যাগাজিন কিনিয়া আনিয়াছে।

অপু 'বিভাবরী' ও 'বঙ্গ সুহৃদ' দুখানা পত্রিকার তরফ হইতে উপন্যাস লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। দুখানাই প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র, দুখানারই গ্রাহক সারা বাংলা জুড়িয়া এবং পৃথিবীর যেখানে যেখানে বাঙালি আছে সর্বত্র। 'বিভাবরী' তাহাকে সম্প্রতি আগাম কিছু টাকা দিল—'বঙ্গ সুহৃদ' এর নিজেদের বড়ো প্রেস আছে—তাহারা নিজের খরচে অপুর একখানা ছোটো গল্পের বই ছাপাইতে রাজি হইল। অপুর বইখানির বিক্রয়ও হঠাৎ বাড়িয়া গেল, আগে যেসব দোকানে তাহাকে পুঁছিতও না—সেসব দোকান হইতে বই চাহিয়া পাঠাইতে লাগিল। এই সময়ে একটি বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ফার্মের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইল, অপু যেন একবার গিয়ে দেখা করে।

অপু বৈকালের দিকে দোকানে গেল। তাহারা বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ নিজেদের খরচে ছাপাইতে ইচ্ছুক—অপু কী চায়? অপু ভাবিয়া দেখিল। প্রথম সংস্করণ হু-হু করিয়া কাটিতেছে—অপর্ণার গহনা বিক্রয় করিয়া বই ছাপাইয়াছিল, লাভটা তার সবই নিজের। ইহাদের দিলে লাভ কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু দোকানে দোকানে ছুটাছুটি, তাগাদা—এসব হাঙ্গামাও কমিবে। তা ছাড়া নগদ টাকার একটা মোহ আছে, সাত-পাঁচ ভাবিয়া সে রাজি হইল। ফার্মের কর্তা তখনই একটা লেখাপড়া করিয়া লইলেন—আপাতত ছশো টাকায় কথাবার্তা মিটিল, শ-দুই সে নগদ পাইল।

দুশো টাকা খুচরা ও নোটে। একগাদা টাকা হাতে ধরে না। কী করা যায় এত টাকায়? পুরানো দিন হইলে সে ট্যাক্সি করিয়া খানিকটা বেড়াইত, রেস্টুরেন্টে খাইত, বায়োস্কোপ দেখিত। কিন্তু আজকাল আগেই খোকার কথা মনে হয়! খোকাকে কী আনন্দ দেওয়া যায় এ টাকায়?

একটা ছোটো গলি দিয়া যাইতে যাইতে একটা শরবতের দোকান। দোকানটাতে পান বিড়ি বিস্কুট বিক্রি হয়, আবার গোটা দুই-তিন সিরাপের বোতলও রহিয়াছে! দিনটা খুব গরম, অপু শরবত খাওয়ার জন্য দোকানটাতে দাঁড়াইল। অপুর একটু পরেই দুটি ছেলে-মেয়ে সেখানে কী নিতে আসিল। গলিরই গরিব ভাড়াটে গৃহস্থ ঘরের ছোটো ছেলে-মেয়ে—মেয়েটি বছর সাত, ছেলেটি একটু বড়ো। মেয়েটি আঙুল দিয়া সিরাপের বোতল দেখাইয়া বলিল, ওই দেখ দাদা, সবুজ—বেশ ভালো, না? ছেলেটি বলিল, সব মিশিয়ে বরফ আছে, ওই যে—

—ক পয়সা নেয়?—চার পয়সা।

অপুর জন্য দোকানি শরবত মিশাইতেছে, বরফ ভাঙিতেছে, ছেলে-মেয়ে দুটি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি অপুর দিকে চাহিয়া বলিল, আপনাকে ওই সবুজ বোতল থেকে দেবে না?

যেন সবুজ বোতলের মধ্যে শচী দেবীর পায়েস পোরা আছে।

অপুর মন করুণার্দ্র হইল। ভাবিল—এরা বোধ হয় কখনো কিছু দেখেনি। এই রং করা টক চিনির রসকে কী ভাবছে, ভালো সিরাপ কী জানে না। বলিল, খুকি, খোকা খাবে? খাও না—ওদের দু-গ্লাস শরবত দাও তো—

প্রথমটা তারা খাইতে রাজি হয় না, অনেক করিয়া অপু তাহাদের লজ্জা ভাঙিল। অপু বলিল, ভালো সিরাপ তোমার আছে? থাকে তো দাও, আমি দাম দেব। কোনো জায়গা থেকে এনে দিতে পার না?

বোতলে যাহা আছে তাহার অপেক্ষা ভালো সিরাপ এ অঞ্চলে নাকি কুত্রাপি মেলা সম্ভব নয়। অবশেষে এই শরবতই এক বড়ো গ্লাস দুই ভাই-বোন মহাতৃপ্তি ও আনন্দের সহিত খাইয়া ফেলিল, সবুজ বোতলের সেই টক চিনির রসই।

অপু তাহাদের বিস্কুট ও এক পয়সা মোড়কের বাজে চকলেট কিনিয়া দিল—দোকানটাতে ভালো কিছু যদি পাওয়া যায় ছাই। তবুও অপুর মনে হইল পয়সা তার সার্থক হইয়াছে আজ।

রাত্রিতে অপুর মনে হইল সে একটা বড়ো অন্যায় করিতেছে, কাজলের প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিতেছে। ওরও তো সেই শৈশব। কাজলের এই অমূল্য শৈশবের দিনগুলিতে সে তাহাকে এই ইট, কংক্রিট, সিমেন্ট ও বার্ড কোম্পানির পেটেন্ট স্টোনে বাঁধানো কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার কাঁচা, উৎসুক স্বপ্নপ্রবণ শিশুমন তুচ্ছ বৈচিত্র্যহীন অনুভূতিতে ভরাইয়া তুলিতেছে—তাহার জীবনে বন-বনানী নাই, নদীর মর্মর নাই, পাখির কলস্বর, মাঠ, জ্যোৎস্না, সঙ্গী-সাথিদের সুখদুঃখ—এসব কিছুই নাই, অথচ কাজল অতি সুন্দর ভাবপ্রবণ বালক—তাহার পরিচয় সে অনেকবার পাইয়াছে।

কাজল দুঃখ জানুক, জানিয়া মানুষ হউক। দুঃখ তার শৈশবে গল্পে পড়া সেই সোনা-করা জাদুকর। ছেঁড়াখোড়া কাপড় ঝুলি ঘাড়ে বেড়ায়, এই চাপদাড়ি, বনেবাদাড়ে ফেরে, কারুর সঙ্গে কথা নয়, কেউ পোঁছে না। সকলে পাগল বলে দুর দুর করে—রাতদিন হাপর জ্বালায়।

পেতল থেকে; রাং থেকে, সীসে থেকে ও-লোক কিন্তু সোনা করিতে জানে, করিয়াও থাকে।

এই দিনটিতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সর্বপ্রথম এতকাল পরে একটা চিন্তা মনে উদয় হইল। নিশ্চিন্দিপুরে একবারটি ফিরিলে কেমন হয়? সেখানে আর কেউ না থাক, শৈশব সঙ্গিনী রানুদিদি তো আছে। সে যদি বিদেশে চলিয়া যায়, তার আগে খোকাকে তার পিতামহের ভিটাটা দেখাইয়া আনাও তো একটা কর্তব্য?

পরদিনই সে কাশীতে লীলাদিকে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিল সে খোকাকে লইয়া নিশ্চিন্দিপুর যাইতেছে, খোকাকে পিতামহের গ্রামটা দেখাইয়া আনিবে। পত্রপাঠ যেন লীলাদিদি তার দেওরকে সঙ্গে লইয়া নিশ্চিন্দিপুরে চলিয়া যায়।

ট্রেনে উঠিয়াও যেন অপুর বিশ্বাস হইতেছিল না, সে সত্যই নিশ্চিন্দিপুরের মাটিতে আবার পা দিতে পারিবে—নিশ্চিন্দিপুর, সে তো শৈশবের স্বপ্নলোক! সে তো মুছিয়া গিয়াছে, মিলাইয়া গিয়াছে, সে শুধু একটা অনতিস্পষ্ট সুখস্মৃতি মাত্র, কখনো ছিল না, নাই-ও!

মাঝেরপাড়া স্টেশনে ট্রেন আসিল বেলা একটার সময়। খোকা লাফ দিয়া নামিল, কারণ প্লাটফর্ম খুব নিচু। অনেক পরিবর্তন হইয়াছে স্টেশনটার। প্লাটফর্মের মাঝখানে জাহাজের মাস্তুলের মতো উঁচু যে সিগন্যালটা ছেলেবেলায় তাহাকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল সেটা আর এখন নাই। স্টেশনের বাহিরে পথের উপর একটা বড়ো জাম গাছ, অপুর মনে আছে, এটা আগে ছিল না। ওর সেই মাদার গাছটা,

যেটার তলায় অনেককাল আগে তাহাদের এদেশ ছাড়িবার দিনটাতে মা খিচুড়ি রাঁধিয়াছিলেন। গাছের তলায় দুখানা মোটরবাস যাত্রীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া, অপুরা থাকিতে থাকিতে দুখানা পুরানো ফোর্ড ট্যাক্সিও আসিয়া জুটিল। আজকাল নাকি নবাবগঞ্জ পর্যন্ত বাস ও ট্যাক্সি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—জিনিসটা অপুর কেমন যেন ভালো লাগিল না। কাজল নবীন যুগের মানুষ, সাগ্রহে বলিল—

মোটরকারে করে যাব বাবা?

অপু ছেলেকে জিনিসপত্র সমেত ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিল। বটের ঝুরি দোলানো, স্নিগ্ধ ছায়াভরা সেই প্রাচীন দিনের পথটা দিয়া সে নিজে মোটরে চড়িয়া যাইতে পারিবে না কখনোই। এদেশের সঙ্গে পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ কি খাপ খায়?

রানুদিদির সঙ্গে দেখা হইল পরদিন বৈকালে। সাক্ষাতের পূর্ব-ইতিহাসটা কৌতুকপূর্ণ, কথাটা রানির মুখেই শুনিল।

রানি অপুর আসিবার কথা শুনে নাই। নদীর ঘাট হইতে বৈকালে ফিরিতেছে। বাঁশবনের পথে কাজল দাঁড়াইয়া আছে, সে একা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

রানি প্রথমত থতমত খাইয়া গেল—অনেককাল আগেকার একটি ছবি অস্পষ্ট মনে পড়িল—ছেলেবেলায় ওই ঘাটের ধারের জঙ্গলে-ভিটেটাতে হরিকাকারা বাস করিত, কোথায় যেন তাহারা উঠিয়া গিয়াছিল তারপরে। তাহাদের বাড়ির সেই অপু না! ছেলেবেলার সেই অপু? পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সে কাছে গিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিল—অপুও বটে, নাও বটে। যে বয়সে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহার সে সময়ের চেহারাখানা রানির মনে আঁকা আছে, কখনো ভুলিবে না—সেই বয়স সেই চেহারা, অবিকল। রানি বলিল, তুমি কাদের বাড়ি এসেছ খোকা?

কাজল বলিল, গাঙ্গুলিদের বাড়ি।

গাঙ্গুলিরা বড়োলোক। কলিকাতা হইতে কেহ কুটুম্ব আসিয়া থাকিবে, তাহাদেরই ছেলে। কিন্তু মানুষের মতোও মানুষ হয়? বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল একেবারে! গাঙ্গুলিবাড়ির বড়ো মেয়ের নাম করিয়া বলিল, তুমি বুঝি কাদুপিসির নাতি!

কাজল লাজুক চোখে চাহিয়া বলিল, কাদুপিসিকে জানিনে তো? আমার ঠাকুরদাদার এই গাঁয়ে বাড়ি ছিল—তাঁর নাম ঈশ্বর হরিহর রায়—আমার নাম শ্রীঅমিতাভ রায়।

বিস্ময়ে ও আনন্দে রানির মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না অনেকক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ভয়ও হইল। রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, তোমার বাবা—খোকা?...

কাজল বলিল, বাবার সঙ্গেই তো কাল এলাম। গাঙ্গুলি বাড়িতে এসে উঠলাম রাত্রে। বাবা ওদের বাইরের ঘরে বসে বসে গল্প করচে। মেলা লোক দেখা করতে এসেছে কিনা তাই।...

রানি দুই হাতের তালুর মধ্যে কাজলের সুন্দর মুখখানা লইয়া আদরের সুরে বলিল, খোকন, খোকন ঠিক বাবার মতো দেখতে—চোখ দুটি অবিকল। তোমার বাবাকে এ পাড়ায় ডেকে নিয়ে এসো খোকন। বলোগে রানুপিসি ডাকচে।

সন্ধ্যার আগেই ছেলের হাত ধরিয়া অপু রানিদের বাড়ি ঢুকিয়া বলিল, কোথায় গেলে রানুদি, চিনতে পার?...রানু ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, অবাক হইয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিল, মনে করে যে এলি এতকাল পরে? তা ও-পাড়ায় গিয়ে উঠলি কেন? গাঙ্গুলিরা আপনার লোক হল তোর?...পরে লীলাদির মতো সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

দূর গ্রামের জাওয়া-বাঁশের বন অস্ত-আকাশের রাঙা পটে অতিকায় লায়ার পাখির পুচ্ছের মতো খাড়া হইয়া আছে, একধারে খুব উঁচু পাড়ে সারিবাঁধা গাংশালিখের গর্ত. কী অপূর্ব শ্যামলতা, কী সান্ধ্য শ্রী!

কাজল বলিল, বেশ বাবা—না?

—তুই এখানে থাক খোকা—আমি যদি রেখে যাই এখানে, থাকতে পারবিনে? তোর পিসিমার কাছে থাকবি, কেমন তো!

কাজল বলিল, হ্যাঁ, ফেলে রেখে যাবে বই কী? আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা! অপু ভাবিতেছিল শৈশবে এই ইছামতী ছিল তার কাছে কী অপূর্ব কল্পনায় ভরা। গ্রামের মধ্যের বর্ষাদিনের জলকাদা-ভরা পথঘাট, বাঁশপাতা পচা আঁটাল মাটির গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাইয়া সে মুক্ত আকাশের তলে নদীর ধারটিতে আসিয়া বসিত। কত বড়ো নৌকা ওর ওপর দিয়া দূর দেশে চলিয়া যাইত। কোথায় ঝালকাটি, কোথায় বরিশাল, কোথায় রায়মঙ্গল—অজানা দেশের অজানা কল্পনায় মুগ্ধ মনে কতদিন সে না ভাবিয়াছে, সেও একদিন ওইরকম নেপাল মাঝির বড়ো ডিঙিটা করিয়া নিরুদ্দেশ বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইয়া যাইবে!

ইছামতী ছিল পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মা। তার তীরের আকাশে-বাতাসে সংগীত মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানি গানের মতো শত স্নেহে তার নবমুকুলিত কচি মনকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, তার তীরে সে সময়ের কত আকাঙ্ক্ষা. বৈচিত্র্য, রোমান্স, তার তীর ছিল দূরের অদেখা বিদেশ, বর্ষার দিনে এই ইছামতী কূলে কূলে ভরা ঢলঢল গৈরিক রূপে সে অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখিত। ইংরাজি বই-এ পড়া Cape Nun এর ওদিকের দেশটা—যে দেশ হইতে লোক আর ফেরে না; He who passes Cape Nun, will either return or not; মুগ্ধচোখে কুলছাপানো ইছামতী দেখিয়া তখন সে ভাবিত—ওঃ, কত বড়ো আমাদের এই গাংটা।

এখন সে আর বালক নাই, কত বড়ো নদীর দু-কূল ছাপানোর লীলা দেখিয়াছে—গঙ্গা, সোন, বড়দল, নর্মদা—তাদের অপূর্ব সন্ধ্যা, অপূর্ব বর্ণসম্ভার দেখিয়াছে—সে বৈচিত্র্য, সে প্রখরতা ইছামতীর নাই। এখন তার চোখে ইছামতী ছোটো নদী। এখন সে বুঝিয়াছে তার গরিব ঘরের মা উৎসব দিনের যে বেশভূষায় তার শৈশব কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া দিত, এসব বনেদি ঘরে মেয়েদের হিরামুক্তার ঘটা, বারাণসী শাড়ির রংঢং-এর কাছে তার মায়ের সেই কাচের চুড়ি শাঁখা কিছুই নয়।

কিন্তু তা বলিয়া ইছামতীকে সে কখনো ভুলিবে?

নদীতে গা ধুইতে গিয়া নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এইসব কথাই সে ভাবিতেছিল। সারাদিনটা আজ গুমট গরম, প্রতিপদ তিথি—কাল গিয়াছে পূর্ণিমা। আজ এখনি জ্যোৎস্না উঠিবে। এই নদীতে ছেলেবেলায় যেসব বধূরা জল লইতে আসিত, তারা এখন প্রৌঢ়া, যেসব কোকিল সেই ছেলেবেলাকার রামনবমী দিনের পুলক ভরাইয়া দুপুরের কুকু ডাক দিত, কচিপাতা-ওঠা বাঁশবনে তাদের ছেলে-মেয়েরা আবার তেমনি গায়!

শুধু তাহার দিদি শুইয়া আছে। রায়পাড়া ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন ছাতিম গাছটার তলায় তাহাদের গ্রামের শ্মশান। সে-দিদির বয়স আর বাড়ে নাই, মুখের তারুণ্য বিলুপ্ত হয় নাই—তার কাচের চুড়ি, নাটাফলের পুঁটুলি অক্ষয় হইয়া আছে এখনও। প্রাণের গোপন অন্তরে যেখানে অপুর শৈশবকালের কাঁচা শিশুমনটি প্রবৃদ্ধ জীবনের শত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উচ্চাশা ও কর্মস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়া মরিয়া আছে—সেখানে সে চিরবালিকা, শৈশব জীবনের সে সমাধিতে জনহীন অন্ধকার রাত্রে সে-ই আসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলে—শিশুপ্রাণের সাথিকে আবার খুঁজিয়া ফেরে।

আজ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া সাঁজ-সকালে আশ্রয়স্থানটিতে সোনার সূর্যকিরণ পড়ে। বর্ষাকালের নিশীথে মেঘ ঝরঝর জল ঢালে, ফাগুন দিনে ঘেঁটু ফুল, হেমন্ত দিনে ছাতিম ফুল ফোটে। জ্যোৎস্না ওঠে। কত পাখি গান গায়। সে এসবই ভালোবাসিত, এসব ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই কোথাও।

অপু তাহাদের ঘাটের ধারে আসিল। ওইখানটিতে এমন এক সন্ধ্যার অন্ধকারে বনদেবী বিশালাক্ষী স্বরূপ চক্রবর্তীকে দেখা দিয়েছিলেন কতকাল আগে!

আজ যদি আবার তাহাকে দেখা দেন!

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড়ো ভালো ছেলে! তুমি কী বর চাও?

—অন্য কিছুই চাইনে, এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী মাঠ বাঁশবাগানের ছায়ায় অবোধ, উদ্‌গ্রীব স্বপ্নময় আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি—তাকে আর একটিবার ফিরিয়া দেবে দেবী—?

'You enter it by the Ancient way
Through Ivory Gate and Golden.'

ঠিক দুপুরবেলা।

রানি কাজলকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না—বেজায় চঞ্চল। এই আছে, কোথা দিয়া যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছে—কেহ বলিতে পারে না। সে রোজ জিজ্ঞাসা করে, পিসিমা, বাবা কবে আসবে? কতদিন দেরি হবে?—

অপু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল, রানুদি, খোকাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, এখানে রাখবে, ওকে বলো না আমি কোথা যাচ্ছি। যদি আমার জন্য কাঁদে ভুলিয়া রেখো—তুমি ছাড়া ওকাজ আর কেউ পারবে না।

কাজলের ঝোঁক পাখির উপর। এত পাখি সে কখনো দেখে নাই—তাহার মামার বাড়ির দেশে ঘিঞ্জি বসতি, এত বড়ো বন, মাঠ নাই—এখানে আসিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় পিছনের সমস্ত মাঠ, বন, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দৈত্যদানো ভূত ও শিয়ালের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে—পিসিমার কাছে আরও ঘেঁষিয়া শোয়। কিন্তু দিনমানে আর ভয় থাকে না, তখন পাখির ডিম ও বাসা খুঁজিয়া বেড়াইবার খুব সুযোগ। রানু বারণ করিয়াছে, গাঙের ধারের পাখির গর্তে হাত দিয়ো না কাজল, সাপ থাকে। শোনে না, সেদিনও গিয়াছিল পিসিমাকে লুকাইয়া কিন্তু অন্ধকার হইয়া গেলেই তার যত ভয়।

কখনো সে ঠাকুরদাদার পোড়ো ভিটাটাতে ঢোকে নাই। বাহির হইতে তাহার বাবা তাহাকে দেখাইয়াছিল, বোধ হয় ঘন বন বলিয়া ভিতরে লইয়া যায় নাই। একবার ঢুকিয়া দেখিতে কৌতূহল হইল!

জায়গাটা উঁচু ঢিবিমতো। কাজল এদিকে-ওদিকে চাহিয়া ঢিবিটার উপরে উঠিল—তারপর ঘন কুঁচকাঁটা ও শ্যাওড়া বনের বেড়া ঠেলিয়া নীচের উঠানে নামিল চারিধারে ইট, বাঁশের কঞ্চি, ঝোপঝাপ। পাখি নাই এখানে? এখানে তো কেউ আসে না—কত পাখির বাসা আছে হয়তো—কে বা খোঁজ রাখে?

বসন্তবৌরী ডাকে—টুকলি—টুকলি। তাহার বাবা চিনাইয়াছিল, কোথায় বাসাটা? না এমনি ডালে বসিয়া ডাকিতেছে?

মুখ উঁচু করিয়া খোকা ঝিকড়ে গাছের ঘন ডালপালার দিকে উৎসুক চোখে দেখিতে লাগিল।

এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্তী, ঠ্যাঙাড়ে বিরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা-অজানা সমস্ত পূর্বপুরুষ দিবসের প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে তুমি—আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি—আমাদের আশীর্বাদ নাও বংশের উপযুক্ত হও।

আরও হইল। সোঁদালি বনে ছায়া হইতে জল আহরণরত সহদেব, ঠাকুরমাদের বেলতলা হইতে শরশয্যাশায়িত ভীষ্ম, এ ঝোপের ও ঝোপের তলা হইতে বীর কর্ণ, গাণ্ডীবধারী অর্জুন, অভাগিনী ভানুমতী, কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, পরাজিত রাজপুত্র দুর্যোধন, তমসাতীরের পর্ণ কুটিরে প্রীতিমতী তাপসবধূবেষ্টিতা অশ্রুমুখী ভগবতী দেবী জানকী, স্বয়ংবর সভায় বরমাল্যহস্তে ভ্রাম্যমাণা আনতবদনা সুন্দরী সুভদ্রা, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে মাঠে মাঠে গোচারণরত সহায়-সম্পদহীন দরিদ্র, ব্রাহ্মণপুত্র ত্রিজট—হাতছানি দিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে তুমি, এই যে আবার ফিরে এসেছ। চেন না আমাদের? কত দুপুরে ভাঙা জানালাটায় বসে বসে আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি যে কত পরিচয়। এসো...এসো...এসো।

সঙ্গে সঙ্গে রানুর গলা শোনা গেল, ও খোকা, ওরে দুষ্টু ছেলে, এই এক গলা বনের মধ্যে ঢুকে তোমার কী হচ্ছে জিজ্ঞেস করি—বেরিয়ে আয় বলছি। খোকা হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল। সে পিসিমাকে মোটেই ভয় করে না। সে জানে পিসিমা তাকে খুব ভালোবাসে—দিদিমার পরে এক বাবা ছাড়া তাকে এমন ভালো আর কেউ বাসে নাই।

হঠাৎ সেই সময় রানুর মনে হইল অপু ঠিক এমনি দুষ্টু মুখের ভঙ্গি করিত ছেলেবেলায়—ঠিক এমনটি।

যুগে যুগে অপরাজিত জীবনরহস্য কী অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে!

খোকার বাবা একটু ভুল করিয়াছিল।

চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

চাঁদের পাহাড়

শংকর একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। এইবার সে সবে এফ.এ. পাশ দিয়ে গ্রামে বসেছে। কাজের মধ্যে সকালে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, দুপুরে আহারান্তে লম্বা ঘুম, বিকেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া।

সারা বৈশাখ এইভাবে কাটাবার পরে একদিন তার মা ডেকে বললেন, শোন একটা কথা বলি শংকর। তোর বাবার শরীর ভালো নয়। এ অবস্থায় আর তোর পড়াশুনা হবে কী করে? কে খরচ দেবে? এইবার একটা কিছু কাজের চেষ্টা দেখ।

মায়ের কথাটা শংকরকে ভাবিয়ে তুললে। সত্যিই তার বাবার শরীর আজ ক-মাস থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে। কলকাতার খরচ দেওয়া তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠচে। অথচ করবেই বা কী শংকর? এখন কি তাকে কেউ চাকরি দেবে? চেনেই বা সে কাকে?

আমরা যে সময়ের কথা বলচি, ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ বাধতে তখনও পাঁচ বছর দেরি। ১৯০৯ সালের কথা। তখন চাকরির বাজার এতটা খারাপ ছিল না। শংকরদের গ্রামের এক ভদ্রলোক শ্যামনগরে না নৈহাটিতে পাটের কলে চাকরি করতেন। শংকরের মা তাঁর স্ত্রীকে ছেলের চাকরির কথা বলে এলেন, যাতে তিনি স্বামীকে বলে শংকরের জন্যে পাটের কলে একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক পরদিন বাড়ি বয়ে বলতে এলেন যে শংকরের চাকুরির জন্যে তিনি চেষ্টা করবেন।

শংকর সাধারণ ধরনের ছেলে নয়। স্কুলে পড়বার সময় সে বারবার খেলাধুলোতে প্রথম হয়ে এসেছে। সেবার মহকুমার একজিবিশনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার করে মেডেল পায়। ফুটবলে অমন সেন্টার ফরওয়ার্ড ও অঞ্চলে তখন কেউ ছিল না। সাঁতার দিতে তার জুড়ি খুঁজে মেলা ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বক্সিং-এ সে অত্যন্ত নিপুণ। কলকাতায় পড়বার সময় ওয়াই. এম. সি. এ.-তে সে রীতিমতো বক্সিং অভ্যাস করেছে। এইসব কারণে পরীক্ষায় সে তত ভালো করতে পারেনি, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু তার একটি বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। তার বাতিক ছিল যত রাজ্যের ম্যাপ ঘাঁটা ও বড়ো বড়ো ভূগোলের বই পড়া। ভূগোলের অঙ্ক কষতে সে খুব মজবুত। আমাদের দেশের আকাশে যেসব নক্ষত্রমণ্ডল ওঠে, তা সে প্রায় সবই চেনে—ওটা কালপুরুষ, ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া, ওটা বৃশ্চিক। কোন মাসে কোনটা ওঠে, কোন দিকে ওঠে—সব ওর নখদর্পণে। আকাশের দিকে চেয়ে তখনি বলে দেবে। আমাদের দেশের বেশি ছেলে যে এসব জানে না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময় সে একরাশ ওইসব বই কিনে এনেছে, নির্জনে বসে প্রায়ই পড়ে আর কী ভাবে ওই জানে। তারপর এল তার বাবার অসুখ, সংসারের দারিদ্র্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে পাটকলে চাকরি নেওয়ার জন্যে অনুরোধ। কী করবে সে? সে নিতান্ত নিরুপায়। মা-বাপের মলিন মুখ সে দেখতে পারবে না। অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকরি নিতে হবে। কিন্তু জীবনের

স্বপ্ন তাহলে ভেঙে যাবে, তাও সে যে না বোঝে এমন নয়। ফুটবলের নাম-করা সেন্টার ফরওয়ার্ড, জেলার হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ান, নামজাদা সাঁতারু শংকর হবে কিনা শেষে পাটের কলের বাবু; নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে সকালের ভোঁ বাজতেই ছুটতে হবে কলে, আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা, ওদিকে সেই ছটার ভোঁ বাজলে ছুটি। তার তরুণ তাজা মন এর কথা ভাবতেই পারে না যে! ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাকড়া গাড়ি টানতে যাবে?

সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই। নদীর ধারে নির্জনে বসে বসে শংকর এইসব কথাই ভাবছিল। তার মন উড়ে যেতে চায়। পৃথিবীর দূর, দূর দেশে—শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। লিভিংস্টোন, স্ট্যানলির মতো, হ্যারি জনস্টন, মার্কো পোলো, রবিনসন ক্রুসোর মতো। এর জন্যে ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরি করেছে—যদিও একথা ভেবে দেখেনি অন্য দেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালি ছেলেদের পক্ষে তা ঘটা একরকম অসম্ভব। তারা তৈরি হয়েছে কেরানি, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হবার জন্যে। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাতপথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।

প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েস্টমার্কের বড়ো ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল।

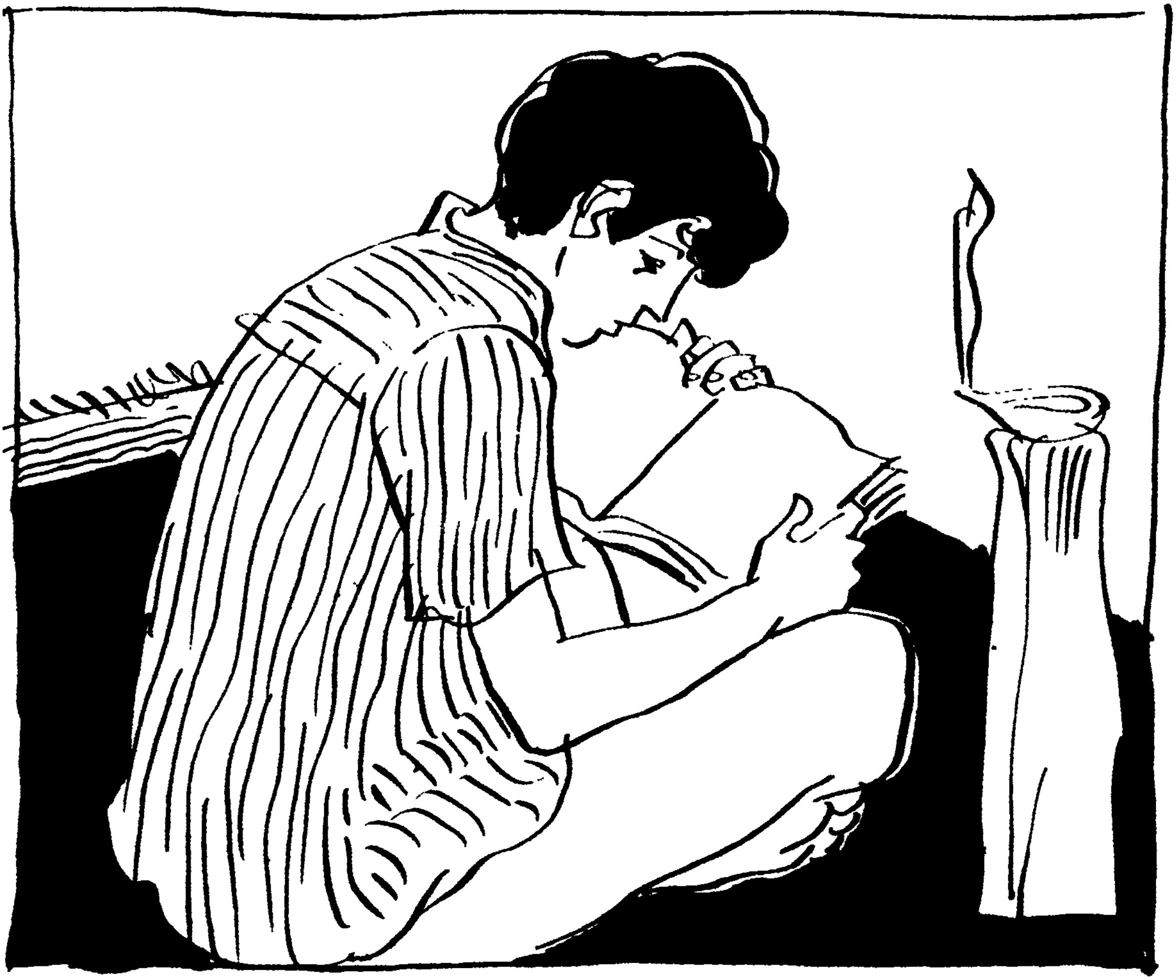

এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড়ো মুগ্ধ করে। সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ জার্মান পর্যটক অ্যান্টন হাউপ্টমান লিখিত আফ্রিকার একটা বড়ো পর্বত—মাউনটেন অফ দি মুন (চাঁদের পাহাড়) আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ। কতবার সে এটা পড়েছে। পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের হাউপ্টমানের মতো সেও একদিন যাবে মাউনটেন অফ দি মুন জয় করতে।

স্বপ্ন! সত্যিকার চাঁদের পাহাড় দূরের জিনিসই চিরকাল। চাঁদের পাহাড় বুঝি পৃথিবীতে নামে?

সে রাত্রে বড়ো অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল সে:

চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনো হাতির দল মড়মড় করে বাঁশ ভাঙচে। সে আর একজন কে তার সঙ্গে, দুজনে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে উঠেচে, চারধারের দৃশ্য ঠিক হাউপ্টমানের লেখা মাউনটেন অফ দি মুনের দৃশ্যের মতো। সেই ঘন বাঁশ বন, সেই পরগাছা ঝোলানো বড়ো বড়ো গাছ, নীচে পচাপাতার রাশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ের খালি গা, আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া সব ধবধবে চিরতুষারে ঢাকা পর্বত-শিখরটি এক-একবার দেখা যাচ্ছে, এক-একবার বনের আড়ালে চাপা পড়চে। পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতির গর্জন শুনতে পেলে...সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল, এত বাস্তব বলে মনে সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার উপর উঠে বসল, ভোর হয়ে গিয়েছে, জানলার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেছে।

উঃ, কী স্বপ্নটাই দেখেছে সে! ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয় বলে তো অনেকে।

অনেকদিন আগের একটি ভাঙা পুরোনো মন্দির আছে তাদের গাঁয়ে। বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়ার জামাই মদন রায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মন্দির তৈরি করেন। এখন মদন রায়ের বংশে কেউ নেই। মন্দির ভেঙেচুরে গিয়েছে, অশ্বত্থ গাছ, বট গাছ গজিয়েছে কার্নিশে—কিন্তু যেখানে ঠাকুরের বেদি তার উপরের খিলেনটা এখনও ঠিক আছে। কোনো মূর্তি নেই, তবুও শনি-মঙ্গলবারে পুজো হয়, মেয়েরা বেদিতে সিঁদুর-চন্দন মাখিয়ে রেখে যায়। সবাই বলে ঠাকুর বড়ো জাগ্রত, যে যা মানত করে তাই হয়। শংকর সেদিন স্নান করে উঠে মন্দিরে একটা বটের ঝুরির গায়ে একটা ঢিল ঝুলিয়ে কী প্রার্থনা জানিয়ে এল।

বিকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে দূর্বাঘাসের বনে বসে রইল। জায়গাটা পাড়ার মধ্যে হলেও বনে ঘেরা, কাছেই একটা পোড়ো বাড়ি; এদের বাড়িতে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল শংকরের শিশুকালে—সেই থেকে বাড়ির মালিক এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাস করছেন; সবাই বলে জায়গাটায় ভূতের ভয়। একা কেউ এদিকে আসে না। শংকরের কিন্তু এই নির্জন মন্দির-প্রাঙ্গণের নিরালা বনে চুপ করে বসে থাকতে বড়ো ভালো লাগে।

ওর মনে আজ ভোরের স্বপ্নটা দাগ কেটে বসে গিয়েছে। এই বনের মধ্যে বসে শংকরের আবার সেই ছবিটা মনে পড়ল—সেই মড়মড় করে বাঁশঝাড় ভাঙচে বুনো হাতির দল, পাহাড়ের অধিত্যকার নিবিড় বনে পাতা-লতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক উঁচুতে পর্বতের জ্যোৎস্নাপাণ্ডুর তুষারাবৃত শিখরদেশটা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের সীমা নির্দেশ করছে। কত স্বপ্ন তো সে দেখেছে জীবনে—অত সুস্পষ্ট ছবি স্বপ্নে সে দেখেনি কখনো, এমন গভীর রেখাপাত করেনি কোনো স্বপ্ন তার মনে।

সব মিথ্যে। তাকে যেতে হবে পাটের কলে চাকরি করতে। তাই তার ললাট-লিপি, নয় কি?

কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা উপন্যাসে ঘটাতে গেলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে। শংকরের জীবনেও এমন একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গেল।

সকালবেলা সে একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে সবে বাড়িতে পা দিয়েছে, এমন সময় ওপাড়ার রামেশ্বর মুখুজ্যের স্ত্রী একটুকরো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বললেন, বাবা শংকর, আমার জামায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে অনেকদিন পরে। ভদ্রেশ্বরের ওদের বাড়িতে চিঠি দিয়েচে, কাল পিন্টু সেখান থেকে এসেচে, এই তার ঠিকানা তারা লিখে দিয়েচে। পড়ো তো বাবা।

শংকর বললে, উঃ, প্রায় দু-বছরের পর খোঁজ মিলল। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কী ভয়টাই দেখালেন। এর আগেও তো একবার পালিয়ে গেছলেন—না? তারপর সে কাগজটা খুললে। লেখা আছে—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউগান্ডা রেলওয়ে হেড অফিস কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট, মোম্বাসা, পূর্ব-আফ্রিকা।

শংকরের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা পড়ে গেল। পূর্ব-আফ্রিকা। পালিয়ে মানুষ এতদূর যায়? তবে সে জানে ননীবালাদিদির এই স্বামী অত্যন্ত একরোখা ডানপিটে ও ভবঘুরে ধরনের। একবার এই গ্রামেই তার সঙ্গে শংকরের আলাপও হয়েছিল, শংকর তখন এনট্রান্স ক্লাসে সবে উঠেছে। লোকটা খুব উদার প্রকৃতির, লেখাপড়া ভালোই জানে, তবে কোনো একটা চাকরিতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না, উড়ে বেড়ানো স্বভাব। আর একবার পালিয়ে বর্মা না কোচিন কোথায় যেন গিয়েছিল। এবারও বড়দাদার সঙ্গে কী নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার দরুন বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, এখবর শংকর আগেই শুনেছিল। সেই প্রসাদবাবু পালিয়ে গিয়ে ঠেলে উঠেচে একেবারে পূর্ব-আফ্রিকায়।

রামেশ্বর মুখুজ্যের স্ত্রী ভালো বুঝতে পারলেন না তাঁর জামাই কত দূরে গিয়েছে। অতটা দূরত্বের তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি চলে গেলে শংকর ঠিকানাটা নিজের নোট বইয়ে লিখে রাখলে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই প্রসাদবাবুকে একখানা চিঠি দিলে। শংকরকে তাঁর মনে আছে কি? তাঁর শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের ছেলে সে। এবার এফ. এ. পাশ দিয়ে বাড়িতে বসে আছে। তিনি কি একটা চাকরি করে দিতে পারেন তাঁদের রেলের মধ্যে? যতদূরে হয় সে যাবে।

দেড়মাস পরে, যখন শংকর প্রায় হতাশ হয়ে পড়েচে চিঠির উত্তর প্রাপ্তি সম্বন্ধে, তখন একখানা খামের চিঠি এল শংকরের নামে। তাতে লেখা আছে:

মোম্বাসা
২নং পোর্ট স্ট্রিট

প্রিয় শংকর,

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। কবজির জোরে তোমার কাছে সেবার হেরে গিয়েছিলুম, সেকথা ভুলিনি। তুমি আসবে এখানে? চলে এসো। তোমার মতো ছেলে যদি বাইরে না বেরুবে তবে কে আর বেরুবে? এখানে নতুন রেল তৈরি হচ্ছে, আরও লোক নেবে। যত তাড়াতাড়ি পার এসো। তোমার কাজ জুটিয়ে দেবার ভার আমি নিচ্ছি। তোমাদের—

প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শংকরের বাবা চিঠি দেখে খুব খুশি। যৌবনে তিনিও নিজে ছিলেন ডানপিটে ধরনের লোক। ছেলে পাটের কলে চাকরি করতে যাবে তাঁর এতে মত ছিল না, শুধু সংসারের অভাব অনটনের দরুন শংকরের মায়ের মতেই সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর মাসখানেক পরে শংকরের নামে এক টেলিগ্রাম এল ভদ্রেশ্বর থেকে। সেই জামাইটি দেশে এসেছেন সম্প্রতি। শংকর যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে টেলিগ্রাম পেয়েই। তিনি আবার মোম্বাসায় ফিরবেন দিন কুড়ির মধ্যে। শংকরকে তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন।

দুই

চার মাস পরের ঘটনা। মার্চ মাসের শেষ।

মোম্বাসা থেকে যে রেলপথ গিয়েছে কিসুমু-ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের ধারে—তারই একটা শাখা লাইন তখন তৈরি হচ্ছিল। জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়ে তিনশো মাইল পশ্চিমে। ইউগান্ডা রেলওয়ের নুডসবার্গ স্টেশন থেকে বাহাত্তর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এখানে শংকর কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কেরানি ও সরকারি স্টোরকিপার হয়ে এসেচে। থাকে ছোটো একটা তাঁবুতে। তার আশেপাশে অনেক তাঁবু। এখানে এখনও বাড়িঘর তৈরি হয়নি বলে তাঁবুতেই সবাই থাকে। তাঁবুগুলো একটা খোলা জায়গায় চক্রাকারে সাজানো—তাদের চারধার ঘিরে বহুদূরব্যাপী মুক্ত প্রান্তর, লম্বা লম্বা ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে গাছ। তাঁবুগুলোর ঠিক গায়েই খোলা জায়গার শেষ সীমায় একটা বড়ো বাওবাব গাছ। আফ্রিকার বিখ্যাত গাছ, শংকর কতবার ছবিতে দেখেচে, এবার সত্যিকার বাওবাব দেখে শংকরের যেন আশ মেটে না।

নতুন দেশ, শংকরের তরুণ তাজা মন, সে ইউগান্ডার এই নির্জন মাঠ ও বনে নিজের স্বপ্নের সার্থকতাকে যেন খুঁজে পেলে। কাজ শেষ হয়ে যেতেই সে তাঁবু থেকে রোজ বেরিয়ে পড়ত, যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকে বেড়াতে বের হত—পুবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। সব দিকেই লম্বা লম্বা ঘাস কোথাও মানুষের মাথা সমান উঁচু, কোথাও তার চেয়েও উঁচু!

কনস্ট্রাকশন তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিন শংকরকে ডেকে বললেন, শোনো রায়, ওরকম এখানে বেড়িয়ো না। বিনা বন্দুকে এখানে এক পা-ও যেয়ো না। প্রথম, এই ঘাসের জমিতে পথ হারাতে পার। পথ হারিয়ে লোকে এসব জায়গায় মারাও গিয়েছে জলের অভাবে। দ্বিতীয়, ইউগান্ডা সিংহের দেশ। এখানে আমাদের সাড়াশব্দ আর হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজে সিংহ হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েচে—কিন্তু ওদের বিশ্বাস নেই। খুব সাবধান! এসব অঞ্চল মোটেও নিরাপদ নয়।

একদিন দুপুরের পর কাজকর্ম বেশ পুরোদমে চলচে, হঠাৎ তাঁবু থেকে কিছু দূরে লম্বা ঘাসের জমির মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই সেদিকে ছুটে গেল ব্যাপার কী দেখতে। শংকরও ছুটল। ঘাসের জমি পাতিপাতি করে খোঁজা হল—কিছুই নেই সেখানে।

কীসের চিৎকার তবে?

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এলেন। কুলিদের নাম-ডাকা হল, দেখা গেল একজন কুলি অনুপস্থিত। অনুসন্ধানে জানা গেল সে একটু আগে ঘাসের বনের দিকে কী কাজে গিয়েছিল, তাকে ফিরে আসতে কেউ দেখেনি।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে ঘাসের বনের বাইরে কটা বালির উপরে সিংহের পায়ের দাগ পাওয়া

গেল। সাহেব বন্দুক নিয়ে লোকজন সঙ্গে করে পায়ের দাগ দেখে অনেক দূর গিয়ে একটা বড়ো পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলির রক্তাক্ত দেহ বার করলেন। তাকে তাঁবুতে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল। কিন্তু সিংহের কোনো চিহ্ন মিলল না। লোকজনের চিৎকারে সে শিকার ফেলে পালিয়েছে। সন্ধ্যার আগেই কুলিটা মারা গেল।

তাঁবুর চারপাশের লম্বা ঘাস অনেক দূর পর্যন্ত কেটে সাফ করে দেওয়া হল পরদিনই। দিন কতক সিংহের কথা ছাড়া তাঁবুতে আর কোনো গল্পই নেই। তারপর মাসখানেক পরে ঘটনাটা পুরোনো হয়ে গেল, সেকথা সকলের মনে চাপা পড়ে গেল। কাজকর্ম আবার বেশ চলল।

সেদিন দিনে খুব গরম। সন্ধ্যার একটু পরেই কিন্তু ঠান্ডা পড়ল। কুলিদের তাঁবুর সামনে অনেক কাঠ-কুটো জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েচে। সেখানে তাঁবুর সবাই গোল হয়ে বসে গল্পগুজব করচে। শংকরও সেখানে আছে, সে ওদের গল্প শুনচে এবং অগ্নিকুণ্ডের আলোতে 'কেনিয়ামর্নিং নিউজ' পড়ছে। খবরের কাগজখানা পাঁচ দিনের পুরোনো। কিন্তু এ জনহীন প্রান্তরে তবু এখানাতে বাইরের দুনিয়ার যা কিছু একটা খবর পাওয়া যায়।

তিরুমল আপ্পা বলে একজন মাদ্রাজি কেরানির সঙ্গে শংকরের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিরুমল তরুণ যুবক, বেশ ইংরেজি জানে, মনেও খুব উৎসাহ। সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। শংকরের পাশে বসে সে আজ সন্ধ্যা থেকে ক্রমাগত দেশের কথা, তার বাপ-মায়ের কথা, তার ছোটো বোনের কথা বলছে! ছোটো বোনকে সে বড়ো ভালোবাসে। বাড়ি ছেড়ে এসে তার কথাই তিরুমলের বড়ো মনে হয়। একবার সে দেশের দিকে যাবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। মাস দুই ছুটি মঞ্জুর করবে না সাহেব?

ক্রমে রাত বেশি হল। মাঝে মাঝে আগুন নিভে যাচ্ছে, আবার কুলিরা তাতে কাঠকুটো ফেলে দিচ্ছে। আরও অনেকে উঠে শুতে গেল। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ ধীরে ধীরে দূর দিগন্তে দেখা দিল—সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলো-আঁধারের লুকোচুরি আর বুনো গাছের দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া।

শংকরের ভারী অদ্ভুত মনে হচ্ছিল বহুদূর বিদেশের এই স্তব্ধ রাত্রির সৌন্দর্য। কুলিদের ঘরের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে একদৃষ্টে সম্মুখের বিশাল জনহীন তৃণভূমির আলো-আঁধারমাখা রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কী ভাবছিল। ওই বাওবাব গাছটার ওদিকে অজানা দেশের সীমা কেপটাউন পর্যন্ত বিস্তৃত—মধ্যে পড়বে কত পর্বত, অরণ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগর জিম্বাব্রি—বিশাল ও বিভীষিকাময় কালাহারি মরুভূমি, হীরকের দেশ, সোনার খনির দেশ!

একজন বড়ো স্বর্ণান্বেষী পর্যটক যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যে পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেলেন সেটা হাতে তুলে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার সঙ্গে সোনা মেশানো রয়েচে। সে জায়গায় বড়ো একটা সোনার খনি বেরিয়ে পড়ল। এধরনের কত গল্প সে পড়েছে দেশে থাকতে।

এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় মহাদেশ, সোনার দেশ, হিরের দেশ—কত অজানা জাতি, অজানা দৃশ্যাবলী, অজানা জীবজন্তু এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কে তার হিসেব রেখেছে?

কত কী ভাবতে ভাবতে শংকর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কীসের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠেছে। ধবধবে সাদা জ্যোৎস্না দিনের মতো

পরিষ্কার। অগ্নিকুণ্ডের আগুন গিয়েছে নিবে। কুলিরা সব কুণ্ডলী পাকিয়ে আগুনের উপর শুয়ে আছে। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ শংকরের দৃষ্টি পড়ল তার পাশে—এখানে তো তিরুমল আপ্পা বসে বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল। সে কোথায়? তাহলে সে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে গিয়ে থাকবে।

শংকরও নিজে উঠে শুতে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে অল্প দূরেই পশ্চিম কোণে মাঠের মধ্যে ভীষণ সিংহ গর্জন শুনতে পাওয়া গেল। রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোক যেন কেঁপে উঠল সে রবে। কুলিরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন। শংকর জীবনে এই প্রথম শুনলে সিংহের গর্জন—সেই দিকদিশাহীন তৃণভূমির মধ্যে শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সে গর্জন যে কী এক অনির্দেশ্য অনুভূতি তার মনে জাগালে। তা ভয় নয়, সে এক রহস্যময় জটিল মনোভাব। একজন বৃদ্ধ মাসাই কুলি ছিল তাঁবুতে। সে বললে, সিংহ লোক মেরেচে। লোক না মারলে এমন গর্জন করবে না।

তাঁবুর ভিতর থেকে তিরুমেলর সঙ্গী এসে হঠাৎ জানালে তিরুমলের বিছানা শূন্য। তাঁবুর মধ্যে কোথাও সে নেই।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। শংকরও নিজে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখে এল সত্যিই সেখানে কেউ নেই। তখনই কুলিরা আলো জ্বেলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সব তাঁবুগুলোতে খোঁজ করা হল, নাম ধরে চিৎকার করে ডাকাডাকি করলে সবাই মিলে—তিরুমলের কোনো সাড়া মিলল না।

তিরুমল যেখানটাতে শুয়ে ছিল, সেখানটাতে ভালো করে দেখা গেল তখন। কোনো একটা ভারী জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মাটির উপর সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে কারো দেরি হল না। বাওবাব গাছের কাছে তিরুমলের জামার হাতার খানিকটা টুকরো পাওয়া গেল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে আগে আগে চললেন, শংকর তাঁর সঙ্গে চলল। কুলিরা তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল। সেই গভীর রাত্রে তাঁবু থেকে দূরে মাঠের চারিদিকে অনেক জায়গা খোঁজা হল, তিরুমলের দেহের কোনো সন্ধান মিলল না। এবার আবার সিংহ গর্জন শোনা গেল, কিন্তু দূরে। যেন এই নির্জন প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী কোনো রহস্যময়ী রাক্ষসীর বিকট চিৎকার।

মাসাই কুলিটা বললে, সিংহ দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। আরও অনেকগুলো মানুষ ও ঘায়েল না করে ছাড়বে না। সবাই সাবধান। যে সিংহ একবার মানুষ খেতে শুরু করে, সে অত্যন্ত ধূর্ত হয়ে ওঠে।

রাত যখন প্রায় তিনটে, তখন সবাই ফিরল তাঁবুতে। বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার এই অংশে পাখি বড়ো একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু একধরনের রাত্রিচর পাখির ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে—সে সুর অপার্থিব ধরনের মিষ্টি। এইমাত্র সেই পাখি কোনো গাছের মাথায় বহুদূরে ডেকে উঠল। মনটা এক মুহূর্তে উদাস করে দেয়। শংকর ঘুমুতে গেল না। আর সবাই তাঁবুর মধ্যে শুতে গেল কারণ পরিশ্রম কারো কম হয়নি। তাঁবুর সামনে কাঠকুটো জ্বালিয়ে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা হল। শংকর সাহস করে বাইরে বসতে অবিশ্যি পারলে না—এরকম দুঃসাহসের কোনো অর্থ হয় না। তবে সে নিজের খড়ের ঘরে শুয়ে জানলা দিয়ে বিস্তৃত জ্যোৎস্নালোকিত অজানা প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল।

মনে কী অদ্ভুত ভাব। তিরুমলের অদৃষ্টলিপি এইজন্যেই বোধ হয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনেছিল! তাকেই বা কী জন্যে এখানে এনেচে তার অদৃষ্ট, কে জানে তার খবর?

আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে—কিন্তু আফ্রিকা ভয়ংকর। দেখতে বাবলা বনে ভরতি বাংলাদেশের মাঠের মতো দেখালে কী হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসংকুল! যেখানে-সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা—পর মুহূর্তে কী ঘটবে, এ মুহূর্তে তা কেউ বলতে পারে না।

আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেছে—তরুণ হিন্দু যুবক তিরুমলকে। সে বলি চায়।

তিরুমল তো গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে পরদিন থেকে এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে, আর সেখানে সিংহের উপদ্রব থাকা যায় না। মানুষ-খেকো সিংহ অতি ভয়ানক জানোয়ার। যেমন সে ধূর্ত, তেমনি সাহসী। সন্ধ্যা তো দূরের কথা, দিনমানেই একা বেশিদূর যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার আগে তাঁবুর মাঠে নানা জায়গায় বড়ো বড়ো আগুনের কুণ্ড করা হয়, কুলিরা আগুনের কাছে ঘেঁষে বসে গল্প করে, রান্না করে, সেখানে বসেই খাওয়াদাওয়া করে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক হাতে রাত্রে তিন-চারবার তাঁবুর চারদিকে ঘুরে পাহারা দেন, ফাঁকা আওয়াজ করেন—এত সতর্কতার মধ্যেও একটা কুলিকে সিংহ নিয়ে পালাল তিরুমলকে মারবার ঠিক দু-দিন পরে সন্ধ্যারাত্রে।

তার পরদিন একটা সোমালি কুলি দুপুরে তাঁবু থেকে তিনশো গজের মধ্যে পাথরের টিবিতে পাথর ভাঙতে গেল—সন্ধ্যায় সে আর ফিরে এল না।

সেই রাত্রেই, রাত দশটার পরে, শংকর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাঁবু থেকে ফিরছে, লোকজন কেউ বড়ো একটা বাইরে নেই, সকাল সকাল যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে, কেবল এখানে, ওখানে দু-একটা নির্বাতিপ্রায় অগ্নিকুণ্ড। দূরে শেয়াল ডাকছে—শেয়ালের ডাক শুনলেই শংকরের মনে হয় যে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের আছে—চোখ বুজে নিজের গ্রামটা ভাববার চেষ্টা করে, তাদের ঘরের কোণের সেই বিলিতি আমড়া গাছটা ভাববার চেষ্টা করে—আজও সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুজলে।

কী চমৎকার লাগে! কোথায় সে? সেই তাদের গাঁয়ের বাড়ির জানলার কাছে তক্তপোশে শুয়ে। বিলিতি আমড়া গাছটার ডালপালা চোখ খুলতেই চোখে পড়বে? ঠিক? দেখবে সে চোখ খুলে?

শংকর ধীরে ধীরে চোখ খুললে। অন্ধকার প্রান্তর। দূরে সেই বড়ো বাওবাব গাছটা অস্পষ্ট অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হল সামনের একটা ছাতার মতো গোল খড়ের নিচু চালার উপরে কী যেন একটা নড়চে। পরক্ষণেই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা সিংহ খড়ের চালা থাবা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করবার চেষ্টা করচে ও মাঝে মাঝে নাকটা চালার গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে কীসের যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে!

তার কাছ থেকে চালাটার দূরত্ব বড়োজোর বিশ হাত।

শংকর বুঝলে সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সিংহ চালার খড় খুঁচিয়ে গর্ত করতে ব্যস্ত, সেখান দিয়ে ঢুকে সে মানুষ নেবে—শংকরকে সে এখনও দেখতে পায়নি। তাঁবুর বাইরে কোথাও লোক নেই, সিংহের ভয়ে বেশি রাত্রে কেউ বাইরে থাকে না। নিজে সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, একগাছা লাঠি পর্যন্ত নেই হাতে।

শংকর নিঃশব্দে পিছু হঠতে লাগল ইঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর দিকে, সিংহের দিকে চোখ রেখে। এক

মিনিট...দু-মিনিট...নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যে তার এত কর্তৃত্ব ছিল, তা এর আগে শংকর জানত না। একটা ভীতিসূচক শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরুল না বা সে হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড় দেবার চেষ্টাও করলে না।

ইঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর পরদা উঠিয়ে সে ঢুকে দেখলে সাহেব টেবিলে বসে তখনও কাজ করছে! সাহেব ওর রকম-সকম দেখে বিস্মিত হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ও বললে, সাহেব, সিংহ।

সাহেব লাফিয়ে উঠল, কই? কোথায়?

বন্দুকের র‍্যাকে একটা .৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফেল ছিল, সাহেব সেটা নামিয়ে নিলে। শংকরকে আর একটা রাইফেল দিলে। দুজনে তাঁবুর পরদা তুলে আস্তে আস্তে বাইরে এল। একটু দূরেই কুলি লাইনের সেই গোল চালা। কিন্তু চালার উপর কোথায় সিংহ? শংকর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এইমাত্র দেখে গেলাম স্যার। ওই চালার উপর সিংহ থাবা দিয়ে খোঁচাচ্চে।

সাহেব বললে, পালিয়েছে। জাগাও সবাইকে।

একটু পরে তাঁবুতে মহা সোরগোল পড়ে গেল। লাঠি সড়কি, গাঁতি, মুগুর নিয়ে কুলির দল হল্লা করে বেরিয়ে পড়ল, খোঁজ খোঁজ চারিদিকে, খড়ের চালা সত্যি ফুটো দেখা গেল। সিংহের পায়ের দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সিংহ উধাও হয়েছে। আগুনের কুণ্ডে বেশি করে কাঠ ও শুকনো খড় ফেলে আগুন আবার জ্বালানো হল। সেই রাত্রে অনেকেরই ভালো ঘুম হল না, তাঁবুর বাইরেও বড়ো একটা কেউ রইল না। শেষ রাত্রের দিকে শংকর নিজের তাঁবুতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল—একটা মহা সোরগোলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মাসাই কুলিরা সিম্বা সিম্বা বলে চিৎকার করছে। দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল। শংকর তাঁবুর বাইরে এসে ব্যাপার জিজ্ঞেস করে জানলে সিংহ এসে আস্তাবলের একটা ভারবাহী অশ্বতরকে জখম করে গিয়েছে—এইমাত্র! সবাই শেষ রাত্রে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে আর সেই সময়ে এই কাণ্ড।

পরদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা ছোকরা কুলিকে তাঁবু থেকে একশো হাতের মধ্যে সিংহ নিয়ে গেল। দিন চারেক পর আর একটা কুলিকে নিলে বাওবাব গাছটার তলা থেকে।

কুলিরা কেউ আর কাজ করতে চায় না। লম্বা লাইনে গাঁতিওয়ালা কুলিদের অনেক সময় খুব ছোটো দলে ভাগ হয়ে কাজ করতে হয়—তারা তাঁবু ছেড়ে দিনের বেলাতেও বেশিদূর যেতে চায় না। তাঁবুর মধ্যে থাকাও রাত্রে নিরাপদ নয়। সকলের মনে ভয়—প্রত্যেকেই ভাবে এবার তার পালা। কাকে কখন নেবে কিছু স্থিরতা নয়। এই অবস্থায় কাজ হয় না। কেবল মাসাই কুলিরা অবিচলিত রইল—তারা যমকেও ভয় করে না। তাঁবু থেকে দু-মাইল দূরে গাঁতির কাজ তারাই করে, সাহেব বন্দুক নিয়ে দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার তাদের দেখাশুনা করে আসে।

কত নতুন ব্যবস্থা করা হল, কিছুতেই সিংহের উপদ্রব কমল না। অত চেষ্টা করেও সিংহ শিকার করা গেল না। অনেকে বলল, সিংহ একটা নয় অনেকগুলো—কটা মেরে ফেলা যাবে? সাহেব বললে, মানুষ-খেকো সিংহ বেশি থাকে না। এ একটা সিংহেরই কাজ।

একদিন সাহেব শংকরকে ডেকে বললে বন্দুকটা নিয়ে গাঁতিদার কুলিদের একবার দেখে আসতে। শংকর বললে, সাহেব তোমার ম্যানলিকারটা দাও।

সাহেব রাজি হল। শংকর বন্দুক নিয়ে একটা অশ্বতরে চড়ে রওনা হল—তাঁবু থেকে মাইলখানেক দূরে এক জায়গায় একটা ছোটো জলা। শংকর দূর থেকে জলাটা যখন দেখতে পেয়েচে, তখন বেলা প্রায় তিনটে। কেউ কোনোদিকে নেই, রোদ্দের ঝাঁজ মাঠের মধ্যে তাপ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেচে।

হঠাৎ অশ্বতর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর কিছুতেই সেটা এগিয়ে যেতে চায় না। শংকরের মনে হল জায়গাটার দিকে যেতে অশ্বতরটা ভয় পাচ্চে। একটু পরে পাশের ঝোপে কী যেন একটা নড়ল। কিন্তু সেদিকে চেয়ে সে কিছু দেখতে পেল না। সে অশ্বতর থেকে নামল তবুও। অশ্বতর নড়তে চায় না।

হঠাৎ শংকরের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝোপের মধ্যে সিংহ তার জন্যে ওত পেতে বসে নেই তো? অনেক সময়ে এরকম হয় সে জানে, সিংহ পথের পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিঃশব্দে তার শিকারের অনুসরণ করে। নির্জন স্থানে সুবিধে বুঝে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে। যদি তাই হয়? শংকর অশ্বতর নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনা করলে না। ভাবলে তাঁবুতে ফিরেই যাই। সবে সে তাঁবুর দিকে অশ্বতরের মুখটা ফিরিয়েছে এমন সময় আবার ঝোপের মধ্যে কী একটা নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক সিংহ গর্জন এবং একটা ধূসর বর্ণের বিরাট দেহ সশব্দে অশ্বতরের

উপর এসে পড়ল। শংকর তখন হাত চারেক এগিয়ে আছে, সে তখুনি ফিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে উপরি উপরি দুবার গুলি করলে! গুলি লেগেছে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু তখন অশ্বতর মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—ধূসর বর্ণের জানোয়ারটা পলাতক। শংকর পরীক্ষা করে দেখলে অশ্বতরের কাঁধের কাছে অনেকটা মাংস ছিন্নভিন্ন, রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সে ছটফট করচে। শংকর এক গুলিতে তার যন্ত্রণার অবসান করলে। তারপর সে তাঁবুতে ফিরে এল।

সাহেব বললে সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েছে। বন্দুকের গুলি যদি গায়ে লাগে তবে দস্তুরমতো জখম তাকে হতেই হবে কিন্তু গুলি লেগেছিল তো? শংকর বললে, গুলি লাগালাগির কথা সে বলতে পারে না। বন্দুক ছুঁড়েছিল এইমাত্র কথা। লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে দু-তিন দিনেও কোনো আহত বা মৃত সিংহের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

জুন মাসের প্রথম থেকে বর্ষা নামল। কতকটা সিংহের উপদ্রবের জন্যে, কতকটা বা জলাভূমির সান্নিধ্যের জন্যে জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁবু ওখান থেকে উঠে গেল।

শংকরকে আর কনস্ট্রাকশন তাঁবুতে থাকতে হল না। কিসুমু থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোটো স্টেশনে সে স্টেশন-মাস্টারের কাজ পেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে সেখানেই চলে গেল।

তিন

নতুন পদ পেয়ে উৎফুল্ল মনে শংকর যখন স্টেশনটাতে এসে নামল, তখন বেলা তিনটে হবে। স্টেশনঘরটা খুব ছোটো। মাটির প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্ম আর স্টেশনের আশপাশ কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্টেশনঘরের পিছনে তার থাকবার কোয়ার্টার। পায়রার খোপের মতো ছোটো। যে ট্রেনখানা তাকে বহন করে এনেছিল, সেখানা কিসুমুর দিকে চলে গেল। শংকর যেন অকূল সমুদ্রে পড়ল। এত নির্জন স্থান সে জীবনে কখনো কল্পনা করেনি।

এই স্টেশনে সে-ই একমাত্র কর্মচারী। একটা কুলি পর্যন্ত নেই। সে-ই কুলি, সে-ই পয়েন্টসম্যান, সে-ই সব।

এরকম ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে, এসব স্টেশন এখনও মোটেই আয়কর নয়। এর অস্তিত্ব এখনও পরীক্ষা-সাপেক্ষ! এদের পিছনে রেল-কোম্পানি বেশি খরচ করতে রাজি নয়। একখানি ট্রেন সকালে, একখানি এই গেল—আর সারাদিন-রাত্রে ট্রেন নেই।

সুতরাং তার হাতে প্রচুর অবসর আছে। চার্জ বুঝে নিতে হবে এই একটু কাজ। আগের স্টেশন-মাস্টারটি গুজরাটি, বেশ ইংরেজি জানে। সে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এল। চার্জ বোঝাবার বেশি কিছু নেই। গুজরাটি ভদ্রলোক তাকে পেয়ে খুব খুশি! ভাবে বোধ হল সে কথা বলবার সঙ্গী পায়নি অনেকদিন। দুজনে প্ল্যাটফর্মে এদিক-ওদিক পায়চারি করলে।

শংকর বললে, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা কেন?

গুজরাটি ভদ্রলোকটি বললে, ও কিছু নয়। নির্জন জায়গা—তাই।

শংকরের মনে হল কী একটা কথা লোকটা গোপন করে গেল। শংকরও আর পীড়াপীড়ি করলে না। রাত্রে ভদ্রলোক রুটি গড়ে শংকরকে খাবার নিমন্ত্রণ করলে। খেতে বসে হঠাৎ লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, ওই যাঃ ভুলে গিয়েছি।

—কী হল?

—খাবার জল নেই মোটে, ট্রেন থেকে নিতে একদম ভুলে গিয়েছি।

—সে কী? এখানে জল কোথাও পাওয়া যায় না?

—কোথাও না! একটা কুয়ো আছে, তার জল বেজায় তেতো আর কষা। সে জলে বাসন মাজা ছাড়া আর কোনো কাজ হয় না। খাবার জল ট্রেন থেকে দিয়ে যায়।

বেশ জায়গা বটে। খাবার জল নেই, মানুষজন নেই। এখানে স্টেশন করেছে কেন শংকর বুঝতে পারল না।

পরদিন সকালে ভূতপূর্ব স্টেশন-মাস্টার চলে গেল। শংকর পড়ল একা। নিজের কাজ করে, রাঁধে খায়, ট্রেনের সময় প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ায়। দুপুরে বই পড়ে কি বড়ো টেবিলটাতে শুয়ে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে ছায়া পড়লে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে।

স্টেশনের চারধার ঘিরে ধু-ধু সীমাহীন প্রান্তর, দীর্ঘ ঘাসের বন, মাঝে ইউকা, বাবলা গাছ—দূরে পাহাড়ের সারি সারা চক্রবাল জুড়ে। ভারী সুন্দর দৃশ্য!

গুজরাটি লোকটি ওকে বারণ করে গিয়েছিল—একা যেন এইসব মাঠে সে না বেড়াতে বার হয়।

শংকর বলেছিল, কেন?

সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর গুজরাটি ভদ্রলোকটির কাছ থেকে পাওয়া যায়নি! কিন্তু তার উত্তর অন্য দিক থেকে সে রাত্রেই মিলল।

রাত বেশি না হতেই আহারাদি সেরে শংকর স্টেশনঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে ডায়েরি লিখছে—স্টেশনঘরেই সে শোবে। সামনের কাচ-বসানো দরজাটি বন্ধ আছে কিন্তু আগল দেওয়া নেই, কীসের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে চেয়ে দেখে দরজার ঠিক বাইরে কাচে নাক লাগিয়ে প্রকাণ্ড সিংহ! শংকর কাঠের মতো বসে রইল। দরজা একটু জোর করে ঠেললেই খুলে যাবে। সেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। টেবিলের ওপর কেবল কাঠের রুলটা মাত্র আছে।

সিংহটা কিন্তু কৌতুকের সঙ্গে শংকর ও টেবিলের কেরোসিনের বাতিটার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খুব বেশিক্ষণ ছিল না, হয়তো মিনিট দুই, কিন্তু শংকরের মনে হল সে আর সিংহটা কতকাল ধরে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সিংহ ধীরে ধীরে অনাসক্ত ভাবে দরজা থেকে সরে গেল। শংকর হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার আগলটা তুলে দিল।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে স্টেশনের চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া কেন। কিন্তু শংকর একটু ভুল করেছিল—সে আংশিক ভাবে বুঝেছিল মাত্র, বাকি উত্তরটা পেতে দু-একদিন বিলম্ব ছিল।

সেটা এল অন্য দিক থেকে।

পরদিন সকালের ট্রেনের গার্ডকে সে রাত্রের ঘটনা বলল। গার্ড লোকটি ভালো, সব শুনে বললে, এসব অঞ্চলে সর্বত্রই এমন অবস্থা। এখান থেকে বারো মাইল দূরে তোমার মতো আরেকটা স্টেশন আছে—সেখানেও এই দশা। এখানে তো যে কাণ্ড—

সে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কথা বন্ধ করে ট্রেনে উঠে পড়ল। যাবার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে বলে গেল, বেশ সাবধানে থেকো সর্বদা।

শংকর চিন্তিত হয়ে পড়ল, এরা কী কথাটা চাপা দিতে চায়? সিংহ ছাড়া আর কিছু আছে নাকি? যাহোক, সেদিন থেকে শংকর প্ল্যাটফর্মে স্টেশনঘরের সামনে রোজ আগুন জ্বালিয়ে রাখে। সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে স্টেশনঘরে ঢোকে—অনেক রাত পর্যন্ত বসে পড়াশুনা করে বা ডায়েরি লেখে। রাত্রের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে, প্ল্যাটফর্মের ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্যে দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে, এক-একদিন গভীর রাতে দূরে কোথাও সিংহের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়—অদ্ভুত জীবন!

ঠিক এই জীবনই সে চেয়েছিল। এ তার রক্তে আছে। এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি, অচেনা নক্ষত্রে ভরা আকাশ, এই বিপদের আশঙ্কা—এই তো জীবন। নিরাপদ শান্ত জীবন নিরীহ কেরানির হতে পারে—তার নয়।

সেদিন বিকেলের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সে নিজের কোয়ার্টারের রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় খুঁটির গায়ে কী একটা দেখে সে তিন হাত লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল—প্রকাণ্ড একটা হলদে খরিশ গোখুরা তাকে দেখে ফণা উদ্যত করে খুঁটি থেকে প্রায় এক হাত বাইরে মুখ বাড়িয়েছে। আর দু-সেকেন্ড পরে যদি শংকরের চোখ সেদিকে পড়ত—তাহলে—না, এখন সাপটাকে মারবার কী করা যায়? কিন্তু সাপটা পরমুহূর্তে খুঁটি বেয়ে উপরে খড়ের চালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বেশ কাণ্ড বটে! ওই ঘরে গিয়ে শংকরকে এখন ভাত রাঁধতে বসতে হবে। এ সিংহ নয় যে, দরজা বন্ধ করে আগুন জ্বেলে রাখবে। খানিকটা ইতস্তত করে শংকর অগত্যা রান্নাঘরে ঢুকল এবং কোনোরকমে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে সন্ধ্যা হবার আগেই খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ করে সেখান থেকে বেরিয়ে স্টেশনঘরে এল। কিন্তু স্টেশনঘরেই বা বিশ্বাস কি? সাপ কখন কোন ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকবে, তাকে কি আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

পরদিন সকালের ট্রেনে গার্ডের গাড়ি থেকে একটি নতুন কুলি তার রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল। সপ্তাহে দু-দিন মোম্বাসা থেকে চাল আর আলু রেল-কোম্পানি এইসব নির্জন স্টেশনের কর্মচারীদের পাঠিয়ে দেয়—মাসিক বেতন থেকে এর দাম কেটে নেওয়া হয়।

যে কুলিটা রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল সে ভারতীয়, গুজরাট অঞ্চলে বাড়ি। বস্তাটা নামিয়ে সে কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে চাইল শংকরের দিকে, এবং পাছে শংকর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, এই ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ল।

কুলির সে দৃষ্টি শংকরের চোখ এড়ায়নি। কী রহস্য জড়িত আছে যেন এই জায়গাটার সঙ্গে, কেউ তা ওর কাছে প্রকাশ করতে চায় না। প্রকাশ করা যেন বারণ আছে। ব্যাপার কী?

দিন দুই পরে ট্রেন পাশ করে সে নিজের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছে—আর একটু হলে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিল আর কী! সেই খরিশ গোখুরা সাপ। পূর্বদৃষ্ট সাপটাও হতে পারে, নতুন একটা যে নয় তারও কোনো প্রমাণ নেই।

শংকর সেই দিন স্টেশনঘর, নিজের কোয়ার্টার ও চারধারের জমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলে। সারা জায়গায় মাটিতে বড়ো বড়ো গর্ত, কোয়ার্টারের উঠোনে, রান্নাঘরের দেওয়ালে, কাঁচা প্ল্যাটফর্মের মাঝে মাঝে সর্বত্র গর্ত ও ফাটল আর ইঁদুরের মাটি। তবুও সে কিছু বুঝতে পারলে না।

একদিন সে স্টেশনঘরে ঘুমিয়ে আছে, রাত অনেক। ঘর অন্ধকার, হঠাৎ শংকরের ঘুম ভেঙে গেল।

পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর একটা কোনো ইন্দ্রিয় যেন মুহূর্তের জন্য জাগরিত হয়ে উঠে তাকে জানিয়ে দিলে যে, সে ভয়ানক বিপদে পড়বে। ঘোর অন্ধকার, শংকরের সমস্ত শরীর যেন শিউয়ে উঠল। টর্চটা হাতড়ে পাওয়া যায় না কেন? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা কীসের অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ টর্চটা তার হাতে ঠেকল, এবং কলের পুতুলের মতো সে সামনের দিকে ঘুরিয়ে টর্চটা জ্বাললে।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে টর্চটা ধরে বিছানার উপরেই বসে রইল।

দেওয়াল ও তার বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় মাথা উঁচু করে তুলে ও টর্চের আলো পড়ার দরুন সাময়িক ভাবে আলো-আঁধার লেগে থ-খেয়ে আছে আফ্রিকার ক্রূর ও হিংস্রতম সাপ—কালো মাম্বা। ঘরের মেঝে থেকে সাপটা প্রায় আড়াই হাত উঁচু হয়ে উঠেছে—এটা এমন কিছু আশ্চর্য নয় যখন ব্ল্যাক মাম্বা সাধারণত মানুষকে তাড়া করে তার ঘাড়ে ছোবল মারে। ব্ল্যাক মাম্বার হাত থেকে রেহাই পাওয়া একরকম পুনর্জন্ম তাও শংকর শুনেছে।

শংকরের একটা গুণ বাল্যকাল থেকেই আছে, বিপদে তার সহজে বুদ্ধিভ্রংশ হয় না—আর তার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর সে ঘোর বিপদেও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

শংকর বুঝলে হাত যদি তার একটু কেঁপে যায়—তবে যে মুহূর্তে সাপটার চোখ থেকে আলো সরে যাবে—সেই মুহূর্তে ওর আলো-আঁধারি কেটে যাবে এবং তখুনি সে করবে আক্রমণ।

সে বুঝলে তার আয়ু নির্ভর করচে এখন দৃঢ় ও অকম্পিত হাতে টর্চটা সাপের চোখের দিকে ধরে থাকার উপর। যতক্ষণ সে এরকম ধরে রাখতে পারবে ততক্ষণ সে নিরাপদ। কিন্তু যদি টর্চটা একটু এদিক-ওদিক সরে যায়?

শংকর টর্চ ধরেই রইল। সাপের চোখ দুটো জ্বলচে যেন দুটো আলোর দানার মতো। কী ভীষণ শক্তি ও রাগ প্রকাশ পাচ্ছে চাবুকের মতো খাড়া উদ্যত তার কালো মিশমিশে সরু দেহটাতে।

শংকর ভুলে গেছে চারপাশের সব আসবাবপত্র, আফ্রিকা দেশটা, তার রেলের চাকরি, মোম্বাসা থেকে কিসুমু লাইনটা, তার দেশ, তার বাবা-মা—সমস্ত জগৎটা শূন্য হয়ে গিয়ে সামনের ওই দুটো জ্বল-জ্বলে আলোর দানায় পরিণত হয়েছে, তার বাইরে শূন্য! অন্ধকার! মৃত্যুর মতো শূন্য, প্রলয়ের পরের বিশ্বের মতো অন্ধকার!

সত্য কেবল এই মহাহিংস্র উদ্যত-ফণা মাম্বা, যেটা প্রত্যেক ছোবলে ১৫০০ মিলিগ্রাম তীব্র বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং দেবার জন্যে ওত পেতে রয়েছে।

শংকরের হাত ঝিমঝিম করছে, আঙুল অবশ হয়ে আসছে, কনুই থেকে বগল পর্যন্ত হাতের যেন সাড়া নেই। কতক্ষণ সে আর টর্চ ধরে থাকবে? আলোর দানা দুটো হয়তো সাপের চোখ নয়—জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র—কিংবা—

টর্চের ব্যাটারির তেজ কমে আসচে না? সাদা আলো যেন হলদে ও নিস্তেজ হয়ে আসচে না? কিন্তু জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র দুটো তেমনি জ্বলচে। রাত না দিন? ভোর হবে না সন্ধ্যা হবে?

শংকর নিজেকে সামলে নিলে। ওই চোখ দুটোয় জ্বালাময়ী দৃষ্টি তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তুলচে। সে সজাগ থাকবে। এ তেপান্তরের মাঠে চ্যাঁচালেও কেউ কোথাও নেই সে জানে, তার নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর দৃঢ়তার উপর নির্ভর করচে তার জীবন। কিন্তু সে পারচে না যে, হাত যেন টনটন করে অবশ

হয়ে আসচে, আর কতক্ষণ সে টর্চ ধরে থাকবে? সাপে না হয় ছোবল দিক কিন্তু হাতখানা একটু নামিয়ে সে আরাম বোধ করবে এখন।

তারপরেই ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজল। ঠিক রাত তিনটে পর্যন্তই বোধ হয় শংকরের আয়ু ছিল, কারণ তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কেঁপে উঠে নড়ে গেল—সামনের আলোর দানা দুটো গেল নিভে কিন্তু সাপ কই? তাড়া করে এল না কেন?

পরক্ষণেই শংকর বুঝতে পারলে সাপটাও সাময়িক মোহগ্রস্ত হয়েচে তার মতো। এই অবসর! বিদ্যুতের চেয়েও বেগে সে বিছানা থেকে একলাফ মেরে অন্ধকারের মধ্যে দরজার আগল খুলে ফেলে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

সকালের ট্রেন এল। শংকর বাকি রাতটা প্ল্যাটফর্মেই কাটিয়েছে। ট্রেনের গার্ডকে বললে সব ব্যাপার। গার্ড বললে, চলো দেখি স্টেশনঘরের মধ্যে। ঘরের মধ্যে কোথাও সাপের চিহ্নও পাওয়া গেল না। গার্ড লোকটা ভালো, বললে, বলি তবে শোনো! খুব বেঁচে গিয়েচ কাল রাত্রে। এতদিন কথাটা তোমায় বলিনি, পাছে ভয় পাও। তোমার আগে যিনি স্টেশন-মাস্টার এখানে ছিলেন—তিনিও সাপের উপদ্রবেই এখান থেকে পালান। তাঁর আগে দুজন স্টেশন-মাস্টার এই স্টেশনের কোয়ার্টারে সাপের কামড়ে মরেচে। আফ্রিকার ব্ল্যাক মাম্বা যেখানে থাকে, তার ত্রিসীমানায় লোক আসে না। বন্ধুভাবে কথাটা বললাম, উপরওয়ালাদের বলো না যেন যে আমার কাছ থেকে একথা শুনেছ। ট্রান্সফারের দরখাস্ত করো।

শংকর বললে, দরখাস্তের উত্তর আসতেও তো দেরি হবে, তুমি একটা উপকার করো। আমি এখানে একেবারে নিরস্ত্র, আমাকে একটা বন্দুক কি রিভলবার যাবার পথে দিয়ে যেয়ো। আর কিছু কার্বলিক অ্যাসিড। ফিরবার পথেই কার্বলিক অ্যাসিডটা আমাকে দিয়ে যেয়ো।

ট্রেন থেকে সে একটা কুলিকে নামিয়ে নিলে এবং দুজনে মিলে সারাদিন সর্বত্র গর্ত বুজিয়ে বেড়ালে। পরীক্ষা করে দেখে মনে হল কাল রাত্রে স্টেশনঘরের পশ্চিমের দেওয়ালের কোণে একটা গর্ত থেকে সাপটা বেরিয়ে ছিল। গর্তগুলো ইঁদুরের, বাইরের সাপ দিনমানে ইঁদুর খাবার লোভে গর্তে ঢুকেছিল হয়তো। গর্তটা বেশ ভালো করে বুজিয়ে দিলে। ডাউন-ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড পাওয়া গেল—ঘরের সর্বত্র ও আশেপাশে সে অ্যাসিড ছড়িয়ে দিলে। কুলিটা তাকে একটা বড়ো লাঠি দিয়ে গেল। দু-তিন দিনের মধ্যেই রেল-কোম্পানি থেকে ওকে একটা বন্দুক দিলে।

চার

স্টেশনে জলের বড়ই কষ্ট। ট্রেন থেকে যে জল দেয়, তাতে রান্না-খাওয়া কোনোরকমে চলে, স্নান হয় না। এখানকার কুয়োর জলও শুকিয়ে গিয়েছে। একদিন সে শুনল স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জলাশয় আছে সেখানে ভালো জল পাওয়া যায়; মাছও আছে।

স্নান ও মাছ ধরার আকর্ষণে একদিন সে সকালের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সেখানে মাছ ধরতে চলল—সঙ্গে একজন সোমালি কুলি; সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম মোম্বাসা থেকে আনিয়ে নিয়ে ছিল। জলাশয়টা মাঝারি গোছের, চারধারে উঁচু ঘাসের বন, ইউকা গাছ, কাছেই একটা অনুচ্চ পাহাড়। জলে সে স্নান সেরে উঠে ঘণ্টা দুই ছিপ ফেলে ট্যাংরা জাতীয় ছোটো ছোটো মাছ

অনেকগুলি পেলে। মাছ অদৃষ্টে জোটেনি অনেকদিন কিন্তু আর বেশি দেরি করা চলবে না কারণ আবার বিকেল চারটের মধ্যে স্টেশনে পৌছোনো চাই, বিকেলের ট্রেন পাশ করাবার জন্যে।

মাঝে মাঝে প্রায়ই সে মাছ ধরতে যায়। কোনোদিন সঙ্গে লোক থাকে—প্রায়ই একা যায়। স্নানের কষ্টও ঘুচছে।

গ্রীষ্মকাল ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠল। আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম—বেলা নটার পর থেকে আর রোদে যাওয়া যায় না। এগারোটার পর থেকে শংকরের মনে হয় যেন দিকবিদিক দাউদাউ করে জ্বলচে। তবুও সে ট্রেনের লোকের মুখে শুনলে মধ্য-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার গরমের কাছে এ নাকি কিছুই নয়।

শীঘ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা থেকে শংকরের জীবনের গতি মোড় ঘুরে অন্য পথে চলে গেল। একদিন সকালের দিকে শংকর মাছ ধরতে গিয়েছিল। যখন ফিরছে তখন বেলা তিনটে। স্টেশন যখন আর মাইলটাক আছে, তখন শংকরের কানে গেল সেই রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে কে যেন কোথায় অস্ফুট আর্তস্বরে কী বলচে! কোনদিক থেকে স্বরটা আসচে লক্ষ করে কিছুদূরে যেতেই দেখলে একটা ইউকা গাছের নীচে স্বল্পমাত্র ছায়াটুকুতে কে একজন বসে আছে।

শংকর দ্রুতপদে তার কাছে গেল। লোকটা ইয়োরোপিয়ান, পরনে তালি দেওয়া ছিন্ন ও মলিন কোটপ্যান্ট। একমুখ লাল দাড়ি, বড়ো বড়ো চোখ, মুখের গড়ন বেশ সুশ্রী, দেহও বেশ বলিষ্ঠ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু সম্ভবত রোগে, কষ্টে ও অনাহারে বর্তমানে শীর্ণ। লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে অবসন্ন ভাবে পড়ে আছে। তার মাথায় মলিন সোলার টুপিটা একদিকে গড়িয়ে পড়েচে মাথা থেকে—পাশে একটা খাকি কাপড়ের বড়ো ঝোলা।

শংকর ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কোথা থেকে আসছ?

লোকটা কথার উত্তর না দিয়ে মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে জলপানের ভঙ্গি করে বললে, একটু জল! জল!

শংকর বললে, এখানে তো জল নেই। আমার উপর ভর দিয়ে স্টেশন পর্যন্ত আসতে পারবে?

অতি কষ্টে খানিকটা ভর দিয়ে এবং শেষের দিকে একরকম শংকরের কাঁধে চেপে লোকটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছোল। ওকে আনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল, বিকেলের ট্রেন ওর অনুপস্থিতিতেই চলে গিয়েছে। ও লোকটাকে স্টেশনঘরে বিছানা পেতে শোয়ালে, জল খাইয়ে সুস্থ করলে, কিছু খাদ্যও এনে দিলে। সে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল বটে, কিন্তু শংকর দেখলে লোকটার ভারী জ্বর হয়েছে। অনেকদিনের অনিয়মে, পরিশ্রমে, অনাহারে তার শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে—দু-চারদিনে সে সুস্থ হবে না।

লোকটা একটু পরে পরিচয় দিলে। তার নাম ডিয়েগো আলভারেজ—জাতে পর্তুগিজ, তবে আফ্রিকার সূর্য তার বর্ণ তামাটে করে দিয়েচে।

রাত্রে ওকে স্টেশনে রাখলে শংকর। কিন্তু ওর অসুখ দেখে সে পড়ে গেল বিপদে—এখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই—সকালের ট্রেন মোম্বাসার দিকে যায় না, বিকেলের ট্রেনে গার্ড রোগীকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রাত কাটতে এখনও অনেক দেরি! বিকেলের গাড়িখানা স্টেশনে এসে যদি পাওয়া যেত, তবে তো কথাই ছিল না।

শংকর রোগীর পাশে রাত জেগে বসে রইল। লোকটির শরীরে কিছু নেই। খুব সম্ভবত কষ্ট ও অনাহার ওর অসুখের কারণ। দূর বিদেশে, ওর কেউ নেই—শংকর না দেখলে ওকে দেখবে কে?

বাল্যকাল থেকেই পরের দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে। শংকর যেভাবে সারা রাত তার সেবা করলে, তার কোনো আপনার লোক ওর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারত না।

উত্তর-পূর্ব কোণের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণির পিছন থেকে চাঁদ উঠছে যখন সে রাত্রে, ঝমঝম করচে নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি, তখন হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে ভীষণ সিংহগর্জন শোনা গেল, রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল—সিংহের ডাকে সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। শংকর বললে, ভয় নেই, শুয়ে থাকো। বাইরের সিংহ ডাকছে, দরজা বন্ধ আছে।

তারপর শংকর আস্তে আস্তে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে চারধারে চেয়ে দেখবামাত্রই যেন সে রাত্রির অপূর্ব দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে ফেলল। চাঁদ উঠচে দূরের আকাশপ্রান্তে—ইউকা গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে পুব থেকে পশ্চিমে, ঘাসের বন যেন রহস্যময়, নিস্পন্দ। সিংহ ডাকছে স্টেশনের কোয়ার্টারের পিছনে প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে। কিন্তু সিংহের ডাক আজকাল শংকরের গা-সওয়া হয়ে

উঠেছে—ওতে আর আগের মতো ভয় পায় না। রাত্রির সৌন্দর্য এত আকৃষ্ট করেছে ওকে যে ও সিংহের সান্নিধ্য যেন ভুলে গেল।

ফিরে ও স্টেশনঘরে ঢুকল। টং টং করে ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। ও ঘরে ঢুকে দেখলে রোগী বিছানায় উঠে বসে আছে। বললে, একটু জল দাও, খাব।

লোকটা বেশ ভালো ইংরিজি বলতে পারে। শংকর টিন থেকে জল নিয়ে ওকে খাওয়ালে।

লোকটার জ্বর তখন যেন কমেছে। সে বললে, তুমি কী বলছিলে? আমার ভয় করছে ভাবছিলে? ডিয়েগো আলভারেজ, ভয় করবে? ইয়্যাং ম্যান, তুমি ডিয়েগো আলভারেজকে জানো না। লোকটার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, বিষাদ ও ব্যঙ্গ মেশানো অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা দিল। সে অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ঢলে পড়ল। ওই হাসিতে শংকরের মনে হল এ লোক সাধারণ লোক নয়। তখন ওর হাতের দিকে নজর পড়ল শংকরের। বেঁটে বেঁটে, মোটা মোটা আঙুল—দড়ির মতো শিরাবহুল হাত, তাম্রাভ দাড়ির নীচে চিবুকের ভাব শক্ত মানুষের পরিচয় দিচ্ছে। এতক্ষণ পরে খানিকটা জ্বর কমে যাওয়াতে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসচে যেন ধীরে ধীবে।

লোকটা বললে, সরে এসো কাছে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেচ। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর বেশি করতে পারত না। তবে একটা কথা বলি—আমি বাঁচব না। আমার মন বলচে আমার দিন ফুরিয়ে এসেচে। তোমার উপকার করে যেতে চাই। তুমি ইন্ডিয়ান? এখানে কত মাইনে পাও? এই সামান্য মাইনের জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূর এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো আজ তোমাকে যেসব কথা বলব—আমার মৃত্যুর পূর্বে তুমি কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না।

শংকর সেই আশ্বাসই দিলে। তারপরই সেই অদ্ভুত রাত্রি ক্রমশ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এমন এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ধরনের আশ্চর্য কাহিনি শুনে গেল—যা সাধারণত উপন্যাসেই পড়া যায়।

ডিয়েগো আলভারেজের কথা

ইয়্যাং ম্যান, তোমার বয়স কত হবে? বাইশ? তুমি, যখন মায়ের কোলে শিশু—আজ বাইশ বছর আগের কথা, ১৮৮৮-৮৯ সালের দিকে আমি কেপ কলোনির উত্তরের পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনির সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন বয়স ছিল কম, দুনিয়ার কোনো বিপদকেই বিপদ বলে গ্রাহ্য করতাম না।

বুলাওয়ে শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে একাই রওনা হলাম, সঙ্গে কেবল দুটি গাধা, জিনিসপত্র বইবার জন্যে। জাম্বেজি নদী পার হয়ে চলেচি, পথ ও দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, শুধু ছোটোখাটো পাহাড়, ঘাস, মাঝে মাঝে কাফিরদের বস্তি। ক্রমে যেন মানুষের বাস কমে এল, এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছোনো গেল, যেখানে এর আগে কখনো কোনো ইয়োরোপিয়ান আসেনি।

যেখানেই নদী বা খাল দেখি—পাহাড় দেখি—সকলের আগে সোনার স্তরের সন্ধান করি। লোকে কত কী পেয়ে বড়োমানুষ হয়ে গিয়েচে দক্ষিণ-আফ্রিকায়, এ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে কত কাহিনিই শুনে এসেছিলুম—সেইসব গল্পের মোহই আমায় আফ্রিকায় নিয়ে এসে ফেলেছিল। কিন্তু বৃথাই দু-বছর ধরে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালুম। কত অসহ্য কষ্ট সহ্য করলুম এই দু-বছরে। একবার তো সন্ধান পেয়েও হারালুম।

সেদিন একটা হরিণ শিকার করেছি সকালের দিকে। তাঁবু খাটিয়ে মাংস রান্না করে শুয়ে পড়লুম দুপুরবেলা, কারণ দুপুরের রোদে পথ চলা সেসব জায়গায় একরকম অসম্ভব, ১১৫ ডিগ্রি থেকে ১৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীষ্মকালে। বিশ্রামের পরে বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি বন্দুকের নলের মাছিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েচে। মাছি না থাকলে রাইফেলের তাগ ঠিক হয় না। এদিক-ওদিক কত খুঁজেও মাছিটা পাওয়া গেল না। কাছেই একটা পাথরের ঢিবি, তার গায়ে সাদা সাদা কী একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল। ঢিবিটার গায়ে সেই জিনিসটা নানা স্থানে আছে। বেছে বেছে তারই একটি দানা সংগ্রহ করে ঘষে-মেজে নিয়ে আপাতত সেটাকেই মাছি করে রাইফেলের নলের আগায় বসিয়ে নিলাম। তারপর বিকেলে সেখান থেকে আবার উত্তর মুখে রওনা হয়েচি, কোথায় তাঁবু ফেলেছিলাম, সেকথা ক্রমেই ভুলে গিয়েছি।

দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেও আমার মতো সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে দুজন মাটাবেল কুলি ছিল। পরস্পরকে পেয়ে আমরা খুশি হলাম, তার নাম জিম কার্টার, আমারই মতো ভবঘুরে, তবে তার বয়স আমার চেয়ে বেশি। জিম একদিন আমার বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আমায় বলল, বন্দুকের মাছি তোমার এরকম কেন? তারপর আমার গল্প শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, তুমি বুঝতে পারনি এ জিনিসটা খাঁটি রুপো, খনিজ রুপো। এ যেখানে পাওয়া যায় সাধারণত সেখানে রুপোর খনি থাকে। আমার আন্দাজ হচ্ছে এক টন পাথর থেকে সেখানে অন্তত ন-হাজার আউন্স রুপো পাওয়া যাবে। সে জায়গাতে এক্ষুনি চলো আমরা যাই। এবার আমরা লক্ষপতি হয়ে যাবে।

সংক্ষেপে বলি। তারপর কার্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে আবার এলাম। কিন্তু চার মাস ধরে কত চেষ্টা করে, কত অসহ্য কষ্ট পেয়ে, কতবার বিরাট দিকদিশাহীন মরুভূমিবৎ ভেল্ডের মধ্যে পথ হারিয়ে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পোঁছেও কিছুতেই আমি সে স্থান নির্ণয় করতে পারলাম না। যখন সেখান থেকে সেবার তাঁবু উঠিয়ে দিয়েছিলাম, অত লক্ষ করিনি জায়গাটা! আফ্রিকার ভেল্ডে কোনো চিহ্ন বড়ো একটা থাকে না, যার সাহায্যে পুরোনো জায়গা খুঁজে বার করা যায়—সবই যেন একরকম। অনেকবার হয়রান হয়ে শেষে আমরা রুপোর খনির আশা ত্যাগ করে গুয়াই নদীর দিকে চললাম। জিম কার্টার আমাকে আর ছাড়লে না। তার মৃত্যু পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিল। তার সে শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবলে এখনও আমার কষ্ট হয়।

তৃষ্ণার কষ্টই এই ভ্রমণের সময় সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। তাই এখন থেকে আমরা নদীপথ ধরে চলব, এই স্থির করা গেল। বনে জন্তু শিকার করে খাই আর মাঝে মাঝে কাফির বস্তি যদি পাই, সেখান থেকে মিষ্টি আলু, মুরগি প্রভৃতি সংগ্রহ করি।

একবার অরেঞ্জ নদী পার হয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটা কাফির বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছি, সেইদিন দুপুরের পরে কাফির বস্তির একটি মোড়লের মেয়ে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমরা দেখতে গেলাম—পাঁচ-ছ-বছরের একটা ছোট্ট উলঙ্গ মেয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে—তার পেটে নাকি ভয়ানক ব্যথা। সবাই কাঁদছে ও দাপাদাপি করচে। মেয়েটার ঘাড়ে নিশ্চয়ই দানো চেপেছে—ওকে মেরে না ফেলে ছাড়বে না। তাকে ও তার বাপ-মাকে—জিজ্ঞেস করে এইটুকু জানা গেল, সে বনের ধারে গিয়েছিল—তারপর থেকে তাকে ভূতে পেয়েছে।

আমি ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম কোনো বনের ফল বেশি পরিমাণে খেয়ে ওর পেট কামড়াচ্চে।

তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কোনো বনের ফল সে খেয়েছিল কি না? সে বললে, হ্যাঁ, খেয়েছিল। কাঁচা ফল? মেয়েটা বললে, ফল নয়, ফলের বীজ! সে ফলের বীজই খাদ্য।

একডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তার ভূত ছেড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ওষুধের বাকসো ছিল। গ্রামে আমাদের খাতির হয়ে গেল খুব। পনেরো দিন আমরা সে গ্রামের সর্দারের অতিথি হয়ে রইলাম। ইলান্ড হরিণ শিকার করি আর রাত্রে কাফিরদের মাংস খেতে নিমন্ত্রণ করি। বিদায় নেবার সময় কাফির সর্দার বললে, তোমরা সাদা পাথর খুব ভালোবাসো না? বেশ খেলবার জিনিস। নেবে সাদা পাথর? দাঁড়াও দেখাচ্চি। একটু পরে সে একটা ডুমুর ফলের মতো বড়ো সাদা পাথর আমাদের হাতে এনে দিলে। জিম ও আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলাম—জিনিসটা হিরে! খনি বা খনির উপরকার পাথরে মৃত্তিকাস্তর থেকে পাওয়া পালিশ না করা হিরের টুকরো!

কাফির সর্দার বললে, এটা তোমরা নিয়ে যাও। ওই যে দূরের বড়ো পাহাড় দেখছ, ধোঁয়া ধোঁয়া—এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে। ওই পাহাড়ের মধ্যে এরকম সাদা পাথর অনেক আছে বলে শুনেছি। আমরা কখনো যাইনি, জায়গা ভালো নয়, ওখানে বুনিপ বলে উপদেবতা থাকে। অনেক চাঁদ আগেকার কথা, আমাদের গ্রামের তিনজন সাহসী লোক কারো বারণ না শুনে ওই পাহাড়ে গিয়েছিল, আর ফেরেনি! আরেকবার একজন তোমাদের মতো সাদা মানুষ এসেছিল, সেও অনেক, অনেক চাঁদ আগে। আমরা দেখিনি, আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদাদের আমলের কথা। সে গিয়েও আর ফেরেনি।

কাফির গ্রাম থেকে বার হয়েই পথে আমরা ম্যাপ মিলিয়ে দেখলাম—দূরের ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট ব্যাপারটা হচ্ছে রিখটারসভেল্ড পর্বতশ্রেণি, দক্ষিণ-আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা বন্য অজ্ঞাত, বিশাল ও বিপদসংকুল অঞ্চল। দু-একজন দুর্ধর্ষ দেশ-আবিষ্কারক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া, কোনো সভ্য মানুষ সে অঞ্চলে পদার্পণ করেনি। ওই বিস্তীর্ণ বনপর্বতের অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ নেই, তার কোথায় কী আছে কেউ বলতে পারে না।

জিম কার্টার ও আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, আমরা দুজনেই তখনই স্থির করলাম ওই অরণ্য ও পর্বতমালা আমাদেরই আগমন প্রতীক্ষায় তার বিপুল রত্নভাণ্ডার লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন করে রেখেছে, ওখানে আমরা যাবই।

কাফির গ্রাম থেকে রওনা হবার প্রায় সতেরো দিন পরে আমরা পর্বতশ্রেণির পাদদেশে নিবিড় বনে প্রবেশ করলাম।

আগেই বলেছি দক্ষিণ-আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে এই পর্বতশ্রেণি অবস্থিত। জঙ্গলের কাছাকাছি কোনো কাফির বস্তি পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ল না। জঙ্গল দেখে মনে হল কাঠুরিয়ার কুঠার আজ পর্যন্ত এখানে প্রবেশ করেনি।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছেছিলাম। জিম কার্টারের পরামর্শমতো সেইখানেই আমরা রাত্রে বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটালাম। জিম জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বালালে, আমি লাগলাম রান্নার কাজে। সকালের দিকে একজোড়া পাখি মেরেছিলাম, সেই পাখি ছাড়িয়ে তার রোস্ট করব এই ছিল মতলব। পাখি ছাড়ানোর কাজে একটু ব্যস্ত আছি, এমন সময় জিম বললে, পাখি রাখো। দু-পেয়ালা কফি করো তো আগে।

আগুন জ্বালাই ছিল। জল গরম করতে দিয়ে আবার পাখি ছাড়াতে বসেছি এমন সময় সিংহের গর্জন একেবারে অতি নিকটে শোনা গেল। জিম বন্দুক নিয়ে বেরুল, আমি বললাম অন্ধকার হয়ে আসচে, বেশি দূর যেয়ো না। তারপরে আমি পাখি ছাড়াচ্চি, কিছু দূরে জঙ্গলের বাইরেই দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম। একটুখানি থেকে আবার আর একটা আওয়াজ। তারপরেই সব চুপ। মিনিট দশ কেটে গেল, জিম আসে না দেখে আমি নিজের রাইফেলটা নিয়ে যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেদিকে একটু যেতেই দেখি জিম আসচে, পিছনে কী একটা ভারী মতো টেনে আনচে। আমায় দেখে বললে, ভারী চমৎকার ছালখানা। জঙ্গলের ধারে ফেলে রাখলে হায়নাতে সাবাড় করে দেবে। তাঁবুর কাছে টেনে নিয়ে যাই চলো! দুজনে টেনে সিংহের প্রকাণ্ড দেহটা তাঁবুর আগুনের কাছে নিয়ে এসে ফেললাম। তারপর ক্রমে রাত হল খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লুম।

অনেক রাত্রে সিংহের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবু থেকে অল্প দূরেই সিংহ ডাকচে। অন্ধকারে বোঝা গেল না ঠিক কতদূরে। আমি রাইফেল নিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। জিম শুধু একবার বললে, সন্ধ্যাবেলার সেই সিংহটার জুড়ি।

বলেই সে নির্বিকারভাবে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাঁবুর বাইরে এসে দেখি আগুন নিবে গিয়েচে। পাশে কাঠকুঠো ছিল, তাই দিয়ে আবার জোর আগুন জ্বালালাম। তারপর আবার এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কিছু দূরে গিয়ে কয়েকজন কাফিরের সঙ্গে দেখা হল। তারা হরিণ শিকার করতে এসেচে। আমরা তাদের তামাকের লোভ দেখিয়ে কুলি ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিতে চাইলাম।

তারা বললে, তোমরা জানো না তাই ওকথা বলচ। এ জঙ্গলে মানুষ আসে না। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও। ওই পাহাড়ের শ্রেণি অপেক্ষাকৃত নিচু, ওটা পার হয়ে ওদিকে খানিকটা সমতল জায়গা আছে, ঘন বনে ঘেরা, তার ওদিকে আবার এর চেয়েও উঁচু পর্বতশ্রেণি। ওই বনের মধ্যে সমতল জায়গাটা বড়ো বিপজ্জনক, ওখানে বুনিপ থাকে। বুনিপের হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে হবে না। ওখানে কেউ যায় না। আমরা তামাকের লোভে ওখানে যাব মরতে? ভালো চাও তো তোমরাও যেয়ো না।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, বুনিপ কী?

তারা জানে না। তবে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে বুনিপ কী না জানলেও, সে কী অনিষ্ট করতে পারে সেটা তারা খুব ভালোরকমই জানে।

ভয় আমাদের ধাতে ছিল না, জিম কার্টারের তো একেবারেই না। সে আরও বিশেষ করে জেদ ধরে বসল। এই বুনিপের রহস্য তাকে ভেদ করতেই হবে—হিরে পাই বা না পাই। মৃত্যু যে তাকে অলক্ষিতে টানছে তখনও যদি বুঝতে পারতাম!

বৃদ্ধ এই পর্যন্ত বলে একটু হাঁপিয়ে পড়ল। শংকরের মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে, এধরনের কথা সে কখনো আর শোনেনি। মুমূর্ষু ডিয়েগো আলভারেজের জীর্ণ পরিচ্ছদ ও শিরাবহুল হাতের দিকে চেয়ে, তার পাকা ভুরু জোড়ার নীচেকার ইস্পাতের মতো নীল দীপ্তিশীল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে শংকরের মন শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় ভরে উঠল।

সত্যিকার মানুষ বটে একজন!

আলভারেজ বললে, আর এক গ্লাস জল।

জল পান করে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করল—

হ্যাঁ, তারপরে শোনো। ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। কত বড়ো বড়ো গাছ, বড়ো বড়ো ফার্ন, কত বিচিত্র বর্ণের অর্কিড ও লায়ানা, স্থানে স্থানে সে বড়া নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য, বড়ো বড়ো গাছের নীচেকার জঙ্গল এতই ঘন। বঁড়শির মতো কাঁটাগাছের গায়ে, মাথার উপরকার পাতায় পাতায় এমন জড়াজড়ি যে সূর্যের আলো কোনো জন্মে সে জঙ্গলে প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। অত্যন্ত বেবুনের উৎপাত জঙ্গলের সর্বত্র, বড়ো গাছের ডালে দলে দলে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানা রকমের বেবুন বসে আছে—অনেক সময় দেখলাম মানুষের আগমন তারা গ্রাহ্য করে না। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়—দু-একটা বুড়ো সর্দার বেবুন সত্যিই হিংস্র প্রকৃতির, হাতে বন্দুক না থাকলে তারা অনায়াসেই আমাদের আক্রমণ করত। জিম কার্টার বললে, অন্তত আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না কখনো এ জঙ্গলে।

সাত-আট দিন সেই নিবিড় জঙ্গলে কাটল। জিম কার্টার ঠিকই বলেছিল, প্রতিদিন একটি করে বেবুন আমাদের খাদ্য জোগান দিতে দেহপাত করত। উঁচু পাহাড়টা থেকে জঙ্গলের নানাস্থানে ছোটো-বড়ো ঝরনা নেমে এসেচে, সুতরাং জলের অভাবও ঘটল না। একবার কিন্তু এতে বিপদও ঘটেছিল। একটা ঝরনার ধারে দুপুরবেলা এসে আগুন জ্বেলে বেবুনের দাপনা ঝলসাবার ব্যবস্থা করচি, জিম গিয়ে তৃষ্ণার ঝোঁকে ঝরনার জল পান করল। তার একটু পরেই তার ক্রমাগত বমি হতে শুরু করল। পেটে ভয়ানক ব্যথা। আমি একটু বিজ্ঞান জানতাম, আমার সন্দেহ হওয়াতে ঝরনার জল পরীক্ষা করে দেখি, জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে। উপর পাহাড়ের আর্সেনিকের স্তর ধুয়ে ঝরনা নেমে আসচে নিশ্চয়ই। হোমিওপ্যাথিক বাকসো থেকে প্রতিষেধক ওষুধ দিতে সন্ধ্যার দিকে জিম সুস্থ হয়ে উঠল।

বনের মধ্যে ঢুকে কেবল এক বেবুন ও মাঝে মাঝে দু-একটা বিষধর সাপ ছাড়া অন্য কোনো বন্যজন্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি! পাখির কথা আর প্রজাপতির কথা অবশ্য বাদ দিলাম। কারণ এইসব ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া এত বিচিত্র বর্ণের ও শ্রেণির পাখি ও প্রজাপতি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বন্যজন্তু বলতে যা বোঝায়, তারা সে পর্যায়ে পড়ে না।

প্রথমেই রিখটারসভেল্ড পর্বতশ্রেণির একটা শাখা-পর্বত আমাদের সামনে পড়ল, সেটা মূল ও প্রধান পর্বতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিচু। সেটা পার হয়ে আমরা একটা বিস্তীর্ণ বনময় উপত্যকায় নেবে তাঁবু ফেললাম। একটা ক্ষুদ্র নদী উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছে। নদী দেখে আমার ও জিমের আনন্দ হল, এইসব নদীর তীর থেকেই অনেক সময় খনিজদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

নদীর নানাদিকে আমরা বালি পরীক্ষা করে বেড়াই, কিছুই কোথাও পাওয়া যায় না। সোনার একটু রেণু পর্যন্ত নেই নদীর বালিতে। আমরা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লুম। তখন প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন কেটে গিয়েচে। সন্ধ্যার সময় কফি খেতে খেতে জিম বললে, দেখো, আমার মন বলচে এখানে আমরা সোনার সন্ধান পাব। থাকো এখানে আর কিছুদিন। আরও কুড়ি দিন কাটল। বেবুনের মাংস অসহ্য ও অত্যন্ত অরুচিকর হয়ে উঠেচে। জিমের মতো লোকও হতাশ হয়ে পড়ল।

আমি বললাম, আর কেন জিম, চলো ফিরি এবার। কাফির গ্রামে আমাদের ঠকিয়েছে। এখানে কিছু নেই।

জিম বললে, এই পর্বতশ্রেণির নানা শাখা আছে, সবগুলো না দেখে যাব না।

একদিন পাহাড়ি নদীটার খাতের ধারে এসে বালি চালতে চালতে পাথরের নুড়ির রাশির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত একখানা হলদে রঙের ছোটো পাথর আমি ও জিম একসঙ্গেই দেখতে পেলাম। দুজনেই তাড়াতাড়ি সেটা খুঁড়ে তুললাম। আমাদের মুখ আনন্দে ও বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জিম বললে, ডিয়েগো, পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হল, চিনেছ তো?

আমিও বুঝেছিলাম। বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু নদীস্রোতে ভেসে আসা জিনিসটা। খনির অস্তিত্ব নেই এখানে!

পাথরখানা দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত হলদে রঙের হিরের জাত। অবশ্য খুব আনন্দের কোনো কারণ ছিল না, কারণ এতে মাত্র এটাই প্রমাণ হয় যে, এই বিশাল পর্বতশ্রেণির কোনো অজ্ঞাত, দুর্গম অঞ্চলে হলদে হিরের খনি আছে। নদীস্রোতে ভেসে এসেছে তা থেকে একটা স্তরের একটা টুকরো। সে মূল খনি খুঁজে বার করা অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য ও সাহস সাপেক্ষ।

সে পরিশ্রম, সাহস ও ধৈর্যের অভাব আমাদের ঘটত না, কিন্তু যে দৈত্য ওই রহস্যময় বনপর্বতের অমূল্য হীরকখনির প্রহরী, সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বাধা দিলে।

একদিন আমরা বনের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে সন্ধ্যার দিকে বিশ্রাম করচি, আমাদের সামনে সেই জায়গাটাতে একটা তাল গাছ, তাল গাছের তলায় গুঁড়িটা ঘিরে খুব ঘন বনঝোপ। হঠাৎ আমরা দেখলাম কীসে যেন অতবড়ো তাল গাছটা এমন নাড়া দিচ্ছে যে, তার উপরকার শুকনো ডালপালাগুলো খড়খড় করে নড়ে উঠছে, যেমন নড়ে ঝড় লাগলে। গাছটাও সেই সঙ্গে নড়ছে।

আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাতাস নেই কোনোদিকে, অথচ তাল গাছটা নড়ছে কেন? আমাদের মনে হল কে যেন তাল গাছের গুঁড়িটা ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে। জিম তখনই ব্যাপারটা কী তা দেখতে গুঁড়ির তলায় সেই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকল।

সে ওর মধ্যে ঢুকবার অল্পক্ষণ পরেই আমি একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে রাইফেল নিয়ে ছুটে গেলুম। ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি জিম রক্তাক্ত দেহে বনের মধ্যে পড়ে আছে, কোনো ভীষণ বলবান জন্তুতে তার মুখের সামনে থেকে বুক পর্যন্ত ধারালো নখ দিয়ে চিরে ফেঁড়ে দিয়েছে—যেমন পুরোনো বালিশ ফেঁড়ে তুলে বার করে তেমনি।

জিম শুধু বললে, সাক্ষাৎ শয়তান! মূর্তিমান শয়তান—হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললে, পালাও, পালাও—

তারপরেই জিম মারা গেল। তাল গাছের গায়ে দেখি যেন কীসের মোটা শক্ত চোঁচ লেগে আছে। আমার মনে হল কোনো ভীষণ বলবান জানোয়ার তাল গাছের গায়ে গা ঘষছিল, গাছটা ওরকম নড়ছিল সেইজন্যেই। জন্তুটার কোনো পাত্তা পেলাম না। জিমের দেহ ফাঁকা জায়গায় বার করে আমি রাইফেল হাতে ঝোপের ওপারে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মাটির উপরে কোনো অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন, তার মোটে তিনটে আঙুল পায়ে। কিছুদূর গেলাম পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে, জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে গুহার মুখে পদচিহ্নটা ঢুকে গেল। গুহার প্রবেশ পথের কাছে শুকনো বালির উপর ওই অজ্ঞাত ভয়ংকর জানোয়ারটার বড়ো বড়ো তিন আঙুলে থাবার দাগ রয়েচে।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেচে। সেই জনহীন অরণ্যভূমি ও পর্বতবেষ্টিত অজ্ঞাত উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আমি এক অজ্ঞাততর ভীষণ বলবান জন্তুর অনুসরণ করছি। ডাইনে চেয়ে দেখি প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় সুউচ্চ ব্যাসাল্টের দেওয়াল খাড়া উঠেচে প্রায় চার হাজার ফুট, বনে বনে নিবিড়, খুব উঁচুতে পর্বতের বাঁশবনের মাথায় সামান্য যেন একটু রাঙা রোদ—কিংবা হয়তো আমার চোখের ভুল, অনন্ত আকাশের আভা পড়ে থাকবে।

ভাবলাম, এসময় গুহার মধ্যে ঢোকা বা এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেচনার কাজ হবে না। জিমের দেহ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। সারারাত তার মৃতদেহ নিয়ে আগুন জ্বেলে, রাইফেল তৈরি রেখে বসে রইলুম।

পরদিন জিমকে সমাধিস্থ করে আবার ওই জানোয়ারটার খোঁজে বার হলাম। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, সে গুহা অনেক খুঁজেও কিছুতেই বার করতে পারলুম না। ওরকম অনেক গুহা আছে পর্বতের নানা জায়গায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন গুহা দেখেছিলাম কে জানে?

সঙ্গীহীন অবস্থায় সেই মহাদুর্গম রিখটারসভেল্ড পর্বতশ্রেণির বনের মধ্যে থাকা চলে না। পনেরো দিন হেঁটে সেই কাফির বস্তিতে পৌঁছোলাম। তারা চিনতে পারলে, খুব খাতির করলে। তাদের কাছে জিমের মৃত্যুকাহিনি বললাম।

শুনে তাদের মুখ ভয়ে কেমন হয়ে গেল, ছোটো ছোটো চোখ ভয়ে বড়ো হয়ে উঠল। বললে, সর্বনাশ! বুনিপ!। ওই ভয়েই ওখানে কেউ যায় না।

কাফির বস্তি থেকে আর পাঁচ দিন হেঁটে অরেঞ্জ নদীর ধারে এসে একখানা ডাচ লঞ্চ পেলাম। তাতে করে এসে সভ্য জগতে পৌঁছোলাম।

আমি আর কখনো রিখটারসভেল্ড পর্বতের দিকে যেতে পারিনি। চেষ্টা করেছিলাম অনেক। কিন্তু বুয়র যুদ্ধ এসে পড়ল। যুদ্ধে গেলাম। আহত হয়ে প্রিটোরিয়ার হাসপাতালে অনেকদিন রইলাম। তারপর সেরে উঠে একটা কমলালেবুর বাগানে কাজ পেয়ে সেখানেই এতদিন ছিলাম।

বছর চার-পাঁচ শান্ত জীবনযাপন করবার পরে, ভালো লাগল না, তাই আবার বার হয়ে ছিলাম। বয়স হয়ে গিয়েছে অনেক, ইয়্যাং ম্যান, এবার আমার চলা বোধ হয় ফুরুবে।

এই ম্যাপখানা তুমি রাখো। এতে রিখটারসভেল্ড পর্বত ও যে নদীতে আমরা হিরে পেয়েছিলাম, মোটামুটি ভাবে আঁকা আছে। সাহস থাকে, সেখানে যেয়ো, বড়োমানুষ হবে। বুয়র যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু-একটা ছোটো-বড়ো হিরের খনি বেরিয়েছে কিন্তু আমরা যেখানে হিরে পেয়েছিলাম তার সন্ধান কেউ জানে না। যেয়ো তুমি।

ডিয়েগো আলভারেজ গল্প শেষ করে আবার অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

শংকরের সেবাশুশ্রূষার গুণে ডিয়েগো আলভারেজ সে যাত্রা সেরে উঠল এবং দিন পনেরো শংকর তাকে নিজের কাছেই রাখলে। কিন্তু চিরকাল যে পথে পথে বেড়িয়ে এসেচে, ঘরে তার মন বসে না। একদিন সে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শংকর নিজের কতর্ব্য ঠিক করে ফেলেছিল। বললে, চলো, তোমার অসুখের সময় যেসব কথা বলেছিলে, মনে আছে? সেই হলদে হিরের খনি?

অসুখের ঝোঁকে আলভারেজ যেসব কথা বলেছিল, এখন সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ আর কোনো কথাটি বলে না। বেশির ভাগ সময় চুপ করে কী যেন ভাবে। শংকরের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বললে, আমিও কথাটা যে না ভেবে দেখছি, তা মনে কোরো না। কিন্তু আলেয়ার পিছনে ছুটবার সাহস আছে তোমার?

শংকর বললে, আছে কি না তা দেখতে দোষ কী? আজই বলো তো মাভো স্টেশনে তার করে আমার বদলে অন্য লোক পাঠাতে বলি।

আলভারেজ কিছুক্ষণ ভেবে বললে, করো তার। কিন্তু আগে বুঝে দেখো। যারা সোনা বা হিরে খুঁজে বেড়ায় তারা সবসময় তা পায় না। আমি আশি বছরের এক বুড়ো লোককে জানতাম, সে কখনো কিছু পায়নি। তবে প্রতিবারই বলত, এইবার ঠিক সন্ধান পেয়েছি, এইবার পাব! আজীবন, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে আর আফ্রিকার ভেল্ডে প্রসপেকটিং করে বেড়িয়েছে।

আরও দিন দশেক পরে দুজনে কিসুমু গিয়ে ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদে স্টিমার চড়ে দক্ষিণ মুখে মোয়ানজার দিকে যাবে ঠিক করলে।

পথে এক জায়গায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাজার হাজার জেব্রা, জিরাফ, হরিণ চরতে দেখে শংকর তো অবাক। এমন দৃশ্য সে আর কখনো দেখেনি।

জিরাফগুলো মানুষকে আদৌ ভয় করে না, পঞ্চাশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

আলভারেজ বললে, আফ্রিকার জিরাফ মারবার জন্যে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বিশেষ লাইসেন্স নিতে হয়। যে-সে মারতে পারে না। সেইজন্য মানুষকে ওদের তত ভয় নেই।

হরিণের দল কিন্তু বড়ো ভীরু, এক এক দলে দু-তিনশো হরিণ চরছে। ওদের দেখে ঘাস খাওয়া ফেলে মুখ তুলে একবার চাইলে, পরক্ষণেই মাঠের দূর প্রান্তের দিকে সবাই চার পা তুলে দৌড়।

কিসুমু থেকে স্টিমার ছাড়ল—এটা ব্রিটিশ স্টিমার, ওদের পয়সা কম বলে ডেকে যাচ্ছে। নিগ্রো মেয়েরা পিঠে ছেলে-মেয়ে বেঁধে মুরগি নিয়ে স্টিমারে উঠেছে। মাসাই কুলিরা ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে, সঙ্গে নাইরোবি শহর থেকে কাচের পুঁতি, কম দামের খেলো আয়না ছুরি প্রভৃতি নানা জিনিস।

স্টিমার থেকে নেমে আবার ওরা পথ চলে। ভিক্টোরিয়া হ্রদের যে বন্দরে ওরা নামল, তার নাম মোয়ানজা। এখান থেকে তিনশো মাইল দূরে ট্যাবোরা, সেখানে পৌঁছে কয়েকদিন বিশ্রাম করে ওরা যাবে তাঙ্গানিকা হ্রদের তীরবর্তী উজিজি বন্দরে।

এই পথে যাবার সময় আলভারেজ বললে তাঙ্গানিকার মধ্য দিয়ে যাওয়া বড়ো বিপজ্জনক ব্যাপার। এখানে একরকম মাছি আছে তা কামড়ালে স্লিপিং সিকনেস হয়। স্লিপিং সিকনেস-এর মড়কে তাঙ্গানিকা জনশূন্য হয়ে পড়েচে। মোয়ানজা থেকে ট্যাবোরার পথে সিংহের ভয়ও খুব বেশি। প্রকৃত পক্ষে আফ্রিকার এই অঞ্চলও সিংহের রাজ্য বলা চলে।

শহর থেকে দশ মাইল দূরে পথের ধারে একটা ছোটো খড়ের বাংলো। সেখানে এক ইয়োরোপীয় শিকারি আশ্রয় নিয়েছে। আলভারেজকে সে খুব খাতির করলে। শংকরকে দেখে বললে, একে পেলে কোথায়? এ তো হিন্দু! তোমার কুলি?

আলভারেজ বললে, আমার ছেলে।

সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললে, কীরকম?

আলভারেজ আনুপূর্বিক সব বর্ণনা করলে, তার রোগের কথা, শংকরের সেবাশুশ্রূষার কথা। কেবল বললে না কোথায় যাচ্ছে ও কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

সাহেব হেসে বললে, বেশ ভালো। ওর মুখ দেখে মনে হয় ওর মনে সাহস ও দয়া দুই-ই আছে। ইস্ট ইন্ডিজের হিন্দুরা লোক হিসেবে ভালোই বটে। একবার উগান্ডাতে একজন শিখ আমার প্রতি এমন সুন্দর আতিথ্য দেখিয়েছিল, তা কখনো ভুলতে পারব না। আজ তোমরা এসো, রাত সামনে, আমার এখানেই রাত্রি যাপন করো। এটা গভর্নমেন্টের ডাকবাংলো, আমিও তোমাদের মতো সারাদিন পথ চলে বিকেলের দিকে এসে উঠেছি।

সাহেবের একটি ছোটো গ্রামোফোন ছিল, সন্ধ্যার পরে টিনবন্দি বিলিতি টোমাটোর ঝোল ও সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করার পরে সবাই বাংলোর বাইরে ক্যাম্প চেয়ারে শুয়ে রেকর্ডের পর রেকর্ড শুনে যাচ্ছে, এমন সময় অল্প দূরে সিংহের গর্জন শোনা গেল। বোধ হল মাটির কাছে মুখ নামিয়ে সিংহ গর্জন করছে—কারণ মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সাহেব বললে, তাঙ্গানিকায় বেজায় সিংহের উপদ্রব আর বড়ো হিংস্র এরা। প্রায় অধিকাংশ সিংহই মানুষখেকো। মানুষের রক্তের আস্বাদ একবার পেয়েছে, এখন মানুষ ছাড়া আর কিছু চায় না।

শংকর ভাবলে খুব সুসংবাদ বটে। উগান্ডা রেলওয়ে তৈরি হবার সময় সে সিংহের উপদ্রব কাকে বলে খুব ভালো করেই দেখেছে।

পরদিন সকালে ওরা আবার রওনা হল। সাহেব বলে দিলে সূর্য উঠে গেলে খুব সাবধানে থাকবে। স্লিপিং সিকনেস-এর মাছি রোদ উঠলেই জাগে, গায়ে যেন না বসে।

দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ। আলভারেজ বললে, খুব সাবধান, এইসব ঘাসের বনেই সিংহের আড্ডা; বেশি পিছনে থেকো না।

আলভারেজের বন্দুক আছে, এই একটা ভরসা। আর একটা ভরসা এই যে, আলভারেজ, যাকে বলে 'ক্র্যাকশট' তা-ই। অর্থাৎ তার গুলি বড়ো একটা ফসকায় না। কিন্তু অত বড়ো অব্যর্থ-লক্ষ্য শিকারি সঙ্গে থেকেও শংকর বিশেষ ভরসা পেলে না, কারণ উগান্ডার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, সিংহ যখন যাকে নেবে এমন সম্পূর্ণ অতর্কিতেই নেবে যে, পিঠের রাইফেলের চামড়া স্ট্র্যাপ খুলবার অবকাশ পর্যন্ত দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যা হবার ঘণ্টাখানেক আগে দূরবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে রাত্রে বিশ্রামের জন্যে স্থান নির্বাচন করে নিতে হল। আলভারেজ বললে, সামনে কোনো গ্রাম নেই। অন্ধকারের পর এখানে পথ চলা ঠিক নয়।

একটা সুবৃহৎ বাওবাব গাছের তলায় দু-টুকরো ক্যাম্বিস ঝুলিয়ে ছোট্ট একটু তাঁবু খাটানো হল। কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রের খাবার তৈরি করতে বসল শংকর। তারপর সমস্ত দিন পরিশ্রমের পরে দুজনেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে আলভারেজ ডাকলে, শংকর, ওঠো।

শংকর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

আলভারেজ বললে, কী একটা জানোয়ার তাঁবুর চারপাশে ঘুরছে, বন্দুক বাগিয়ে রাখো।

সত্যিই একটা কোনো অজ্ঞাত বৃহৎ জন্তুর নিশ্বাসের শব্দ তাঁবুর পাতলা ক্যাম্বিসের পরদার বাইরে শোনা যাচ্ছে বটে। তাঁবুর সামনে সন্ধ্যায় যে আগুন করা হয়েছিল, তার স্বল্পাবশিষ্ট আলোকে সুবৃহৎ বাওবাব গাছটা একটা ভীষণদর্শন দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। শংকর বন্দুক নিয়ে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করতে বৃদ্ধ বারণ করলে।

পরক্ষণেই জানোয়ারটা হুড়মুড় করে তাঁবুটা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর পরদার ভিতর থেকেই আলভারেজ পর পর দুবার রাইফেল ছুঁড়লে। শব্দটা লক্ষ করে শংকরও সেই মুহূর্তে বন্দুক ওঠালে। কিন্তু শংকর ঘোড়া টিপবার আগে আলভারেজের রাইফেল আর একবার আওয়াজ করে উঠল। তারপরেই সব চুপ।

ওরা টর্চ ফেলে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এসে দেখলে তাঁবুর পুব দিকে বাইরের পরদাটা খানিকটা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ।

সেটা তখনও মরেনি, কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছে। আরও দুবার গুলি খেয়ে সেটা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

আলভারেজ আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বলল, রাত এখনও অনেক। ওটা এখানে পড়ে থাক। চলো আমরা আমাদের ঘুম শেষ করি।

দুজনেই এসে শুয়ে পড়ল—একটু পরে শংকর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলে আলভারেজের নাসিকা গর্জন শুরু হয়েছে। শংকরের চোখে ঘুম এল না।

আধঘণ্টা পরে শংকরের মনে হল, আলভারেজের নাসিকা গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে তাঙ্গানিকা অঞ্চলের সমস্ত সিংহ যেন এক যোগে ডেকে উঠল। সে কী ভয়ানক সিংহের ডাক। আগেও শংকর অনেকবার সিংহ গর্জন শুনেছে, কিন্তু এ রাত্রের সে ভীষণ বিরাট গর্জন তার চিরকাল মনে ছিল। তা ছাড়া ডাক তাঁবু থেকে বিশ হাতের মধ্যে।

আলভারেজ আবার জেগে উঠল। বললে, নাঃ, রাত্রে দেখছি একটু ঘুমুতে দিলে না। আগের সিংহটার জোড়া। সাবধানে থাকো। বড়ো পাজি জানোয়ার।

কী দুর্যোগের রাত্রি। তাঁবুর আগুনও তখন নিবু নিবু। তার বাইরে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাতলা ক্যাম্বিসের চটের মাত্র ব্যবধান—তার ওদিকে সাথিহারা পশু। বিরাট গর্জন করতে করতে সেটা একবার তাঁবু থেকে দূরে যায়, আবার কাছে আসে, কখনো তাঁবু প্রদক্ষিণ করে।

ভোর হবার কিছু আগে সিংহটা সরে পড়ল। ওরাও তাঁবু তুলে আবার যাত্রা শুরু করলে।

ছয়

দিন পনেরো পরে শংকর ও আলভারেজ উজিজি বন্দর থেকে স্টিমারে তাঙ্গানিকা হ্রদে ভাসল। হ্রদ পার হয়ে আলবার্টভিল বলে একটা ছোটো শহরে কিছু আবশ্যকীয় জিনিস কিনে নিল। এই শহর থেকে কাবালো পর্যন্ত বেলজিয়ম গভর্নমেন্টের রেলপথ আছে। সেখান থেকে কঙ্গোনদীতে স্টিমার চড়ে তিন দিনের পথ সানকিনি যেতে হবে, সানকিনিতে নেমে কঙ্গোনদীর পথ ছেড়ে, দক্ষিণ মুখে অজ্ঞাত বনজঙ্গল ও মরুভূমির দেশে প্রবেশ করতে হবে।

কাবালো অতি অপরিষ্কার স্থান, কতকগুলো বর্ণসংকর পর্তুগিজ ও বেলজিয়ানের আড্ডা।

স্টেশনের বাইরে পা দিয়েছে এমন সময় একজন পর্তুগিজ ওর কাছে এসে বললে, হ্যালো, কোথায় যাবে? দেখছি নতুন লোক, আমায় চেনো না নিশ্চয়ই। আমার নাম আলবুকার্ক।

শংকর চেয়ে দেখলে আলভারেজ তখনও স্টেশনের মধ্যে।

লোকটার চেহারা যেমন কর্কশ তেমনই কদাকার। কিন্তু সে ভীষণ জোয়ান, প্রায় সাত ফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীরের প্রত্যেকটির মাংসপেশি গুণে নেওয়া যায়, এমন সুদৃঢ় ও সুগঠিত।

শংকর বললে, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।

লোকটা বললে, তুমি দেখছি কালা আদমি, বোধ হয় ইস্ট ইন্ডিজের। আমার সঙ্গে পোকার খেলবে চলো।

শংকর ওর কথা শুনে চটেছিল, বললে, তোমার সঙ্গে পোকার খেলবার আমার আগ্রহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝলে, লোকটা পোকার খেলবার ছলে তার সর্বস্ব অপহরণ করতে চায়। পোকার একরকম তাসের জুয়াখেলা। শংকর নাম জানলেও সে খেলা জীবনে কখনো দেখেওনি; নাইরোবিতে সে

জানত বদমাইস জুয়াড়িরা পোকার খেলার ছল করে নতুন লোকের সর্বনাশ করে। এটা একধরনের ডাকাতি।

শংকরের উত্তর শুনে পর্তুগিজ বদমাইসটা রেগে লাল হয়ে উঠল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে চাইল। সে আরও কাছে ঘেঁষে এসে, দাঁতে দাঁত চেপে, অতি বিকৃত সুরে বললে, কী? নিগার, কী বললি? ইস্ট ইন্ডিজের তুলনায় তুই অত্যন্ত ফাজিল দেখছি। তোর ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যে তোকে জানিয়ে দিই যে, তোর মতো কালা আদমিকে আলবুকার্ক এই রিভলবারের গুলিতে কাদাখোঁচা পাখির মতো ডজনে ডজনে মেরেছে। আমার নিয়ম হচ্ছে এই, শোন—কাবালোতে যারা নতুন লোক নামবে, তারা হয় আমার সঙ্গে পোকার খেলবে, নয়তো আমার সঙ্গে রিভলবারের দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে।

শংকর দেখলে এই বদমাইস লোকটার সঙ্গে রিভলবারের লড়াইয়ে নামলে মৃত্যু অনিবার্য। বদমাইসটা হচ্ছে একজন ক্র্যাকশট গুন্ডা, আর সে কী? কাল পর্যন্ত রেলের নিরীহ কেরানি ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না করে যদি পোকারই খেলে তবে সর্বস্ব যাবে।

হয়তো আধমিনিট কাল শংকরের দেরি হয়েছে উত্তর দিতে, লোকটা কোমরের চামড়ার হোলস্টার থেকে নিমেষের মধ্যে রিভলবার বার করে শংকরের পেটের কাছে উঁচিয়ে বললে, যুদ্ধ না, পোকার?

শংকরের মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভীতুর মতো সে পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নিচু করবে না, হোক মৃত্যু।

সে বলতে যাচ্ছে—যুদ্ধ, এমন সময় পিছন থেকে ভয়ানক বাঁজখাই সুরে কে বললে, এই সামলাও। গুলিতে মাথার চাঁদি উড়ল!

দুইজনেই চমকে উঠে পিছনে চাইলে। আলভারেজ তার উইনচেস্টার রিপিটারটা বাগিয়ে, উঁচিয়ে, পর্তুগিজ বদমাইসটার মাথা লক্ষ করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। শংকর সুযোগ বুঝে চট করে পিস্তলের নলের উলটোদিকে ঘুরে গেল। আলভারেজ বললে, বালকের সঙ্গে রিভলবার ডুয়েল? ছোঃ, তিন বলতে পিস্তল ফেলে দিবি, এক—দুই—তিন—আলবুকার্কের শিথিল হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল।

আলভারেজ বললে, বালককে একা পেয়ে খুব বীরত্ব জাহির করছিলি, না? শংকর ততক্ষণে পিস্তলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে। আলবুকার্ক একটু বিস্মিত হল, আলভারেজ যে শংকরের দলের লোক, তা সে ভাবেওনি। সে হেসে বললে, আচ্ছা, মেট, কিছু মনে কোরো না, আমারই হার। দাও, আমার পিস্তল দাও ছোকরা। কোনো ভয় নেই, দাও। এসো হাতে হাত দাও। তুমিও মেট। আলবুকার্ক রাগ পুষে রাখে না। এসো, কাছেই আমার কেবিন, এক-এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে যাও।

আলভারেজ নিজের জাতের লোকের রক্ত চেনে। ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে শংকরকে সঙ্গে নিয়ে আলবুকার্কের কেবিনে গেল। শংকর বিয়ার খায় না শুনে তাকে কফি করে দিল। প্রাণ খোলা হাসি হেসে কত গল্প করলে, যেন কিছুই হয়নি।

শংকর বাস্তবিকই লোকটার দিকে আকৃষ্ট হল। কিছুক্ষণ আগের অপমান ও শত্রুতা যে এমন বেমালুম ভুলে গিয়ে, যাদের হাতে অপমানিত হয়েছে, তাদেরই সঙ্গে এমনি ধারা দিলখোলা হেসে খোশগল্প করতে পারে, পৃথিবীতে এধরনের লোক বেশি নেই।

পরদিন ওরা কাবালো থেকে স্টিমারে উঠল কঙ্গোনদী বেয়ে দক্ষিণ মুখে যাবার জন্যে। নদীর দুই তীরের দৃশ্যে শংকরের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এরকম অদ্ভুত বনজঙ্গলের দৃশ্য জীবনে কখনো সে দেখেনি। এতদিন সে যেখানে ছিল আফ্রিকার সে অঞ্চলে এমন বন নেই, সে শুধু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রধানত ঘাসের বন, মাঝে মাঝে বাবলা ও ইউকা গাছ। কিন্তু কঙ্গোনদী বেয়ে স্টিমার যত অগ্রসর হয়, দু-ধারে নিবিড় বনানী, কত ধরনের মোটা মোটা লতা, বনের ফুল। বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী আপনার সৌন্দর্য ও নিবিড় প্রাচুর্যে আপনি মুগ্ধ।

শংকরের মধ্যে যে সৌন্দর্যপ্রিয় ভাবুক মনটি ছিল, (হাজার হোক সে বাংলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আলভারেজের মতো শুধু কঠিন প্রাণ স্বর্ণন্বেষী প্রসপেক্টর নয়) এই রূপের মেলায় সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে রাঙা অপরাহ্ণে ও দুপুর রোদে আপন মনে কত কী স্বপ্নজাল রচনা করে।

অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, অচেনা তারাভরা বিদেশের আকাশের তলায় রহস্যময়ী বন্যপ্রকৃতি তখন যেন জেগে উঠেছে—জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্যজন্তুর ডাক কানে আসে। শংকরের চোখে ঘুম নেই, এই সৌন্দর্যস্বপ্নে বিভোর হয়ে, মধ্য-আফ্রিকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও সে জেগে বসে থাকে।

ওই জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডল—আকাশের অনেকদূর তার ছোটো গ্রামের মাথায়ও আজ অমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেচে, ওইরকম একফালি কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রে চাঁদও। সেসব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূরে এসে সে পড়েচে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কী এর পরিণতি কে জানে!

দু-দিন পরে বোট এসে সানকিনি পৌঁছোল। সেখান থেকে ওরা আবার পদব্রজে রওনা হল। জঙ্গল এদিকে বেশি নেই, কিন্তু দিগন্তপ্রসারী জনমানবহীন প্রান্তর ও অসংখ্য ছোটো-বড়ো পাহাড়, অধিকাংশ পাহাড় বৃক্ষ ও বৃক্ষশূন্য, কোনো কোনো পাহাড়ে ইউফোর্বিয়া জাতীয় গাছের ঝোপ। কিন্তু শংকরের মনে হল, আফ্রিকার এই অঞ্চলের দৃশ্য বড়ো অপরূপ। এতটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে মন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সূর্যাস্তের রং, জ্যোৎস্নারাত্রির মায়া, এই দেশকে রাত্রে অপরাহ্ণে রূপকথার পরিরাজ্য করে তোলে।

আলভারেজ বললে, এই ভেল্ড অঞ্চলে সব জায়গা দেখতে একরকম বলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশি।

কথাটা যেদিন বলা হল, সেদিনই এক কাণ্ড ঘটল। জনহীন ভেল্ডে সূর্য অস্ত গেলে ওরা একটা ছোটো পাহাড়ের আড়ালে তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বাললে—শংকর জল খুঁজতে বেরুল। সঙ্গে আলভারেজের বন্দুকটা নিয়ে গেল, কিন্তু মাত্র দুটি টোটা। আধঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরে বেলাটুকু গেল, পাতলা অন্ধকারে সমস্ত প্রান্তরকে ধীরে ধীরে আবৃত করে দিলে। শংকর শপথ করে বলতে পারে, সে আধঘণ্টার বেশি হাঁটেনি। হঠাৎ চারধারে চেয়ে শংকরের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল, যেন কী একটা বিপদ আসচে, তাঁবুতে ফেরা ভালো। দূরে দূরে ছোটো-বড়ো পাহাড়, একইরকম দেখতে সবদিক, কোনো চিহ্ন নেই, সব একাকার!

মিনিট পাঁচ-ছয় হাঁটবার পরই শংকরের মনে হল সে পথ হারিয়েছে। তখন আলভারেজের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু তখনও সে অনভিজ্ঞতার দরুন বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পারলে না। হেঁটেই যাচ্ছে—হেঁটেই যাচ্ছে—একবার মনে হয় সামনে, একবার মনে হয় বাঁয়ে, একবার মনে হয় ডাইনে। তাঁবুর আগুনের কুণ্ডটা দেখা যায় না কেন! কোথায় সেই ছোটো পাহাড়টা?

দু-ঘণ্টা হাঁটবার পর শংকরের খুব ভয় হল। ততক্ষণে সে বুঝেছে যে, সে সম্পূর্ণরূপে পথ হারিয়েচে এবং ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। একা তাকে রোডেসিয়ার এই জনমানবশূন্য, সিংহসংকুল অজানা প্রান্তরে রাত কাটাতে হবে—অনাহারে এবং এই কনকনে শীত বিনা কম্বলে ও বিনা আগুনে। সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই দাঁড়াল যে, পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে অর্থাৎ পথ হারানোর চব্বিশ ঘণ্টা পরে, উদভ্রান্ত, তৃষ্ণায় মুমূর্ষু শংকরকে, ওদের তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে, একটা ইউফোর্বিয়া গাছের তলা থেকে আলভারেজ উদ্ধার করে তাঁবুতে নিয়ে এল।

আলভারেজ বললে, তুমি যে পথ ধরেছিলে শংকর, তোমাকে আজ খুঁজে বার করতে না পারলে তুমি গভীর থেকে গভীরতর মরুপ্রান্তরের মধ্যে গিয়ে পড়ে, কাল দুপুর নাগাদ তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে। এর আগে তোমার মতো অনেকেই রোডেসিয়ার ভেল্ডে এভাবে মারা গিয়েছে। এসব ভয়ানক জায়গা। তুমি আর কখনো তাঁবু থেকে ওরকম বেরিয়ো না, কারণ তুমি আনাড়ি। মরুভূমিতে ভ্রমণের কৌশল তোমার জানা নেই, ডাহা মারা পড়বে।

শংকর বললে, আলভারেজ, তুমি দুবার আমার প্রাণ রক্ষা করলে, এ আমি ভুলব না।

আলভারেজ বললে, ইয়াং ম্যান, ভুলে যাচ্ছ যে তার আগে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি না থাকলে উগান্ডার তৃণভূমিতে আমার হাড়গুলো সাদা হয়ে আসত এতদিনে।

মাস দুই ধরে রোডেসিয়া ও এঙ্গোলার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভেল্ড অতিক্রম করে, অবশেষে দূরে মেঘের মতো পর্বতশ্রেণি দেখা গেল। আলভারেজ ম্যাপ মিলিয়ে বললে, ওই হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থান, রিখটারসভেল্ড পর্বত, এখনও এখান থেকে চল্লিশ মাইল হবে। আফ্রিকার এইসব খোলা জায়গায় অনেক দূর থেকে জিনিস দেখা যায়।

এ অঞ্চলে অনেক বাওবাব গাছ। শংকরের এ গাছটা বড়ো ভালো লাগে—দূর থেকে যেন মনে হয় বট কি অশ্বত্থ গাছের মতো কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায় বাওবাব গাছ, ছায়াবিরল অথচ বিশাল, আঁকা-বাঁকা, সারা গায়ে যেন বড়ো বড়ো আঁচিল কী আব বেরিয়েছে, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা বেঁটে, কুদর্শন, কুব্জ দৈত্য। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এখানে-ওখানে প্রায় সর্বত্রই দূরে নিকটে বড়ো বড়ো বাওবাব গাছ দাঁড়িয়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলার দুর্জয় শীতে তাঁবুর সামনে আগুন করে বসে আলভারেজ বললে, এই যে দেখছ রোডেসিয়ার ভেল্ড অঞ্চল, এখানে হিরে ছড়ানো আছে সর্বত্র, এটা হিরের খনির দেশ! কিম্বার্লি খনির নাম নিশ্চয় শুনেছ। আরও অনেক ছোটোখাটো খনি আছে, এখানে-ওখানে ছোটো-বড়ো হিরের টুকরো কত লোক পেয়েচে, এখনও পায়।

কথা শেষ করেই বলে উঠল, ও কারা?

শংকর সামনে বসে ওর কথা শুনছিল। বললে, কোথায় কে?

কিন্তু আলভারেজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার হাতের বন্দুকের গুলির মতোই অব্যর্থ, একটু পরে তাঁবু থেকে দূরে অন্ধকারে কয়েকটি অস্পষ্ট মূর্তি এদিকে এগিয়ে আসছে, শংকরের চোখে পড়ল। আলভারেজ বললে, শংকর, বন্দুক নিয়ে এসো, চট করে যাও, টোটা ভরে—

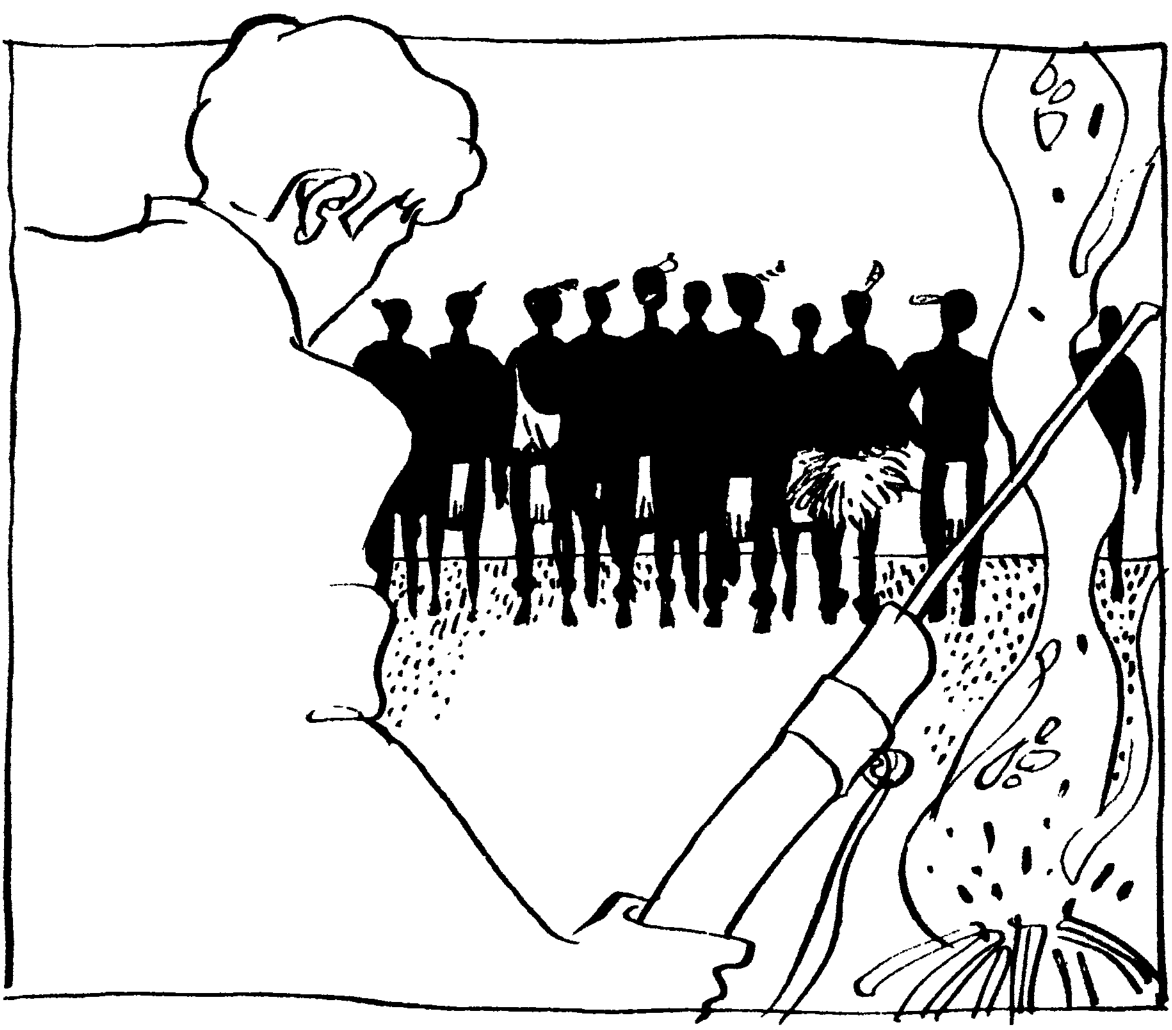

বন্দুক হাতে শংকর বাইরে এসে দেখল, আলভারেজ নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করছে, কিছুদূরে অজানা মূর্তি কয়টি এখনও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আসছে। একটু পরে তারা এসে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের বাইরে দাঁড়াল। শংকর চেয়ে দেখলে আগন্তুক কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায়—তাদের হাতে কিছু নেই, পরনে লেংটি, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালক—সুগঠিত চেহারা। তাঁবুর আলোয় মনে হচ্ছিল, যেমন কয়েকটি ব্রোঞ্জের মূর্তি।

আলভারেজ জুলু ভাষায় বললে, কী চাও তোমরা?

ওদের মধ্যে কী কথাবার্তা চলল, তারপর ওরা সব মাটির উপর বসে পড়ল। আলভারেজ বললে, শংকর ওদের খেতে দাও।

তারপর অনুচ্চস্বরে বললে, বড়ো বিপদ। খুব হুঁশিয়ার শংকর!

টিনের খাবার খোলা হল। সকলের সামনেই খাবার রাখলে শংকর। আলভারেজও ওই সঙ্গে আবার খেতে বসল যদিও সে ও শংকর সন্ধ্যার সময়েই তাদের নৈশ-আহার শেষ করেচে। শংকর বুঝলে আলভারেজের কোনো মতলব আছে, কিংবা এদেশের রীতি অতিথির সাথে খেতে হয়।

আলভারেজ খেতে খেতে জুলু ভাষায় আগন্তুকদের সঙ্গে গল্প করচে, অনেকক্ষণ পরে খাওয়া শেষে ওরা চলে গেল। যাবার আগে সবাইকে একটা করে সিগারেট দেওয়া হল।

ওরা চলে গেলে আলভারেজ বললে, ওরা মাটাবেল জাতির লোক। ভয়ানক দুর্দান্ত, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে অনেকবার লড়েছে। শয়তানকেও ভয় করে না। ওরা সন্দেহ করেছে আমরা ওদের দেশে এসেছি হিরের খনির সন্ধানে। আমরা যে জায়গাটায় আছি, এটা ওদের একজন সর্দারের রাজ্য। কোনো সভ্য গভর্নমেন্টের আইন এখানে খাটবে না। ধরবে আর নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারবে। চলো, আমরা তাঁবু তুলে রওনা হই।

শংকর বললে, তবে তুমি বন্দুক আনতে বললে কেন?

আলভারেজ হেসে বললে, দেখো, ভেবেছিলাম যদি ওরা খেয়েও না ভোলে, কিংবা কথাবার্তায় বুঝতে পারি যে, ওদের মতলব খারাপ, ভোজনরত অবস্থাতেই ওদের গুলি করব। এই দেখো রিভলবার পিছনে রেখে তবে খেতে বসেছিলাম, এ কটাকে সাবাড় করে দিতাম। আমার নাম আলভারেজ, আমিও এককালে শয়তানকে ভয় করতুম না, এখনও করিনে। ওদের হাতের মাছ মুখে পৌঁছোবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।

আরও পাঁচ-ছ-দিন পথ চলবার পরে একটা খুব বড়ো পর্বতের পাদমূলে নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানীর মধ্যে ওরা প্রবেশ করলে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি বিশাল। সে বন দেখে শংকরের মনে হল, একবার যদি সে এর মধ্যে পথ হারায় সারাজীবন ঘুরলেও বার হয়ে আসবার সাধ্য তার হবে না। আলভারেজও তাকে সাবধান করে দিয়ে বললে, খুব হুঁশিয়ার শংকর, বনে চলাফেরা যার অভ্যাস নেই, সে পদে পদে এইসব বনে পথ হারাবে। অনেক লোক বেঘোরে পড়ে বনের মধ্যে মারা পড়ে। মরুভূমির মধ্যে যেমন পথ হারিয়ে ঘুরেছিলে, এর মধ্যেও ঠিক তেমনই পথ হারাতে পার। কারণ এখানে সবই একরকম, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাকে পৃথক করে চিনে নেবার কোনো চিহ্ন নেই। ভালো বুশম্যান না হলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। বন্দুক না নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না, এটিও যেন মনে থাকে। মধ্য-আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পার্ক নয়।

শংকরকে তা না বললেও চলত, কারণ এসব অঞ্চল যে শখের পার্ক নয়, তা এর চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছে। সে জিজ্ঞেস করলে, তোমার সেই হলদে হিরের খনি কতদূরে? এই তো রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা, ম্যাপে যতদূর বোঝা যাচ্ছে।

আলভারেজ হেসে বললে, তোমার ধারণা নেই বললাম যে। আসল রিখটারসভেল্ডের এটা বাইরের থাক। এরকম আরও অনেক থাক আছে। সমস্ত অঞ্চলটা এত বিশাল যে পুবে সত্তর মাইল ও পশ্চিম দিকে একশো থেকে দেড়শো মাইল পর্যন্ত গেলেও এ বন-পাহাড় শেষ হবে না। সর্বনিম্ন প্রস্থ চল্লিশ মাইল। সমস্ত জড়িয়ে আট-ন হাজার বর্গমাইল সমস্ত রিখটারসভেল্ড পার্বত্য অঞ্চল ও অরণ্য। এই বিশাল অজানা অঞ্চলের কোনখানটাতে এসেছিলুম আজ সাত-আট বছর আগে, ঠিক সে জায়গাটা খুঁজে বার করা কী ছেলেখেলা ইয়াং ম্যান?

শংকর বললে, এদিকে খাবার ফুরিয়েছে, শিকারের ব্যবস্থা দেখতে হয়, নইলে কাল থেকে বায়ু ভক্ষণ করা ছাড়া উপায় নেই।

আলভারেজ বললে, কিছু ভেবো না। দেখছ না গাছে গাছে বেবুনের মেলা। কিছু না মেলে, বেবুনের দাপনা ভাজা আর কফি দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট খাব আজ থেকে। আজ আর নয়, তাঁবু ফেলো, বিশ্রাম করা যাক।

একটা বড়ো গাছের নীচে তাঁবু খাটিয়ে ওরা আগুন জ্বালালে। শংকর রান্না করলে, আহারাদি শেষ করে যখন দুজনে আগুনের সামনে বসেছে, তখনও বেলা আছে।

আলভারেজ কড়া তামাকের পাইপ টানতে টানতে বললে, জানো শংকর, আফ্রিকার এইসব অজানা অরণ্যে এখনও কত জানোয়ার আছে, যার খবর বিজ্ঞানশাস্ত্র রাখে না? খুব কম সভ্য মানুষ এখানে এসেছে। ওকাপি বলে যে জানোয়ার সে তো প্রথম দেখা গেল ১৯০০ সালে। একধরনের বুনো শুয়োর আছে, যা সাধারণ বুনো শুয়োরের প্রায় তিনগুণ বড়ো আকারের। ১৮৮৮ সালে মোজেস কাউলে, পৃথিবী পর্যটক ও বড়ো শিকারি, সর্বপ্রথম ওই বুনো শুয়োরের সন্ধান পান বেলজিয়াম কঙ্গোর লুয়ালাবু অরণ্যের মধ্যে। তিনি বহু কষ্টে একটা শিকার করেন এবং নিউইয়র্ক প্রাণীবিদ্যা সংক্রান্ত মিউজিয়ামে উপহার দেন। বিখ্যাত রোডেসিয়ান মনস্টারের নাম শুনেছ?

শংকর বললে, না, কী সেটা?

—শোনো তবে। রোডেসিয়ার উত্তর সীমায় প্রকাণ্ড জলাভূমি আছে। ওদেশের অসভ্য জুলুদের মধ্যে অনেকেই এক অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারকে এই জলাভূমিতে মাঝে মাঝে দেখেছে। ওরা বলে তার মাথা কুমিরের মতো, গন্ডারের মতো তার শিং আছে, গলাটা অজগর সাপের মতো লম্বা ও আঁশওয়ালা দেহটা জলহস্তীর মতো, ল্যাজটা কুমিরের মতো। বিরাটদেহ এই জানোয়ারের প্রকৃতিও খুব হিংস্র। জল ছাড়া কখনো ডাঙায় এ জানোয়ারকে দেখা যায়নি। তবে এইসব অসভ্য দেশি লোকের অতিরঞ্জিত বিবরণ বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু ১৮৮০ সালে জেমস মার্টিন বলে একজন প্রসপেক্টর রোডেসিয়ার এই অঞ্চলে বহুদিন ঘুরেছিল সোনার সন্ধানে। মিস্টার মার্টিন আগে জেনারেল ম্যাথিউসের এইড-ডি-বাস ছিলেন, নিজে একজন ভালো ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ববিদও ছিলেন। ইনি তাঁর ডায়েরির মধ্যে রোডেসিয়ার এই অজ্ঞাত জানোয়ার দূর থেকে দেখেছেন বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। তিনিও বলেন জানোয়ারটা আকৃতিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপের মতো ও বেজায় বড়ো। কিন্তু তিনি জোর করে কিছু বলতে পারেননি, কারণ খুব ভোরের কুয়াশার মধ্যে কোভিরাণ্ডো হ্রদের সীমানায়, জলাভূমিতে আবছায়া ভাবে তিনি জানোয়ারটিকে দেখেছিলেন। জানোয়ারটার ঘোড়ার চিঁ হিঁ ডাকের মতো ডাক শুনেই তাঁর সঙ্গের জুলু চাকরগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পালাতে বলল, সাহেব পালাও, পালাও, ডিঙ্গোনেক। ডিঙ্গোনেক। ডিঙ্গোনেক ওই জানোয়ারটার জুলু নাম। দু-তিন বছরে এক-আধবার দেখা দেয় কি না দেয়, কিন্তু সেটা এতই হিংস্র যে তার আবির্ভাব সে দেশের লোকের পক্ষে ভীষণ ভয়ের ব্যাপার। মিস্টার মার্টিন বলেন, তিনি তাঁর ৩০০ টোটা গোটা দুই উপরি উপরি ছুঁড়েছিলেন জানোয়ারটার দিকে। অত দূর থেকে তাক হল না, রাইফেলের আওয়াজে সেটা সম্ভবত জলে ডুব দিলে।

শংকর বললে, তুমি কী করে জানলে এসব? মার্টিনের ডায়েরি ছাপানো হয়েছিল নাকি?

—না, অনেকদিন আগে বুলাওয়ে ক্রনিকল কাগজে মিস্টার মার্টিনের এই ঘটনাটা বেরিয়েছিল। আমি

তখন সবে এদেশে এসেচি। রোডেসিয়া অঞ্চলে আমিও প্রসপেক্টিং করে বেড়াতুম বলে জানোয়ারটার বিবরণ আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। কাগজখানা অনেকদিন আমার কাছে রেখেও দিয়েছিলুম। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। ওরাই নাম দিয়েছিল জানোয়ারটার রোডেসিয়ান মনস্টার।

শংকর বললে, তুমি কোনো কিছু অদ্ভুত জানোয়ার দেখোনি?

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেচে। সেই আবছায়া আলো অন্ধকারের মধ্যে শংকরের মনে হল—হয়তো শংকরের ভুল হতে পারে—কিন্তু শংকরের মনে হল সে দেখল আলভারেজ, দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক আলভারেজ, দুঁদে ও অব্যর্থ-লক্ষ্য আলভারেজ, ওর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল, এবং—এবং সেটাই সকলের চেয়ে আশ্চর্য—যেন পরক্ষণেই শিউরে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আলভারেজ যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই চারপাশের জনমানবহীন ঘন জঙ্গল ও রহস্যভরা দূরারোহ পর্বতমালার দিকে একবার চেয়ে দেখলে, কোনো কথা বললে না। যেন এই পর্বত জঙ্গলে বহুকাল পরে এসে অতীতের কোনো বিভীষিকাময় পুরাতন ঘটনা ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে—যে স্মৃতিটা ওর পক্ষে খুব প্রীতিকর নয়।

আলভারেজ ভয় পেয়েছে!

অবাক! আলভারেজের ভয়! শংকর ভাবতেও পারে না! কিন্তু সেই ভয়টা অলক্ষিতে এসে শংকরের মনেও চেপে বসল। এই সম্পূর্ণ অজানা বিচিত্র রহস্যময় বনানী, এই বিরাট পর্বত প্রাচীর যেন এক গভীর রহস্যকে যুগ যুগ ধরে গোপন করে আসছে। যে বীর যে নির্ভীক এগিয়ে এসো সে—কিন্তু মৃত্যুপণে ক্রয় করতে হবে সেই গহন রহস্যের সন্ধান।

রিখটারসভেল্ড পবর্তমালা ভারতের দেবাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় নয়—এদেশের মাসাই, জুলু, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতোই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংসলোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না।

সাত

তারপর দিন দুই কেটে গেল।। ওরা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলে। পথ কোথাও সমতল নয়, কেবল চড়াই আর উতরাই, মাঝে মাঝে কর্কশ ও দীর্ঘ টুসক-ঘাসের বন, জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য, ঝরনা এক-আধটা যদিও বা দেখা যায়, আলভারেজ তাকে জল ছুঁতেও দেয় না। দিব্যি স্ফটিকের মতো নির্মল জল পড়ছে ঝরনা বেয়ে, সুশীতল ও লোভনীয়, তৃষ্ণার্ত লোকের পক্ষে সে লোভ সম্বরণ করা বড়োই কঠিন, কিন্তু আলভারেজ জলের বদলে ঠান্ডা চা খাওয়াবে তবুও জল খেতে দেবে না। জলের তৃষ্ণা ঠান্ডা চায়ে দূর হয় না, তৃষ্ণার কষ্টই সবচেয়ে বেশি কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল শংকরের। একজায়গায় টুসক-ঘাসের বন বেজায় ঘন! তবে উপরে ওদের চারধার ঘিরে সেদিন কুয়াশাও খুব গভীর! হঠাৎ বেলা উঠলে নীচের কুয়াশা সরে গেল। সামনে চেয়ে শংকরের মনে হল, খুব বড়ো একটা চড়াই তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে, কত উঁচু সেটা তা জানা সম্ভব নয়, কারণ নিবিড় কুয়াশা কিংবা মেঘে তার উপরের দিকটা সম্পূর্ণরূপে আবৃত।

আলভারেজ বললে, রিখটারসভেল্ডের আসল রেঞ্জ।

শংকর বললে, এটা পার হওয়া কি দরকার?

আলভারেজ বললে, এজন্যে দরকার যে সেবার আমি আর জিম দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিলুম এই পর্বতশ্রেণির পাদমূলে কিন্তু আসল রেঞ্জ পার হইনি। যে নদীর ধারে হলদে হিরে পাওয়া গিয়েছিল, তার গতি পুব থেকে পশ্চিমে। এবার আমরা যাচ্ছি উত্তর থেকে দক্ষিণে, সুতরাং পর্বত পার হয়ে ওপারে না গেলে কি সেই নদীটার ঠিকানা করতে পারি!

শংকর বললে, আজ যেরকম কুয়াশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে একটু অপেক্ষা করা যাক না কেন? আর একটু বেলা বাড়ুক।

তাঁবু ফেলে আহারাদি সম্পন্ন করা হল। বেলা বাড়লেও কুয়াশা তেমন কাটল না। শংকর ঘুমিয়ে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন নেই। চোখ মুছতে মুছতে তাঁবুর বাইরে এসে সে দেখলে আলভারেজ চিন্তিত মুখে ম্যাপ খুলে বসে আছে। শংকরকে দেখে বললে, শংকর, আমাদের এখনও অনেক ভুগতে হবে। সামনে চেয়ে দেখো।

আলভারেজের কথার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শংকরের চোখে পড়ল। কুয়াশা কখন কেটে গেছে, তার সামনে বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বতের প্রধান থাক ধাপে ধাপে উঠে মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পাহাড়ের কটিদেশ নিবিড় বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জ আবৃত, কিন্তু উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সূর্যের রঙিন আলোয় দেবলোকের কনক-দেউলের মতো বহুদূর নীল শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সামনের পর্বতাংশ সম্পূর্ণ দুরারোহ, শুধুই খাড়া খাড়া উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ—কোথাও একটু ঢালু নেই। আলভারেজ বললে, এখান থেকে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়, শংকর। দেখেই বুঝেছ নিশ্চয়। পাহাড়ের কোলে কোলে পশ্চিম দিকে চলো। যেখানে ঢালু এবং নিচু পাব, সেখান দিয়েই পাহাড় পার হতে হবে। কিন্তু এই দেড়শো মাইল লম্বা পর্বতশ্রেণি মধ্যে কোথায় সেরকম জায়গা আছে, এ খুঁজতেই তো এক মাসের উপর যাবে দেখছি।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পশ্চিম দিকে যাওয়ার পর এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল যেখানে পর্বতের গা বেশ ঢালু, যেখান দিয়ে পর্বতে ওঠা চলতে পারে।

পরদিন খুব সকাল থেকে পর্বতারোহণ শুরু হল। শংকরের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ছটা। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে শংকর আর চলতে পারে না। যে জায়গাটা দিয়ে তারা উঠছে—সেখানে পর্বতের খাড়াই চার মাইলের মধ্যে উঠেছে ছ-হাজার ফুট, সুতরাং পথটা ঢালু হলেও কী ভীষণ দুরারোহ তা সহজেই বোঝা যাবে। তা ছাড়া যতই উপরে উঠছে, অরণ্য ততই নিবিড়তর, ঘন অন্ধকার চারদিকে। বেলা হয়েছে, রোদ উঠেছে অথচ সূর্যের আলো ঢোকেনি জঙ্গলের মধ্যে—আকাশই চোখে পড়ে না তায় সূর্যের আলো!

পথ বলে কোনো জিনিস নেই। চোখের সামনে শুধুই গাছের গুঁড়ি যেন ধাপে ধাপে আকাশের দিকে উঠে চলেছে। কোথা থেকে জল পড়ছে, কে জানে, পায়ের নীচের প্রস্তর আর্দ্র ও পিচ্ছিল, প্রায় সর্বত্রই শেওলা-ধরা। পা পিছলে গেলে গড়িয়ে নীচের দিকে বহুদূর চলে গিয়ে তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডে আহত হতে হবে।

শংকর বা আলভারেজ কারো মুখে কথা নেই। উত্তুঙ্গ পথে উঠবার কষ্টে দুজনেই অবসন্ন, দুজনেরই ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। শংকরের কষ্ট আরও বেশি, বাংলার সমতল ভূমিতে আজন্ম মানুষ হয়েছে, পাহাড়ে ওঠার অভ্যাসই নেই কখনো।

শংকর ভাবছে, আলভারেজ কখন বিশ্রাম করতে বলবে? সে আর উঠতে পারছে না, কিন্তু যদি সে মরেও যায়, একথা আলভারেজকে সে কখনোই বলবে না যে, সে আর পারছে না। হয়তো তাতে আলভারেজ ভাববে ইস্ট ইন্ডিজের মানুষগুলো দেখছি নিতান্তই অপদার্থ। এই মহাদুর্গম পর্বত ও অরণ্যে সে ভারতের প্রতিনিধি—এমন কোনো কাজ সে করতে পারে না যাতে তার মাতৃভূমির মুখ ছোটো হয়ে যায়।

বড়ো চমৎকার বন, যেন পরির রাজ্য! মাঝে মাঝে ছোটোখাটো ঝরনা যেন বনের মধ্য দিয়ে খুব উপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে ডালে নানা রঙের টিয়াপাখি চোখ ঝলসে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড়ো বড়ো ঘাসের মাথায় সাদা সাদা ফুল, অর্কিডের ফুল ঝুলচে গাছের ডালের গায়ে, গুঁড়ির গায়ে।

হঠাৎ শংকরের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে মাঝে লম্বা দাড়ি-গোঁফওয়ালা বালখিল্য মুনিদের মতো ও কারা বসে রয়েচে! তারা সবাই চুপচাপ বসে, মুনিজনোচিত গাম্ভীর্যে ভরা। ব্যাপার কী?

আলভারেজ বললে, ও কলোবাসজাতীয় মাদি বাঁদর। পুরুষজাতীয় কলোবাস বাঁদরের দাড়ি-গোঁফ নেই, স্ত্রীজাতীয় কলোবাস বাঁদরের হাতখানেক লম্বা দাড়ি-গোঁফ গজায় এবং তারা বড়ো গম্ভীর, দেখেই বুঝতে পাচ্ছ।

ওদের কাণ্ড দেখে শংকর হেসেই খুন!

পায়ের তলায় মাটিও নেই, পাথরও নেই—তার বদলে আছে শুধু পচা পাতা ও শুকনো গাছের গুঁড়ির স্তূপ। এইসব বনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাতার রাশি ঝরছে, পচে যাচ্ছে, তার উপরে শ্যাওলা পুরু হয়ে উঠচে, ছাতা গজাচ্ছে, তার উপরে আবার নতুন ঝরা পাতার রাশি, আবার পড়ছে গাছের ডাল-পালা, গুঁড়ি। জায়গায় জায়গায় ষাট-সত্তর ফুট গভীর হয়ে জমে রয়েছে এই পাতার স্তূপ।

আলভারেজ ওকে শিখিয়ে দিলে, এইসব জায়গায় খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে। এমন জায়গা আছে, যেখানে মানুষ চলতে চলতে ওই ঝরা পাতার রাশির মধ্যে ভুস করে ঢুকে ডুবে যেতে পারে, যেমন অতর্কিতে পথ চলতে চলতে পুরোনো কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। উদ্ধার করা সম্ভব না হলে সেসব ক্ষেত্রে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু অনিবার্য।

শংকর বললে, পথের গাছপালা না কাটলে আর তো ওঠা যাচ্ছে না, বড়ো ঘন হয়ে উঠছে।

ক্ষুরের মতো ধারালো চওড়া এলিফ্যান্ট ঘাসের বন—যেন রোমান যুগের দ্বিধার তলোয়ার। তার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় দুজনের কেউই নিরাপদ বলে ভাবছে না নিজেকে, দু-হাত তফাতে কী আছে দেখা যায় না যখন, তখন সবরকম বিপদের সম্ভাবনাই তো রয়েছে। বাঘ, সিংহ বা বিষাক্ত সাপ কোনোটিই থাকা বিচিত্র নয়।

শংকর লক্ষ করচে মাঝে মাঝে ডুগডুগি বা ঢোল বাজনার মতো একটা শব্দ হচ্ছে কোথায় যেন বনের মধ্যে। কোনো অসভ্য জাতির লোক ঢোল বাজাচ্ছে নাকি? আলভারেজকে সে জিজ্ঞেস করলে।

আলভারেজ বললে, ঢোল নয়, বড়ো বেবুন কিংবা বনমানুষ বুক চাপড়ে ওইরকম শব্দ করে। মানুষ এখানে কোথা থেকে আসবে?

শংকর বললে, তুমি যে বলেছিলে এ বনে গরিলা নেই?

—গরিলা সম্ভবত নেই। আফ্রিকার মধ্যে বেলজিয়ান কঙ্গোর কিছু অঞ্চল, রাওয়েনজির আল্পস্ বা তিরুঙ্গা আগ্নেয় পর্বতের অরণ্য ছাড়া অন্য কোথাও গরিলা আছে বলে তো জানা নেই। গরিলা ছাড়াও অন্য ধরনের বনমানুষ বুক চাপড়ে ওরকম আওয়াজ করতে পারে।

ওরা সাড়ে চার হাজার ফুটের উপরে উঠেছে। সেদিনের মতো সেখানেই রাত্রির বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলা হল। একটা বিশাল সত্যিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের রাত্রিকালীন শব্দ এত বিচিত্র ধরনের ও এত ভীতিজনক যে সারারাত শংকর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। শুধু ভয় নয়, ভয় মিশ্রিত একটা বিস্ময়।

কত রকমের শব্দ—হায়নার হাসি, কলোবাস বানরের কর্কশ চিৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, বাঘের ডাক—প্রাকৃতিক এই বিরাট নিজস্ব পশুশালায় রাত্রে কেউ ঘুমোয় না। সমস্ত অরণ্যটা এই গভীর রাত্রে যেন হঠাৎ খেপে উঠেছে। বছর কয়েক আগে খুব বড়ো একটা সার্কাসের দল এসে ওদের স্কুল-বোর্ডিংয়ের পাশের মাঠে তাঁবু ফেলেছিল, তাদের জানোয়ারদের চিৎকারে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা রাত্রে ঘুমোতে পারত না—শংকরের সেই কথা এখন মনে পড়ল। কিন্তু এসবের চেয়েও মধ্যরাত্রে একদল বনহস্তীর বৃংহতি তাঁবুর অত্যন্ত নিকটে শুনে শংকর এমন ভয় পেয়ে গেল যে, আলভারেজকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠালে। আলভারেজ বললে, আগুন জ্বলছে তাঁবুর বাইরে, কোনো ভয় নেই, ওরা ঘেঁষবে না এদিকে।

সকালে উঠে আবার উপরে ওঠা শুরু। উঠছে—উঠছে—মাইলের পর মাইল বুনো বাঁশের জঙ্গল, তার তলায় বুনো আদা। ওদের পথের একশো হাতের মধ্যে বাঁদিকের বাঁশবনের তলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হস্তীযূথ কচি বাঁশের কোঁড় মড়মড় করে ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল।

পাঁচ হাজার ফুট উপরে কত কী বুনো ফুলের মেলা—টকটকে লাল ইরিথ্রিনা প্রকাণ্ড গাছে ফুটেছে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে ঠিক বাংলাদেশের বনকলমি ফুলের মতো, কিন্তু রংটা অত গাঢ় বেগুনি নয়। সাদা ভেরোনিকা ঘন সুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেছে। বন্য কফির ফুল, রঙিন বেগোনিয়া। মেঘের রাজ্য ফুলের বন, মাঝে মাঝে সাদা বেলুনের মতো মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগডালে এসে আটকাচ্ছে—কখনো বা আরও নেমে এসে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সাড়ে সাত হাজার ফুটের উপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। এই পর্যন্ত উঠতে ওদের আরও দু-দিন লেগেচে। আর অসহ্য কষ্ট, কোমর-পিঠ ভেঙে পড়ছে। এখানে বনানীর মূর্তি বড়ো অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখা-প্রশাখা পুরু শ্যাওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শ্যাওলা ঝুলছে—সে শ্যাওলা কোথাও কোথাও এত লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মতো হয়েছে—বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্ছে, তার উপর কোথাও সূর্যের আলো নেই, সব সময়েই যেন গোধূলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরনের নিস্তব্ধতা—বাতাস বইছে তারও শব্দ নেই, পাখির কুজন নেই সে বনে—মানুষের গলার সুর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোনো অন্ধকার নরকে দীর্ঘশ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা।

সেদিন অপরাহ্নে যখন আলভারেজ তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করবার হুকুম দিলে—তখন তাঁবুর বাইরে বসে একপাত্র কফি খেতে খেতে শংকরের মনে হল, এ যেন সৃষ্টির আদিম যুগের অরণ্যানী, পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ যখন কোনো একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করেনি, সে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরাটকায় সরীসৃপের দল জগৎজোড়া বনজঙ্গলের নিবিড় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত—সৃষ্টির সেই অতীত প্রভাতে সে যেন কোনো জাদুমন্ত্রের বলে ফিরে গিয়েছে।

সন্ধ্যার পরেই সমগ্র বনানী নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হল। তাঁবুর বাইরে ওরা আগুন করেছে—সেই আলোর মণ্ডলীর বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। এ বনের আশ্চর্য নিস্তব্ধতা শংকরকে বিস্মিত করেছে। বনানীর সেই বিচিত্র নৈশ শব্দ এখানে স্তব্ধ কেন? আলভারেজ চিন্তিত মুখে ম্যাপ দেখছিল। বললে, শোনো শংকর, একটা কথা ভাবছি। আট হাজার ফুট উঠলাম, কিন্তু এখনও পর্বতের সেই খাঁজটা পেলাম না, যেটা দিয়ে আমরা রেঞ্জ পার হয়ে ওপারে যাব। আর কত ওপরে উঠব? যদি ধরো এই অংশে স্যাডলটা না-ই থাকে?

শংকরের মনেও খটকা যে না জেগেছে তা নয়। সে আজই ওঠবার সময় মাঝে মাঝে ফিল্ড গ্লাস দিয়ে উপরের দিকে দেখবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঘন মেঘে বা কুয়াশায় উপরের দিকটা সর্বতাই আবৃত থাকায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিই তো তারা কত উঠবে আর, সমতল খাঁজ যদি না পাওয়া যায়? আবার নীচে নামতে হবে, আবার অন্য জায়গা বেয়ে উঠতে হবে। দফা সারা!

সে বললে, ম্যাপে কী বলে?

আলভারেজের মুখ দেখে মনে হল ম্যাপের উপর সে আস্থা হারিয়েছে। বললে, এ ম্যাপ অত খুঁটিনাটি ভাবে তৈরি নয়। এ পর্বতে উঠেচে কে, যে ম্যাপ তৈরি হবে? এই যে দেখছ—এখানা স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির তৈরি ম্যাপ, যিনি পর্তুগিজ পশ্চিম-আফ্রিকার ফার্ডিনান্ডো পো শৃঙ্গ আরোহণ করে খুব নাম করেন, এবং বছর কয়েক আগে বিখ্যাত পর্বত আরোহণকারী ডিউক অব আব্রুৎসির অভিযানেও যিনি ছিলেন। কিন্তু রিখটারসভেল্ড তিনি ওঠেননি, এ ম্যাপে পাহাড়ের যে কনটুর ছবি আঁকা আছে, তা খুব নিখুঁত বলে মনে তো হয় না। ঠিক বুঝছিনে।

হঠাৎ শংকর বলে উঠল, ও কী!

তাঁবুর বাইরে প্রথমে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ, এবং পরক্ষণেই একটা কষ্টকর কাশির শব্দ পাওয়া গেল যেন থাইসিসের রোগী খুব কষ্টে কাতরভাবে কাশছে। একবার... দুবার...তারপরেই শব্দটা থেমে গেল! কিন্তু সেটা মানুষের গলার শব্দ নয়, শুনবামাত্রই শংকরের সেকথা মনে হল।

রাইফেল নিয়ে সে ব্যস্তভাবে তাঁবুর বার হতে যাচ্ছে, আলভারেজ তাড়াতাড়ি উঠে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলে। শংকর আশ্চর্য হয়ে বললে, কেন, কীসের শব্দ ওটা? বলে আলভারেজের দিকে চাইতেই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েচে! শব্দটা শুনেই কি?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের মণ্ডলীর বাইরে, নিবিড় অন্ধকারে একটা ভারী অথচ লঘুপদ জীব যেন বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে—বেশ মনে হল।

দুজনেই খানিকটা চুপচাপ, তারপরে আলভারেজ বললে, আগুনে কাঠ ফেলে দাও! বন্দুক দুটো ভরা আছে কি না দেখো। ওর মুখের ভাব দেখে শংকর ওকে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করলে না।

রাত্রি কেটে গেল।

পরদিন সকালে শংকরেরই ঘুম ভাঙল আগে। তাঁবুর বাইরে এসে কফি করবার আগুন জ্বালতে সে তাঁবু থেকে কিছুদূরে কাঠ ভাঙতে গেল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ভিজে মাটির উপর একটা পায়ের দাগ, লম্বায় এগারো ইঞ্চির কম নয়, কিন্তু পায়ে তিনটে মাত্র আঙুল। তিন আঙুলেরই দাগ বেশ স্পষ্ট। পায়ের দাগ ধরে সে এগিয়ে গেল—আরও অনেকগুলো সেই পায়ের দাগ আছে, সবগুলোতেই সেই তিন আঙুল।

শংকরের মনে পড়ল উগান্ডার স্টেশনঘরে আলভারেজের মুখে শোনা জিম কার্টারের মৃত্যুকাহিনি। গুহার মুখের বালির উপর সেই অজ্ঞাত হিংস্র জানোয়ারের তিন আঙুলওয়ালা পায়ের দাগ। কাফির গ্রামের সেই সর্দারের মুখে শোনা গল্প।

কাল রাত্রে আলভারেজের বিবর্ণ মুখও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। আর একদিনও আলভারেজ ঠিক এই রকমই ভয় পেয়ে ছিল, যেদিন পর্বতের পাদমূলে ওরা প্রথম এসে তাঁবু পাতে।

বুনিপ! কাফির সর্দারের গল্পের সেই বুনিপ! রিখটারসভেল্ড পর্বত ও অরণ্যের বিভীষিকা, যার ভয়ে শুধু অসভ্য মানুষ কেন, অন্য কোনো বন্যজন্তু পর্যন্ত এই আট হাজার ফুটের উপরকার বনে আসে না।

কাল রাত্রে কোনো জানোয়ারের শব্দ পাওয়া যায়নি কেন, এখন তা শংকরের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আলভারেজ পর্যন্ত ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল ওর গলার শব্দ শুনে। বোধ হয় ও শব্দের সঙ্গে আলভারেজের পূর্ব পরিচয় ঘটেছে।

আলভারেজের ঘুম ভাঙতে সেদিন একটু দেরি হল। গরম কফি এবং কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সেই নির্ভীক ও দুর্ধর্ষ আলভারেজ, যে মানুষকেও ভয় করে না, শয়তানকেও না। শংকর ইচ্ছে করেই আলভারেজকে ওই অজ্ঞাত জানোয়ারের পায়ের দাগটা দেখালে না, কী জানি যদি আলভারেজ বলে বসে—এখনও পাহাড়ের স্যাডল পাওয়া গেল না, তবে নেমে যাওয়া যাক।

সকালে সেদিন খুব মেঘ করে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। পর্বতের ঢাল বেয়ে যেন হাজার ঝরনার ধারায় বৃষ্টির.জল গড়িয়ে নীচে নামছে। এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। এতটা উঠেছে ওরা কিন্তু প্রতি হাজার ফুট উপর থেকে নীচের অরণ্যের গাছপালার মাথা দেখে সেগুলিকে সমতলভূমির অরণ্য বলে ভ্রম হচ্ছে—কাজেই প্রথমটা মনে হয় যেন কতটুকুই বা উঠেছি, ওইটুকু তো!

বৃষ্টি সেদিন থামল না। বেলা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আলভারেজ উঠবার হুকুম দিলে। শংকর এটা আশা করেনি! এখানে শংকর কর্মী শ্বেতাঙ্গ-চরিত্রের একটা দিক লক্ষ করলে। তার মনে হচ্ছিল, কেন, এই বৃষ্টিতে মিছিমিছি বার হওয়া? একটা দিনে কী এমন হবে? বৃষ্টি মাথায় পথ চলে লাভ?

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে ঘন অরণ্যানী ভেদ করে সেদিন ওরা সারাদিন উঠল। উঠছে, উঠছে, উঠছেই—শংকর আর পারে না। কাপড়চোপড় জিনিসপত্র, তাঁবু সব ভিজে একাকার, একখানা রুমাল পর্যন্ত শুকনো নেই কোথাও। শংকরের কেমন একটা অবসাদ এসেছে দেহে ও মনে—সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকার হয়ে ভীমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল, তখন ওর মনে হল—এই অজানা দেশে অজানা পর্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্র জন্তুসংকুল বনের মধ্যে দিয়ে, বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায়, কোন অনির্দেশ্য হীরকখনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে চলেছে সে কোথায়? আলভারেজ কে তার? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল? হিরের খনিতে তার দরকার নেই। বাংলাদেশের খড়ে-ছাওয়া ঘর, ছায়া-ভরা শ্রান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখিদের কাকলি—সেসব যেন কতদূরের কোন অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি সেসবের চেয়ে মূল্যবান নয়।

কিন্তু তার এভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময় রাত্রের বর্ণনা নেই। শংকর আর পৃথিবীতে নেই, বাংলা বলে কোনো দেশ নেই, সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে! সে আর কোথাও ফিরতে চায় না, হিরে চায় না, অর্থ চায় না—পৃথিবীর থেকে বহু ঊর্ধ্বে এক কৌমুদীশুভ্র দেবলোকের এখন সে অধিবাসী। তার চারধারে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য, কোনো মানুষের চোখ এর আগে তা দেখেনি। সে গহন নিস্তব্ধতা, এর আগে কোনো মানুষ অনুভব করেনি। জনমানবহীন বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বত ও অরণ্য, ওই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে

আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যানস্তিমিত—পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে।

সেই রাত্রে ঘুম থেকে ও ধড়মড়িয়ে উঠল আলভারেজের ডাকে! আলভারেজ ডাকছে, শংকর, শংকর, ওঠো বন্দুক বাগাও—

—কী, কী?

তারপর ও কান পেতে শুনল—তাঁবুর চারপাশে কে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোরে নিশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে তাঁবুর মধ্যে থেকে। চাঁদ ঢলে পড়েচে, তাঁবুর বাইরে অন্ধকারই বেশি, জ্যোৎস্নাটুকু গাছের মগডালে উঠে গিয়েচে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর দরজার মুখে আগুন তখনও একটু একটু জ্বলচে—কিন্তু তার আলোর বৃত্ত যেমন ছোটো, আলোর জ্যোতি ততোধিক ক্ষীণ, তাতে দেখবার সাহায্য কিছুই হয় না।

হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল—গাছপালা ভেঙে একটি ভারী জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালাল যেন। তাঁবুর সকলে সজাগ হয়ে উঠেছে, এখন আর অতর্কিতে শিকারের সুবিধে হবে না—বাইরের জানোয়ারটা তা বুঝতে পেরেছে।

জানোয়ারটা যাই হোক না কেন, তার যেন বুদ্ধি আছে। বিচারের ক্ষমতা আছে, মস্তিষ্ক আছে।

আলভারেজ রাইফেল হাতে টর্চ জ্বেলে বাইরে গেল। শংকরও গেল ওর পিছনে পিছনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল, তাঁবুর উত্তর-পূর্ব কোণের জঙ্গলের চারা গাছপালার উপর দিয়ে যেন একটা ভারী স্টিম রোলার চলে গিয়েছে। আলভারেজ সেইদিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে বার দুই আওয়াজ করল।

কোনোদিকে কোনো শব্দ পাওয়া গেল না।

ফিরবার সময় তাঁবুর ঠিক দরজার মুখে আগুনের কুণ্ডের অতি নিকটেই একটা পায়ের দাগ দুজনেরই চোখে পড়ল। মাত্র তিনটে আঙুলের দাগ ভিজে মাটির উপর সুস্পষ্ট।

এতে প্রমাণ হয়, জানোয়ারটা আগুনকে ডরায় না। শংকরের মনে হল, যদি ওদের ঘুম না ভাঙত, তবে সেই অজ্ঞাত বিভীষিকাটি তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে একটুও দ্বিধা করত না, এবং তারপরে কী ঘটত তা কল্পনা করে কোনো লাভ নেই! আলভারেজ বললে, শংকর, তুমি তোমার ঘুম শেষ করো, আমি জেগে আছি।

শংকর বললে, না, তুমি ঘুমোও আলভারেজ।

আলভারেজ ক্ষীণ হাসি হেসে বললে, পাগল, তুমি জেগে কিছু করতে পারবে না, শংকর। ঘুমিয়ে পড়ো, ওই দেখো দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আবার ঝড়বৃষ্টি আসবে, রাত শেষ হয়ে আসছে, ঘুমোও। আমি বরং একটু কফি খাই।

রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে এল মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিদ্যুৎ, তেমনি মেঘগর্জন। সে বৃষ্টি চলল সমানে সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শংকরের মনে হল পৃথিবীতে আজ প্রলয়ের বর্ষণ শুরু হয়েছে, প্রলয়ের দেবতা সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবার সূচনা করেছেন বুঝি। বৃষ্টির বহর দেখে আলভারেজ পর্যন্ত দমে গিয়ে তাঁবু ওঠাবার নাম মুখে আনতে ভুলে গেল।

বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকেল পাঁচটা। বোধ হয় বৃষ্টি না থামলেই ভালো ছিল, কারণ অমনি আলভারেজ চলা শুরু করবার হুকুম দিলে। বাঙালি ছেলের স্বভাবতই মনে হয়—এখন অবেলায় যাওয়া কেন? এত কী সময় বয়ে যাচ্ছে? কিন্তু আলভারেজের কাছে দিন, রাত, বর্ষা, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, অন্ধকার সব সমান। সে রাত্রে বর্ষাস্নাত বনভূমির মধ্য দিয়ে মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে উঠছে, উঠছে—এমন সময় আলভারেজ পিছন থেকে বলে উঠল, শংকর দাঁড়াও, ওই দেখো—

আলভারেজ ফিল্ড গ্লাস দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে বাঁ পাশের পর্বত-শিখরের দিকে চেয়ে দেখছে। শংকর ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। হ্যাঁ, সমতল খাঁজটা পাওয়া গিয়েছে। বেশি দূরেও নয়, মাইল দুইয়ের মধ্যে বাঁ দিক ঘেঁষে।

আলভারেজ হাসিমুখে বললে, দেখেছ স্যাডলটা? থামবার দরকার নেই, চলো আজ রাত্রেই স্যাডলের উপর পৌঁছে তাঁবু ফেলব। শংকর আর সত্যিই পারছে না। এই দুর্ধর্ষ পর্তুগিজটার সঙ্গে হিরের সন্ধানে এসে সে কী ঝকমারি না করেছে! শংকর জানে অভিযানের নিয়মানুযায়ী দলপতির হুকুমের উপর কোনো কথা বলতে নেই। এখানে আলভারেজই দলপতি, তার আদেশ অমান্য করা চলবে না। কোথাও আইনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও পৃথিবীর ইতিহাসের বড়ো বড়ো অভিযানে সবাই এই নিয়ম মেনে চলে। সেও মানবে।

অবিশ্রান্ত হাঁটবার পর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে স্যাডলে যখন উঠল—শংকরের তখন আর এক পা-ও চলবার শক্তি নেই!

স্যাডলটার বিস্তৃতি তিন মাইলের কম নয়, কখনো বা দুশো ফুট খাড়া উঠেছে, কখনো বা চার-পাঁচশো ফুট নেমে গিয়েছে এক মাইলের মধ্যে, সুতরাং বেশ দুরারোহ—যতটুকু সমতল, ততটুকু শুধুই বড়ো বড়ো বনস্পতির জঙ্গল, ইরিথ্রিনা, পেনসিয়ানা, রিঠাগাছ, বাঁশ বা বন্য আদা। বিচিত্র বর্ণের অর্কিডের ফুল ডালে ডালে। বেবুন ও কলোবাস বাঁদর সর্বত্র।

আরও দু-দিন ধরে ক্রমাগত নামতে নামতে রিখটারসভেল্ড পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে ওরা পদার্পণ করল। শংকরের মনে হল, এদিকে জঙ্গল যেন আরও বেশি দুর্ভেদ্য ও বিচিত্র। আটলান্টিক মহাসাগরের দিক থেকে সমুদ্রবাষ্প উঠে কতক ধাক্কা খায় পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন পর্বতে, বাকিটা আটকায় বিশাল রিখটারসভেল্ডের দক্ষিণসানুতে—সুতরাং বৃষ্টি এখানে হয় অজস্র, গাছপালার তেজও তেমনি।

দিন পনেরো ধরে সেই বিরাট অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকার সর্বত্র দুজনে মিলে খুঁজেও আলভারেজ বর্ণিত পাহাড়ি নদীর কোনো ঠিকানা বার করতে পারলে না। ছোটোখাটো ঝরনা দু-একটা উপত্যকার উপর দিয়ে বইছে বটে, কিন্তু আলভারেজ কেবলই ঘাড় নাড়ে আর বলে, এসব নয়!

শংকর বলে, তোমার ম্যাপ দেখো না ভালো করে।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আলভারেজের ম্যাপের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আলভারেজ বলে, ম্যাপ কী হবে? আমার মনেই গভীর ভাবে আঁকা আছে সে নদী ও সে উপত্যকার ছবি—সে একবার দেখতে পেলেই তখুনি চিনে নেব। এ সে জায়গাই নয়, এ উপত্যকা সে উপত্যকাই নয়।

নিরুপায়! খোঁজো তবে।

একমাস কেটে গেল। পশ্চিম আফ্রিকায় বর্ষা নামল মার্চ মাসের প্রথমে! সে কী ভয়ানক বর্ষা। শংকর তার কিছু নমুনা পেয়ে এসেছে রিখটারসভেল্ড পার হবার সময়ে। উপত্যকা ভেসে গেল পাহাড় থেকে নামা বড়ো বড়ো পার্বত্য ঝরনার জলধারায়। তাঁবু ফেলবার স্থান নেই। একরাত্রে হঠাৎ অতিবর্ষণের ফলে ওদের তাঁবুর সামনে একটা নিরীহ্ ক্ষীণকায় ঝরনাধারা ভীমমূর্তি ধারণ করে তাঁবুসুদ্ধ ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জোগাড় করেছিল—আলভারেজের সজাগ ঘুমের জন্যে সে যাত্রা বিপদ কেটে গেল।

কিন্তু দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। শংকর একদিন ঘোর বিপদে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। সে বিপদটাও বড়ো অদ্ভুত ধরনের।

সেদিন আলভারেজ তাঁবুতে তার নিজের রাইফেল পরিষ্কার করছিল, সেটা শেষ করে রান্না করবে কথা ছিল; শংকর রাইফেল হাতে বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে বার হয়েছে।

আলভারেজ বলে দিয়েছে তাকে এ বনে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে আর বন্দুকের ম্যাগাজিনে সবসময় যেন কার্ট্রিজ ভরা থাকে। আর একটা মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে, সেটা এই—বনের মধ্যে বেড়াবার সময় হাতের কবজিতে কম্পাস সর্বদা বেঁধে নিয়ে বেড়াবে এবং যে পথ দিয়ে যাবে, পথের ধারে গাছপালায় কোনো চিহ্ন রেখে যাবে, যাতে ফিরবার সময় সেইসব চিহ্ন ধরে আবার ঠিক ফিরতে পার। নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

সেদিন শংকর স্প্রিংবক হরিণের সন্ধানে গভীর বনে চলে গিয়েছে। সকালে বেরিয়েছিল, ঘুরে ঘুরে বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়ে এক জায়গায় একটা বড়ো গাছের তলায় সে একটু বিশ্রামের জন্যে বসল।

সেখানটাতে চারধারেই বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির মেলা, আর সব গাছেই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে এক প্রকারের বড়ো বড়ো লতা উঠে তাদের ছোটো ছোটো পাতা দিয়ে এমন নিবিড় ভাবে আষ্টেপৃষ্টে গাছগুলো জড়িয়েছে যে গুঁড়ির আসল রং দেখা যাচ্ছে না। কাছেই একটা ছোটো জলার ধারে ঝাড়ে ঝাড়ে মারিপোসা লিলি ফুটে রয়েছে।

খানিকটা সেখানে বসবার পরে শংকরের মনে হল তার কী একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী ধরনের অস্বস্তি তা সে কিছু বুঝতে পারল না—অথচ জায়গাটা ছেড়ে উঠে যাবারও ইচ্ছে তার হল না—সে ক্লান্তও বটে, আর জায়গাটা বেশ আরামেরও বটে।

কিন্তু এ তার কী হল? তার সমস্ত শরীরে এত অবসাদ এল কোথা থেকে? ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরল নাকি?

অবসাদটা কাটাবার জন্যে সে পকেট হাতড়ে একটা চুরুট বার করে ধরালে। কীসের একটা মিষ্টি মিষ্টি সুগন্ধ বাতাসে, শংকরের বেশ লাগছে গন্ধটা। একটু পরে দেশলাইটা মাটি থেকে কুড়িয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে মনে হল, হাতটা যেন তার নিজের নয়—যেন অন্য কারো হাত, তার মনের ইচ্ছায় সে হাত নড়ে না।

ক্রমেই তার সর্বশরীরে যেন বেশ একটা আরামদায়ক অবসাদে অবশ হয়ে পড়তে চাইল। কী হবে

আর বৃথা ভ্রমণে, আলেয়ার পিছু পিছু বৃথা ছুটে! এইরকম বনের ঘন ছায়ায় নিভৃত লতাবিতানে, অলস স্বপ্নে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে সুখ আর কী আছে?

একবার তার মনে-হল এইবেলা উঠে তাঁবুতে যাওয়া যাক নতুবা তার কোনো একটা বিপদ ঘটবে যেন। একবার সে উঠবার চেষ্টাও করতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তার দেহমনব্যাপী অবসাদের জয় হল। অবসাদ নয়, যেন একটা মৃদুমধুর নেশার আনন্দ। সমস্ত জগৎ তার কাছে তুচ্ছ। সে নেশাটাই তার সারাদেহ অবশ করে আনছে ক্রমশ।

শংকর গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে ভালো করেই শুয়ে পড়ল। বড়ো বড়ো কটনউড গাছের শাখায় আলোছায়ার রেখা বড়ো অস্পষ্ট, কাছেই কোথাও বুনো প্যাঁচার ডাক অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল, ক্রমে যেন তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তারপরে কী হল শংকর কিছু জানে না।

আলভারেজ যখন বহু অনুসন্ধানের পর ওর অচৈতন্য দেহটা কটনউড জঙ্গলের ছায়ায় আবিষ্কার করলে, তখন বেলা বেশি নেই। প্রথমটা আলভারেজ ভাবলে, এ নিশ্চয়ই সর্পাঘাত, কিন্তু দেহটা পরীক্ষা করে সর্পাঘাতের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। হঠাৎ মাথার উপরকার ডালপালা ও চারধারে গাছপালার দিকে নজর পড়তেই অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী আলভারেজ ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলে। সেখানটাতে সর্বত্র অতি মারাত্মক বিষলতার বন, যার রসে আফ্রিকান অসভ্য মানুষেরা তিরের ফলা ডুবিয়ে নেয়। যার বাতাস এমনই বেশ সুগন্ধ বহন করে, কিন্তু নিশ্বাসের সঙ্গে বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে, অনেক সময় পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে, মৃত্যুও ঘটা আশ্চর্য নয়।

তাঁবুতে এসে শংকর দু-তিন দিন শয্যাগত হয়ে রইল। সর্বশরীর ফুলে ঢোল। মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে আর সর্বদাই তৃষ্ণায় গলা কাঠ। আলভারেজ বললে, যদি তোমাকে সারারাত ওখানে থাকতে হত, তাহলে সকালবেলা তোমাকে বাঁচানো কঠিন হত।

একদিন একটা ঝরনার জলধারার বালুময় তীরে শংকর হলদে রঙের কী দেখতে পেলে। আলভারেজ পাকা প্রসপেক্টর, সে এসে বালি ধুয়ে সোনার রেণু বার করলে—কিন্তু তাতে সে বিশেষ উৎসাহিত হল না। সোনার পরিমাণ এত কম যে মজুরি পোষাবে না—এক টন বালি ধুয়ে আউন্স তিনেক সোনা হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

শংকর বললে, বসে থেকে লাভ কী, তবু যা সোনা পাওয়া যায়, তিন আউন্স সোনার দামও কম নয়!

সে যেটাকে অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিস বলে মনে করছে, অভিজ্ঞ প্রসপেক্টর আলভারেজের কাছে সেটা কিছুই নয়। তা ছাড়া শংকরের মজুরির ধারণার সঙ্গে আলভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না। শেষ পর্যন্ত ও কাজ শংকরকে ছেড়ে দিতে হল।

ইতিমধ্যে ওরা মাসখানেক ধরে জঙ্গলের নানা অঞ্চলে বেড়ালে। আজ এখানে দু-দিন তাঁবু পাতে, সেখানে থেকে আরেক জায়গায় উঠে যায়, সেখানে কিছুদিন তন্নতন্ন করে চারধার দেখবার পরে আরেক জায়গায় উঠে যায়। সেদিন অরণ্যের একটা নতুন স্থানে পৌঁছে ওরা তাঁবু পেতেছে। শংকর বন্দুক নিয়ে দু-একটা পাখি শিকার করে সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে এসে দেখলে আলভারেজ বসে চুরুট টানছে, তার মুখ দেখে মনে হল সে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।

শংকর বললে, আমি বলি আলভারেজ, তুমিই যখন বার করতে পারলে না, তখন চলো ফিরি।

আলভারেজ বললে, নদীটা তো উড়ে যায়নি, এই বন, পর্বতের কোনো না কোনো অঞ্চলে সেটা নিশ্চয়ই আছে।

—তবে আমরা বার করতে পারছিনে কেন?

—আমাদের খোঁজ ঠিকমতো হচ্ছে না।

—বলো কী আলভারেজ, ছ-মাস ধরে জঙ্গল চষে বেড়াচ্ছি, আবার কাকে খোঁজা বলে?

আলভারেজ গম্ভীর মুখে বললে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে কোথায় জানো শংকর? তোমাকে এখনও কথাটা বলিনি, শুনলে হয়তো খুব দমে যাবে বা ভয় পাবে। আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, এসো আমার সঙ্গে।

শংকর অধীর আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর পিছনে পিছনে চলল। ব্যাপারটা কী?

আলভারেজ একটু দূরে গিয়ে একটা বড়ো গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বললে, শংকর, আমরা আজই এখানে এসে তাঁবু পেতেছি, ঠিক তো?

শংকর অবাক হয়ে বললে, এ কথার মানে কী? আজই তো এখানে এসেছি, না আবার কবে এসেছি?

—আচ্ছা, ওই গাছের গুঁড়ির কাছে সরে এসে দেখো তো?

শংকর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, গুঁড়ির নরম ছাল ছুরি দিয়ে খুদে কে D. A. লিখে রেখেছে—কিন্তু লেখাটা টাটকা নয়, অন্তত মাসখানেকের পুরোনো!

শংকর ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে না। আলভারেজের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আলভারেজ বললে, বুঝতে পারলে না? এই গাছে আমিই মাসখানেক আগে আমার নামের অক্ষর দুটি খুদে রাখি। আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। তুমি তো বুঝতে পার না, তোমার কাছে সব বনই সমান। এর মানে এখন বুঝেছ? আমরা চক্রাকারে বনের মধ্যে ঘুরছি। এসব জায়গায় যখন এরকম হয়, তখন তা থেকে উদ্ধার পাওয়া বেজায় শক্ত।

এতক্ষণে শংকর বুঝলে ব্যাপারটা। বললে, তুমি বলতে চাও মাসখানেক আগে আমরা এখানে এসেছিলাম?

—ঠিক তাই। বড়ো অরণ্যে বা মরুভূমিতে এই বিপদ ঘটে। একে বলে ডেথ সার্কল, আমার মনে মাসখানেক আগে প্রথম সন্দেহ হয় যে, হয়তো আমর ডেথ সার্কল-এ পড়েচি। সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই গাছের ছালে ওই অক্ষর দুটি খুদে রাখি। আজ বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল!

শংকর বললে, আমাদের কম্পাসের কী হল? কম্পাস থাকতে দিক ভুল হচ্ছে কীভাবে রোজ রোজ?

আলভারেজ বললে, আমার মনে হয় কম্পাস খারাপ হয়ে গিয়েছে। রিখটারসভেল্ড পার হবার সময় সেই যে ভয়ানক ঝড় ও বিদ্যুৎ হয়, তাতেই কীভাবে ওর চৌম্বক শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—তাহলে আমাদের কম্পাস এখন অকেজো?

—আমার তাই ধারণা।

শংকর দেখলে অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। ম্যাপ ভুল, কম্পাস অকেজো, তার উপর ওরা পড়েছে এক

ভীষণ দুর্গম গহনারণ্যের মাঝে বিষম মরণঘূর্ণিতে। জনমানুষ নেই, খাবার নেই, জলও নেই বললেই হয়, কারণ যেখানকার সেখানকার জল পানের উপযুক্ত নয়। থাকার মধ্যে আছে এক ভীষণ, অজ্ঞাত মৃত্যুর ভয়। জিম কার্টার এই অভিশপ্ত অরণ্যানীর মধ্যে রত্নের লোভে এসে প্রাণ দিয়েছিল, এখানে কারো মঙ্গল হবে বলে মনে হয় না।

আলভারেজ কিন্তু দমে যাবার পাত্রই নয়। সে দিনের পর দিন চলল বনের মধ্যে দিয়ে। বনের কোনো কূলকিনারা পায় না শংকর, আগে যাও বা ছিল, ঘূর্ণিপাকে তারা ঘুরচে শোনা অবধি, শংকরের দিক সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে।

দিন তিনেক পরে ওরা একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হল, সেখানে রিখটারসভেল্ডের একটি শাখা আসল পর্বতমালার সঙ্গে সমকোণ করে উত্তর দিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে। খুব কম হলেও সেটা চার হাজার ফুট উঁচু। আরও পশ্চিম দিকে একটা খুব উঁচু পর্বতচূড়া ঘন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার উপত্যকা তিন মাইল বিস্তীর্ণ হবে এবং এই উপত্যকা খুব ঘন জঙ্গলে ভরা।

বনে গাছপালার যেন তিনটে-চারটে থাক। সকলের উপরের থাকে শুধুই পরগাছা আর শ্যাওলা, মাঝের থাকে ছোটো-বড়ো বনস্পতির ভিড়, নীচের থাকে ঝোপঝাপ, ছোটো ছোটো গাছ। সূর্যের আলোর বালাই নেই বনের মধ্যে।

আলভারেজ বনের মধ্যে না ঢুকে বনের ধারেই তাঁবু ফেলতে বললে। সন্ধ্যার সময় ওরা কফি খেতে খেতে পরামর্শ করতে বসল যে, এখন কী করা যাবে। খাবার একদম ফুরিয়েছে, চিনি অনেকদিন থেকেই নেই, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আর দু-এক দিন পরে কফিও শেষ হবে। সামান্য কিছু ময়দা এখনও আছে—কিন্তু আর কিছুই নেই। ময়দা এই জন্যে আছে যে, ওরা ও জিনিসটা কালেভদ্রে ব্যবহার করে। ওদের প্রধান ভরসা বন্যজন্তুর মাংস, কিন্তু যখন ওদের গুলি বারুদের কারখানা নেই, তখন শিকারের ভরসাই বা চিরকাল করা যায় কী করে?

কথা বলতে বলতে শংকর দূরের যে পাহাড়ের চূড়াটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে, সেদিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিল। এই সময়ে অল্পক্ষণের জন্যে মেঘ সম্পূর্ণ সরে গেল। চূড়াটার অদ্ভুত চেহারা, যেন কুলফি বরফের আগার দিকটা কে এক কামড়ে খেয়ে ফেলেচে।

আলভারেজ বললে, এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বুলাওয়ে কি সলস্‌বেরি চারশো থেকে পাঁচশো মাইলের মধ্যে। মধ্যে শ-দুই মাইল মরুভূমি। পশ্চিম দিকে উপকূল তিনশো মাইলের মধ্যে বটে, কিন্তু পর্তুগিজ পশ্চিম-আফ্রিকা অতি ভীষণ দুর্গম জঙ্গলে ভরা, সুতরাং সেদিকের কথা বাদ দাও। এখন আমাদের উপায় হচ্ছে, হয় তুমি নয় আমি সলস্‌বেরি কি বুলাওয়ে চলে গিয়ে টোটা ও খাবার কিনে আনি। কম্পাসও চাই।

আলভারেজের মুখে এই কথাটা বড়ো শুভক্ষণে শংকর শুনেছিল। দৈব মানুষের জীবনে যে কত কাজ করে, তা মানুষে কি সবসময় বোঝে? দৈবক্রমে 'বুলাওয়েও' ও 'সলস্‌বেরি' দুটো শহরের নাম, তাদের অবস্থানের দিক ও এই জায়গাটা থেকে তাদের আনুমানিক দূরত্ব শংকরের কানে গেল। এর পরে সে কতবার মনে মনে আলভারেজকে ধন্যবাদ দিয়েছিল এই নাম দুটো বলবার জন্যে।

কথাবার্তা সেদিন বেশি অগ্রসর হল না। দুজনে পরিশ্রান্ত ছিল, সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করলে।

আট

মাঝ রাতে শংকরের ঘুম ভেঙে গেল। কী একটা শব্দ হচ্ছে ঘন বনের মধ্যে, কী একটা কাণ্ড কোথায় ঘটছে বনে। আলভারেজও বিছানায় উঠে বসেছে। দুজনেই কান খাড়া করে শুনলে—বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার! কী হচ্ছে বাইরে?

শংকর তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে বাইরে আসছিল, আলভারেজ বারণ করলে। বললে, এসব অজানা জঙ্গলে রাত্রিবেলা ওরকম তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে যেয়ো না। তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি। বিনা বন্দুকেই বা যাচ্ছ কোথায়?

তাঁবুর বাইরে রাত্রি ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুজনেই টর্চ ফেলে দেখলে—বন্যজন্তুর দল গাছপালা ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্মত্তের মতো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পশ্চিমের সেই ভীষণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, পূর্ব দিকের পাহাড়টার দিকে চলেছে! হায়েনা, বেবুন, বুনো মহিষ। দুটো চিতাবাঘ তো ওদের গা ঘেঁষে ছুটে পালাল। আরও আসছে, দলে দলে আসছে। ধাড়ি ও মাদি কলোবাস বাঁদর দলে দলে ছানাপোনা নিয়ে ছুটেছে, সবাই যেন কোনো আকস্মিক বিপদের মুখ থেকে প্রাণের ভয়ে ছুটেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথায় একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে—চাপা গম্ভীর মেঘগর্জনের মতো শব্দটা, কিংবা দূরে কোথাও যেন হাজারটা জয়ঢাক একসঙ্গে বাজছে!

ব্যাপার কী! দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলে। দুজনেই অবাক! আলভারেজ বললে, শংকর, আগুনটা ভালো করে জ্বালো, নয়তো বন্যজন্তুর দল আমাদের তাঁবুসুদ্ধ ভেঙে মাড়িয়ে চলে যাবে।

জন্তুদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল যে! মাথার উপরেও পাখির দল বাসা ছেড়ে পালাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা স্প্রিংবক হরিণের দল ওদের দশগজের মধ্যে এসে পড়ল।

কিন্তু ওরা দুজনে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ব্যাপার দেখে যে, এত কাছে পেয়েও গুলি করতে ভুলে গেল। এমন ধরনের দৃশ্য ওরা জীবনে কখনো দেখেনি।

শংকর আলভারেজকে কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাবে, তারপরেই—প্রলয় ঘটল। অন্তত শংকরের তো তাই বলেই মনে হল। সমস্ত পৃথিবীটা দুলে এমন কেঁপে উঠল যে, ওরা দুজনেই টলে পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে হাজারটা বাজ যেন কাছেই কোথায় পড়ল। মাটি যেন চিরে ফেঁড়ে গেল—আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাটল।

আলভারেজ মাটি থেকে উঠবার চেষ্টা করতে করতে বললে, ভূমিকম্প!

কিন্তু পরক্ষণেই তারা দেখে বিস্মিত হল, রাত্রির অমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হঠাৎ দূর হয়ে পঞ্চাশ হাজার বাতির এমন বিজলি আলো জ্বলে উঠল কোথা থেকে?

তারপর তাদের নজরে পড়ল দূরের সেই পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। সেখানে যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিলীলা শুরু হয়েছে। রাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত দিগন্ত সেই প্রলয়ের আলোয়, আগুনরাঙা মেঘ ফুঁসিয়ে উঠেছে পাহাড়ের চুড়ো থেকে দু-হাজার, আড়াই হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতে—সঙ্গে সঙ্গে কী বিশ্রী নিশ্বাস রোধকারী উৎকট গন্ধ বাতাসে!

আলভারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল, আগ্নেয়গিরি! সান্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা!

কী অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য! ওরা কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না খানিকক্ষণ। লক্ষটা তুবড়ি একসঙ্গে জ্বলছে, লক্ষটা রংমশালে একসঙ্গে আগুন দিয়েছে শংকরের মনে হল। রাঙা আগুনের মেঘ মাঝে মাঝে নিচু হয়ে যায়, হঠাৎ যেমন আগুনে ধুনো পড়লে দপ করে জ্বলে ওঠে, অমনি দপ করে হাজার ফুট ঠেলে ওঠে। আর সেইসঙ্গে হাজারটা বোমা ফাটার আওয়াজ!

এদিকে পৃথিবী এমন কাঁপছে যে, দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—কেবল টলে টলে পড়তে হয়। শংকর তো টলতে টলতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। ঢুকে দেখে একটা ছোটো কুকুরছানার মতো জীব তার বিছানায় গুটিসুটি হয়ে ভয়ে কাঁপছে। শংকরের টর্চের আলোয় সেটা থতমত খেয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল, আর তার চোখ দুটি মণির মতো জ্বলতে লাগল।

আলভারেজ তাঁবুতে ঢুকে দেখে বললে, নেকড়ে বাঘের ছানা। রেখে দাও, আমাদের আশ্রয় নিয়েছে যখন প্রাণের ভয়ে।

ওরা কেউ এর আগে প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখেনি, এ থেকে যে বিপদ আসতে পারে তা ওদের জানা নেই—কিন্তু আলভারেজের কথা ভালো করে শেষ হতে না হতে, হঠাৎ কী প্রচণ্ড ভারী জিনিসের পতনের শব্দে ওরা আবার তাঁবুর বাইরে গিয়ে যখন দেখলে যে, একখানা পনেরো সের ওজনের জ্বলন্ত

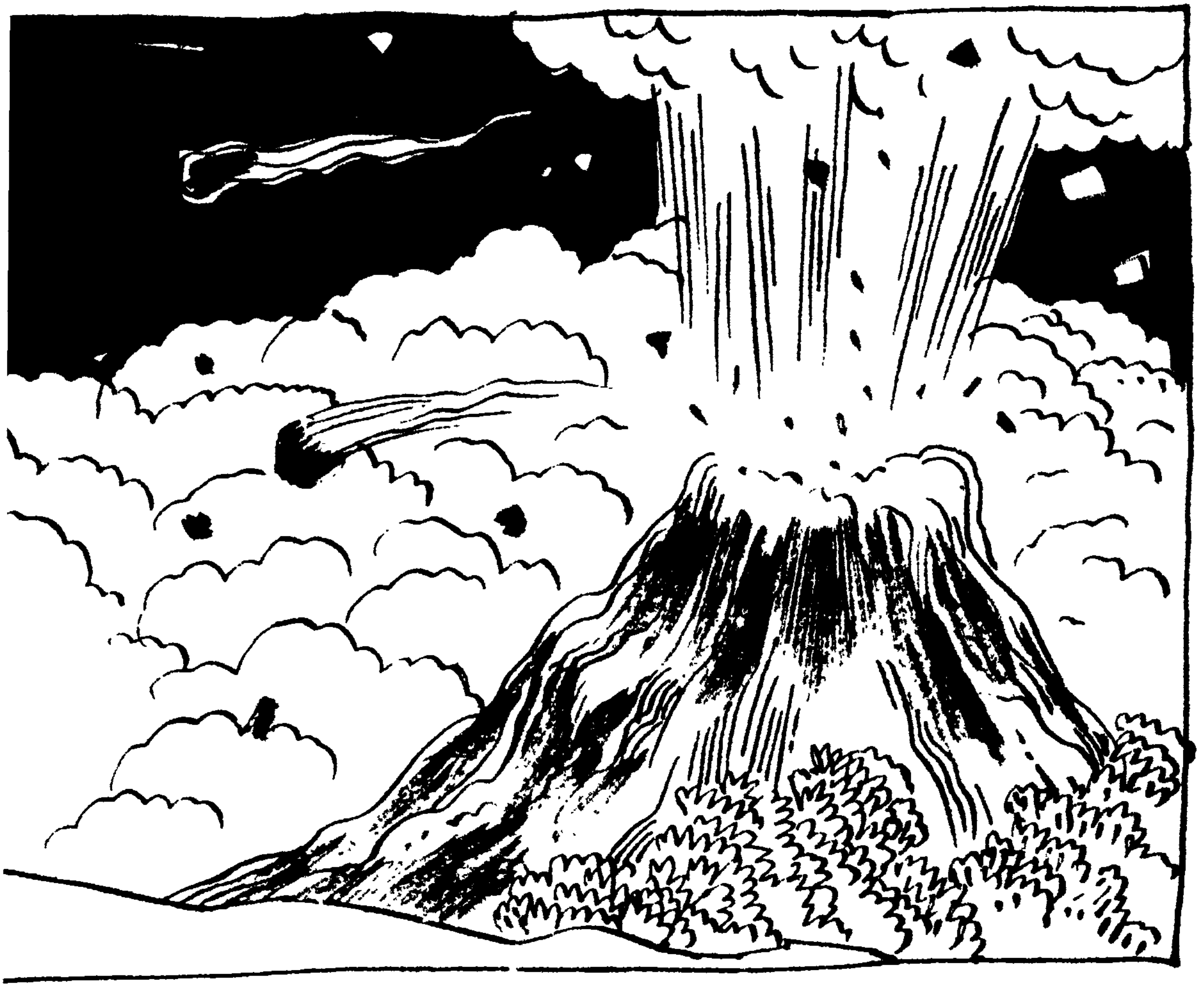

কয়লার মতো রাঙা পাথর অদূরে একটা ঝোপের উপর এসে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটাও জ্বলে উঠেছে। তখন আলভারেজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, পালাও, শংকর, তাঁবু ওঠাও—শিগগির—

ওরা তাঁবু ওঠাতে ওঠাতে আরও দু-পাঁচখানা আগুনরাঙা জ্বলন্ত ভারী পাথর এদিক-ওদিক সশব্দে পড়ল। নিশ্বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে, এমনই ঘন গন্ধকের ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়েছে।

দৌড়...দৌড়...দৌড়...দু-ঘণ্টা ধরে ওরা জিনিসপত্র কতক টেনে হিঁচড়ে, কতক বয়ে নিয়ে পুব দিকের সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌঁছোল। সেখানে পর্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বাতাসে। আধঘণ্টা পরে সেখানেও পাথর পড়তে শুরু করলে। ওরা পাহাড়ের উপর উঠল, সেই ভীষণ জঙ্গল আর রাত্রির অন্ধকার ঠেলে। ভোর যখন হল, তখন আড়াই হাজার ফুট উঠে পাহাড়ের ঢালুতে বড়ো একটা গাছের তলায়, দুজনেই হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল।

সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের যে ভীষণ সৌন্দর্য অনেকখানি কমে গেল, কিন্তু শব্দ ও পাথর পড়া যেন বাড়ল। এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব মিহি ধূসরবর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়ছে, গাছপালা লতাপাতার উপর দেখতে দেখতে পাতলা একপুরু ছাই জমে গেল।

সারাদিন সমানভাবে অগ্নিলীলা চলল—আবার রাত্রি এল। নীচের উপত্যকা-ভূমির অত বড়ো হেমলক গাছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তর বর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রিতে আবার সেই ভীষণ সৌন্দর্য, কতদূর

পর্যন্ত বন ও আকাশ, কতদূরের দিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে পর্বতের অগ্নি-কটাহের আগুনে—তখন পাথর পড়াটা একটু কেবল কমেছে। কিন্তু সেই রাঙা আগুন-ভরা বাষ্পের মেঘ তখনও সেইরকমই দীপ্ত হয়ে রয়েচে।

রাত দুপুরের পরে একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ ওদের তন্দ্রা ছুটে গেল—ওরা সভয়ে চেয়ে দেখলে জ্বলন্ত পাহাড়ের চূড়ার মুন্ডুটা উড়ে গিয়েছে! নীচের উপত্যকাতে ছাই, আগুন ও জ্বলন্ত পাথর ছড়িয়ে পড়ে অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা দিলে। আলভারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হল। ওদের তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেল। পিছনের একটা উঁচু গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে।

শংকর ভাবছিল—এই জনহীন আরণ্য অঞ্চলে এত বড়ো একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে ঘটে গেল, তা কেউ দেখতেও পেত না, যদি তারা না থাকত। সভ্য জগৎ জানেও না, আফ্রিকার গহন অরণ্যের এ আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব। কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।

সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, মোমবাতি হাওয়ার মুখে জ্বলে গিয়ে যেমন মাথার দিকে অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে, পাহাড়ের চূড়াটার তেমনি চেহারা হয়েছে। কুলফি বরফটাতে ঠিক যেন কে আরেকটা কামড় বসিয়েচে।

আলভারেজ ম্যাপ দেখে বললে, এটা আগ্নেয়গিরি বলে ম্যাপে দেওয়া নেই। সম্ভবত বহু বছর পরে এই এর প্রথম অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে, তা খুব অর্থপূর্ণ।

শংকর বললে, কী নাম?

আলভারেজ বললে, এর নাম লেখা আছে 'ওলডোনিও লেঙ্গাই'—প্রাচীন জুলু ভাষায় এর মানে 'অগ্নিদেবের শয্যা'। নামটা দেখে মনে হয়, এ অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের কাছে এ পাহাড়ের আগ্নেয় প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল না। বোধ হয় তারপর দু-একশো বছর কিংবা তার বেশিকাল এটা চুপচাপ ছিল।

ভারতবর্ষের ছেলে শংকরের দুই হাত আপনা-আপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করলে। প্রণাম, হে রুদ্রদেব প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্যে প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা আপনার এ রূপের কাছে শত হীরকখানি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।

নয়

আগ্নেয় পর্বতের অত কাছে বাস করা আলভারেজ উচিত বিবেচনা করলে না। ওলডোনিও লেঙ্গাই পাহাড়ের ধূমায়িত শিখরদেশের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে, তারা আরও পশ্চিম ঘেঁষে চলতে থাকল। সেদিকের গহন অরণ্যে আগুনের আঁচটিও লাগেনি, বর্ষার জলে সে অরণ্য আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে, ছোটো ছোটো গাছপালার ও লতাঝোপের সমাবেশ। ছোটো-বড়ো কত ঝরনাধারা ও পার্বত্য নদী বয়ে চলেছে—তাদের মধ্যে একটাও আলভারেজের পূর্বপরিচিত নয়।

এইবার এক জায়গায় ওরা এসে উপস্থিত হল, যেখানে চারিদিকেই চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোটো-বড়ো পাহাড় ও প্রত্যেক পাহাড়ের গায়েই নানা আকারের গুহা। স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্য রিখ্‌টারসভেল্ডের সাধারণ দৃশ্য থেকে একটু অন্যরকম। এখানে বন তত ঘন নয়, কিন্তু খুব বড়ো বড়ো গাছ চারিদিকে আর যেখানে-সেখানে পাহাড় ও গুহা।

একটা উঁচু টিপির মতো গ্রানাইটের পাহাড়ের উপর ওরা তাঁবু ফেলে রইল। এখানে এসে পর্যন্ত

শংকরের মনে হয়েছে জায়গাটা ভালো নয়। কী একটা অস্বস্তি, মনের মধ্যে কী একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, তা সে না পারে ভালো করে নিজে বুঝতে, না পারে আলভারেজকে বোঝাতে।

একদিন আলভারেজ বললে, সব মিথ্যে শংকর, আমরা এখনও বনের মধ্যে ঘুরছি। আজ সেই গাছটা আবার দেখেছি, সেই D.A. লেখা। অথচ তোমার মনে আছে, আমরা কতদূর সম্ভব পশ্চিমদিক ঘেঁষেই চলেছি আজ পনেরো দিন। কী করে আমরা আবার সেই গাছের কাছে আসতে পারি?

শংকর বললে, তবে এখন কী উপায়?

—উপায় আছে! আজ রাত্রে একটা বড়ো গাছের মাথায় উঠে নক্ষত্র দেখে নির্ণয় করতে হবে। তুমি তাঁবুতে থেকো।

শংকর একটা কথা বুঝতে পারছিল না। তারা যদি চক্রাকারে ঘুরচে, তবে অনুচ্চ শৈলমালা ও গুহার দেশে কী করে এল? এ অঞ্চলে তো কখনো আসেনি বলেই মনে হয়। আলভারেজ এর উত্তরে বললে, গাছটাতে নাম খোদাই দেখে সে আর কখনো তার পূর্বদিকে আসবার চেষ্টা করেনি। পূর্বদিকে মাইল দুই এলেই এই স্থানটিতে ওরা পৌঁছোত।

সে রাত্রে শংকর একা তাঁবুতে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ছিল। এই একখানা বাংলা বই সে দেশ থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে আনে, এবং বহুবার পড়লেও সময় পেলেই আবার পড়ে।

কতদূরে ভারতবর্ষ, তার মধ্যে চিতোর, মেওয়ার, মোঘল-রাজপুতের বিবাদ! এই অজানা মহাদেশের অজানা মহা অরণ্যানীর মধ্যে বসে সেসব যেন অবাস্তব বলে মনে হয়।

তাঁবুর বাইরে হঠাৎ যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শংকর প্রথমটা ভাবলে, আলভারেজ গাছ থেকে নেমে ফিরে আসছে বোধ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এ মানুষের স্বাভাবিক পায়ের শব্দ নয়, কেউ দু-পায়ে থলে জড়িয়ে খঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘষে ঘষে টেনে টেনে চললে যেন এমন ধরনের শব্দ হওয়া সম্ভব। আলভারেজের উইনচেস্টার রিপিটারটা হাতের কাছেই ছিল, ও সেটা তাঁবুর দরজার দিকে বাগিয়ে বসল। বাইরে পদশব্দটা একবার থেমে গেল—পরেই আবার তাঁবুর দক্ষিণ পাশ থেকে বাঁ দিকে এল। একটা কোনো বড়ো প্রাণীর ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ যেন পাওয়া গেল—ঠিক যেমন পাহাড় পার হবার সময় এক রাত্রে ঘটেছিল, ঠিক সেইরকমই।

শংকর একটু ভয় খেয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে রাইফেলে ছুঁড়ে বসল। একবার...দুবার।

সঙ্গে সঙ্গে মিনিট দুই পরে দূরের গাছে মাথা থেকে প্রত্যুত্তের দুবার রিভলবারের আওয়াজ পাওয়া গেল। আলভারেজ মনে ভেবেছে, শংকরের কোনো বিপদ উপস্থিত, নতুবা রাত্রে খামকা রিভলবার ছুঁড়বে কেন? বোধ হয় সে তাড়াতাড়ি নেমেই আসছে।

এদিকে চারদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজে জানোয়ারটা বোধ হয় পালিয়েছে, আর তার সাড়াশব্দ নেই। শংকর টর্চ জ্বেলে তাঁবুর বাইরে এসে ভাবলে, আলভারেজকে সংকেতে গাছ থেকে নামতে বারণ করবে, এমন সময় কিছুদূরে বনের মধ্যে হঠাৎ আবার দুবার বিস্তলের আওয়াজ এবং সেইসঙ্গে একটা অস্পষ্ট চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

শংকর পিস্তলের আওয়াজ লক্ষ করে ছুটে গেল। কিছু দূরে গিয়েই দেখলে বনের মধ্যে একটা বড়ো গাছের তলায় আলভারেজ শুয়ে। টর্চের আলোয় তাকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে শংকর শিউরে উঠল—তার সর্বশরীর রক্তমাখা, মাথাটা বাকি শরীরের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেছে। গায়ের কোটটা ছিন্নভিন্ন।

শংকর তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে। ডাকলে, আলভারেজ! আলভারেজ!

আলভারেজের সাড়া নেই। তার ঠোঁট দুটো একবার যেন নড়ে উঠল, কী যেন বলতে গেল। সে শংকরের দিকে চেয়েই আছে, অথচ সে চোখে যেন দৃষ্টি নেই, অথবা কেমন যেন নিস্পৃহ উদাস দৃষ্টি।

শংকর ওকে বহন করে তাঁবুতে নিয়ে এল। মুখে জল দিল, তারপর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে দেখে গলার নীচে কাঁধের দিকের খানিকটা জায়গার মাংস কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে! সারা পিঠটারও সেই অবস্থা। কোনো এক অসাধারণ বলশালী জন্তু, তীক্ষ্ণধার নখে বা দাঁতে, পিঠখানা চিরে ফালাফালা করেছে।

পাশে নরম মাটিতে কোনো এক জন্তুর পায়ের দাগ—তিনটে মাত্র আঙুল সে পায়ে।

সারারাত্রি সেই ভাবেই কাটল, আলভারেজের সাড়া নেই, সংজ্ঞা নেই। সকাল হবার সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চেতনা ফিরে এল। শংকরের দিকে বিস্ময়ের ও অচেনার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, যেন এর আগে সে কখনো শংকরকে দেখেনি। তারপর আবার চোখ বুজল। দুপুরের পর খুব সম্ভবত নিজের মাতৃভাষায় কী সব বকতে শুরু করল, শংকর এক বর্ণও বুঝতে পারলে না। বিকেলের দিকে সে হঠাৎ শংকরের দিকে চাইলে। চাইবার সঙ্গে সঙ্গে শংকরের মনে হল, সে ওকে চিনতে পেরেছে। এইবার ইংরিজিতে বললে, শংকর! এখনও বসে আছ? তাঁবু ওঠাও, চলো যাই—তারপর অপ্রকৃতিস্থের মতো নির্দেশহীন ভঙ্গিতে হাত তুলে বললে, রাজার ঐশ্বর্য লুকোনো রয়েছে ওই পাহাড়ের গুহার মধ্যে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি। চলো আমরা যাই, তাঁবু ওঠাও, দেরি কোরো না।

এই আলভারেজের শেষ কথা।

তারপর কতক্ষণ শংকর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সন্ধ্যা হল, একটু একটু করে সমগ্র বনানী ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল।

শংকরের তখন চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আগে আগুন জ্বাললে, তারপর দুটো রাইফেলে টোটা ভরে তাঁবুর দোরের দিকে বন্দুকের নল বাগিয়ে, আলভারেজের মৃতদেহের পাশে একখানা সতরঞ্চির উপর বসে রইল।

তারপর সে রাত্রে আবার নামল তেমনি ভীষণ বর্ষা। তাঁবুর কাপড় ফুঁড়ে জল পড়ে জিনিসপত্র ভিজে গেল। শংকর তখন কিন্তু এমন হয়ে গিয়েছে যে, তার কোনোদিকে দৃষ্টি নেই। এই ক-মাসে সে আলভারেজকে সত্যিই ভালোবেসেছিল, তার নির্ভীকতা, তার সংকল্পে অটলতা, তার পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তি, তার বীরত্ব—শংকরকে মুগ্ধ করেছিল। সে আলভারেজকে নিজের পিতার মতো ভালোবাসত। আলভারেজও তাকে তেমনি স্নেহের চোখে দেখত।

কিন্তু এসবের চেয়েও শংকরের বেশি মনে হচ্ছে যে, আলভারেজ শেষকালে মারা গেলে সেই অজ্ঞাত জানোয়ারটারই হাতে। ঠিক জিম কার্টারের মতোই।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তার মন ভয়ে আকুল হয়ে উঠল। সম্মুখে ভীষণ অজানা মৃত্যুদূত—ঘোর রহস্যময় তার অস্তিত্ব। কখন সে আসবে, কখন বা যাবে, কেউ তার সন্ধান দিতে পারবে না। ঘুমে ঢুলে না পড়ে শংকর মনের বলে জেগে বসে রইল সারারাত।

ওঃ, সে কী ভীষণ রাত্রি। যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন ও রাত্রির কথা সে ভুলবে না। গাছে গাছে,

ডালে ডালে, হাজার ধারায় বৃষ্টি পতনের শব্দ ও একটানা ঝড়ের শব্দ, অরণ্যানীর অন্যসকল নৈশ শব্দ আজ ডুবিয়ে দিয়েছে, পাহাড়ের উপর বড়ো গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে! এই ভয়ংকর রাত্রিতে সে একা এই ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে! কালো গাছের গুঁড়িগুলো যেন প্রেতের মতো দেখাচ্ছে, অত বড়ো ঝড় বৃষ্টিতেও জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে। সম্মুখে বন্ধুর মৃতদেহ। ভয় পেলে চলবে না। সাহস আনতেই হবে, নতুবা ভয়েই সে মরে যাবে। সাহস আনবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে রাইফেল দুটির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে। একটা উইনচেস্টার, অপরটি ম্যানলিকার—দুটোরই ম্যাগাজিনে টোটা ভরতি। এমন কোনো শরীরধারী জীবন নেই, যে এই দুই শক্তিশালী অতি ভয়ানক মারণাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, আজ রাত্রে অক্ষত দেহে তাঁবুতে ঢুকতে পারে!

ভয় ও বিপদ মানুষকে সাহসী করে। শংকর সারারাত সজাগ পাহারা দিল। পরদিন সকালে আলভারেজের মৃতদেহ সে একটা বড়ো গাছের তলায় সমাধিস্থ করলে এবং দুখানা গাছের ডাল ক্রুশের আকারে শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে সমাধির উপর পুঁতে দিলে।

আলভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে ওপর্টো খনি বিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা ছিল ওর নামে। তাদের শেষ পরীক্ষায় আলভারেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। ওর কথাবার্তায় অনেক সময়েই শংকরের সন্দেহ হত যে, সে নিতান্ত মূর্খ ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে নয়।

লোকালয় থেকে বহুদূরে এই জনহীন গহন অরণ্যে, ক্লান্ত আলভারেজের রত্নানুসন্ধান শেষ হল। তার মতো মানুষ রত্নের কাঙাল নয়, বিপদের নেশায় পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই তাদের জীবনের পরম আনন্দ, কুবেরের ভাণ্ডারও তাকে এক জায়গায় চিরকাল আটকে রাখতে পারত না।

দুঃসাহসিক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের বনস্পতিদল ছায়া দেবে সমাধির উপর। সিংহ, গরিলা, হায়না সজাগ রাত্রি যাপন করবে, আর সবার উপরে, সবাইকে ছাপিয়ে বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযুগ।

দশ

সে দিন সে রাত্রিও কেটে গেল। শংকর এখন দুঃসাহসে মরিয়া হয়ে উঠেছে। যদি তাকে প্রাণ নিয়ে এ ভীষণ অরণ্য থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে তাকে ভয় পেলে চলবে না। দু-দিন সে কোথাও না গিয়ে, তাঁবুতে বসে মন স্থির করে ভাববার চেষ্টা করলে, সে এখন কী করবে। হঠাৎ তার মনে হল আলভারেজের সেই কথাটা—সলস্‌বেরি...এখান থেকে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আন্দাজ ছ-শো মাইল...

সলস্‌বেরি! দক্ষিণ রোডেসিয়ার রাজধানী সলস্‌বেরি। যে করে হোক, পৌঁছুতেই হবে তাকে সলস্‌বেরিতে। সে এখনও অনেকদিন বাঁচবে, তার জন্মকোষ্ঠিতে লেখা আছে। এ জায়গায় বেঘোরে সে মরবে না।

শংকর ম্যাপগুলো খুব ভালো করে দেখলে। পর্তুগিজ গভর্নমেন্টের ফরেস্ট সার্ভের ম্যাপ, ১৮৭৩ সালের রয়েল মেরিন সার্ভের তৈরি উপকূলের ম্যাপ, ভ্রমণকারী স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ, এ বাদে আলভারেজের হাতে আঁকা ও জিম কার্টারের সইযুক্ত একখানা জীর্ণ, বিবর্ণ খসড়া নকশা! আলভারেজ বেঁচে থাকতে সে এইসব ম্যাপ ভালো করে বুঝতে একবারও চেষ্টা করেনি, এখন এই ম্যাপ বোঝার উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। সলস্‌বেরির সোজা রাস্তা বার করতে হবে। এ স্থান থেকে তার অবস্থিতি বিন্দুর দিক নির্ণয় করতে হবে, রিখটারসভেল্ড অরণ্যের এ গোলকধাঁধা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে—সবই এই ম্যাপগুলির সাহায্যে।

অনেক দেখবার পর শংকর বুঝতে পারলে এই অরণ্য ও পর্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছুই দেওয়া নেই—এক আলভারেজের ও জিম কার্টারের খসড়া ম্যাপখানা ছাড়া। তাও সেগুলি এত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে এত সাংকেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যে, শংকরের পক্ষে তা প্রায় দুর্বোধ্য। কারণ এদের সব সময়েই ভয় ছিল যে, ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে, পাছে আর কেউ এসে ওদের ধনে ভাগ বসায়।

চতুর্থ দিন শংকর সে স্থান ত্যাগ করে আন্দাজ মতো পুব দিকে রওনা হল। যাবার আগে কিছু বনফুলের মালা গেঁথে আলভারেজের সমাধির উপর অর্পণ করলে।

বুশ ক্রাফ্‌ট বলে একটা জিনিস আছে। সুবিস্তীর্ণ, বিজন, গহন অরণ্যানীর মধ্যে ভ্রমণ করবার সময় এ বিদ্যা জানা না থাকলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আলভারেজের সঙ্গে এতদিন ঘোরাঘুরি করার ফলে, শংকর কিছু কিছু বুশ ক্রাফ্‌ট শিখে নিয়েছিল, তবুও তার মনে সন্দেহ হল যে, এই বন একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা সে কি অর্জন করেছে? শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করে তাকে চলতে হবে, ভাগ্য ভালো থাকলে বন পার হতে পারবে, ভাগ্য প্রসন্ন না হয় মৃত্যু।

দুটো-তিনটে ছোটো পাহাড় সে পার হয়ে চলল। বন কখনো গভীর, কখনো পাতলা। কিন্তু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতির আর শেষ নেই। শংকরের জানা ছিল যে, দীর্ঘ এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবে যে বনের প্রান্তসীমায় পৌঁছোনো গিয়েছে। কারণ গভীর জঙ্গলে কখনো এলিফ্যান্ট বা টুসক ঘাস জন্মায় না। কিন্তু এলিফ্যান্ট ঘাসের চিহ্ন নেই কোনোদিকে—শুধু বনস্পতি আর নিচু বনঝোপ।

প্রথম দিন শেষ হল এক নিবিড়তর অরণ্যের মধ্যে। শংকর জিনিসপত্র প্রায় সবই ফেলে দিয়ে এসেছিল, কেবল আলভারেজের ম্যানলিকার রাইফেলটা, অনেকগুলো টোটা, জলের বোতল, টর্চ, ম্যাপগুলো, কম্পাস, ঘড়ি, একখানা কম্বল ও সামান্য কিছু ওষুধ সঙ্গে নিয়েছিল—আর নিয়েছিল একটা দড়ির দোলনা। তাঁবুটা যদিও খুব হালকা ছিল, বয়ে আনা অসম্ভব বিবেচনায় ফেলেই এসেছে।

দুটো গাছের ডালে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে সে দড়ির দোলনা টাঙালে এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে গাছতলায় আগুন জ্বালালে। দোলনায় শুয়ে বন্দুক হাতে জেগে রইল, কারণ ঘুম অসম্ভব। একে ভয়ানক মশা, তার উপর সন্ধ্যার পর থেকে গাছতলার কিছুদূর দিয়ে একটা চিতাবাঘ যাতায়াত শুরু করলে। গভীর অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে যেন দুটো আগুনের ভাঁটা, শংকর টর্চের আলো ফেললে পালিয়ে যায়, আবার আধঘণ্টা পরে ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। শংকরের ভয় হল, ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো বা [illegible] দিয়ে দোলনায় উঠে আক্রমণ করবে। চিতাবাঘ অতি ধূর্ত জানোয়ার। কাজেই সারারাত্রি শংকর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। তার উপর চারধারে নানা বন্যজন্তুর রব। একবার একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কাছেই কোথাও একদল বালক-বালিকার খিলখিল হাসির শব্দে তন্দ্রা ছুটে গিয়ে ও চমকে জেগে উঠল। ছেলে-মেয়েরা হাসে কোথায়? এই জনমানবহীন অরণ্যে বালক-বালিকাদের যাতায়াত করা বা এত রাত্রে হাস্য তো উচিত নয়! পরক্ষণেই তার মনে পড়ল একজাতীয় বেবুনের ডাক ঠিক ছেলেপুলের হাসির মতো শোনায়, আলভারেজ একবার গল্প করেছিল। ভোরবেলা সে গাছ থেকে নেমে রওনা হল। বৈমানিকরা যাকে বলেন 'ফ্লাইং ব্লাইন্ড'—সে সেইভাবে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, দু-চোখ বুজে। এই দু-দিন চলেই সে সম্পূর্ণভাবে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে—আর তার উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম জ্ঞান নেই। সে বুঝলে কোনো মহারণ্যে দিক ঠিক রেখে চলা কী ভীষণ কঠিন ব্যাপার। তোমার চারপাশে সব সময়েই

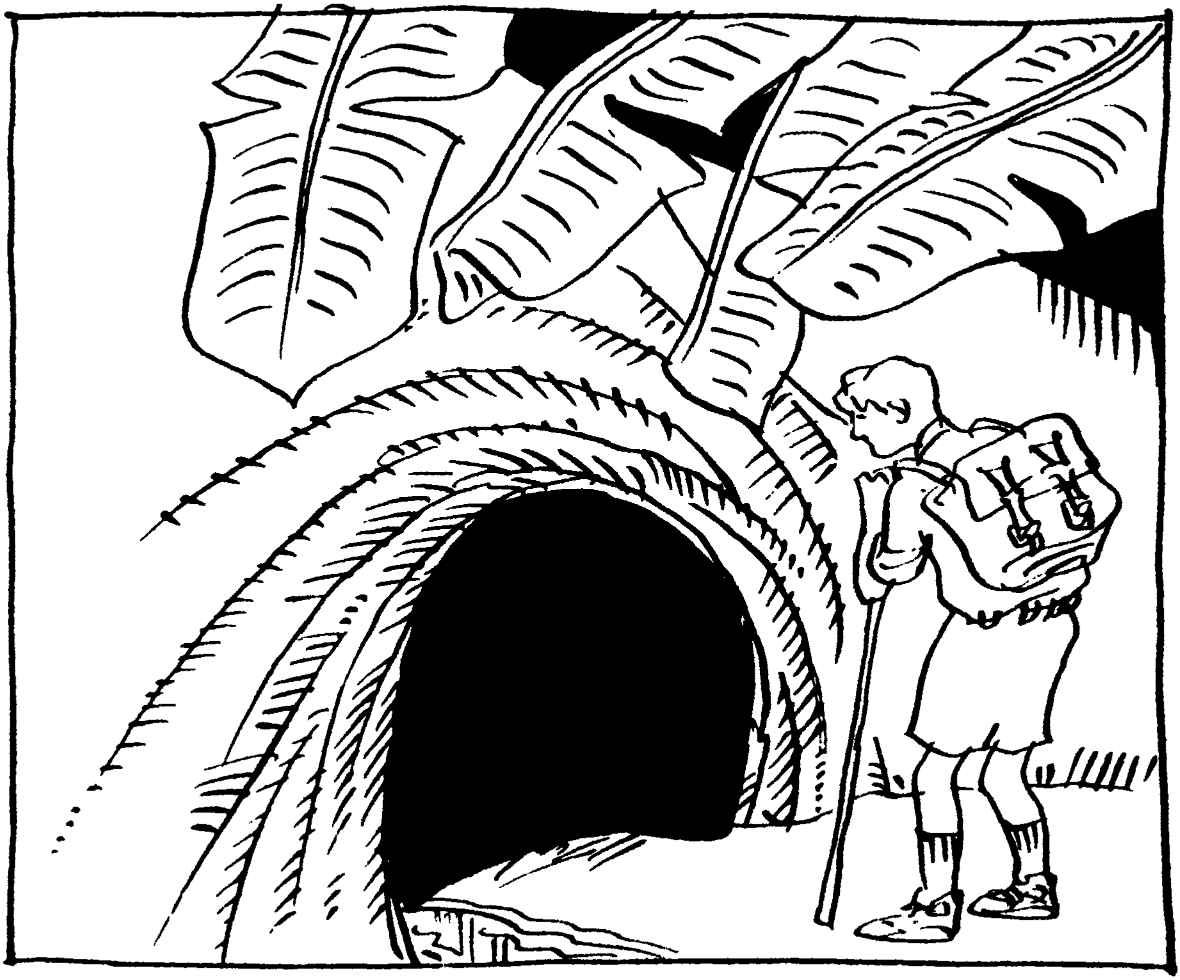

গাছের গুঁড়ি, অগণিত, অজস্র, তার মাপজোখ নেই। তোমার মাথার উপর সবসময় ডালপালা লতাপাতার চন্দ্রাতপ। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্যের আলোও কম, সব সময়েই যেন গোধূলি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, ওই একই ব্যাপার। কম্পাস এদিকে অকেজো, কী করেই বা দিক ঠিক রাখা যায়!

পঞ্চম দিনে একটা পাহাড়ের তলায় এসে সে বিশ্রামের জন্যে থামল। কাছেই একটা প্রকাণ্ড গুহার মুখ, একটা ক্ষীণ জলস্রোত গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।

অত বড়ো গুহা আগে কখনো না দেখার দরুন কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সে জিনিসপত্র বাইরে রেখে গুহার মধ্যে ঢুকল। গুহার মুখে খানিকটা আলো—ভেতরে বড়ো অন্ধকার, টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে, সে ক্রমশ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছোল, যেখানে ডাইনে-বাঁয়ে আরও দুটো মুখ। উপরের দিকে টর্চ উঠিয়ে দেখলে, ছাদটা অনেকটা উঁচু। সাদা শক্ত নুনের মতো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সরু-মোটা ঝুরি ছাদ থেকে ঝাড়লণ্ঠনের মতো ঝুলছে।

গুহার দেওয়ালগুলো ভিজে, গা বেয়ে অনেক জায়গায় জল খুব ক্ষীণধারায় ঝরে পড়ছে। শংকর ডাইনের গুহায় ঢুকল, সেটা ঢুকবার সময় সরু কিন্তু ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে। পায়ে পাথর নয়, ভিজে মাটি। টর্চের আলোয় ওর মনে হল, গুহাটা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের ভূমির এক কোণে আরেকটা গুহামুখ।

সেটা দিয়ে ঢুকে শংকর দেখলে সে যেন দু-ধারে পাথরের উঁচু দেওয়ালওলা একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে এসেছে। গলিটা আঁকাবাঁকা, একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে, শংকর অনেক দূর চলে গেল গলিটা ধরে।

ঘণ্টা দুই এতে কাটল। তারপর সে ভাবলে, এবার ফেরা যাক। কিন্তু ফিরতে গিয়ে সে আর কিছুতেই সে ত্রিভুজ গুহাটা খুঁজে পেল না। কেন, এই তো সেই গুহা থেকেই ওই সরু গুহাটা বেরিয়েছে, সরু গুহা তো শেষ হয়েই গেল—তবে সেই ত্রিভুজ গুহাটা কই?

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে শংকরের হঠাৎ কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হল। সে গুহার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেনি তো? সর্বনাশ!

সে বসে আতঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করলে, ভাবলে—না, ভয় পেলে তার চলবে না। স্থির বুদ্ধি ভিন্ন এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। মনে পড়ল, আলভারেজ তাকে বলে দিয়েছিল, অপরিচিত স্থানে বেশিদূর অগ্রসর হবার সময়ে পথের পাশে সে যেন কোনো চিহ্ন রেখে যায় যাতে আবার সেই চিহ্ন ধরে ফিরতে পারে। এ উপদেশ সে ভুলে গিয়েছিল। এখন উপায়?

টর্চের আলো জ্বালাতে আর তার ভরসা হচ্ছে না। যদি ব্যাটারি ফুরিয়ে যায়, তবে নিরুপায়। গুহার মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য। সেই অন্ধকার এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পথ খুঁজে বার করা তো দূরের কথা।

সারাদিন কেটে গেল—ঘড়িতে সন্ধে সাতটা। এদিকে টর্চের আলো রাঙা হয়ে আসছে ক্রমশ! ভীষণ গুমোট গরম গুহার মধ্যে, তা ছাড়া পানীয় জল নেই। পাথরের দেওয়াল বেয়ে যে জল চুয়ে পড়ছে, তার আস্বাদ কষা, ক্ষার ঈষৎ লোনা। তার পরিমাণও বেশি নয়। জিভ দিয়ে চটে খেতে হয় দেওয়ালের গা থেকে।

বাইরে অন্ধকার হয়েছে নিশ্চয়ই, সাড়ে-সাতটা বাজল।

আটটা, নটা, দশটা। তখনও শংকর পথ হাতড়াচ্ছে। টর্চের পুরোনো ব্যাটারি জ্বলছে সমানে বেলা তিনটে থেকে, এইবার তা এত ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে, শংকর ভয়ে আরও উন্মাদের মতো হয়ে উঠল। এই আলো যতক্ষণ, তার প্রাণের ভরসাও ততক্ষণ। নতুবা এই নরকের মতো মহা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবার কোনো আশা নেই—স্বয়ং আলভারেজও পারত না।

টর্চ নিবিয়ে ও চুপ করে একখানা পাথরের উপর বসে রইল। এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারত যদি আলো থাকত, কিন্তু এই অন্ধকারে সে কী করে এখন? একবার ভাবলে, রাত্রিটা কাটুক না, দেখা যাবে এখন। পরক্ষণেই মনে হল—তাতে আর এমন কী সুবিধে হবে? এখানে তো দিন-রাত্রি সমান।

অন্ধকারেই সে দেওয়াল ধরে ধরে চলতে লাগল। হায়, হায়, কেন গুহায় ঢুকবার সময়ে দুটো নতুন ব্যাটারি সঙ্গে নেয়নি। অন্তত একটা দেশলাই!

ঘড়ি হিসেবে সকাল হল। গুহার চির-অন্ধকারে কিন্তু আলো জ্বলল না! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শংকরের শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। বোধ হয়, এই গুহার অন্ধকারে ওর সমাধি অদৃষ্টে লেখা আছে, দিনের আলো আর তাকে দেখতে হবে না। আলভারেজের বলি গ্রহণ করে আফ্রিকার রক্ততৃষ্ণা মেটেনি, তাকেও চাই।

তিন দিন, তিন রাত্রি কেটে গেল। শংকর জুতোর সুকতলা চিবিয়ে খেয়েছে, একটা আরশুলা কি ইঁদুর কি কাঁকড়াবিছে, গুহার মধ্যে কোনো জীব নেই যে সে ধরে খায়। মাথা ক্রমশ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আসছে, তার জ্ঞান নেই সে কী করছে বা তার কী ঘটবে—কেবল একটুকু মাত্র জ্ঞান রয়েছে যে তাকে গুহা থেকে

যে করে হোক বেরুতেই হবে, দিনের আলোর মুখ দেখতেই হবে। তাই সে অবসন্ন নির্জীব দেহেও অন্ধকার হাতড়ে হাতড়েই বেড়াচ্ছে, হয়তো মরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এইরকম ভাবে হাতড়াবে।

একবার সে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পরে সে জেগে উঠল তা সে জানে না। দিন, রাত্রি, ঘণ্টা, ঘড়ি দণ্ড, পল মুছে গিয়েছে এই ঘোর অন্ধকারে! হয়তো বা তার চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে, কে জানে!

ঘুমোবার পরে সে যেন একটু বল পেল। আবার উঠল, আবার চলল, আলভারেজের শিষ্য সে, নিশ্চেষ্ট ভাবে হাত-পা কোলে করে বসে কখনোই মরবে না। সে পথ খুঁজবে, খুঁজবে যতক্ষণ বেঁচে আছে।

আশ্চর্য, সে নদীটাই বা গেল কোথায়? গুহার মধ্যে গোলকধাঁধায় ঘুরবার সময় জলধারাকে সে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। নদী দেখতে পেলে হয়তো উদ্ধার পাওয়াও যেতে পারে, কারণ তার এক মুখ যেদিকেই থাক, অন্য মুখ আছে গুহার বাইরে। কিন্তু নদী তো দূরের কথা একটা অতি ক্ষীণ জলধারার সঙ্গেও আজ তিন দিন পরিচয় নেই! জল অভাবে শংকর মরতে বসেছে! কষা, লোনা, বিস্বাদ জল চেটে-চেটে তার জিভ ফুলে উঠেছে, তৃষ্ণা তাতে বেড়েছে ছাড়া কমেনি।

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে শংকর খুঁজতে লাগল, ভিজে দেওয়ালের গায়ে কোথাও শ্যাওলা জন্মেছে কি না—খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। না, তাও নেই। পাথরের দেওয়াল সর্বত্র অনাবৃত, মাঝে মাঝে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পাতলা সর পড়েচে, একটা ব্যাঙের ছাতা কি শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদও নেই। সূর্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদ এখানে বাঁচতে পারে না।

আরও একদিন কেটে রাত হল। এত ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হচ্ছে বলে তো বোধ হয় না। ওর মনে হতাশা ঘনিয়ে এসেছে। সে কী আরও চলবে, কতক্ষণ চলবে? এতে কোনো ফল নেই, এ চলার শেষ নেই। কোথায় যে চলেচে এই গাঢ় নিকষকালো অন্ধকারে এই ভয়ানক নিস্তব্ধতার মধ্যে! উঃ, কী ভয়ানক অন্ধকার, আর কী ভয়ানক নিস্তব্ধতা! পৃথিবী যেন মরে গিয়েছে, সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য নিবে গিয়েছে, সেই মৃত পৃথিবীর জনহীন, শব্দহীন, সময়হীন শ্মশানে সে-ই একমাত্র প্রাণী বেঁচে আছে।

আর বেশিক্ষণ এরকম থাকলে সে ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

এগারো

শংকর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ হয়, কিংবা হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে থাকবে। মোটের উপর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল তখন ঘড়িতে বারোটা—সম্ভবত রাত বারোটাই হবে। ও উঠে আবার চলতে শুরু করলে। একজায়গায় তার সামনে একটা পাথরের দেওয়াল পড়ল—তার রাস্তা যেন আটকে রেখেছে। টর্চের রাঙা আলো একটিবার মাত্র জ্বালিয়ে সে দেখলে, যে দেওয়াল ধরে সে এতক্ষণ যাচ্ছিল, তারই সঙ্গে সমকোণ করে এ দেওয়ালটা আড়াআড়ি ভাবে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সে কান খাড়া করলে, অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন ক্ষীণ জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, ঠিক জলের শব্দই বটে, কুলুকুলু, কুলুকুলু, ঝরনা ধারার শব্দ—যেন পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে মাঝে মাঝে বেধে জল বইছে কোথাও। ভালো করে শুনে ওর মনে হল, জলের শব্দটা হচ্ছে এই পাথরের দেওয়ালের ওপরে। দেওয়ালে কান পেতে শুনে ওর ধারণা আরও বদ্ধমূল হল! দেওয়াল ফুঁড়ে যাবার

উপযুক্ত ফাঁক আছে কি না, টর্চের রাঙা আলোয় অনুসন্ধান করতে এক জায়গায় খুব নিচু ও সংকীর্ণ প্রাকৃতিক রন্ধ্র দেখতে পেলে। সেখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা গিয়ে হাতে জল ঠেকল। সন্তর্পণে উপরের দিকে হাত দিয়ে বুঝল, সেখানটাতে দাঁড়ানো যেতে পারে। দাঁড়িয়ে উঠে ঘন অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা যেতেই, স্রোতযুক্ত বরফের মতো ঠান্ডা জলে পায়ের পাতা ডুবে গেল।

ঘন অন্ধকারের মধ্যেই নিচু হয়ে ও প্রাণ ভরে ঠান্ডা জল পান করে নিলে। তারপর টর্চের ক্ষীণ আলোয় জলের স্রোতের গতি লক্ষ করলে। এ ধরনের নির্ঝরের স্রোতের উজানের দিকে গুহার মুখ সাধারণত হয় না। টর্চ নিবিয়ে সেই মহা নিবিড় অন্ধকারে পায়ে পায়ে জলের ধারা অনুভব করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে চলল। নির্ঝর চলেছে এঁকেবেঁকে, কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে। এক জায়গায় সেটা তিন-চারটে ছোটো-বড়ো ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক চলে গিয়েছে, ওর মনে হল।

সেখানে এসে সে দিশাহারা হয়ে পড়ল। টর্চ জ্বেলে দেখলে স্রোত নানামুখী। আলভারেজের কথা মনে পড়ল, পথে চিহ্ন রেখে না গেলে, এখানে এবার গোল পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

নিচু হয়ে চিহ্ন রেখে যাওয়ার উপযোগী কিছু খুঁজতে গিয়ে দেখলে, স্বচ্ছ নির্মল জলাধারার এপারে-ওপারে দু-পারেই একধরনের পাথরের নুড়ি বিস্তর পড়ে আছে। সেই ধরনের পাথরের নুড়ির উপর দিয়েও প্রধান জলধারা বয়ে চলেছে।

অনেকগুলি নুড়ি পকেটে নিয়ে, সে প্রত্যেক শাখা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করবে ভেবে, দুটো নুড়ি ধারার পাশে রাখতে গেল। একটা স্রোত থেকে খানিকদূর গিয়ে আবার অনেকগুলো ফেক্‌ড়ি বেরিয়েছে। প্রত্যেক সংযোগস্থলে ও নুড়ি সাজিয়ে একটা 'এস' অক্ষর তৈরি করে রাখলে।

অনেকগুলো স্রোতশাখা আবার ঘুরে শংকর যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই যেন ঘুরে গেল। পথে চিহ্ন রেখে গিয়েও শংকরের মাথা গোলমাল হয়ে যাবার জোগাড় হল।

একবার শংকরের পায়ে খুব ঠান্ডা কী ঠেকতেই, আলো জ্বেলে দেখলে, জলের ধারে এক প্রকাণ্ডকায় অজগর কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। ওজগর ওর স্পর্শে আলস্য পরিত্যাগ করে মাথাটা উঠিয়ে কড়ির দানার মতো চোখে চাইতেই টর্চের আলোয় দিশেহারা হয়ে গেল—নতুবা শংকরের প্রাণ সংশয় হয়ে উঠত। শংকর জানে অজগর সাপ অতি ভয়ানক জন্তু—বাঘ-সিংহের মুখ থেকেও হয়তো পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, অজগর সাপের নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। একটি বার ল্যাজ ছুঁড়ে পা জড়িয়ে ধরলে আর দেখতে হত না!

এবার অন্ধকারে চলতে ওর ভয়ানক ভয় করছিল। কী জানি, কোথায় আবার কোন অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে! দুটো-তিনটে স্রোতশাখা পরীক্ষা করে দেখবার পরে ও তার নিজের চিহ্নের সাহায্যে পুনরায় সংযোগস্থলে ফিরে এল। প্রধান সংযোগস্থলে ও নুড়ি দিয়ে একটি ক্রুশচিহ্ন করে রেখে গিয়েছিল। এবার ওরই মধ্যে যেটাকে প্রধান বলে মনে হল, সেটা ধরে চলতে গিয়ে দেখলে, সেও সোজামুখে যায়নি। কিছুদূর গিয়েই তারও নানা ফেক্‌ড়ি বেরিয়েছে। এক-একজায়গায় গুহার ছাদ এত নিচু হয়ে নেমে এসেছে যে কুঁজো হয়ে, কোথাও বা মাজা দুমড়ে, অশীতিপর বৃদ্ধের ভঙ্গিতে চলতে হয়।

হঠাৎ একজায়গায় টর্চ জ্বেলে সেই অতি ক্ষীণ আলোতেও শংকর বুঝতে পারলে, গুহাটা সেখানে ত্রিভুজাকৃতি—সেই ত্রিভুজ গুহা, যাকে খুঁজে বার না করতে পেরে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।

একটু পরেই দেখলে বহুদূরে যেন অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি নক্ষত্র জ্বলছে। গুহার মুখ। এবার আর ভয় নেই। এ যাত্রার মতো সে বেঁচে গেল।

শংকর যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন রাত তিনটে। সেখানটায় গাছপালা কিছু কম, মাথার উপর নক্ষত্রভরা আকাশ দেখা যায়। সেই মহা অন্ধকার থেকে বার হয়ে এসে রাত্রির নক্ষত্রালোকিত স্বচ্ছ অন্ধকার তার কাছে দীপালোকখচিত নগরপথের মতো মনে হল। প্রাণভরে সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে, এ অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্যে।

ভোর হল। সূর্যের আলো গাছের ডালে ডালে ফুটল। শংকর ভাবলে এ অমঙ্গলজনক স্থানে আর একদণ্ডও সে থাকবে না। পকেটে একখানা পাথরের নুড়ি তখনও ছিল, ফেলে না দিয়ে গুহার বিপদের স্মারক স্বরূপ সেখানা সে কাছে রেখে দিলে।

পরদিন এলিফ্যান্ট ঘাস দেখা গেল বনের মধ্যে, সেদিনই সন্ধ্যার আগে অরণ্য শেষ হয়ে খোলা জায়গা দেখা দিল। রাত্রে শংকর অনেকক্ষণ বসে ম্যাপ দেখলে। সামনে যে মুক্ত প্রান্তরবৎ দেশ পড়ল, এখান থেকে এটা প্রায় তিনশো মাইল বিস্তৃত, একেবারে জাম্বেসি নদীর তীর পর্যন্ত। এই তিনশো মাইলের খানিকটা পড়েছে, বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে, প্রায় ১৭৫ মাইল, অতি ভীষণ, জনমানবহীন, জলহীন, পথহীন মরুভূমি। আলভারেজ মিলিটারি ম্যাপ থেকে নোট করেছে যে, এই অঞ্চলের উত্তরপূর্ব কোণ লক্ষ করে একটি বিশেষ পথ ধরে না গেলে মাঝামাঝি পার হতে যাওয়ার মানেই মৃত্যু। ম্যাপে এর নাম দিয়েচে 'তৃষ্ণারদেশ'! রোডেসিয়া পৌঁছোতে পারলে যাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে, কারণ সেসব স্থানে মানুষ আছে।

শংকর এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিলে। পথের এই ভয়ানক অবস্থা জেনেশুনেও সে দমে গেল না, হাত-পা হারা হয়ে পড়ল না। এই পথে আলভারেজ একা গিয়ে সলস্‌বেরি থেকে টোটা ও খাবার কিনে আনবে বলেছিল। বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ যা পারবে বলে স্থির করেছিল, সে তা থেকে পিছিয়ে যাবে?

কিন্তু সাহস ও নির্ভীকতা এক জিনিস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ম্যাপ দেখে গন্তব্যস্থানের দিক নির্ণয় করার ক্ষমতা শংকরের ছিল না। সে দেখলে ম্যাপের সে কিছুই বোঝে না। মিলিটারি ম্যাপগুলোতে দুটো মরুমধ্যস্থ কূপের জায়গায় ল্যাটিচিউড লংগিচিউড দেওয়া আছে, 'ম্যাগনেটিক নর্থ' আর 'ট্রু নর্থ' ঘটিত কী একটা গোলমেলে অঙ্ক কষে বার করত আলভারেজ, শংকর দেখেছে কিন্তু শিখে নেয়নি।

সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় কী? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই শংকর এই দুস্তর মরুভূমিতে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হল। ফলে, দু-দিন যেতে না যেতেই শংকর সম্পূর্ণ দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ম্যাপ দেখে যেকোনো অভিজ্ঞ লোক যে জলাশয় চোখ বুঁজে বার করতে পারত—শংকর তার তিন মাইল উত্তর দিয়ে চলে গেল, অথচ তখন তার জল ফুরিয়ে এসেছে, নতুন পানীয় জল সংগ্রহ করে না নিলে জীবন বিপন্ন হবে। প্রথমত শুধু প্রান্তর আর পাহাড়, ক্যাকটাস ও ইউফোর্বিয়ার বন, মাঝে মাঝে গ্র্যানিটের স্তূপ। তারপর কী ভীষণ কষ্টের সে পথচলা! খাবার নেই, জল নেই, পথ ঠিক নেই, মানুষের মুখ দেখা নেই। দিনের পর দিন শুধু সুদূর শূন্য, দিগ্বলয় লক্ষ করে সে হতাশ পথযাত্রা। মাথার উপর আগুনের মতো সূর্য, পায়ের নীচে বালিপাথর যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। সূর্য উঠছে—অস্ত যাচ্ছে, নক্ষত্র উঠছে,

চাঁদ উঠছে—আবার অস্ত যাচ্ছে। মরুভূমির গিরগিটি একঘেয়ে সুরে ডাকছে, ঝিঁঝি ডাকছে—সন্ধ্যায়, গভীর রাত্রে।

মাইল-লেখা পাথর নেই, কত মাইল অতিক্রম করা হল তার হিসেব নেই। খাদ্য দুই-একটা পাখি, কখনো বা মরুভূমির বাজার্ড শকুনি, যার মাংস জঠুর বিস্বাদ। এমনকী একদিন একটা পাহাড়ি বিষাক্ত কাঁকড়াবিছে, যার দংশনে মৃত্যু—তাও যেন পরম সুখাদ্য, মিললে মহা সৌভাগ্য।

দু-দিন ঘোর তৃষ্ণায় কষ্ট পাবার পরে পাহাড়ের ফাটলে একটা জলাশয় পাওয়া গেল। কিন্তু জলের চেহারা লাল, কতকগুলো কী পোকা ভাসছে জলে, ডাঙায় কী একটা জন্তু মরে পরে ঢোল হয়ে আছে। সেই জলই আকণ্ঠ পান করে শংকর প্রাণ বাঁচালে।

দিনের পর দিন কাটছে, মাস গেল, কী সপ্তাহ গেল, কী বছর গেল হিসেব নেই। শংকর শুকিয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে, কোথায় চলেছে তার কিছুই ঠিক নেই—শুধু সামনের দিকে যেতে হবে এই সে জানে। সামনের দিকেই ভারতবর্ষ—বাংলা দেশ।

তারপর পড়ল আসল মরু কালাহারি মরুভূমির এক অংশ। দূর থেকে তার চেহারা দেখে শংকর ভয়ে শিউরে উঠল। মানুষ কী করে পার হতে পারে এই অগ্নিদগ্ধ প্রান্তর! শুধুই বালির পাহাড়, আর তাম্রাভ কটা বালির সমুদ্র। ধু ধু করে যেন জ্বলছে দুপুরের রোদে। মরুভূমির কিনারে, প্রথম দিনের ছায়ায় ১২৭ ডিগ্রির উত্তাপ উঠল থার্মোমিটারে।

ম্যাপে বার বার লিখে দিয়েচে, উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে ছাড়া কেউ এই মরুভূমি মাঝামাঝি পার হতে যাবে না। গেলেই মৃত্যু, কারণ সেখানে জল একদম নেই। জল যে উত্তর-পূর্ব ধারে আছে তাও নয়, তবে ত্রিশ মাইল, সত্তর মাইল ও নব্বুই মাইল ব্যবধানে তিনটি স্বাভাবিক উনুই আছে—যাতে জল পাওয়া যায়। ওই উনুইগুলি প্রায়ই পাহাড়ের ফাটলে, খুঁজে বার করা বড়োই কঠিন। এইজন্যেই মিলিটারি ম্যাপে ওদের জায়গার অক্ষ ও দ্রাঘিমা দেওয়া আছে।

শংকর ভাবলে, ওসব বার করতে পারব না। সেক্সট্যান্ট্ আছে, নক্ষত্রের চার্ট আছে, কিন্তু তাদের ব্যবহার সে জানে না। যা হয় হবে, ভগবান ভরসা। তবে যতদূর সম্ভব উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে যাবার চেষ্টা সে করবে!

তৃতীয় দিনে নিতান্ত দৈববলে সে একটা উনুই দেখতে পেল! জল কাদাগোলা, আগুনের মতো গরম, কিন্তু তাই তখন অমৃতের মতো দুর্লভ। মরুভূমি ক্রমে ঘোরতর হয়ে উঠল। কোনো প্রকার জীবের বা উদ্ভিদের চিহ্ন ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। আগে রাত্রে আলো জ্বাললে দু-একটা কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে আসত, ক্রমে তাও আর আসে না।

দিনে উত্তাপ যেমন ভীষণ, রাত্রে তেমনি শীত। শেষ রাত্রে শীতে হাত-পা জমে যায় এমন অবস্থা, অথচ ক্রমশ আগুন জ্বালাবার উপায় গেল, কারণ জ্বালানি কাঠ আর একেবারেই নেই। কয়েকদিনের মধ্যে সঞ্চিত জলও গেল ফুরিয়ে। সেই সুবিস্তীর্ণ বালুকাসমুদ্রে, একটি পরিচিত বালুকণা খুঁজে বার করা যতদূর সম্ভব, তার চেয়েও অসম্ভব ক্ষুদ্র হাত-দুই পরিধির এক জলের উনুই বার করা।

সেদিন সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণার কষ্টে শংকর উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। এতক্ষণে শংকর বুঝেছে, এ ভীষণ মরুভূমি একা পার হওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সামিল। সে এমন জায়গায় এসে পড়েছে, সেখান থেকে ফিরবার উপায়ও নেই।

একটা উঁচু বালিয়াড়ির উপর উঠে সে দেখলে, চারধারে শুধুই কটা বালির পাহাড়, পূর্ব দিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমে সূর্য ডুবে গেলেও সারা আকাশ সূর্যাস্তের আভায় লাল। কিছু দূরে একটা ছোটো টিপির মতো পাহাড় এবং দূর থেকে মনে হল একটা গুহাও আছে। এধরনের গ্রানিটের ছোটো টিপি এদেশে সর্বত্র, ট্রান্সভাল ও রোডেশিয়ায় এদের নাম 'কোপর্যে' অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। রাত্রে শীতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে শংকর সেই গুহায় আশ্রয় নিলে।

এইখানে এক ব্যাপার ঘটল।

বারো

গুহার মধ্যে ঢুকে শংকর টর্চ জ্বেলে দেখলে (নতুন ব্যাটারি তার কাছে ডজন দুই ছিল) গুহাটা ছোটো, বেশ একটা ছোটোখাটো ঘরের মতো, মেঝেটাতে অসংখ্য ছোটো ছোটো পাথর ছড়ানো। গুহার এক কোণে চোখ পড়তেই শংকর অবাক হয়ে গেল। একটা ছোট্ট কাঠের পিপে। এখানে কী করে এল কাঠের পিপে?

দু-পা এগিয়েই সে চমকে উঠল।

গুহার দেওয়ালের ধার ঘেঁষে শায়িত অবস্থায় একটা সাদা নরকঙ্কাল, তার মুন্ডুটা দেওয়ালের দিকে

ফেরানো। কঙ্কালের আশেপাশে কালো কালো থলে ছেঁড়ার মতো জিনিস, বোধ হয় সেগুলো পশমের কোটের অংশ। দুখানা বুট জুতো কঙ্কালের পায়ে তখনও লাগানো। একপাশে একটা মরচে-পড়া বন্দুক।

পিপেটার পাশে একটা ছিপি-আঁটা বোতল। বোতলের মধ্যে একখানা কাগজ, ছিপিটা খুলে কাগজখানা বার করে দেখলে তাতে ইংরিজিতে কী লেখা আছে।

পিপেটাতে কী আছে দেখবার জন্যে যেমনি সে সেটা নাড়াতে গিয়েচে, অমনি পিপের নীচ থেকে একটা ফোঁসফোঁস শব্দ শুনে ওর শরীরের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু হয়ে ঠেলে উঠল। বোধ হয়, ছোবল মারবার আগে সাপটা এক সেকেন্ড দেরি করেছিল! সেই এক সেকেন্ড দেরি করার জন্যে শংকরের প্রাণ রক্ষা হল। পরমুহূর্তেই শংকরের ৪৫ অটোম্যাটিক কোল্ট গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অতবড়ো ভীষণ বিষধর স্যান্ড ভাইপারের মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে, রক্তমাংস খানিকটা পিপের গায়ে, খানিকটা পাথরের দেওয়ালে ছিটকে লাগল। আলভারেজ ওকে শিখিয়েছিল, পথে সর্বদা হাতিয়ার তৈরি রাখবে। এ উপদেশ কতবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

অদ্ভুত পরিত্রাণ! সব দিক থেকেই। পিপেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, সেটাতে অল্প একটু জল তখনও আছে। খুব কালো শিউ গোলার মতো রং বটে, তবুও জল। ছোটো পিপেটা উঁচু করে তুলে পিপের ছিপি খুলে ঢকঢক করে শংকর সেই দুর্গন্ধ কালো কালির মতো জল আকণ্ঠ পান করলে। তারপর সে টর্চের আলোতে সাপটা পরীক্ষা করলে। পুরো পাঁচ হাত লম্বা সাপটা, মোটাও বেশ। এ ধরনের সাপ মরুভূমির বালির মধ্যে শরীর লুকিয়ে শুধু মুন্ডুটা উপরে তুলে থাকে—অতি মারাত্মক রকমের বিষাক্ত সাপ।

এইবার বোতলের মধ্যের কাগজখানা খুলে মন দিয়ে পড়লে। যে ছোট্ট পেনসিল দিয়ে এটা লেখা হয়েছে—বোতলের মধ্যে সেটাও পাওয়া গেল। কাগজখানাতে লেখা আছে—

আমার মৃত্যু নিকট। আজই আমার শেষ রাত্রি। যদি আমার মরণের পরে, কেউ এই ভয়ংকর মরুভূমির পথে যেতে যেতে এই গুহায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন তবে সম্ভবত এই কাগজ তাঁর হাতে পড়বে।

আমার গাধাটা দিন দুই আগে মরুভূমির মধ্যে মারা গিয়েছে। এক পিপে জল তার পিঠে ছিল, সেটা আমি এই গুহার মধ্যে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছি, যদিও জ্বরে আমার শরীর অবসন্ন। মাথা তুলবার শক্তি নেই। তার উপর অনাহারে শরীর আগে থেকেই দুর্বল।

আমার বয়স ২৬ বছর। আমার নাম আত্তিলিও গাত্তি। ফ্লোরেন্সের গাত্তি বংশে আমার জন্ম। বিখ্যাত নাবিক রিওলিনো কাভালকান্তি গাত্তি—যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে তুর্কিদের সঙ্গে লড়েছিলেন, তিনি আমার একজন পূর্বপুরুষ।

রোম ও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভবঘুরে হয়ে গেলাম সমুদ্রের নেশায়—যা আমাদের বংশগত নেশা! ডাচ-ইন্ডিজ যাবার পথে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ ডুবি হল।

আমরা সাতজন লোক অতি কষ্টে ডাঙা পেলাম। ঘোর জঙ্গলময় অঞ্চল আফ্রিকার এই পশ্চিম উপকূল। জঙ্গলের মধ্যে শেকুজাতির এক গ্রামে আমরা আশ্রয় নিই এবং প্রায় দু-মাস সেখানে থাকি। এখানেই দৈবাৎ এক প্রকাণ্ড অদ্ভুত হিরের খনির গল্প শুনলাম। পূর্ব দিকে এক প্রকাণ্ড পার্বত্য ও ভীষণ আরণ্য অঞ্চলে নাকি এই হিরের খনি অবস্থিত।

আমরা সাতজন ঠিক করলাম এই হিরের খনি যে করে হোক, বার করতে হবেই। আমাকে ওরা দলের অধিনায়ক করলে। তারপর আমরা দুর্গম জঙ্গল ঠেলে চললাম সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পার্বত্য অঞ্চলে। সে গ্রামের কোনো লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হল না। তারা বলে, তারা কখনো সে জায়গায় যায়নি, কোথায় তা জানে না, বিশেষত এক উপদেবতা নাকি সে বনের রক্ষক। সেখান থেকে হিরে নিয়ে কেউ আসতে পারে না।

আমরা দমবার পাত্র নই। পথে যেতে যেতে ঘোর কষ্টে বেঘোরে দুজন সঙ্গী মারা গেল। বাকি চারজন আর অগ্রসর হতে চায় না। আমি দলের অধ্যক্ষ, গাত্তি বংশে আমার জন্ম, পিছু হটতে জানি না। যতক্ষণ প্রাণ আছে, এগিয়ে যেতে হবে এই জানি। আমি ফিরতে চাইলাম না।

শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। আজ রাতেই আসবে সে নিরবয়ব মৃত্যুদুত। বড়ো সুন্দর আমাদের ছোট্ট সেরিনো লাগ্রানো, ওরই তীরে আমার পৈতৃক প্রাসাদ, কস্টোলিরিওলিনি। এতদূরে থেকেও আমি সেরিনো লাগ্রানোর তীরবর্তী কমলালেবুর বাগানের লেবু ফুলের সুগন্ধ পাচ্ছি। ছোট্ট যে গির্জাটি পাহাড়ের নীচেই, তার রুপোর ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ পাচ্ছি।

না, এসব কী আবোল তাবোল লিখছি জ্বরের ঘোরে। আসল কথাটা বলি। কতক্ষণই বা আর লিখব?

আমরা সে পর্বতমালা, সে মহাদুর্গম অরণ্যে গিয়েছিলাম। সে খনি বার করেছিলাম। যে নদীর তীরে হিরে পাওয়া যায়, এক বিশাল ও অতি ভয়ানক গুহার মধ্যে সে নদীর উৎপত্তি স্থান। আমিও সেই গুহার মধ্যে ঢুকে এবং নদীর জলের তীরে ও জলের মধ্যে পাথরের নুড়ির মতো অজস্র হিরে ছড়ানো দেখতে পাই। প্রত্যেকটি নুড়ি টেট্রাহেড্রন ক্রিস্ট্যাল, স্বচ্ছ ও হরিদ্রাভ। লন্ডন ও আমস্টার্ডামের বাজারে এমন হিরে নেই।

এই অরণ্য ও পর্বতের সে উপদেবতাকে আমি এই গুহার মধ্যে দেখেচি—ধুনোর কাঠের মশালের আলোয়, দূর থেকে আবছায়া ভাবে। সত্যিই ভীষণ তার চেহারা! জ্বলন্ত মশাল হাতে ছিল বলেই সেদিন আমার কাছে সে ঘেঁষেনি। এই গুহাতেই সে সম্ভবত বাস করে। হিরের খনির সে রক্ষক, এই প্রবাদের সৃষ্টি সে জন্যেই বোধ হয়ে হয়েছে।

কিন্তু কী কুক্ষণেই হিরের সন্ধান পেয়েছিলাম এবং কী কুক্ষণেই সঙ্গীদের কাছে তা প্রকাশ করেছিলাম। ওদের নিয়ে আবার যখন সে গুহায় ঢুকি, হিরের খনি খুঁজে পেলাম না। একে ঘোর অন্ধকার, মশালের আলোয় সে অন্ধকার দূর হয় না, তার উপরে বহুমুখী নদী, কোন স্রোতটার ধারা হিরের রাশির উপর দিয়ে বইচে, কিছুতেই আর বার করতে পারলাম না।

আমার সঙ্গীরা বর্বর, জাহাজের খালাসি। ভাবলে, ওদের ফাঁকি দিলাম বুঝি। আমি একা নেব এই বুঝি আমার মতলব। ওরা কী ষড়যন্ত্র আঁটলে জানিনে, পরদিন সন্ধেবেলা চারজন মিলে অতর্কিতে ছুরি খুলে আমায় আক্রমণ করলে। কিন্তু তারা জানত না আমাকে, আন্তিলিও গাত্তিকে। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত বইচে আমার পূর্বপুরুষ রিওলিনি কাভালকান্তি গাত্তির, যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে ওরকম বহু বর্বরকে নরকে পাঠিয়েছিলেন। সান্টাকাটালিনার সামরিক বিদ্যালয়ে যখন আমি ছাত্র, আমাদের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ফেন্সার এন্টোনিও ড্রেফুসকে ছোরার ডুয়েলে জখম করি। আমার ছোরার আঘাতে ওরা দুজনে মারা গেল, দুজন সাংঘাতিক ঘায়েল হল, নিজেও আমি চোট পেলাম ওদের হাতে। আহত বদমাইস দুটোও সেই রাত্রে ভবলীলা শেষ করল। ভেবে দেখলাম এখন এই গুহার গোলকধাঁধার ভিতর থেকে খনি খুঁজে হয়তো বার করতে

পারব না। তা ছাড়া আমি সাংঘাতিক আহত, আমায় সভ্যজগতে পৌঁছোতেই হবে। পূর্ব দিকের পথে ডাচ উপনিবেশে পৌঁছোব বলে রওনা হয়েছিলুম। কিন্তু এপর্যন্ত এসে আর অগ্রসর হতে পারলুম না। ওরা তলপেটে ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিষিয়ে। সেই সঙ্গে জ্বর। মানুষের কী লোভ তাই ভাবি। কেন ওরা আমাকে মারলে? ওরা আমার সঙ্গী, একবারও তো ওদের ফাঁকি দেওয়ার কথা আমার মনে আসেনি!

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরক খনির মালিক আমি, কারণ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তা আমি আবিষ্কার করেছি। যিনি আমার এ লেখা পড়ে বুঝতে পারবেন, তিনি নিশ্চয়ই সভ্য মানুষ ও খ্রিস্টান। তাঁর প্রতি আমার অনুরোধ, আমাকে তিনি যেন খ্রিস্টানের উপযুক্ত কবর দেন। অনুগ্রহের বদলে ওই খনির স্বত্ব তাঁকে আমি দিলাম! রানি শেবার ধনভাণ্ডার এ খনির কাছে কিছু নয়!

প্রাণ গেল, যাক কী করব? কিন্তু কী ভয়ানক মরুভূমি এ! একটা ঝিঁঝি পোকার ডাক পর্যন্ত নেই কোনোদিকে! এমন সব জায়গাও থাকে পৃথিবীতে! আমার আজ কেবলই মনে হচ্ছে পপলার-ঘেরা সেরিনো লাগ্রানো হ্রদ আর দেখব না, তার ধারে যে চতুর্দশ শতাব্দীর গির্জাটা, তার সেই বড়ো রুপোর ঘণ্টার পবিত্র ধ্বনি, পাহাড়ের উপরে আমাদের যে প্রাচীন প্রাসাদ কাস্টোলি রিওলিনি, মুরদের দুর্গের মতো দেখায়, দূরে আমিব্রিয়ার সবুজ মাঠ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট ডোরা নদী বয়ে যাচ্ছে—যাক, আবার কী প্রলাপ বকছি।

গুহার দুয়ারে বসে আকাশের অগণিত তারা প্রাণ ভরে দেখছি। শেষবারের জন্যে। সাধু ফ্রাঙ্কোর সেই সৌর স্তোত্র মনে পড়চে—

স্তুত হোন প্রভু মোর, পবন সঞ্চার তরে, স্থির বায়ু তরে,
ভগিনি মেদিনী তবে, নীল মেঘ তরে, আকাশের তরে,
তারকা সমূহ তরে, সুদিন কুদিন তরে, দেহের মরণ তরে।

আরেকটা কথা। আমার দুই পায়ে জুতোর মধ্যে পাঁচখানা বড়ো হিরে লুকানো আছে। তোমায় তা দিলাম, হে অজানা পথিক বন্ধু। আমার শেষ অনুরোধটি ভুলো না। জননী মেরি তোমার মঙ্গল করুন।

—কম্যান্ডার আত্তিলিও গাত্তি

১৮৮০ সাল। সম্ভবত মার্চ মাস

হতভাগ্য যুবক!

তার মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ তিরিশ বছর কেটে গিয়েছে, এই তিরিশ বছরের মধ্যে এ পথে হয়তো কেউ যায়নি, গেলেও গুহাটার মধ্যে ঢোকেনি। এতকাল পরে তার চিঠিখানা মানুষের হাতে পড়ল।

আশ্চর্য যে, কাঠের পিপেটাতে তিরিশ বছর পরেও জল ছিল কী করে?

কিন্তু কাগজখানা পড়েই শংকরের মনে হল, এই লেখায় বর্ণিত ওইটেই সেই গুহা—সে নিজে যেখানে পথ হারিয়ে মারা যেতে বসেছিল! তারপর সে কৌতূহলের সঙ্গে কঙ্কালের পায়ের জুতো টান দিয়ে খসাতেই পাঁচখানা বড়ো বড়ো পাথর বেরিয়ে পড়ল। এ অবিকল সেই পাথরের নুড়ির মতো, যা এক পকেট কুড়িয়ে অন্ধকার গুহার মধ্যে সে পথ চিহ্ন করেছিল এবং যার একখানা তার কাছে রয়েছে। এ পাথরের নুড়ি তো সে রাশি রাশি দেখেছে গুহার মধ্যে সেই অন্ধকারময়ী নদীর জলস্রোতের নীচে, তার দুই তীরে! কে জানত যে হিরের খনি খুঁজতে সে ও আলভারেজ সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসে

ছ-মাস ধরে রিখটারসভেল্ড পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গিয়েছে—এমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সেখানে গিয়ে পড়বে! হিরে যে এমন রাশি রাশি পড়ে থাকে পাথরের নুড়ির মতো—তাই বা কে ভেবেছিল! আগে এসব জানা থাকলে, পাথরের নুড়ি সে দু-পকেট ভরে কুড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসত।

কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ হয়ে গিয়েছে যে, সে রত্নখনির গুহা যে কোথায়, কোন দিকে, তার কোনো নকশা করে আনেনি বা সেখানে কোনো চিহ্ন রেখে আসেনি, যাতে আবার সেটা খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। সেই সুবিস্তীর্ণ পর্বত ও অরণ্য অঞ্চলের কোন জায়গায় সেই গুহাটা দৈবাৎ সে দেখেছিল, তা কি তার ঠিক আছে, না ভবিষ্যতে সে আবার সে জায়গা বার করতে পারবে? এ যুবকও তো কোনো নকশা করেনি, কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছিল রত্নখনি আবিষ্কার করার পরেই, এর ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। হয়তো এ যা বার করতে পারত নকশা না দেখে— সে তা পারবে না।

হঠাৎ আলভারেজের মৃত্যুর পূর্বের কথা শংকরের মনে পড়ল। সে বলেছিল, চলো যাই, শংকর, গুহার মধ্যে রাজার ভাণ্ডার লুকানো আছে! তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি।

শংকর গুহার মধ্যেই সেই নরকঙ্কালটা সমাধিস্থ করলে। পিপেটা ভেঙে ফেলে তারই দুখানা কাঠে মরচে-পড়া পেরেক ঠুকে ক্রুশ তৈরি করলে ও সমাধির উপর সেই ক্রুশটা পুঁতলে। এছাড়া খ্রিস্ট ধর্মাচারীকে সমাধিস্থ করবার অন্য কোনো রীতি তার জানা নেই। তারপরে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, এই মৃত যুবকের আত্মার শান্তির জন্য!

এসব শেষ করতে সারাদিনটা কেটে গেল। রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন আবার সে রওনা হল। কঙ্কালের চিঠিখানা ও হিরেগুলি যত্ন করে সঙ্গে নিল।

তবে তার মনে হয়, এই অভিশপ্ত হিরের খনির সন্ধানে যে গিয়েছে, সে আর ফেরেনি। আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা মরেছে, জিম কার্টার মরেছে, আলভারেজ মরেছে। এর আগেই বা কত লোক মরেছে তার ঠিক কী? এইবার তার পালা। এই মরুভূমিতেই তার শেষ, এই বীর ইটালিয়ান যুবকের মতো।

তেরো

দুপুরের রোদে যখন দিকদিগন্তে আগুন জ্বলে উঠল, একটা ছোট্ট পাথরের ঢিপির আড়ালে শংকর আশ্রয় নিলে। ১৩৫ ডিগ্রি উত্তাপ উঠেছে তাপমান যন্ত্রে, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এ উত্তাপে পথ হাঁটা চলে না। যদি যেকোনোরকমে এ ভয়ানক মরুভূমির হাত এড়াতে পারত, তবে হয়তো জীবন্ত অবস্থায় মানুষের আবাসেও পৌঁছোতে পারত। সে ভয় করে শুধু এই মরুভূমি, সে জানে কালাহারি মরু বড়ো বড়ো সিংহের বিচরণভূমি! তার হাতে রাইফেল আছে—রাতদুপুরেও একা যত বড়ো সিংহই হোক, সম্মুখীন হতে সে ভয় করে না—কিন্তু ভয় হয় তৃষ্ণা রাক্ষসীকে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। দুপুরে সে দুবার মরীচিকা দেখলে। এতদিন মরুপথে আসতেও এ আশ্চর্য নৈসর্গিক দৃশ্য দেখেনি, বইয়েই পড়েছিল মরীচিকার কথা। একবার উত্তর-পূর্ব কোণে, একবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, দুই মরীচিকাই কিন্তু প্রায় একরকম—অর্থাৎ একটা বড়ো গম্বুজওয়ালা মসজিদ বা গির্জা, চারপাশে খেজুরকুঞ্জ, সামনে বিস্তৃত জলাশয়। উত্তর-পূর্ব কোণের মরীচিকাটা বেশ স্পষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে দূরদিগন্তে মেঘমালার মতো পর্বতমালা দেখা গেল। শংকর নিজের চোখকে বিশ্বাস

করতে পারল না। পূর্বদিকে একটাই মাত্র বড়ো পর্বত এখান থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব, দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রান্তবর্তী চিমানিমানি পর্বতমালা। তাহলে কী বুঝতে হবে যে, সে বিশাল কালাহারি পদব্রজে পার হয়ে প্রায় শেষ করতে চলেছে? না এও মরীচিকা?

কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত পথ চলেও জ্যোৎস্নারাত্রে সে দূর পর্বতের সীমারেখা তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেলে। অসংখ্য ধন্যবাদ হে ভগবান, মরীচিকা নয় তবে। জ্যোৎস্নারাত্রে কেউ কখনো মরীচিকা দেখেনি।

তবে কী প্রাণের আশা আছে? আজ পৃথিবীর বৃহত্তম রত্নখনির মালিক সে। নিজের পরিশ্রমে ও দুঃসাহসের বলে সে তার স্বত্ব অর্জন করেছে। দরিদ্র বাংলা মায়ের বুকে সে যদি আজ বেঁচে ফেরে!

দু-দিনের দিন বিকেলে সে এসে পর্বতের নীচে পৌঁছোল। তখন সে দেখলে, পর্বত পার হওয়া ছাড়া ওপারে যাওয়ার কোনো সহজ উপায় নেই। নইলে ২৫ মাইল মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পর্বতের দক্ষিণপ্রান্ত ঘুরে আসতে হবে। মরুভূমির মধ্যে সে আর কিছুতেই যেতে রাজি নয়। সে পাহাড় পার হয়েই যাবে।

এইখানে সে প্রকাণ্ড একটা ভুল করলে। সে ভুলে গেল যে সাড়ে-বারো হাজার ফুট একটা পর্বতমালা ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রিখটারসভেল্ড পার হওয়ার মতোই শক্ত। তার চেয়েও শক্ত, কারণ সেখানে আলভারেজ ছিল এখানে সে একা।

শংকর ব্যাপারের গুরুত্বটা তেমন বুঝতে পারলে না, ফলে চিমানিমানি পর্বত উত্তীর্ণ হতে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসল, ভীষণ প্রজ্বলন্ত কালাহারি পার হতে গিয়েও সে এমন ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়নি।

চিমানিমানি পর্বতে জঙ্গল খুব বেশি ঘন নয়। শংকর প্রথম দিন অনেকটা উঠল—তারপর একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে কোনো দিকে যাবার উপায় নেই। কোন পথটা দিয়ে উঠেছিল, সেটাও আর খুঁজে পেলে না—তার মনে হল, সে সমতলভূমির যে জায়গা দিয়ে উঠেছিল, তার ত্রিশ ডিগ্রি দক্ষিণে চলে এসেছে। কেন যে এমন হল, এর কারণ কিছুতেই সে বার করতে পারলে না। কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেল, কখনো উঠছে, কখনো নামছে, সূর্য দেখে দিক ঠিক করে নিচ্ছে, কিন্তু সাত-আট মাইল পাহাড় উত্তীর্ণ হতে এতদিন লাগছে কেন?

তৃতীয় দিনে আর একটা নতুন বিপদ ঘটল। তার আগের দিন একখানা আলগা পাথর গড়িয়ে তার পায়ে চোট লেগেছিল। তখন তত কিছু হয়নি, পরদিন সকালে আর সে শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাঁটু ফুলেছে, বেদনাও খুব! দুর্গম পথে নামা-ওঠা করা এ অবস্থায় অসম্ভব। পাহাড়ের একটা ঝরনা থেকে উঠবার সময় জল সংগ্রহ করে এনেছিল, তাই একটু-একটু করে খেয়ে চালাচ্ছে। পায়ের বেদনা কমে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। বেশি দূর যাওয়া চলবে না। সামান্য একটু-আধটু চলাফেরা করতেই হবে খাদ্য ও জলের চেষ্টায়। ভাগ্যে, পাহাড়ের এই স্থানটা যেন খানিকটা সমতলভূমির মতো, তাই রক্ষে!

এইসব অবস্থায়, এই মনুষ্যবাসহীন পাহাড়ে বিপদ তো পদে পদেই! একা এ পাহাড় টপকাতে গেলে যে কোনো ইয়োরোপীয় পর্যটকদেরও ঠিক এইরকম বিপদ ঘটতে পারত।

শংকর আর পারে না। ওর হৃৎপিণ্ডে কী একটা রোগ হয়েছে, একটু হাঁটলেই ধড়াস ধড়াস করে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরায় ধাক্কা মারে। অমানুষিক পথশ্রমে, দুর্ভাবনায়, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে, কখনো বা অনাহারের কষ্টে, ওর শরীরে কিছু নেই।

চার দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। খাদ্য নেই, গতকাল থেকে। রাইফেল সঙ্গে আছে, কিন্তু একটা বন্যজন্তুর দেখা নেই! দুপুরে একটা হরিণকে চরতে দেখে ভরসা হয়েছিল, কিন্তু রাইফেলটা তখন ছিল ৫০ গজ তফাতে একটা গাছে ঠেস দেওয়া, আনতে গিয়ে হরিণটা পালিয়ে গেল। জল খুব সামান্যই আছে চামড়ার বোতলে। এ অবস্থায় নেমে সে ঝরনা থেকে জল আনবেই বা কী করে? হাঁটুটা আরও ফুলেছে; বেদনা এত বেশি যে একটু চলাফেরা করলেই মাথার শির পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়ে যন্ত্রণায়।

পরিষ্কার আকাশের নীচে জলকণাশূন্য বায়ুমণ্ডলের গুণে অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিকচক্রবালে মেঘলা করে ঘিরেছে নীল পর্বতমালা দূরে দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্ত বিস্তীর্ণ কালাহারি। দক্ষিণে ওয়াহকুহক পর্বত, তারও অনেক পিছনে মেঘের মতো দেখা যায় পল ক্রুগার পর্বতমালা। সলস্‌বেরির দিকে কিছু দেখা যায় না, চিমানিমানি পর্বতের এক উচ্চতর শৃঙ্গ সেদিকে দৃষ্টি আটকেছে।

আজ দুপুর থেকে ওর মাথার উপর শকুনির দল উড়ছে। এতদিন এত বিপদেও শংকরের যা হয়নি, আজ শকুনির দল মাথার উপর উড়তে দেখে সত্যিই ওর ভয় হয়েছে। ওরা তাহলে কি বুঝেছে যে শিকার জুটবার বেশি দেরি নেই!

সন্ধ্যার কিছু পরে কী একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখলে, পাশেই এক শিলাখণ্ডের আড়ালে একটা ধূসর রঙের নেকড়ে বাঘ—নেকড়ের লম্বা ছুঁচালো কান দুটো খাড়া হয়ে আছে, সাদা সাদা দাঁতের উপর দিয়ে রাঙা জিভটা অনেকখানি বার হয়ে লকলক করচে! চোখে চোখ পড়তেই সেটা চট করে পাথরের আড়াল থেকে সরে দূরে পালাল।

নেকড়ে বাঘটাও তাহলে কি বুঝেছে! পশুরা নাকি আগে থেকে অনেক কথা জানতে পারে।

হাড়-ভাঙা শীত পড়ল রাত্রে। ও কিছু কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে। অগ্নিকুণ্ডের আলো যতটুকু পড়েছে তার বাইরে ঘন অন্ধকার।

কী একটা জন্তু এসে অগ্নিকুণ্ড থেকে কিছুদূরে অন্ধকারে দেহ মিশিয়ে চুপ করে বসল। কোয়োট, বন্যকুকুর জাতীয় জন্তু। ক্রমে আর একটা, আর দুটো, আর তিনটে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দশ-পনেরোটা এসে জমা হল। অন্ধকারে তার চারধার ঘিরে নিঃশব্দে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে যেন কীসের প্রতীক্ষা করছে।

কীসব অমঙ্গলজনক দৃশ্য!

ভয়ে ওর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। সত্যিই কি এতদিনে তারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে? সে-ও পারলে না রিখটারসভেল্ড থেকে হিরে নিয়ে পালিয়ে যেতে?

উঃ, আজ কত টাকার মালিক সে! হিরের খনি বাদ যাক, তার সঙ্গে যে ছখানা হিরে রয়েছে, তার দাম অন্তত দু-তিন লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই হবে। তার গরিব গ্রামে, গরিব বাপ-মায়ের বাড়ি যদি সে এই টাকা নিয়ে গিয়ে উঠতে পারত! কত গরিবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারত, গ্রামের কত দরিদ্র কুমারীকে বিবাহের যৌতুক দিয়ে ভালো পাত্রে বিবাহ দিত, কত সহায়হীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শেষ কটা দিন নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারত।

কিন্তু যা হবার নয় কী হবে সেসব ভেবে? তার চেয়ে এই অপূর্ব রাত্রির নক্ষত্রালোকিত আকাশের শোভা, এই বিশাল পর্বত ও মরুভূমির নিস্তব্ধ গম্ভীর রূপ, মৃত্যুর আগে সেও চোখ ভরে দেখতে চায়,

সেই ইটালিয়ান যুবক গাত্তির মতো। ওরা যে অদৃষ্টের তারে গাঁথা সবাই—আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা, জিম কার্টার, আলভারেজ, শংকর।

রাত গভীর হয়েছে। কী ভীষণ শীত! একবার সে চেয়ে দেখলে, কোয়োটগুলো এরই মধ্যে কখন আরও কাছে সরে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যে আলো পড়ে তাদের চোখগুলো জ্বলছে। শংকর একখানা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই ওরা সব দূরে সরে গেল, কিন্তু কী নিঃশব্দ ওদের গতিবিধি আর কী অসীম ওদের ধৈর্য। শংকরের মনে হল, এরা জানে শিকার ওদের হাতের মুঠোয়, হাতছাড়া হবার কোনো উপায় নেই।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাবেলার সেই ধূসর নেকড়ে বাঘটাও দু-দুবার এসে অন্ধকারে কোয়োটদের পিছনে বসে দেখে গিয়েছে।

একটুও ঘুমুতে ভরসা হল না ওর। কী জানি, কোয়োট আর নেকড়ের দল হয়তো তাহলে জীবন্তই তাকে ছিঁড়ে খাবে মৃত মনে করে। অবসন্ন, ক্লান্ত দেহে জেগেই বসে থাকতে হবে তাকে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসলেও উপায় নেই। মাঝে মাঝে কোয়োটগুলো এগিয়ে এসে বসে, ও জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই সরে যায়। দু-একটা হায়েনাও এসে ওদের দলে যোগ দিয়েছে, হায়েনাদের চোখগুলো অন্ধকারে কী ভীষণ জ্বলে!

কী ভয়ানক অবস্থাতে পড়েছে। জনবিরল বর্বর দেশের জনশূন্য পর্বতের সাড়ে-তিন হাজার ফুট উপরে সে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় বসে, গভীর রাত ঘোর অন্ধকার, সামান্য আগুন জ্বলছে। মাথার উপর জলকণাশূন্য স্তব্ধ বায়ুমণ্ডলের গুণে আকাশের অগণ্য তারা জ্বলজ্বল করছে যেন ইলেকট্রিক আলোর মতো, নীচে তার চারধার ঘিরে অন্ধকারে মাংসলোলুপ নীরব নেকড়ে কোয়োট হায়েনার দল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এটাও মনে হল, বাংলার পাড়াগাঁয়ে ম্যালোরিয়ায় ধুঁকে সে মরছে না। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু। পদব্রজে কালাহারি মরুভূমি পার হয়েছে সে...একা। মরে গিয়ে চিমানিমানি পর্বতের শিলায় নাম খুদে রেখে যাবে। সে একজন বিশিষ্ট ভ্রমণকারী ও আবিষ্কারক! এত বড়ো হিরের খনি সে-ই তো খুঁজে বার করেছে! আলভারেজ মারা যাওয়ার পরে সেই বিশাল অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের গোলকধাঁধা থেকে সে তো একাই বার হতে পেরে এত দূর এসেছে! এখন সে নিরুপায়, অসুস্থ, চলৎশক্তি রহিত। তবুও সে যুঝছে, ভয় তো পায়নি, সাহস তো হারায়নি। কাপুরুষ, ভীতু নয় সে। জীবন-মৃত্যু তো অদৃষ্টের খেলা। না বাঁচলে তার দোষ কী!

দীর্ঘ রাত্রি কেটে গিয়ে পুব দিক ফরসা হল। সঙ্গে সঙ্গে বন্যজন্তুর দল কোথায় পালাল। বেলা বাড়ছে, আবার নির্মম সূর্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে শুরু করছে দিক-বিদিক। সঙ্গে সঙ্গে শকুনির দল কোথা থেকে এসে হাজির। কেউ মাথার উপর ঘুরচে, কেউ বা দূরে দূরে গাছের ডালে কি পাথরের উপরে বসেছে, খুব ধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে। ওরা যেন বলছে, কোথায় যাবে বাছাধন? যে কদিন লাফালাফি করবে, করে নাও। আমরা বসি, এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই আমাদের।

শংকরের খিদে নেই। খাবার ইচ্ছেও নেই। তবুও সে গুলি করে একটা শকুনি মারলে। রোদ ভীষণ চড়েছে, আগুন-তাতা পাথরের গায়ে পা রাখা যায় না! এ পর্বতও মরুভূমির সামিল, খাদ্য এখানে মেলে না, জলও না। সে মরা শকুনিটা নিয়ে এসে আগুন জ্বেলে ঝলসাতে বসল। এর আগে মরুভূমির মধ্যেও সে শকুনির মাংস খেয়েছে। এরাই এখন প্রাণধারণের একমাত্র উপায়, আজ ও খাচ্ছে ওদের, কাল ওরা খাবে ওকে! শকুনিগুলো এসে আবার মাথার উপর জুটেছে।

তার নিজের ছায়া পড়েছে পাথরের গায়ে, সে নির্জন স্থানে শংকরের উদ্ভ্রান্ত মনে ছায়াটা যেন একজন

সঙ্গী মনে হল। বোধ হয়, ওর মাথা খারাপ হয়ে আসছে! কারণ বেঘোর অবস্থায়, ও কতবার নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগল, কতবার পরক্ষণের সচেতন মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে সামলে নিল।

সে পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? জ্বর হয়নি তো? তার মাথার মধ্যে ক্রমশ গোলমান হয়ে যাচ্ছে সব। আলভারেজ...হিরের খনি...পাহাড়, পাহাড়, বালির সমুদ্র...আত্তিলিও গাত্তি কাল রাত্রে ঘুম হয়নি...আবার রাত আসছে, সে একটু ঘুমিয়ে নেবে।

কীসের শব্দে ওরা তন্দ্রা ছুটে গেল। একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ আসছে কোনদিক থেকে? কোনো পরিচিত শব্দের মতো নয়। কীসের শব্দ? কোনদিক থেকে শব্দটা আসছে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু ক্রমশ কাছে আসছে সেটা।

হঠাৎ আকাশের দিকে শংকরের চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তার মাথার উপর দিয়ে আকাশের পথে বিকট শব্দ করে কী একটা জিনিস যাচ্ছে। ওই কি এরোপ্লেন? সে বইয়ে ছবি দেখেছে বটে।

এরোপ্লেন যখন ঠিক মাথার উপর এল, শংকর চিৎকার করলে, কাপড় ওড়ালে, গাছের ডাল ভেঙে নাড়ল, কিন্তু কিছুতেই পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না। দেখতে দেখতে এরোপ্লেনখানা সুদূর ভায়োলেট রঙের পল ক্রুগার পর্বতমালার মাথার উপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

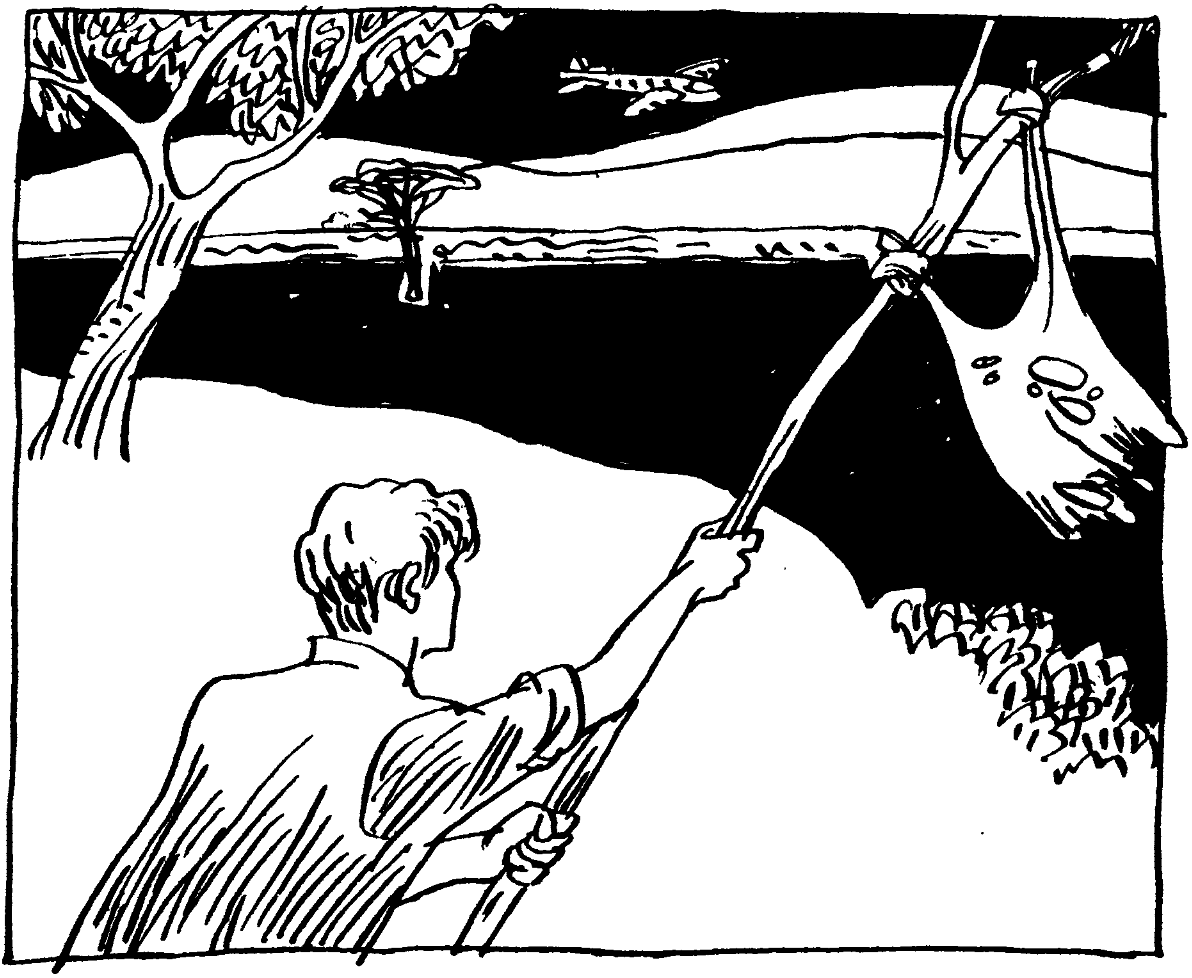

হয়তো আরও এরোপ্লেন যাবে এপথ দিয়ে। কী আশ্চর্য দেখতে এই এরোপ্লেন জিনিসটা। ভারতবর্ষে থাকতে সে একখানাও দেখেনি।

শংকর ভাবলে আগুন জ্বালিয়ে কাঁচা ডাল পাতা দিয়ে সে যথেষ্ট ধোঁয়া করবে। যদি আবার এপথে যায়, পাইলটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে ধোঁয়া দেখে। একটা সুবিধে হয়েছে, এরোপ্লেনের ওই বিকট আওয়াজে শকুনির দল কোনদিকে ভেগেছে যেন।

সেদিন কাটল। দিন কেটে রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে শংকরের দুর্ভোগ শুরু হল। আবার গত রাত্রির পুনরাবৃত্তি। সেই কোয়োটের দল আবার এল। আগুনের চারধারে তারা আবার তাকে ঘিরে বসল। নেকড়ে বাঘটা সন্ধ্যা না হতেই দূর থেকে একবার দেখে গেল। গভীর রাত্রে আরেকবার এল।

কীসে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়! আওয়াজ করতে ভরসা হয় না—টোটা মাত্র দুটি বাকি। টোটা ফুরিয়ে গেলে তাকে অনাহারে মরতে হবে। মরতে তো হবেই, তবে দু-দিন আগে আর পরে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

কিন্তু আওয়াজ তাকে করতেই হল। গভীর রাত্রে হায়েনাগুলো এসে কোয়োটদের সাহস বাড়িয়ে দিলে। তারা আরও সরে এগিয়ে এসে তাকে চারধার থেকে ঘিরলে। পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারলে আর ভয় পায় না।

একবার একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল—বসে বসেই ঢুলে পড়েছিল। পর মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে দেখলে, নেকড়ে বাঘটা অন্ধকার থেকে পা টিপেটিপে তার অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে। ওর ভয় হল, হয়তো ওটা ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভয়ের চোটে একবার গুলি ছুঁড়লে।

আরেকবার শেষ রাতের দিকে ঠিক এরকমই হল। কোয়োটগুলোর ধৈর্য অসীম, সেগুলো চুপ করে বসে থাকে মাত্র, কিছু বলে না। কিন্তু নেকড়ে বাঘটা ফাঁক খুঁজছে।

রাত ফরসা হবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নের মতো অন্তর্হিত হয়ে গেল কোয়োট, হায়েনা ও নেকড়ের দল সঙ্গে সঙ্গে শংকরও আগুনের ধারে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা কীসের শব্দে শংকরের ঘুম ভেঙে গেল।

খানিকটা আগে খুব বড়ো একটা আওয়াজ হয়েছে কোনো কিছুর। শংকরের কানে তার রেশ এখনও লেগে আছে।

কেউ কি বন্দুকের আওয়াজ করেছে? কিন্তু তা অসম্ভব, এই দুর্গম পর্বতের পথে কোন মানুষ আসবে?

একটি মাত্র টোটা অবশিষ্ট আছে। শংকর ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, সেটা খরচ করে একটা আওয়াজ করলে। যা থাকে কপালে, মরছেই তো। উত্তরে দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল।

আনন্দে ও উত্তেজনায় শংকর ভুলে গেল যে, তার পা খোঁড়া, ভুলে গেল যে একটানা বেশিদূর সে যেতে পারে না। তার আর টোটা নেই, সে আর বন্দুকের আওয়াজ করতে পারলে না কিন্তু প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল। গাছের ডাল ভেঙে নাড়তে লাগল, আগুন জ্বালাবার কাঠকুটোর সন্ধানে চারিদিকে আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল।

ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক জরিপ করবার দল, কিম্বার্লি থেকে কেপটাউন যাবার পথে, চিমানিমানি

পর্বতের কালাহারি মরুভূমির উত্তর-পূর্ব কোণে তাঁবু ফেলেছিল। সঙ্গে সাতখানা ডবল টায়ার ক্যাটারপিলার চাকা বসানো মোটর গাড়ি, এদের দলে নিগ্রো কুলি ও চাকরবাকর বাদে ন-জন ইয়োরোপীয়। জন চারেক হরিণ শিকার করতে উঠেছিল চিমানিমানি পর্বতের প্রথম ও নিম্নতম থাকটাতে।

হঠাৎ এ জনহীন অরণ্যপ্রদেশে সভ্য রাইফেলের আওয়াজ শুনে ওরা বিস্মিত হয়ে উঠল। কিন্তু পুনরায় ওদের আওয়াজের প্রত্যুত্তর না পেয়ে ইতস্তত খুঁজতে বেরিয়ে দেখতে পেলে, সামনে একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর চূড়ো থেকে, এক জীর্ণ ও কঙ্কালসার কোটরগতচক্ষু প্রেতমূর্তি উন্মাদের মতো হাত-পা নেড়ে তাদের কী বোঝাবার চেষ্টা করছে। তার পরনে ছিন্নভিন্ন অতি মলিন ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদ।

ওরা ছুটে গেল। শংকর আবোল-তাবোল কী বকলে, ওরা ভালো বুঝতে পারলে না। যত্ন করে ওকে নামিয়ে পাহাড়ের নীচে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ওর জিনিসপত্র নামিয়ে আনা হয়েছিল। ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু এই ধাক্কায় শংকরকে বেশ ভুগতে হল। ক্রমাগত অনাহারে, কষ্টে, উদ্বেগে, অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণের ফলে, তার শরীর খুব জখম হয়েছিল, সেই রাত্রেই তার বেজায় জ্বর এল।

জ্বরে সে অঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়ল, কখন যে মোটরগাড়ি ওখান থেকে ছাড়ল, কখন যে তারা সলস্‌বেরিতে পৌঁছোল, শংকরের কিছুই খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় পনেরো দিন সে সলস্‌বেরির হাসপাতালে কাটিয়ে দিলে। তারপর ক্রমশ সুস্থ হয়ে, মাসখানেক পরে একদিন সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরের রাজপথে এসে দাঁড়াল।

চোদ্দো

সলস্‌বেরি! কত দিনের স্বপ্ন!

আজ সে সত্যিই বড়ো একটা ইয়োরোপীয় ধরনের শহরের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। বড়ো বড়ো বাড়ি, ব্যাঙ্ক, হোটেল, দোকান, পিচঢালা চওড়া রাস্তা, একপাশ দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রাম চলচে, জুলু রিকশাওয়ালা রিকশা টানছে, কাগজওয়ালা কাগজ বিক্রি করছে। সবই যেন নতুন, যেন এসব দৃশ্য জীবনে কখনোই সে দেখেনি।

লোকালয়ে তো এসেছে, কিন্তু একেবারে কপর্দকশূন্য। এক পেয়ালা চা খাবার পয়সাও তার নেই। কাছে একটা ভারতীয় দোকান দেখে তার বড়ো আনন্দ হল। কতদিন যেন দেখেনি স্বদেশবাসীর মুখ! দোকানদার মেমন মুসলমান, সাবান ও গন্ধদ্রব্যের পাইকারি বিক্রেতা। খুব বড়ো দোকান। শংকরকে দেখেই সে বুঝলে এ দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত। নিজে দু-টাকা সাহায্য করলে ও একজন বড়ো ভারতীয় সওদাগরের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলে।

টাকা দুটি পকেটে নিয়ে শংকর আবার পথে এসে দাঁড়াল। আসবার সময় বলে এল—অসীম ধন্যবাদ টাকা দুটির জন্যে। এ আমি আপনার কাছে ধার নিলাম, আমার হাতে পয়সা এলে আপনাকে কিন্তু এ টাকা নিতে হবে। সামনেই একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁ। সে ভালো কিছু খাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে

না, কতদিন সভ্যখাদ্য মুখে দেয়নি! সেখানে ঢুকে এক টাকার পুরি, কচুরি, হালুয়া, মাংসের চপ, কেক পেট ভরে খেলে। সেই সঙ্গে দু-তিন পেয়ালা কফি।

চায়ের টেবিলে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের দিকে তার নজর পড়ল! তাতে এক জায়গায় হেড লাইনে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে—

ন্যাশনাল পার্ক জরিপ দলের বিচিত্র অভিজ্ঞতা
মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় শ্রান্ত এক ভারতীয় আবিষ্কার
তার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনি

শংকর দেখলে, তার একটা ফটোও ছাপা হয়েছে কাগজে। তার মুখে সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা গল্পও দেওয়া হয়েছে। এরকম গল্প সে কারো কাছে করেনি।

খবরের কাগজখানার নাম সলস্‌বেরি ডেলি ক্রনিকল। সে খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে। তার চারপাশে ভিড় জমে গেল। ওকে খুঁজে বার করবার জন্যে রিপোর্টারের দল অনেক চেষ্টা করেছিল জানা গেল। সেখানে চিমানিমানি পর্বতে পা ভেঙে পড়ে থাকার গল্প বলে ও ফটো তুলতে দিয়ে শংকর পঞ্চাশ টাকা পেলে। তা থেকে সে আগে সেই সহৃদয় মুসলমান দোকানদারের টাকা দুটি দিয়ে এল।

আগ্নেয়গিরিটার সম্বন্ধে সে কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখলে। তাতে আগ্নেয়গিরিটার নামকরণ করলে মাউন্ট আলভারেজ। তবে মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যে লুকানো এত বড়ো একটা আস্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির এই গল্প—কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে না। অবিশ্যি রত্নের গুহার বাষ্পও সে কাউকে জানতে দেয়নি। দিলে দলে দলে লোক ছুটবে ওর সন্ধানে।

তারপরে একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে এক রাশ ইংরেজি বই ও মাসিক পত্রিকা কিনলে। বই পড়েনি কতকাল! সন্ধ্যায় একটা সিনেমায় ছবি দেখলে। কতকাল পরে, রাত্রে হোটেলের ভালো বিছানায় ইলেকট্রিক আলোর তলায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে সে মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে নীচের প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর স্ট্রিটের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ট্রাম যাচ্ছে নীচ দিয়ে, রিকশা যাচ্ছে, ভারতীয় কফিখানায় ঠুনঠুন করে ঘণ্টা বাজছে, মাঝে মাঝে দু-চারখানা মোটরও যাচ্ছে। এর সঙ্গে মনে হল আরেকটা ছবি—সামনে আগুনের কুণ্ড, কিছুদূরে বৃত্তাকারে ঘিরে বসে আছে কোয়োট ও হায়েনার দল। ওদের পিছনে নেকড়েটার দুটো গোল গোল চোখ আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে অন্ধকারের মধ্যে।

কোনটা স্বপ্ন? চিমানিমানি পর্বতে যাপিত সেই ভয়ংকর রাত্রি, না আজকের এই রাত্রি?

ইতিমধ্যে সলস্‌বেরিতে শংকর একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠেছে।

রিপোর্টারের ভিড়ে তার হোটেলের হল সবসময়ে ভরতি। খবরের কাগজের লোক আসে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাপবার কন্‌ট্রাক্ট করতে, কেউ আসে ফটো নিতে।

আত্তিলিও গাত্তির কথা সে ইটালিয়ান কনসাল জেনারেলকে জানাল। তাঁর অফিসের পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে জানা গেল আত্তিলিও গাত্তি নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইটালিয়ান যুবক ১৮৭৯ সালের আগস্ট

মাসে পর্তুগিজ পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ ডুবি হবার পর নামে। তারপর যুবকটির আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি। তার আত্মীয়স্বজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক। ১৮৯০-৯৫ সাল পর্যন্ত তারা তাদের নিবুদ্দিষ্ট আত্মীয়ের সন্ধানের জন্যে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকার কনসুলেট অফিসকে জ্বালিয়ে খেয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করাও হয়েছিল তার সন্ধানের জন্য। ১৮৯৫ সাল থেকে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

পূর্বোক্ত মুসলমান দোকানদারটির সাহায্যে সে ব্ল্যাকমুন স্ট্রিটের বড়ো জহুরি রাইডাল ও মরস্‌বির দোকানে চারখানা পাথর সাড়ে বত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি করলে। বাকি দুখানার দর আরও বেশি উঠেছিল, কিন্তু শংকর সে দুখানা পাথর তার মাকে দেখাবার জন্যে দেশে নিয়ে যেতে চায়। এখন বিক্রি করবার তার ইচ্ছে নেই।

নীল সমুদ্র।

বম্বেগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পর্তুগিজ পূর্ব-আফ্রিকার বেইরা বন্দরের নারিকেল বনশ্যাম তীরভূমিকে মিলিয়ে যেতে দেখতে দেখতে শংকর ভাবছিল তার জীবনের এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা। এই তো জীবন, এইভাবেই তো জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল সে। মানুষের আয়ু মানুষের জীবনের ভুল মাপকাঠি। দশ বছরের জীবন উপভোগ করেছে সে এই দেড় বছরে। আজ সে শুধু একজন ভবঘুরে পথিক নয়, একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সহ-আবিষ্কারক। মাউন্ট আলভারেজকে সে জগতে প্রসিদ্ধ করবে। দূরে ভারত মহাসমুদ্রের পারে জননী জন্মভূমি পূণ্যভূমি ভারতবর্ষের জন্য এখন মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মন উৎসুক হয়ে আছে, কবে দূর থেকে বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চুড়ো মাতৃভূমির উপকূলের সান্নিধ্য ঘোষণা করবে। তারপর, বাউল কীর্তনগান মুখরিত বাংলাদেশের প্রান্তে তাদের শ্যামল গ্রামটি, সামনে আসছে বসন্তকাল, পল্লিপথে যখন একদিন সজনে ফুলের দল পথ বিছিয়ে পড়ে থাকবে, বউ-কথা-কও ডাকবে ওদের বকুল গাছটায়, নদীর ঘাটে লাগবে গিয়ে ওর ডিঙি।

বিদায়, আলভারেজ বন্ধু! স্বদেশ ফিরে যাওয়ার এই আনন্দের মুহূর্তে তোমার কথাই মনে হচ্ছে আজ। তুমি সেই দলের মানুষ, সারা আকাশ যাদের ঘরের ছাদ, সারা পৃথিবী যাদের পায়ে চলার পথ। আশীর্বাদ কোরো তোমার মহারণ্যের নির্জন সমাধি থেকে, যেন তোমার মতো হতে পারি জীবনে, অমনি সুখ-দুঃখে নিস্পৃহ, অমনি নির্ভীক।

বিদায়, বন্ধু আত্তিলিও গাত্তি! অনেক জন্মের বন্ধু ছিলে তুমি।

তোমরা সবাই মিলে শিখিয়েছ চীন দেশের সেই প্রাচীন ছড়াটি কত সত্য—

ছাদের আলসের চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফটিক পাথর হয়ে ভেঙে যাওয়া অনেক ভালো, অনেক ভালো, অনেক ভালো।

আবার তাকে আফ্রিকায় ফিরতে হবে। এখন জন্মভূমির টান বড়ো টান। এখন জন্মভূমির কোলে সে কিছুদিন কাটাবে। তারপর দেখবে সে কোম্পানি গঠন করবার চেষ্টা করবে—আবার সুদূর রিখটারসভেল্ড পর্বতে ফিরবে রত্নখনির অনুসন্ধানে—খুঁজে সে বার করবেই!

পরিশিষ্ট

সলস্‌বেরি থাকতে শংকর সাউথ রোডেসিয়ান মিউজিয়ামের কিউরেটর প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ ডক্টর ফিটজেরাল্ডের সঙ্গে দেখা করেছিল, বিশেষ করে বুনিপের কথাটা তাঁকে বলবার জন্যে। দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পরে ডক্টর ফিটজেরাল্ডের কাছ থেকে নিম্নলিখিত পত্রখানা সে পায়:

THE SOUTH RHODESIAN MUSEUM
Salisbury, Rhodesia, South Africa

January 12, 1911

Dear Mr. Chowdhury,

I am writing this letter to fulfil my promise to you to let you know what I thought about your report of a strange three toed monster in the wilds of the Richtersveld Mountains. On looking up my files I find other similar accounts by explorers who had been to the region before you, specially by Sir Robert Mc Culloch the famous naturalist, whose report has not yet been published, owing to his sudden and untimely death last year. On thinking the matter over, I am inclined to believe that the monster you saw was nothing more than a species of anthropoid ape, closely related to the gorilla, but much bigger in size and more savage than the specimens found in the Ruwenzori and Virunga Mountains. This species is becoming rarer and rarer every day, and such numbers as do exist are not easily to be got at on account of their shyness and the habit of hiding themselves in the depths of the high-altitude rain forest of the Richtersveld. It is only the very fortunate traveller who gets glimpses of them, and I should think that in meeting them he runs risks proportionate to his good luck.

Congratulating you on both your luck and pluck.

I remain, Yours sincerely
(Sd) J.G. FITZGERALD

হিরা মানিক জ্বলে

ছোট্ট গ্রাম সুন্দরপুর।

একটি নদীও আছে গ্রামের উত্তর প্রান্তে। মহকুমা থেকে বারো মাইল, রেল স্টেশন থেকেও সাত-আট মাইল।

গ্রামের মুস্তফি বংশ একসময়ে সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন, এখন তাঁদের অবস্থা আগের মতো না থাকলেও আশেপাশের অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে তাঁরাই এখনও পর্যন্ত বড়োলোক বলে গণ্য, যদিও ভাঙা পুজোর দালানে আগের মতো জাঁকজমকে এখন আর পুজো হয় না—প্রকাণ্ড বাড়ির যে মহলগুলোর ছাদ খসে পড়েছে গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে, সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না, বাড়ির মেয়েদের বিবাহ দিতে হয় কেরানি পাত্রদের সঙ্গে—অর্থের এতই অভাব।

সুশীল এই বংশের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে বাড়ি বসে আছে—বড়ো বংশের ছেলে, তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনো চাকুরি করেননি, সুতরাং বাড়ি বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করুক, এই ছিল বাড়ির সকলেরই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়।

সুশীল তাই করেই আসছে অবিশ্যি।

সুন্দরপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস খুব বেশি নেই— আগে অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাস ছিল, তাদের সবাই এখন বিদেশে চাকুরি করে—বড়ো বড়ো বাড়ি জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

মুস্তফিদের প্রকাণ্ড ভদ্রাসনের দক্ষিণে ও পূর্বে তাঁদের দৌহিত্র রায় বংশ বাস করে। পূর্বে যখন মুস্তফিদের সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল তখন বিদেশ থেকে কুলগৌরবসম্পন্ন রায়দের আনিয়ে কন্যাদান করে জমি দিয়ে এখানেই বাস করিয়েছিলেন এঁরা।

কালের বিপর্যয় সেই রায় বংশের ছেলেরা এখন সুশিক্ষিত ও প্রায় সকলেই বিদেশে ভালো চাকুরি করে। নগদ টাকার মুখ দেখতে পায়—বাড়ি কেউ বড়ো একটা আসে না—যখন আসে তখন খুব বড়ো-মানুষি চাল দেখিয়ে যায়। পদে পদে মাতুল বংশের ওপর টেক্কা দিয়ে চলাই যেন তাদের দু-একমাস স্থায়ী পল্লীবাসের সর্বপ্রধান লক্ষ্য।

আশ্বিন মাস। পুজোর বেশিদিন দেরি নেই।

অঘোর রায়ের বড়ো ছেলে অবনী সস্ত্রীক বাড়ি এসেছে। শোনা যাচ্ছে দুর্গোৎসব না করলেও অবনী এবার ধুমধামে নাকি কালীপুজো করবে। অবনী সরকারি দপ্তরে ভালো চাকুরি করে। অবনীর বাবা অঘোর রায় ছেলের কাছেই বিদেশে থাকেন। তিনি এসময় বাড়ি আসেননি, তাঁর মেজো ছেলে অখিলের সঙ্গে পুরী গিয়েছেন। অখিল যেন কোথাকার সাব ডেপুটি—পনেরো দিন ছুটি নিয়ে স্ত্রী-পুত্র ও বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছে।

সুশীল অবনীদের বৈঠকখানায় বসে এদের চালবাজির কথা শুনছিল অনেকক্ষণ থেকে।

অবনী বললে, মামা, তোমাদের বড়ো শতরঞ্জি আছে?

—একখানা দালানজোড়া শতরঞ্জি তো ছিল জানি—কিন্তু সেটা ছিঁড়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়।

—ছেঁড়া শতরঞ্জি আমার চলবে না। তাহলে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ভালো একখানি বড়ো শতরঞ্জি কিনে আনি, বন্ধুবান্ধব পাঁচজনে আসবে, তাদের সামনে বার করার উপযুক্ত হওয়া চাই তো! বড়ো আলো আছে?

—বাতির ঝাড় ছিল, এক-এক থাকে কাচ খুলে গিয়েছে—তাতে চলে তো নিয়ো।

—তোমাদের তাতেই কাজ চলে?

—কেন চলবে না? দেখায় খুব ভালো। তা ছাড়া দুর্গোৎসবের কাজ দিনমানেই বেশি—রাত্রে আরতি হয়ে গেলেই আলোর কাজ তো মিটে গেল।

—আমার ডে-লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। কালীপুজোর রাতের আলোর ব্যবস্থা একটু ভালোরকম থাকা দরকার। ইলেকট্রিক আলোয় বারো মাস বাস করা অভ্যেস, সত্যি পাড়াগেঁয়ে এসে এমন অসুবিধে হয়!

বৃদ্ধ সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলি তাঁর ছোটো ছেলের একটা চাকুরির জন্যে অবনীর কাছে কদিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটু—অবিশ্যি খুব সামান্যই একটু—ভরসা পেয়েছিলেন, তিনি অমনি বলে উঠলেন—তা অসুবিধে হবে না? বলি তোমরা বাবাজি কীরকম জায়গায় থাকো, কী ধরনে থাকো—তা আমার জানা আছে তো। গঙ্গাচানের যোগে কলকাতা গেলেই তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠি, আর সে কী যত্ন! ওঃ ইলেক্‌টিরি আলো না হলে কি বাবাজি তোমাদের চলে?

সুশীল কলকাতায় দু-একবারমাত্র গিয়েছে—আধুনিক সভ্যতার যুগের নতুন জিনিসই তার অপরিচিত—শিক্ষিত ও শহুরে বাবু অবনীর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা বলতে হয়।

তবুও সে বললে, ডে-লাইটের চেয়ে কিন্তু ঝাড়লণ্ঠন দেখায় ভালো—

অবনী হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কী!

—ওহে যে যুগে জমিদারপুত্রেরা নিষ্কর্মা বসে থাকত আর হাতিতে চড়ে জরদগবের মতো ঘুরে বেড়াত—ওসব চাল ছিল সেকালের। মর্ডান যুগে ওসব অচল, বুঝলে মামা? এ হল প্রগতির যুগ—হাতির বদলে এসেছে ইলেকট্রিক লাইট—সেকালকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে?

বনেদি পুরোনো আমলের চালচলনে আবাল্য অভ্যস্ত সুশীল। বয়সে যুবক হলেও প্রাচীনের ভক্ত।

সে বললে, কেন, হাতি চড়াটা কি খারাপ দেখলে?

—রামোঃ? জবড়জং ব্যাপার! হাতির মতো মোটা জানোয়ারের ওপর বসে থাকা পেটমোটা নাদুস নুদুস—

সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলি বললেন, গোবর—গণেশ—

—জমিদারছেলেরই শোভা পায়, কিন্তু কাজে যারা ব্যস্ত, সময় যাদের হাতে কম, দিনে যাদের ত্রিশ মাইল চক্কর দিয়ে বেড়াতে হয় নিজের কাজে বা আপিসের কাজে—তাদের পক্ষে দরকার মোটরবাইক বা মোটরকার। স্মার্ট যারা—তাদের উপযুক্ত যানই হচ্ছে—

সুশীল প্রতিবাদ করে বললে, স্মার্ট কারা জানিনে; মোগল বাদশাহের সময় আকবর আওরঙ্গজেবের মতো বীর হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত—তারা স্মার্ট হল না—হল তোমাদের কলকাতার আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা চশমা-চোখে ছোকরাবাবুর দল, যারা বাপের পয়সায় গড়ের মাঠে হাওয়া খায়—কিংবা শখে পড়ে দু-দশ কদম মোটর ড্রাইভ করে, তারা? অত বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, তারা হাতি

চড়ে যুদ্ধ করত, পুরুরাজ হাতির পিঠে চড়ে আলেকজান্ডারের গ্রিক বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল—তারা স্মার্ট ছিল না, স্মার্ট হল সিনেমার ছোকরা অ্যাক্টরের দল?

সুশীল সেখান থেকে উঠে চলে এল। অবনীর ধরন-ধারণ তার ভালো লাগেনি—দূর সম্পর্কের মামা-ভাগনে কোনোকালের দৌহিত্র বংশের লোক, এই পর্যন্ত। এখন তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কী যোগ আছে?—কিছুই না। জমিদারের ছেলেদের ওপর অবনীর এ কটাক্ষ. সুশীলের মনে হল তাকে লক্ষ করেই করা হয়েছে।

তা করতে পারে—এরা এখন সব হঠাৎ-বড়োলোকের দল, পুরোনো বংশের ওপর এদের রাগ থাকা অসম্ভব নয়।

সুশীল জমিদারপুত্র বটে, নিষ্কর্মাও বটে। বসে খেতে খেতে দিনকতক পরে পেটমোটা হয়েও উঠবে—এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ। অবনী তাকে লক্ষ করেই বলেছে নিশ্চয়ই।

বাড়ি এসে সুশীল জ্যাঠামশায়কে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা জ্যাঠামণি, আমাদের বংশে কখনো কেউ চাকরি করেছে?

জ্যাঠামশায় তারাকান্ত মুস্তফির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তিনি পুজোর দালানের সঙ্গে ছোটো

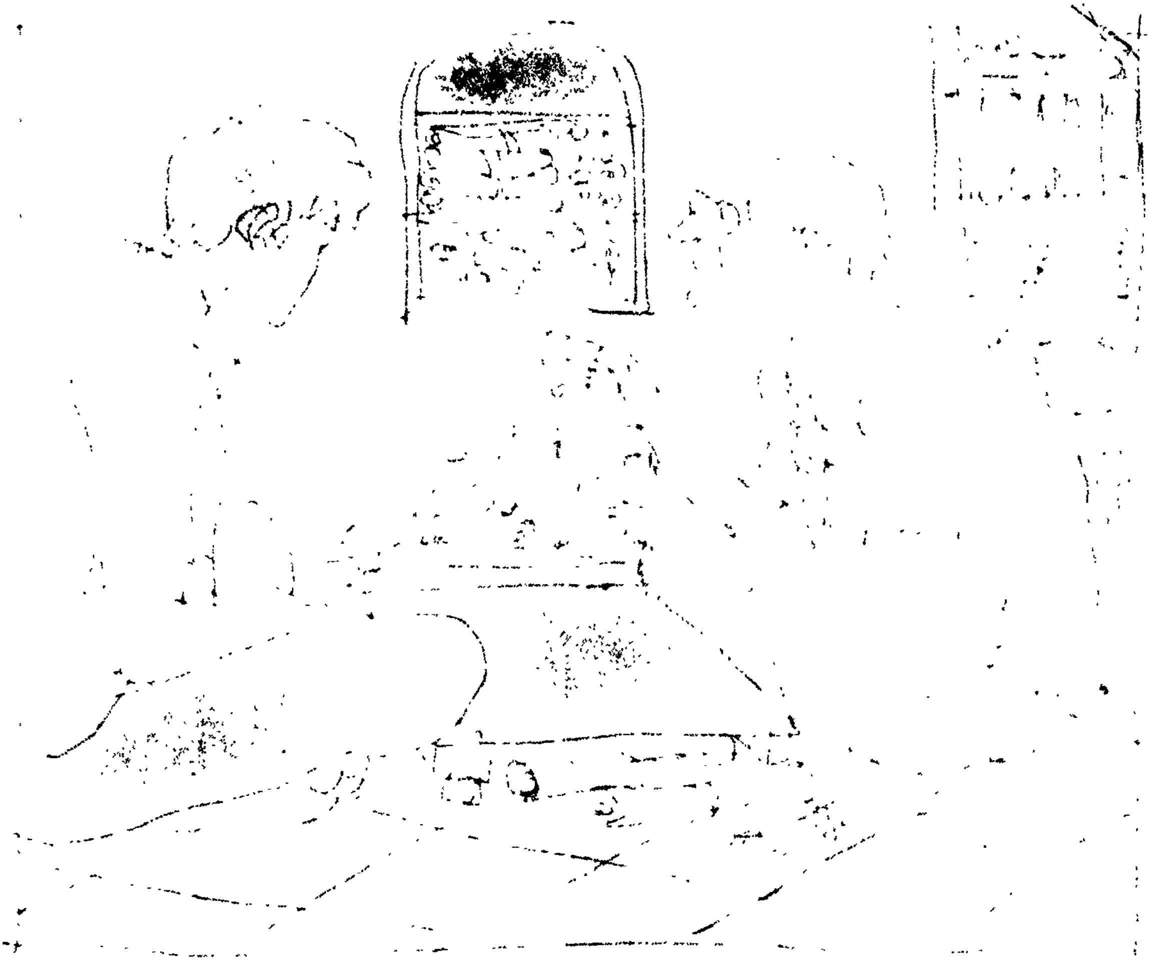

কুঠরিতে সারাদিন বৈষয়িক কাগজপত্র দেখেন এবং মাঝে মাঝে গীতা পাঠ করেন। ঘরটার কুলুঙ্গিতে ও দেওয়ালের গায়ের তাকে গত পঞ্চাশ বছরের পুরোনো পাঁজি সাজানো। তারাকান্ত বললেন, কেন বাবা সুশীল? এ বংশে কারো কোনো ভাবনা ছিল যে চাকুরি করবে?

—ছেলেরা কী করত জ্যাঠামণি?

—পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেয়ে আমাদের পুরুষানুক্রমে চলে আসছে—তবে আজকাল বড়ো খারাপ সময় পড়েছে, জমিজমাও অনেক বেরিয়ে গেল—তা যা-হয় একটু কষ্ট যাচ্ছে। কী আবার করবে কে? ওতে আমাদের মান যায়।

সুশীল কথাটা ভেবে দেখলে অবসর সময়ে। অবনীর কথাগুলো হিংসেতে ভরা ছিল এখন দেখা যাচ্ছে। অবনীদের বাইরে বেরিয়ে চাকুরি না করলে চলে না—আর তাদের চিরকাল চলে আসছে বাড়ি বসে—এতে অবনীর হিংসের কথা বই কী।

মামার বাড়ি খেয়ে চিরকাল ওরা মানুষ। আজ হঠাৎ বড়োলোক হয়ে চাল দেওয়া কথাবার্তায় সেই মাতুল বংশকেই ছোটো করতে চায়।

সুশীল এর প্রমাণ অন্য একদিক থেকে খুব শিগগিরই পেলে। মুস্তফিদের সাবেকি পুজোর মণ্ডপে দুর্গোৎসব টিমটিম করে সমাধা হল—লোকের পাতে ছেঁচড়া, কলাইয়ের ডাল, খেতের রাঙা নাগরা চালের ভাত, পুকুরের মাছ, জোলো দুধোলো দই ও চিনির ডেলা গোলা মন্ডা খাইয়ে—কিন্তু অবনীদের বাড়ি যে কালীপুজো হল—সে একটা দেখবার জিনিস।

কালীপুজোর রাত্রে গাঁসুদ্ধ পোলাও মাংস, কলকাতা থেকে আনা দই রাবড়ি সন্দেশ খেলে। টিন টিন দামি সিগারেট নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিলি হল। পরদিন দুপুরে যাত্রা ও ভাসানের রাত্রে প্রীতি সম্মেলনে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। অবনীর এক বন্ধু আবার ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড দেখিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতাও করলে। গ্রামের লোক সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। এ গাঁয়ে এমনটি আর কখনো হয়নি—কেউ দেখেনি! সকলের মুখে অবনীর সুখ্যাতি।

কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না, যদি তারা সেইসঙ্গে অমনি মুস্তফি জমিদারদের ছোটো করে না দিত।

—নাঃ, মুস্তফিরা কখনো এদের সঙ্গে দাঁড়ায়? বলে—কীসে আর কীসে!

—যা বলেছ ভায়া! নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না—

—শুধু লম্বা লম্বা কথা আছে—আর কিছু নেই রে ভাই।

এধরনের একটা কথা একদিন সুশীলের নিজের কানেই গেল। নিজেদের পুকুরের ঘাটে বসে সুশীল ছিপে মাছ ধরছে, গাঁয়ের ওর পরিচিত দুটি ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে পথ দিয়ে যাচ্ছেন। একজন বললেন, মুস্তফিদের ওপর এবার খুব একহাত নিয়েছে অবনী। অপরজন বললে, তার মানে মুস্তফিদের আর কিছু নেই। সব ছেলেগুলো বাড়ি বসে বসে খাবে, আজকালকার দিনে কি আর সেকেলে বনেদি চাল চলে? লেখাপড়া তো একটা ছেলেও ভালো করে শিখলে না—

—লেখাপড়া শিখেও তো ওই সুশীলটা বাপের হোটেলে দিব্যি বসে খাচ্ছে—ওদের কখনো কিছু হবে না বলে দিলাম। যত সব আলসে আর কুঁড়ে।

কথাটা সুশীলের মনে লাগল। এদিক থেকে সে কোনোদিন নিজেকে বিচার করে দেখেনি। চিরকাল তো এইরকম হয়ে আসছে তাদের বংশে, এতদিন কেউ কিছু বলেনি, আজকাল বলে কেন তবে?

পাশের গ্রামে সুশীলের এক বন্ধু থাকত, সুশীল তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। ছেলেটির নাম প্রমথ, তার বাবা একসময়ে মুস্তফিদের স্টেটের নায়েব ছিলেন, কিন্তু তারপর চাকুরি ছেড়ে মাল-চালানি ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন।

প্রমথ বেশ বুদ্ধিমান ও বলিষ্ঠ যুবক। সে নিজের চেষ্টায় গ্রামে একটা নৈশ স্কুল করেছে, একটা দরিদ্র-ভাণ্ডার খুলেছে—তার পেছনে গ্রামের তরুণদের যে দলটি গড়ে উঠেছে—গ্রামের মঙ্গলের জন্যে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই। সম্প্রতি প্রমথ বাবার আড়তে বেরুতে আরম্ভ করেছে।

সুশীল বললে, প্রমথ, আমাকে তোমাদের আড়তে কাজ শেখাবে?

প্রমথ আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে চেয়ে বললে, কেন বলো তো? হঠাৎ একথা কেন তোমার মুখে?

—বসে বসে চিরকাল বাপের ভাত খাব?

—তোমাদের বংশে কেউ কখনো অন্য কাজ করেনি, তাই বলছি। হঠাৎ এ মতিবুদ্ধি ঘটল কেন তোমার?

—সে বলব পরে। আপাতত একটা হিল্লে করে দাও তো!

—ওর মধ্যে কঠিন আর কী। যেদিন ইচ্ছে এসো, বাবার কাছে নিয়ে যাব।

মাসখানেক ধরে সুশীল ওদের আড়তে বেরুতে লাগল। কিন্তু ক্রমশ সে দেখলে, ভুসি মাল-চালানির কাজের সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ নেই। তার বাবা ছেলেকে আড়তে যোগ দিতে বাধা দেননি, বরং বলেছিলেন ব্যবসার কাজে যদি কিছু টাকা দরকার হয়, তাও তিনি দেবেন।

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আড়তের কাজ কীরকম হচ্ছে?

সুশীল বললে, ও ভালো লাগে না, তার চেয়ে বরং ডাক্তারি পড়ি।

—তোমার ইচ্ছে। তাহলে কলকাতায় গিয়ে দেখে শুনে এসো।

কলকাতায় এসে সুশীল দেখলে, ডাক্তারি স্কুলে ভরতি হবার সময় এখন নয়। ওদের বছর আরম্ভ হয় জুলাই মাসে—তার এখনও তিন-চার মাস দেরি। সুশীলের এক মামা খিদিরপুরে বাসা করে থাকতেন, তাঁর বাসাতেই সুশীল এসে উঠেছিল—তাঁরই পরামর্শে সে দু-একটা আপিসে কাজের চেষ্টা করতে লাগল।

দিন-পনেরো অনেক আপিসে ঘোরাফেরা করেও সে কোথাও কোনো কাজের সুবিধে করতে পারলে না—এদিকে টাকা এল ফুরিয়ে। মামার বাসায় খাবার খরচ লাগত না অবিশ্যি, কিন্তু হাতখরচের জন্যে রোজ একটি টাকা দরকার। বাবার কাছে সে চাইবে না—নগদ টাকার সেখানে বড়ো টানাটানি, সে জানে। একটা কিছু না করে এবার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে নেই তার। অথচ করাই বা যায় কী? সন্ধ্যার দিকে গড়ের মাঠে বসে রোজ ভাবে।

সুশীল সেদিন গড়ের মাঠের একটা নির্জন জায়গায় বসেছিল চুপ করে। বড্ড গরম পড়ে গিয়েছে—খিদিরপুরে তার মামার বাসাটিও ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের চিৎকার ও উপদ্রবে সদা সরগরম—সেখানে গিয়ে একটা ঘরে তিন-চারটি আট-দশ বছরের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে।

সুশীলের ভালো লাগে না আদৌ। তাদের অবস্থা এখন খারাপ হতে পারে, কিন্তু দেশের বাড়িতে জায়গার কোনো অভাব নেই।

ওপরে-নীচে বড়ো বড়ো ঘর আছে—লম্বা লম্বা দালান, বারান্দা—পুকুরের ধারের দিকে বাইরের মহলে এত বড়ো একটা রোয়াক আছে যে, সেখানে অনায়াসে একটা যাত্রার আসর হতে পারে।

এমন সব জ্যোৎস্নারাতে কতদিন সে পুকুরের ধারে ওই রোয়াকটায় একা বসে কাটিয়েছে। পুকুরের ওপারে নারিকেল গাছের সারি, তার পেছনে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের চুড়োটা, সামনের দিকে ওর ঠাকুরদাদার আমলের পুরোনো বৈঠকখানা। এ বৈঠকখানায় এখন আর কেউ বসে না—কাঠ ও বিচুলি, শুকনো তেঁতুল, ভুসি, ঘুঁটে ইত্যাদি রাখা হয় বর্ষাকালে।

মাঝে মাঝে সাপ বেরোয় এখানে।

সেবার ভাদ্রমাসে তালনবমীর ব্রতের ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছে পুজোর দালানে, হঠাৎ একটা চ্যাঁচামেচি শোনা গেল পুকুরপাড়ের পুরোনো বৈঠকখানার দিক থেকে।

সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, হরি চাকর বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকেছিল বিচালি পাড়বার জন্যে—সেই সময় কী সাপে তাকে কামড়েছে।

হইহই হল। লোকজন এসে সারা বৈঠকখানার মালামাল বার করে সাপের খোঁজ করতে লাগল। কিছু দেখা গেল না। হরি চাকর বললে সে সাপ দেখেনি, বিচুলির মধ্যে থেকে তাকে কামড়েছে।

ওঝার জন্যে রানিনগরে খবর গেল। রানিনগরের সাপের ওঝা তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত—তারা এসে ঝাড়ফুঁক করে হরিকে সে-যাত্রা বাঁচালে। লোকজন খুঁজে সাপও বের করলে—প্রকাণ্ড খয়ে-গোখরে। হরি যে বেঁচে গেল, তার পুনর্জন্ম বলতে হবে।

—বাবু, ম্যাচিস্ আছে—ম্যাচিস্?

সুশীল চমকে মাথা তুলে দেখলে, একটি কালোমতো লোক। অন্ধকারে ভালো দেখা গেল না। নিম্নশ্রেণির অশিক্ষিত অবাঙালি লোক বলেই সুশীলের ধারণা হল—কারণ তারাই সাধারণত দেশলাইকে 'ম্যাচিস্' বলে থাকে।

সুশীল ধূমপান করে না, সুতরাং সে দেশলাইও রাখে না। সেকথা লোকটাকে বলতে সে চলেই যাচ্ছিল—কিন্তু খানিকটা গিয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে যেন কী ভেবে ফিরে এল।

সুশীলের একটু ভয় হল। লোকটিকে এবার সে ভালো করে দেখে নিয়েছে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। বেশ সবল, শক্ত হাত-পাওয়ালা চেহারা—গুন্ডা হওয়া বিচিত্র নয়। সুশীলের পকেটে বিশেষ কিছু নেই—টাকা-তিনেক মাত্র। সুশীল একটু সতর্ক হয়ে সরে বসল। লোকটা ওর কাছে এসে বিনীত সুরে বললে, বাবুজি, দু-আনা পয়সা হবে?

সুশীল বিনা বাক্যব্যয়ে একটা দু-আনি পকেট থেকে বের করে লোকটার হাতে দিলে। তাই নিয়ে যদি খুশি হয়, হোক না। এখন ও চলে গেলে যে হয়।

চলে যাওয়ার কোনো লক্ষণ কিন্তু লোকটার মধ্যে দেখা গেল না। সে সুশীলের কাছেই এসে সকৃতজ্ঞ সুরে বলল, বহুত মেহেরবানি আপনার বাবু। আমার আজ খাওয়ার কিছু ছিল না—এই পয়সা লিয়ে হুটেলে গিয়ে রোটি খাব। বাবুজির ঘর কুথায়?

ভালো বিপদ দেখা যাচ্ছে। পয়সা পেয়ে তবুও নড়ে না যে! নিশ্চয় আরও কিছু পাবার মতলব আছে ওর মনে মনে। সুশীল চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে কাছাকাছি কেউ নেই। পকেটে টাকা তিনটে ছাড়া সোনার বোতামও আছে জামায়, হঠাৎ এখন মনে পড়ল।

ও উত্তর দিলে, কলকাতাতেই বাড়ি, বালিগঞ্জে। আমার কাকা পুলিসে কাজ করেন কিনা, এদিকে রোজ বেড়াতে আসেন মোটর নিয়ে। এতক্ষণে এলেন বলে, রেড রোডে মোটর রেখে এখানেই আসবেন। আমি এখানে থাকি রোজ, উনি জানেন।

—বেশ বাবু, আপনাকে দেখেই বড়ো ঘরানা বলে মনে হয়।

সুশীলের মনে কৌতূহল হওয়াতে সে বললে, তুমি কোথায় থাক?

—মেটেবুরুজে বাবুজি।

—কিছু করো নাকি?

—জাহাজে কাজ করতাম, এখন কাজ নেই। ঘুরি-ফিরি কাজের খোঁজে। রোটি জোগাড় করতে হবে তো?

লোকটার সম্বন্ধে কৌতূহল আরও বেড়ে উঠল। তা ছাড়া লোকটার কথাবার্তার ধরনে মনে হয় লোকটা খুব খারাপ ধরনের নয় হয়তো। সুশীল বললে, জাহাজে কতদিন খালাসিগিরি করছ?

—দশ বছরের কুছু ওপর হবে।

—কোন কোন দেশে গিয়েছ?

—সব দেশে। যে দেশে বলবেন সে দেশে। জাপান লাইন, বিলেত লাইন, জাভা সুমাত্রার লাইন—এস. এস. পেনগুইন, এস. এস. গোলকুন্ডা—এস. এস. নলডেরা, পিয়োনোর বড়ো জাহাজ নলডেরা, নাম শুনেছেন?

'পিয়োনো' কী জিনিস, পল্লিগ্রামের সুশীল তা বুঝতে পারলে না। না, ওসব শোনেনি।

—তা বাবুজি, আপনার কাজে ছিপাব না। সরাব পিয়ে পিয়ে কাজটা খারাবি হয়ে পড়ল, জাহাজ থেকে ডিসচার্জ করে দিলে। এখন এই কোষ্টো যাচ্ছে, মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারিনি। কী করব, নসিব বাবুজি!

—জাহাজের কাজ আবার পাবে না?

—পাব বাবুজি, ডিসচার্জ স্যাটিক-ফিটিক ভালো আছে। সরাব-টরাবের কথা ওতে কিছু নেই। কাপ্তানটা ভালো লোক, তাকে কেঁদে গোড়-পাকড়ে বললাম—সাহেব, আমার রোটি মেরো না। ওকথা লিখো না!

লোকটি আর একটু কাছে এসে ঘেঁষে বসল। বললে, আমার নসিব খারাপ বাবু—নয় তো আমার আজ চাকরি করে খেতে হবে কেন? আজ তো আমি রাজা।

সুশীল মৃদু কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞাসা করলে, কীরকম?

লোকটি এদিক-ওদিক চেয়ে সুর নামিয়ে বললে, আজ আর বলব না। এইখানে কাল আপনি আসতে পারবেন?

—কেন পারব না?

—তাই আসবেন কাল। আচ্ছা বাবু, আপনি পুরানো লিখা পড়তে পারেন?

সুশীল একটু আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, কী লেখা?

—সে কাল বাৎলাব। আপনি কাল এখানে আসবেন, তবে বেলা থাকতে আসবেন—সুরজ ডুবার আগে।

মামার বাসায় এসে কৌতূহলে সুশীলের রাতে চোখে ঘুমই এল না। এক-একবার তার মনে হল, জাহাজি মাল্লা কত দূর কত দেশ ঘুরেছে, কোনো এক আশ্চর্য ব্যাপারের কথা কী তাকে বলবে? কোনো নতুন দেশের কথা? পুরোনো লেখা কীসের?...

ওর ছোটো মামাতো ভাই সনৎ ওর পাশেই শোয়। গরমে তারও চোখে ঘুম নেই। খানিকটা উশখুশ করার পরে সে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। বললে, দাদা চা খাবে? চা করব?

—এত রাত্তিরে চা কী রে?

—কী করি বলো। ঘুম আসছে না চোখে—খাও একটু চা।

সনৎ ছেলেটিকে সুশীল খুব পছন্দ করে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, লেখাপড়াতেও ভালো; ফুটবল খেলায় এরই মধ্যে বেশ নাম করেছে, কলেজ টিমের বড়ো বড়ো ম্যাচে খেলবার সময় ওকে ভিন্ন চলে না।

সনৎ-এর আর একটা গুণ, ভয় বলে কোনো জিনিস নেই তার শরীরে। মনে হয় দুনিয়ার কোনো কিছুকে সে গ্রাহ্য করে না। দুবার এই স্বভাবের দোষে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল, একবার খেলার মাঠে এক সার্জেন্টের সঙ্গে মারামারি করে, নিজে তাতে মার খেয়েছিলও খুব—মার দিয়েছিল সেবার। ওর বাবা টাকাকড়ি খরচ করে ওকে জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে আনেন। আর একবার মাহেশের রথতলায় একটি মেয়েকে গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে গুন্ডার ছুরিতে প্রায় প্রাণ গিয়েছিল আর কি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক যুবকদল ওকে গুন্ডাদের মাঝখান থেকে টেনে উদ্ধার করে আনে।

সুশীল বললে, সনৎ, কতদূর লেখাপড়া করবি ভাবছিস?

—দেখি দাদা। বি.এস্‌সি. পর্যন্ত পড়ে একটা কারখানায় ঢুকে কাজ শিখব। কলকবজার দিকে আমার ঝোঁক, সে তো তুমি জানোই—

—আমি যদি কোনো ব্যবসায় নামি, আমার সঙ্গে থাকবি তুই?

—নিশ্চয়ই থাকব। তুমি যেখানে থাকবে, যা করবে—আমি তাতে থাকি, এ আমার বড়ো ইচ্ছে কিন্তু। কী ব্যবসা করবে ভাবছ দাদা?

—আচ্ছা, কাউকে এখন এসব কিছু বলিসনে। তোকে আমি জানাব ঠিক সময়ে। তোকে নইলে আমার চলবে না। চল আজ শুয়ে পড়ি—রাত দুটো বাজে—

পরদিন সুশীল গড়ের মাঠে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে একা বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল—তবুও লোকটির দেখা নেই।

অন্ধকার নামল। আসবে না সে লোক? হয়তো নয়। কী একটা বলবে ভেবেছিল কাল, রাতারাতি তার মন ঘুরে গেছে।

রাত আটটার সময় সুশীল উঠতে যাবে, এমন সময়ে পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সে চেয়ে দেখলে। পরক্ষণেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লোকটা ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে।

—সেলাম, বাবুজি! মাপ করবেন, বড়ো দেরি হয়ে গেল। এই দেখুন—লোকটার পায়ের ওপর দিয়ে ভারী একটা জিনিস চলে গিয়েছে যেন। সাদা কাপড়ের ব্যান্ডেজ বাঁধা—কিন্তু ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে।

সুশীল বললে, এঃ, কী হয়েছে পায়ে?

—এইজন্যেই দেরি হয়ে গেল বাবুজি। বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর একটা ভারী হাতে ঠেলাগাড়ি পায়ের ওপর এসে পড়ল। দুজন লোক ঠেলছিল, তাদের সঙ্গে মারামারি হয়ে গেল আমার সঙ্গের লোকদের।

—বসো বসো। তোমার পায়ে দেখছি সাঙ্ঘাতিক লেগেছে! না এলেই পারতে!

—না এলে আপনি তো হারিয়ে যেতেন। আপনাকে আর পেতাম কোথায়? রিক্‌শা করে এসেছি বাবুজি, দাঁড়াতে পারছিনে।

লোকটা ঘাসের ওপর বসে পড়ল। বললে, আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাবুজি, আজ কোনো কাজ হবে না।

লোকটা কথা বলবে, সুশীল শুনবে। এতে দিনের আলোর কী দরকার, সুশীল বুঝতে পারলে না। বললে, কী কথা বলবে বলেছিলে—বলে যাও না।

লোকটা ধীরে ধীরে চাপা গলায় অনেক কথা বললে—মোটামুটি তার বক্তব্য এই—

তার বাড়ি আগে ছিল পশ্চিমে, কিন্তু অনেকদিন থেকে বাংলাদেশে আছে এবং বাঙালি খালাসিদের সঙ্গে কাজ করে বাংলা শিখেছে। লোকটা মুসলমান, ওর নাম জামাতুল্লা। একবার কয়েকজন তেলেগু লশকরের সঙ্গে সে একটা জাহাজে কাজ করে ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপে নারকোল-কুচি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেত মাদ্রাজ থেকে। সেই সময় একবার তাদের জাহাজ ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অচল হয়ে পড়ে। সৌরাবায়া থেকে তাদের কোম্পানির অন্য জাহাজ এসে তাদের জাহাজের মাল তুলে নিয়ে যাবার আগে সাতদিন ওরা সেইখানে পড়েছিল। একদিন সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে জাহাজসুদ্ধ লোকের কলেরা হল।

এইখানে সুশীল জিজ্ঞেস করলে, সবারই কলেরা হল?

—কেউ বাদ ছিল না বাবু। খাবার পাওয়া যেত না, পাহাড়ের একটা গর্তে কাঁকড়া পেয়ে সেদিন ওরা তাই ধরেছিল। ছোটো ছোটো—লাল কাঁকড়া।

—তারপর?

—দুজন বাদে বাকি সর্ব সেই রাত্রে মারা গেল। বাবুজি, সে রাতের কথা ভাবলে এখনও ভয় হয়। সতেরোজন দিশি লশকর আর দুজন ওলন্দাজ সাহেব—একজন মেট আর একজন ইঞ্জিনিয়ার—সেই রাত্রে সাবাড়। রইলাম বাকি কাপ্তান আর আমি।

তারপর জাহাজে কাপ্তান ওকে বললে—মড়াগুলো টান দিয়ে ফেলে দাও জলে—

ও বললে—আমি মুর্দাফরাশ নই সাহেব, ও আমি ছোঁব না—

সাহেব ওকে গুলি করে মারতে এল। ও গিয়ে লুকোলো ডেকের ঢাকনি খুলে হোল্ডের মধ্যে। সেই রাত্রে কাপ্তান সাহেব খুব মদ খেয়ে চিৎকার করে গান গাইছে—ও সেই সময় জাহাজের বোট খুলে নিয়ে নামাতে গেল।

ডেভিট থেকে বোট নামাবার শব্দে সাহেবের মদের নেশা ভাঙলে না তাই নিস্তার—ডেকের ওপরে তখন দুটো মড়া পড়ে রয়েছে—মরণের বীজ জাহাজের সর্বত্র ছড়ানো, ভয়ে ও কিছু খায়নি সকাল থেকে, পাছে কলেরা হয়। সুতরাং অনাহারে ও ভয়ে খানিকটা দুর্বলও হয়ে পড়েছে।

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছিল, দুপুরের দিকে ও লক্ষ করেছিল। সারারাত নৌকো বাইবার পর ভোরে এসে বোট ডাঙায় লাগল। ও নেমে দেখে ডাঙায় ভীষণ জঙ্গল, ওদেশের সব দ্বীপেই এধরনের জঙ্গল—ও জানত। লোকজনের চিহ্ন নেই কোনোদিকে।

বোট ডাঙায় বেঁধে ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দু-দিন হাঁটলে, শুধু গাছের কচি পাতা আর একধরনের অম্ল-মধুর ফল খেয়ে। মানুষের বসতির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে একজায়গায় এসে হঠাৎ একেবারে ও অবাক হয়ে গেল।

ওর সামনে প্রকাণ্ড বড়ো সিংহদরজা—কিন্তু বড়ো বড়ো লতাপাতা উঠে একেবারে ঢেকে ফেলে দিয়েছে। সিংহদরজার পর একটা বড়ো পাঁচিলের খানিকটা—আরও খানিক গিয়ে একটা বড়ো মন্দির, তার চুড়ো ভেঙে পড়েছে—মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বলে তার মনে হল। সে ভারতের লোক, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সে চেনে। এক্ষেত্রে হয়তো সে ঠিক চিনতে পারেনি, তবে তার ওইরকম বলেই মনে হয়েছিল।

অবাক হয়ে সে আরও ঘুরে ঘুরে দেখলে। জায়গাটা একটা বহুকালের পুরোনো শহরের ভগ্নস্তূপ মনে হল। কত মন্দির, কত ঘর, কত পাথরের সিংহদরজা, গভীর বনের মধ্যে বড়ো বড়ো কাছির মতো লতার নাগপাশ বন্ধনে জড়িয়ে কত যুগ ধরে পড়ে আছে। ভীষণ বিষধর সাপের আড্ডা সর্বত্র! একটা বড়ো ভাঙা মন্দিরে সে পাথরের প্রকাণ্ড বড়ো মূর্তি দেখেছিল—প্রায় আট-দশ হাত উঁচু।

সন্ধ্যা আসবার আর বেশি দেরি নেই দেখে তার বড়ো ভয় হয়ে গেল। এসব প্রাচীনকালের নগর শহর—জিন পরির আড্ডা, তেলেগু লশকরেরা যাকে ওদের ভাষায় বলে 'বিহ্মমুনি'।

বিহ্মমুনি বড়ো ভয়ানক জিন, হিন্দুদের পুরোহিত মারা যাওয়ার পর বিহ্মমুনি হয়। এই গহন অরণ্যের মধ্যে লোকহীন পরিত্যক্ত বহু প্রাচীন নগরীর অলিতে-গলিতে ঝোপে ঝোপে ধূম্রবর্ণ, বিকটাকার, কত যুগের বুভুক্ষু বিহ্মমুনির দল সন্ধ্যার অন্ধকার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সন্ধানে জাগ্রত হয়ে উঠে হাঁক পাড়ে—ম্যায় ভুখা হুঁ! তাদের হাতের নাগালে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? অতএব, এখান থেকে পালানোই একমাত্র বাঁচবার পথ।

সুশীল এক মনে শুনছিল; বললে, পালিয়ে গেলে কোথায়?

—সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার দু-দিন তিন-দিন ধরে হেঁটে সমুদ্রের ধারে পৌছোলাম। জাহাজে উঠব এসে—এই তখন খেয়াল।

—আবার সেই মড়া-ভরতি জাহাজে কেন?

—বুঝলেন না বাবুজি? যদি জাহাজে উঠি, তবে তো দেশে পৌছুবার ঠিকানা মেলে। নয়তো সেই জংলি মুলুকে যাব কোথায়? চারিধারে সমুদ্র, যদি জাহাজ না পাই, তবে সেই জংলি মুলুকে না খেয়ে মরতে হবে, নয়তো জংলি লোকেরা খুন করে ফেলবে। বাবুজি, তখন এমন ডর, যে রাতে ঘুমুতে পারি নে। একদিন প্রকাণ্ড এক বনমানুষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম—নসিবের জোর খুব। অমন

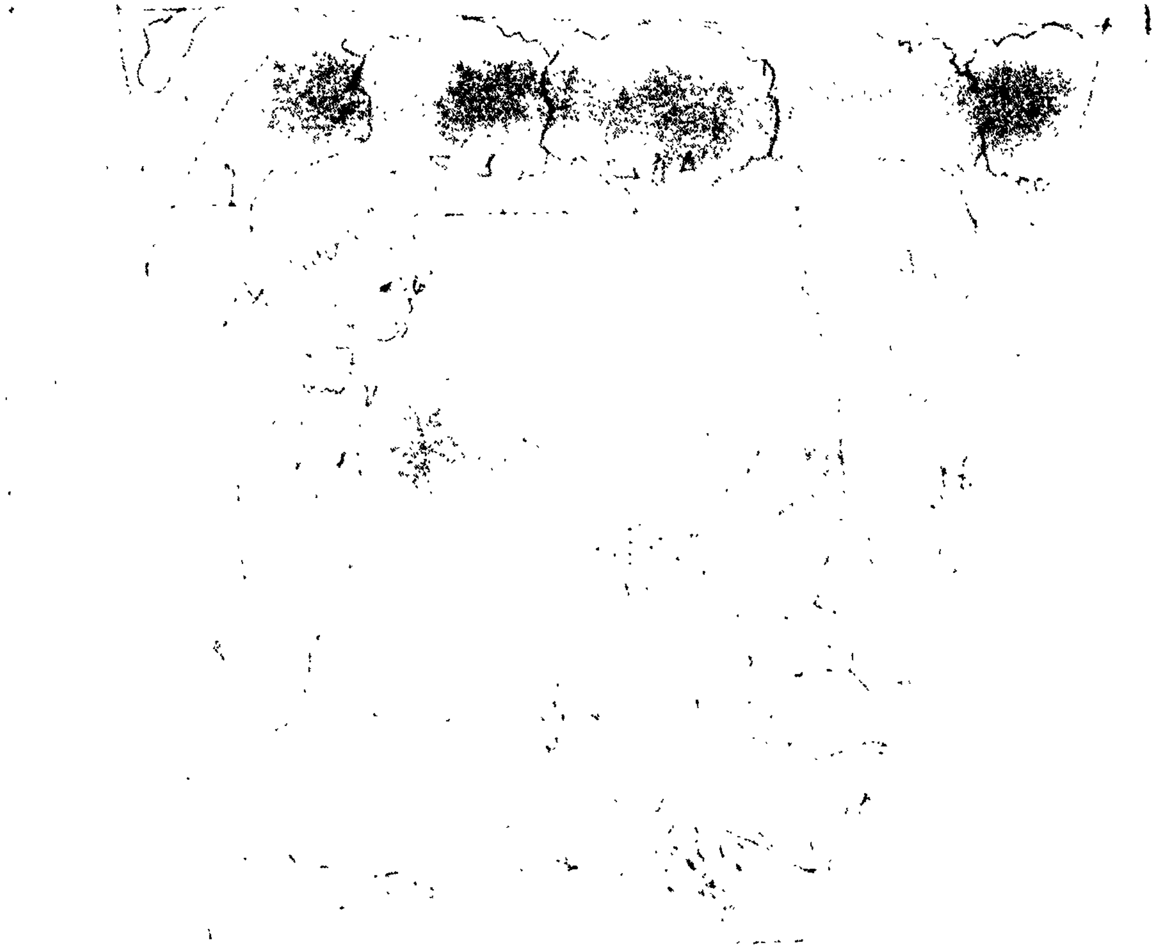

ধরনের জানোয়ার যে দুনিয়ায় আছে—তা জানতাম না। গাছের ওপর একদল বনমানুষ ছিল, ধাড়িটা আমায় দেখতে পেলে না বাবুজি, দেখলে আর বাঁচতাম না।

সুশীল মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখলে—লোকটা মিথ্যা কথা বলচে না সত্যি বলচে, ওর এই বনমানুষের কথা তার একটা মস্ত বড়ো পরীক্ষা। সুশীল জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশুনো করেছিল, বাড়িতে আগে নানারকম পাখি, বেজি, খরগোশ, শজারু ও বাঁদর পুষত। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলত—'মুস্তফিদের চিড়িয়াখানা'। এ সম্বন্ধে ইংরাজি বইও নিজের পয়সায় কিনেছিল।

ও বললে, কত বড়ো বনমানুষ?

—খুব বড়ো বাবুজি। ইন্দোরের পালোয়ান রামনকীব সিং-এর চেয়ে একটা বাচ্চার গায়ে জোর বেশি। নিজের আঁখসে দেখলাম।

—কী করে দেখলে?

—ডাল ফাঁড়লে হাত আর পা দিয়ে ধরে! আমার মাথার ওপর গাছপালার ডালগুলো তো বনমানুষে বিলকুল ভরতি হয়ে গিয়েছিল।

—তবে তো তুমি সুমাত্রা দ্বীপে কিংবা বোর্নিওতে গিয়েছিলে, কিংবা ওর কাছাকাছি কোনো ছোটো দ্বীপে। তুমি যে বনমানুষ বলছ, ও হচ্ছে ওরাং ওটাং। ও ছাড়া আর কোনো বনমানুষ ও দেশে থাকবে না—

লোকটা হঠাৎ অত্যন্ত বিস্ময়ে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—দাঁড়ান—দাঁড়ান, বাবুজি, কী জায়গার নাম করলেন আপনি?

—সুমাত্রা আর বোর্নিও—

—ওঃ, বাবুজি আপনি বহুত পড়ালেখা আদমি! এই নাম কতকাল শুনিনি জানেন? আজ দশ-বারো বছর। শেষের নামটা কী বললেন বাবুজি? বোর্নিও—ঠিক। সুলু-সির নাম জাহাজি চার্টে দেখবেন। সুলু-সির কাছাকাছি, এপার-ওপার। কেন জানেন বাবুজি? এই নাম শুনলে আমার বহু কথা মনে পড়ে যায়। তাজ্জব কথা! আজ দেখছেন আমার এই গড়ের মাঠে বসে দু-একটা পয়সা ভিক্ষে করা—কিন্তু আমি আজ...আচ্ছা, সেকথা এখন থাক।

—তারপর কী করলে বলো না! জঙ্গল থেকে এসে উঠলে আবার জাহাজে?

—হ্যাঁ, উঠলাম! সেই কাপ্তেন তখন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে নিজের কেবিনে চাবি দিয়ে ঘুমুচ্ছে, আমি আগে তো ভাবলাম—মরে গিয়েছে। মড়াগুলো কতক কাপ্তান ফেলে দিয়েছে, কতক তখনও রয়েছে। ভীষণ বদ গন্ধ—আর সেই গরম! আমি জাহাজের কিছু খেতে পারিনে কলেরার ভয়ে। ডাঙায় গিয়ে মাছ ধরতাম—আর কচ্ছপ।

—কাপ্তেন বেঁচে ছিল?

—বেঁচে ছিল, কিন্তু বেচারির মগজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তখনকার দিনে বেতার ছিল না, আমাদের জাহাজে যে অমন হয়ে গেল, সে খবর কোথাও দেওয়া যায়নি। ওসব দিকের সমুদ্রে জাহাজ বেশি চলাচল করে না—জাহাজের লাইন নয়। এগারো দিন পরে সৌরাবায়া থেকে জাহাজ যাচ্ছিল পাসারাপং, তারা আমাদের আগুন দেখে এসে জাহাজে তুলে নিয়ে বাঁচায়।

—কীসের আগুন?

—ডুবো-পাহাড়ের খানিকটা ভাঁটার সময় বেরিয়ে থাকত। পাটের থলে জ্বালিয়ে সেখানে রোজ আগুন করতাম—অন্য জাহাজের যদি চোখে পড়ে। তাতেই তো বেঁচে গেলাম।

এ পর্যন্ত শুনে সুশীল বুঝতে পারলে না লোকটার ভাগ্য কীসে ফিরেছিল। তবে লোকটা যে মিথ্যা কথা বলছে না, ওর কথার ধরন থেকে সুশীলের মনে হল। কিন্তু এইবার লোকটা যে কাহিনি বললে, তা শেষ পর্যন্ত শুনে সুশীল বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল। অল্পক্ষণের জন্য সারা গড়ের মাঠ, এমনকী বিরাট কলকাতা শহরটাই যেন তার সমস্ত আলোর মালা নিয়ে তার চোখের সামনে থেকে গেল বেমালুম মুছে—বহু দূরের কোনো বিপদসঙ্কুল নীল সমুদ্রে সে একা পাড়ি জমিয়েছে বহুকালের লুকোনো হিরে-মানিক-মুক্তোর সন্ধানে। পৃথিবীর কত পর্বতে, কন্দরে, মরুতে, অরণ্যে অজানা স্বর্ণরাশি মানুষের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—বেরিয়ে পড়তে হবে সেই লুকোনো রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে—পুরুষ যদি হও। নয় তো আপিসের দোরে দোরে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মতো ঘুরে ঘুরে সেলাম বাজিয়ে চাকুরির সন্ধান করে বেড়ানোই যার একমাত্র লক্ষ্য, তার ভাগ্যে নৈব চ, নৈব চ।

এই খালাসিটা হয়তো লেখাপড়া শেখেনি, হয়তো মার্জিত নয়, কিন্তু এ সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে এসেছে, দুনিয়ার মস্ত বড়ো বড়ো নগর বন্দর, বড়ো বড়ো দ্বীপ দেখতে কিছু বাকি রাখেনি। এ একটা পুরুষমানুষ বটে—কত বিপদে পড়েছে, কত বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে।

বিপদের নামে ত্রিশ হাত পেছিয়ে থাকে যারা, গা বাঁচিয়ে চলবার ঝোঁক যাদের সারাজীবন ধরে, তাদের দ্বারা না ঘুচবে অপরের দুঃখ, না ঘুচবে তাদের নিজেদেব দুঃখ। লক্ষ্মী যান না কাপুরুষের কাছে, অলসের কাছে। তিনি তাদের কৃপা করেন—যারা বিপদকে, বিলাসকে, আরামপ্রিয়তাকে তুচ্ছ বোধ করে।

জাহাজ সৌরাবায়া এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সত্যিই ক্লান্তিতে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়, অখাদ্য ভক্ষণে ওদের শরীর ভেঙে পড়েছিল। দিন পনেরো হাসপাতালে শুয়ে থাকবার পর ক্রমশ ওর শরীর ভালো হয়ে গেল—কাপ্তেনের মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণও ক্রমে দূর হল।

ওদের জন্যে কিছু টাকা চাঁদা উঠেছিল। ও হাসপাতাল থেকে যেদিন বাইরে পা দিলে, সেদিন এক দয়াবতী মেমসাহেব ওকে টাকাটা দিয়ে গেলেন। দুঃস্থ নাবিকদের থাকবার জন্যে গভর্নমেন্টের একটা বাড়ি আছে, সেখানে ওকে বিনি খরচায় থাকবার অনুমতি দেওয়া হল।

এই বাড়িতে সে প্রায় দু-মাস ছিল, তারপর অন্য জাহাজে চাকরি নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে। তারপর পাঁচ-সাত বছর কেটে গেল। ও যেমন জাহাজে কাজ করে তেমনি করে যাচ্ছে। প্রাচ্যদেশের বড়ো বড়ো বন্দরের মদের দোকান ও জুয়ার আড্ডার সঙ্গে তখন সে সুপরিচিত।

একবার তাদের জাহাজ ম্যানিলাতে থেমেছে। ও অন্যান্য লশকরদের সঙ্গে গিয়ে এক পরিচিত জুয়ার আড্ডায় উঠেছে, এমন সময়ে এক আড্ডাধারী এসে ওকে বললে, একবার এসো তো! তোমাদের দেশের একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ও অবাক হয়ে বললে, আমাদের দেশের?

আড্ডাধারী চীনাম্যান হেসে বললে, হ্যাঁ, ইন্ডিয়ার। এতকাল দোকান করছি বন্দরে, ইন্ডিয়ার মানুষ চিনিনে?

ও আড্ডাধারী পিছু পিছু গিয়ে দেখলে—জুয়ার আড্ডার পেছনে একটা পায়রার খোপের মতো ছোটো ভীষণ নোংরা ঘরে একজন লোক শুয়ে। লোকটার বয়স কত ঠিক বোঝবার জো নেই—চল্লিশও হতে পারে, আবার ষাটও হতে পারে। বিছানার সঙ্গে যেন সে মিশে গিয়েছে বহুদিন ধরে অসুখে ভুগে।

ওকে দেখে লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে তেলেগু ভাষায় বললে, দেশের লোককে দেখতে পাইনে। যখন হংকং হাসপাতালে ছিলাম, অনেক দেশের লোক দেখতাম সেখানে। বসো এখানে! আহা, ভারতের লোক তুমি। মুসলমান? তা কী? এতদূর বিদেশে তুমি শুধু ভারতের লোক, যে দেশের মাটিতে আমার জন্ম, সেই একই দেশের মাটিতে তোমারও জন্ম। এখানে তুমি আমার ভাই।

ও রোগীর বিছানার পাশে বসল। সেই অপরিচিত মুমূর্ষু স্বদেশবাসীকে দেখে ওর মনে একটা গভীর অনুকম্পা ও মমতা জেগে উঠল—যেন সত্যিই কতকালের আপনার জন।

রোগী বললে, আমার নাম নটরাজন, ত্রিবেন্দ্রাম শহর থেকে এগারো মাইল দূরে কাটিউম্পা বলে ছোটো একটা গ্রামে আমার বাড়ি। কোচিন থেকে যে স্টিমলঞ্চ ছাড়ে ত্রিবেন্দ্রাম যাবার জন্যে, সে স্টিমার আমার গ্রামের ঘাট ছুঁয়ে যায়। বেউরা কাল্লিয়াম নদীর ধারে, চারিধারে বন আর ছোটো পাহাড়—

কেটিউম্পা গ্রাম তুমি দেখনি, বুঝতে পারবে না সে কী চমৎকার জায়গা! আমি অনেক দেশ বেড়িয়েছি পৃথিবীর, ভবঘুরে হয়ে চিরদিন কাটিয়ে দিলাম জীবনটা—কিন্তু আমি তোমায় বলছি শোনো, ভারতবর্ষের মধ্যে তো বটেই, এমনকী পৃথিবীর মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর একটি অদ্ভুত সুন্দর দেশ। কিন্তু আমার দেশের বর্ণনা শোনাবার জন্যে আজ তোমায় ডাকিনি। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, কাল যে সূর্যদেব উঠবে আকাশে, তা আমি চোখে বোধ হয় দেখতে পাব না—তুমি আমার দেশবাসী ভাই, একটা উপকার করবে আমার?

—কী বলুন? আপনি আমার চাচার বয়সি, যা হুকুম করবেন—বলুন। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব।

রোগী পাণ্ডুর মুখ অল্পক্ষণের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—নিবু নিবু প্রদীপের শিখার মতো। ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, কথা দিলে? কিন্তু ভীষণ লোভ দমন করতে হবে ভাই!

—আল্লার নাম বলছি, যা করতে বলবেন—তাই করব।

—আমার মাথার বালিশের তলায় একটা চামড়ার ব্যাগ আছে, সেটা বার করে নাও। আমার মৃত্যুর পরে ব্যাগটা আমার গ্রামে আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবে।

ও রোগীর মাথাটা সন্তর্পণে একধারে সরিয়ে আস্তে আস্তে একটা ছোটো চামড়ার ব্যাগ বার করলে। ব্যাগের মধ্যে কতগুলো কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হয় না ওর।

বৃদ্ধ নটরাজন বললে, তোমার কাছে আমি কোনো কথা লুকোব না। ব্যাগটার মধ্যে একখানা ম্যাপ আছে—জীবনে অনেক সাহসের কাজ করেছি, অনেক বনে-জঙ্গলে ঘুরেছি—অনেকরকম লোকের সঙ্গে মিশেছি। এই ম্যাপখানা এবং ব্যাগের মধ্যে যা যা আছে—তা আমি সৎপথে হস্তগত করিনি। সংক্ষেপে কথাটা বলে নিই, কারণ বেশি বলবার আমার সময় বা শক্তি নেই। আজ বিশ-বাইশ বছর আগে এই ব্যাগ আমার হস্তগত হয়। যে ম্যাপখানা এই ব্যাগের মধ্যে আছে, তার সাহায্যে যে-কোনো লোক দুনিয়ায় মহা ধনী লোক হয়ে যেতে পারে। সুলু-সির একটা খাঁড়ির ধারে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন আমলের এক নগরের ভগ্নস্তূপ আছে। সেই নগর প্রাচীন যুগের এক হিন্দু রাজ্যের রাজধানী ছিল। তার এক জায়গায় প্রচুর ধনরত্ন লুকানো আছে। যার কাছ থেকে এ ম্যাপ আমি পাই, সে আমারই বন্ধু, দুজনে মিলে সুলু সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি করেছি, দশ বছর ধরে। সে জাতিতে মালয়, ম্যাপ তার তৈরি—সে নিজে ওই শহরের সন্ধান খুঁজে বার করেছিল। সেখানে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে, সামান্য কিছু পাথর ছাড়া সে বেশি কোনো জিনিস আনতে পারেনি সেখান থেকে। তার নিজের লেখা জাহাজের লগ্ বুকের (Log Book) কয়েকখানা পাতা আমি মালয় ভাষা থেকে নিজের সুবিধের জন্যে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নিই সৌরাবায়াতে এক গরিব মালয় স্কুল-মাস্টারকে ধরে। সেই অনুবাদের কাগজখানাও এই ব্যাগের মধ্যে আছে। তারপর ম্যাপখানা হস্তগত করে আমি নিজে অনেক খোঁজাখুঁজি করি—কিন্তু সুলু সমুদ্র ও ওদিকের বহুশত বসতিহীন ও বসতিযুক্ত ছোটো ও বড়ো দ্বীপ—তাদের প্রত্যেকটিতে ভীষণ জঙ্গল। ম্যাপও যা আছে, তা খুব নিখুঁত নয়—মোটের উপর সে দ্বীপ আমি বার করতে পারিনি। দেশের গ্রামে আমার ছেলে আছে, তাকে নিয়ে গিয়ে ম্যাপটা আর ব্যাগ দিয়ো। এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে—আমার বোম্বেটে বন্ধু সেই প্রাচীন শহরে একটা জিনিস পায়। জিনিসটা একটা সিলমোহর বলেই মনে হয়। একখানা গোটা পদ্মরাগ মণির ওপর সিলমোহরটা খোদাই করা। সেটাও এর মধ্যে আছে। সেই মোহরের ওপর যে অদ্ভুত চিহ্নটি আঁকা আছে—আমার বিশ্বাস ছিল, সেটা একটা বড়ো হদিস ওই প্রাচীন নগরীর

রত্নভাণ্ডারের। তাই ওখানা আমি কবচের মতো গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েছি এতদিন। কিন্তু আজ বুঝেছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। উনিশ বছর আগে গ্রাম থেকে যখন চলে আসি, তখন আমার ছেলে ছিল দু-বছরের—আর আমার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিনি এই উনিশ বছরের মধ্যে। বেঁচে থাকলে আজ সে একুশ-বাইশ বছরের যুবক। তার হাতে এগুলো সব দিয়ে বলে দিয়ো, বাপের ছেলে যদি হয়, সে যেন খুঁজে বার করে সেই নগরী, তার বাপ যা পারেনি। আর আমার কিছু বলবার নেই। ব্যাগটা নাও হাতে তুলে।

রোগী এই পর্যন্ত বলে ক্লান্তিতে চোখ বুজল। চীনা আড্ডাধারীর ইঙ্গিতে ও রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সুশীল বললে, তারপর?

—বাবুজি, যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, নটরাজন বাঁচল কি মারা গেল সেদিকে কোনো খেয়াল করিনি। আমার মাথা তখন ঘুরছে। ব্যাগ খুলে দেখলাম—কতকগুলো পুরোনো কাগজপত্র ও ম্যাপখানা ছাড়া আর কিছুই নেই। পদ্মরাগ মণিটা নেড়েচেড়ে কিছু বুঝলাম না—ওসব জিনিসের আমরা কী বুঝি বলুন! কিন্তু তখন আমার আর একটা বড়ো কথা মনে হয়েছে, নটরাজন যখন ওর গল্প করেছিল, আমার মনে পড়ল সাত বছর আগের সেই ঘটনা। জাহাজে সেই কলেরা হওয়া, আমার জাহাজ থেকে পালানো এবং বনজঙ্গলের মধ্যে সেই বিন্ধ্যমুনির দেশের মধ্যে গিয়ে পড়া, বুঝলেন না বাবুজি?

—খুব বুঝেছি, বলে যাও।

—আমার মনে হল, আমি সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম ঘুরতে ঘুরতে। সে পুরোনো শহর আমি দেখেছি। নটরাজন যা বের করতে পারেনি, আমি সেখানে একটা গোটা দিন কাটিয়েছি। এই জায়গা সুলু-সির ধারে তাও আমি জানি। যদিও ঠিক বলতে পারব না হয়তো কিন্তু দূর থেকে দেখলে বোধ হয় চিনব।

—ত্রিবাঙ্কুরের সেই গাঁয়ে গেলে না?

লোকটা বললে, প্রথমে ওর লোভ হয়েছিল খুব। পদ্মরাগ মণিটার দাম যাচাই করে দেখা গেল, প্রায় দেড় হাজার টাকা দাম সেটার। তা ছাড়া আরও লোভ হল, নটরাজনের ছেলেকে ম্যাপ দেবার কী দরকার? এই ম্যাপের সাহায্যে সে-ই তো জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারে। বিশেষ করে একবার যখন সেখানে সে গিয়েছিল। কিন্তু তিন-চার দিন ভাবার পরে ওর মনে হল, মরবার আগে বিশ্বাস করে নটরাজন ওর হাতে জিনিসগুলো সঁপে দিয়েছে তার ছেলেকে দেবার জন্যে। অতএব খানিকটা ইচ্ছা এবং খানিকটা অনিচ্ছাতে সেখানে যেতে সে বাধ্যই হল। বড়ো মজার ব্যাপার ঘটল কিন্তু সেখানে।

সুশীল বললে, কীরকম?

—বাবুজি, অনেক কষ্ট করে বেউরা কাম্পিয়াম নদীর ধারে সেই কেটিউপ্পা গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছোলাম। দেখলাম—নটরাজন মিথ্যে বলেনি, নদীটা একেবারে ওদের গ্রামের নীচে দিয়েই গিয়েছে বটে। নিজের পকেট থেকে যাওয়ার খরচ করলাম। গাঁয়ে গিয়ে যাকেই জিজ্ঞেস করি, কেউ নটরাজনের ছেলের খোঁজ দিতে পারে না। নটরাজনের কথাই অনেকের মনে নেই। দু-একজন বুড়ো লোক বললে—নটরাজনকে তারা চিনত বটে, তবে অনেকদিন সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তার স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে তারা জানে না।

—তারপর?

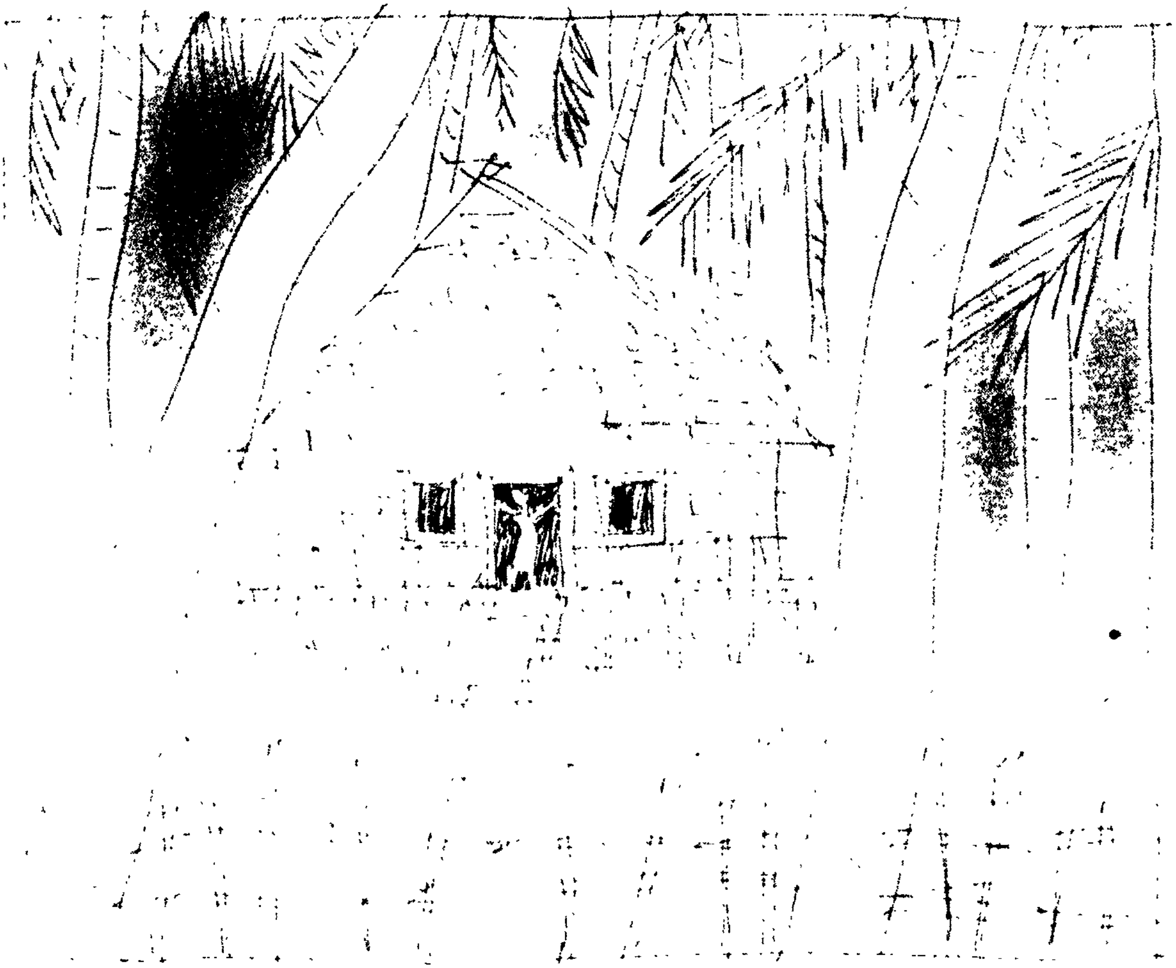

—মনে খানিকটা আনন্দ যে না হল, তা নয়। ছেলেকে যদি সন্ধান না করতে পারি, তবে আমার দোষ কী? তবুও একে-ওকে জিজ্ঞেস করি। শেষকালে গাঁয়ের কাছারিতে কী ভেবে গিয়ে খোঁজ করলাম। তারা শুনে বললে—অনেকদিন আগে নটরাজনের জায়গা-জমি নীলাম করতে হয়েছিল খাজনা না দেওয়ার জন্যে। নীলামের নোটিশ তারা পাঠিয়েছিল ত্রিবান্দ্রাম শহরে।

—পেলে খুঁজে?

—ঠিকানা তো খুঁজে বার করলাম। ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি, নারকেল গাছের বাগান সামনে। শহরের মধ্যে বাড়িটা নয়, শহর থেকে মাইল খানেক দূরে। অনেক ডাকাডাকির পরে এক বুড়ি এসে দোর খুলে দিলে। মাথার চুল সব সাদা হয়েছে, অথচ মুখ দেখে খুব বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না। বললে—কাকে চাও? আমি বললাম—নটরাজনের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বুড়ি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—ও নাম কোথায় শুনলে? ও নাম তো কেউ জানে না। আমি তখন সব কথা বুড়িকে বললাম। শুনে বুড়ি কেঁদে ফেলল। বললে—আমার ছেলেও আজ নিরুদ্দেশ, তার বাপের মতো সেও বেরিয়েছে, আজ তিন বছর হয়ে গেল কোনো খবর পাইনি।

—তুমি কী করলে?

—এই কথা শুনে আমার বড়ো কষ্ট হল বাবুজি। আমি সেখানে বুড়ির বাড়ি সাত-আট দিন রইলাম। তাকে মা বলে ডাকি। বুড়িও আমায় যত্ন করতে লাগল। বুড়ি বড়ো গরিব, ভাড়াটে ঘরে থাকে। তার ছেলে স্কুলে পড়ত। সে রাঁধুনিগিরি করে ছেলের পড়ার খরচ ও নিজেদের খরচ চালাত। এখনও সে নারকেল তেলের গুদামের শেঠজিদের বাড়ি রাঁধে। কোনোরকমে একটা পেট চলে যায়। বুড়িকে পদ্মরাগ মণিটা আমি দেখাইনি—

—এত কষ্ট করে ওটার বেলা ফাঁকি দিলে?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল, পদ্মরাগ মণির গায়ে একটা আঁকজোক আছে—যা হদিস দেবে হিরে-জহরতের—এই হল ওখানা না দেওয়ার গোড়ার কথা। ভাবলাম কী জানেন? ভাবলাম এই—নটরাজনের ছেলে না-পাত্তা, বুড়ির কাজ নয় ম্যাপ দেখে সুলু-সি যাওয়া আর সেই দ্বীপের মধ্যে লুকানো শহর খুঁজে বার করা। যদি ওকে দিই এগুলো এখানে পড়ে নষ্ট হবে। তার চেয়ে যদি আমি নিই, হয়তো চেষ্টা করলে একদিন না একদিন আমি সেখানে গিয়ে পৌছুতেও পারি। যদি হিরে-জহরত পাই, বুড়িকে আমি ভালোভাবে খোরপোশ দিয়ে রাখব। কিন্তু যদি পদ্মরাগ মণিখানা দিয়ে দিই, তবে হদিসটা হাতছাড়া হয়ে গেল। বুড়ি এখুনি অপরকে মণি বিক্রি করবে। যে কিনবে, সে মণির গায়ে আঁকা সিলমোহরের কোনো মানেই বুঝবে না। লোহার সিন্দুকে আটকে থাকবে জিনিসটা, তাতে কারো কোনো উপকার নেই। কী বলেন আপনি?

—তোমার যুক্তি মন্দ নয়। যদিও আমার মনে হয়—জিনিসটা দেওয়াই তোমার উচিত ছিল। যাদের জিনিস, তারা সেটা নিয়ে যা খুশি করুক না কেন। তোমার ওপর শুধু পৌছে দেওয়ার ভার। সেটা তুমি রাখলে নিজের কাছে।

—হাঁ বাবুজি। এই দেখুন, আমার কাছেই আছে। আসুন এই আলোর কাছে।

সুশীল আলোর নীচে গিয়ে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর প্রসারিত করতলের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ল। মস্ত একখানা পাথর—একটু চ্যাপটা গড়নের, উজ্জ্বল সবুর রঙের, তার ওপর খোদাই-কাজ করা।

সুশীল ওর হাত থেকে সিলমোহরটা নিয়ে দেখলে উলটেপালটে। খোদাই করা এত বড়ো পাথর সে কখনো দেখেনি। বড়ো সাইজের একটা লেবেঞ্চুসের মতো। সিলমোহরের মধ্যে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল—বড়ো একটা ওঁ-কারের 'ওঁ'-র ল্যাজ জড়িয়ে জড়িয়ে পাকিয়েছে একটা বটগাছ কিংবা অন্য কোনো গাছকে। তারপর সে আরও ভালো করে চেয়ে দেখলে—আসলে ওটা ওঁ-কার নয়, যদিও সেইরকম দেখাচ্ছে বটে, কোনো নাগ দেবতার মূর্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। ত্রিভুজাকৃতি কী একটা আঁকা রয়েছে ছবির বাঁদিকে। কোনো নাম বা সন-তারিখ নেই।

লোকটা বললে, কিছু বুঝলেন বাবু?

—নাঃ, তবে হিন্দুর সঙ্গে এ জিনিসের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। দেড় হাজার টাকার জিনিসটা তুমি যে বড়ো বিক্রি করে ফেলোনি এতদিন?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল এই খোদাই করা আঁকজোকের মধ্যে আসল মালের হদিস পাওয়া যাবে, সেই লোভেই একে হাতছাড়া করে ফেলিনি।

—নটরাজনের স্ত্রী কোথায়?

—তাকে কেটিউপ্পা গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। মাসে মাসে টাকা পাঠাই। শহরে খরচ বেশি, গাঁয়ে খরচ কম। ঘর ভাড়া লাগে না। সেই সেদিনও পাঁচ টাকা ডাকে পাঠিয়েছি। এখন চাকরি নেই—নিজের পেটই চলে না।

—কাগজপত্র আর ম্যাপগুলো?

—ওই নটরাজনের স্ত্রী—তাকে আমি মা বলি—সেখানে তার কাছেই আছে। সঙ্গে নিয়ে বেড়াইনে, বড্ড দামি ও দরকারি জিনিস—আমার কাছে থাকলে হারিয়ে যেতে পারে। সে বুড়ি তার বেতের পেটরায় তুলে রেখে দিয়েছে, যখন দরকার হবে নিয়ে আসব গিয়ে।

—এসব আজ কত বছরের কথা হল?

—বেশি দিনের নয়। আজ দু-বছর আগে আমি নটরাজনের গাঁয়ে গিয়ে বুড়ির সঙ্গে প্রথম দেখা করি।

—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো। এই মানিকখানা বিক্রি করে ফেলে টাকাটা নটরাজনের স্ত্রীকে দাওগে। তার জীবনটা একটু ভালোভাবে কাটবে। দেড় হাজার টাকা হাতে পেলে সে খুব খুশি হবে। তাদেরই জিনিস ধর্মত দেখতে গেলে, তোমার নিজের কাছে রাখা মানে চুরি করা!

—কিন্তু বাবু, তাহলে হদিস চলে গেল যে।

—যাবে না। প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচে ওটা তুলে নিলেই চলে। ওই ছবিটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। মানিকখানা যার জিনিস, তাকে দাও ফিরিয়ে। তুমি যখন মা বলে ডাকো, তখন তার আশীর্বাদ তোমার বড়ো দরকার। মানিকখানা যদি বুড়ি বিক্রি করে, যে কিনবে সে ওর খোদাই ছবির কোনো মানে করতে পারবে না, তার কোনো কাজেই লাগবে না।

—বেশ বাবুজি, আপনি কাজটা করিয়ে দিন না।

—কাল এটা সঙ্গে করে নিয়ে আমার সঙ্গে এখানেই দেখা কোরো। আমার একটা জানাশুনো লোক আছে—সে এইসব কাজ করে, তাকে দিয়ে করিয়ে দেব।

রাত হয়ে গিয়েছিল। সুশীল মাঠ থেকে ফিরতে ফিরতে কত কথাই ভাবলে। তার মাথার মধ্যে যেন কেমন করছে। এ যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনির মতো অদ্ভুত! এমনভাবে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে একজন মুসলমান লশকরের সঙ্গে দেখা হবে—সে এমন একটি আজগুবি গল্প বলে যাবে—এ কখনো সে ভেবেছিল? গল্পটা আগাগোড়া গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেও পারত সে, যদি ওই চুনির সিলমোহরখানা সে না দেখত নিজের চোখে।

লোকটার গল্প যে সত্যি—তা ওই পাথরখানা থেকে বোঝা যাচ্ছে। সন-তারিখ ও জায়গা মিলিয়ে এমনভাবে সে গল্প বলে গেল—যা অবিশ্বাস করা শক্ত। সুশীল ওকে শেষের দিকে যে প্রশ্নটা করেছিল, অর্থাৎ কতদিন আগে বুড়ির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, সেটা শুধু সময় সম্বন্ধে তাকে জেরা করা মাত্র।

সুশীল বাড়ি গিয়ে সনৎকে বললে, এই কলকাতা শহরেই অনেক মজা ঘটে যায় দেখছি।

সনৎ বললে, কী দাদা?

—সে একটা অদ্ভুত গল্প। যদি বলবার দরকার বুঝি, তবে বলব—

পরদিন গড়ের মাঠে আবার সে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে রইল। একটু পরে জামাতুল্লা এসে ওর পাশে নিঃশব্দে বসে পড়ল। বললে, আমার কথা ভাবলেন বাবুজি?

—চলো আমার সঙ্গে। একটা ছাঁচ তোমাকে করিয়ে দিই। এনেছ ওটা?

—হাঁ বাবুজি। দেখুন, আমি ভিক্ষে করে খাচ্ছি আজ দু-মাস, তবুও এত বড়ো দামি পাথরটা বিক্রি করিনি শুধু বড়ো একটা লাভের আশায়! কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, তত আমার মনে হচ্ছে নসিব আমার খারাপ, নইলে সেই জায়গায় গিয়েও তো কিছু করতে—

—জামাতুল্লা, তুমি লেখাপড়া জানা লোক না হলেও খুব বুদ্ধি আছে। একা তুমি কিছু করতে পারবে না তা বেশ বোঝো। এ কাজে টাকা চাই, লোক চাই, জাহাজ চাই! অনেক টাকার খেলা সেসব। তোমার অত টাকা নেই। মিছে কেন নটরাজনের স্ত্রীর পাওয়া জিনিস থেকে বঞ্চিত করবে?

দু-একদিনের মধ্যে প্যারিস-প্লাস্টারে ছাঁচটা হয়ে গেল। সুশীল প্রাচীন ধনী বংশেব সন্তান, যে ওর ছাঁচ গড়িয়ে দিলে, সে ভাবলে—ওদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি এটা। ফেরত দেওয়ার সময় সে বললে—এটা আমার এক বন্ধুকে একবার দেখতে দেবে?

—কেন বলো তো?

—আমার সে বন্ধু মিউজিয়ামে কাজ করে। পণ্ডিত লোক। যদি গভর্মেন্টের তরফ থেকে এটা কিনে নেওয়া হয়—তাই বলছি।

—তাকে তোমার স্টুডিওতে কাল নিয়ে এসো।

পরদিন জামাতুল্লাকে নিয়ে সুশীল বন্ধুর স্টুডিওতে গিয়ে দেখলে একটি সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন।

বন্ধুটি বলে উঠল, এই যে এসো সুশীল, ইনি এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন, আলাপ করিয়ে দিই—ড. রজনীকান্ত বসু, এম.এ.পিএইচ.ডি.— মিউজিয়ামে সম্প্রতি চাকুরিতে ঢুকেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ড. বসু পদ্মরাগের সিলমোহরের ওপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠে বললেন, এ জিনিসটা আপনি পেলেন কোথায়?

সুশীলের আর্টিস্ট বন্ধু বললে, ওটা ওদের বংশের জিনিস। ওরা পল্লিগ্রামের প্রাচীন ধনী বংশ।

ড. বসু সন্দিগ্ধ মুখে বললেন, কিন্তু এ তো তা নয়। এ যে বহু পুরোনো জিনিস। এ আপনারা পেয়েছিলেন কোথায়—তার ইতিহাস কিছু জানেন? যদি বলতে বাধা না থাকে—

সুশীল বললে, না ড. বসু, আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। আপনি কী আন্দাজ করছেন?

ড. বসু বললে, দেখুন সিলমোহরের ওপর এ চিহ্ন আমি নিজে কখনো দেখিনি—তবে এই ধরনের পাথরের ওপর সিলমোহর ওঙ্কারভাটে পাওয়া গিয়েছে। ফরাসি ইন্দোচীনের জঙ্গলের মধ্যে পুরোনো নগরের ধ্বংসস্তূপে। এর সময় নির্দিষ্ট হয়েছে মোটামুটি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। আমাদের মিউজিয়ামেও আছে। কাল যাবেন, দেখাব। কিন্তু আপনার এটা আরও পুরোনো, আমি একে নির্ভয়ে নবম শতাব্দীতে ফেলে দিতে পারি—কিংবা তারও আগে।

সুশীল বললে, আপনার তাই মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। নইলে বলতাম না। আর সেইজন্যেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি—আপনাদের পূর্বপুরুষ

এটা পেলেন কী করে? এ হল সমুদ্রপারের জিনিস। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের আমগাছের ছায়ায় শান্ত ও নিরীহ জিনিস নিয়ে কারবার—কিন্তু সিলমোহরের পেছনে রয়েছে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার দুর্দান্ত সাহস, দুর্জয় বিক্রম, যুদ্ধ, রক্তপাত। ভারতবাসী যেদিন সমুদ্রের ওপারে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেইসব দিনের ইতিহাসও সিলমোহরের সঙ্গে জড়ানো। তাই বলছি—এটা আপনারা পেলেন কী করে?

ওখান থেকে বার হয়ে আসবার সময়ে সুশীলের মনে টাকার স্বপ্ন ছিল না।

ছিল সে সুদূরের দুঃসাহসিক অভিযানের স্বপ্ন—জামাতুল্লা খালাসির অত বড়ো পদ্মরাগ মণিখানার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সে এমন একদিনের স্বপ্ন—যা প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে, তরুণদের প্রাণে নতুন আশা, উৎসাহ ও আনন্দের সংবাদ আনে বয়ে—

তবু তা সুশীলের মনে যে ছবি জাগাল, তা আদৌ স্পষ্ট নয়—সবই আবছায়া, সবই ধোঁয়া ধোঁয়া। সুশীল ইতিহাসের ছাত্র নয়। ড. বসুর শেষ কথা কটির সঙ্গে যেন এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক শক্তি মেশানো ছিল—তাই চোখের সামনে প্রাচীনকালের সুদীর্ঘ অলিন্দ বেয়ে তলোয়ার হাতে বর্মে বর্মে সুসজ্জিত বীরের দল সারি সারি চলেছে, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না—অজানা সমুদ্রপথে তাদের বিজয় অভিযান নব উপনিবেশের ইতিহাস সৃষ্টি করে ভাবীকালের অসহায় ও অকর্মণ্য সন্তানদের শিরায় শিরায় নতুন রক্তের আলোড়ন এনে দেয়।

কোথায় সে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে, পুরোনো জমিদারঘরের বিলাসপুষ্ট আয়েসি ছেলেটি সেজে—তাদেরই পূর্বপুরুষ একদিন যে অসি হাতে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে ছিল—তাদেরই স্বজাতি, স্বদেশবাসী—আর সে থাকবে দিব্যি আরামে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে, তেলে-জলে, দাদখানি চালের ভাত আর মাছের ঝোলে কোনোরকমে পৈতৃক বাঙালি প্রাণটুকু বজায় রেখে চলবে টায় টায়!

চিরকাল হয়তো এমনি কেটে যাবে তার। প্রজা ঠেঙিয়ে, খাজনা আদায় করে, পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টেনে আর পালা-পার্বণে গ্রাম্য লোকজনের পাতে দই মোন্ডা দিয়ে হাততালি অর্জন করবার প্রাণপণ চেষ্টায় মশগুল হয়ে।

তারপর আছে মামলা-মোকদ্দমার তদারক করতে কোর্টে ছুটোছুটি—ডিক্রি, নালিশ, কিস্তিবন্দি, সইমোহরের নকল সমন জারি—উঃ! ভাবলে তার গা কেমন করে। প্রাচীন ধনী বংশের লাল খেরো-বাঁধানো রেকর্ড ও খাতিয়ানের চাপে সে নিজের যৌবন ও জীবনকে একদম পিষে মেরে ফেলে শেষের দিকে যখন মহকুমার হাসপাতালে একটিমাত্র রোগী থাকবার স্থানের টাকা জেলাবোর্ডের হাতে দেবে স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষা কল্পে—তখন হয়তো সে পাবে রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর খেতাব।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভাববে—এই তো জীবনের পরম সার্থকতা সে পেয়ে গেছে।

না দেখবে দুনিয়া—না দেখবে জীবন, ঠুলিপরা বলদের মতো ঘানিগাছের চারিধারে ঘুরেই জীবন কাটিবে।

রাত্রে সে সনৎকে ডেকে বললে, সনৎ, তোর সাহস আছে?

—কেন দাদা?

—আমি যদি বিদেশে বেরুই, আমার সঙ্গে যাবি?

—এখুনি—যদি নিয়ে যাও!

—অনেক দূর হলেও?

—যেখানে বলো।

—বাড়ির জন্যে মন কেমন করবে না?

—আমি পুরুষমানুষ না দাদা? ও কথাই ওঠে না।

—আমি এমনি জিজ্ঞেস করছি—

পরদিন সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়ল পুরোনো দিনের বৃহত্তম ভারতের ইতিহাস। যেসব কথা সে জানত না, কোনোদিন শোনেনি—ড. বসুর কথায় তার ইচ্ছে গেল সেগুলো জানবার ও পড়বার।

বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের অভিযান, চম্পারাজ্যের কথা—সুদূর সমুদ্রপারের ভারতীয় উপনিবেশ চম্পা। ভারতবাসী অসির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ দিয়ে যে দেশের মাটি-পাথরের গায়ে নাগরাজ-বাসুকি, শিব-পার্বতী ও বিষ্ণুমূর্তি অমর করে রেখেছে।

জামাতুল্লা খালাসিকে সে একশোবার ধন্যবাদ জানাল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়তে পড়তে।

সে তো এক পাড়াগাঁয়ে অলস জীবনযাপন করেছিল—

কোনোদিন এসব কথা সে জানতেও পারত না, এত বড়ো ছবি তাঁর মনে কোনোদিন জাগতও না—যদি দৈবক্রমে জামাতুল্লা খালাসি সেদিন তার পাশে এসে বসে দেশলাই না চাইত।

তুচ্ছ এক পয়সার দেশলাই।

পড়ার টেবিলে বসে বসেই সুশীলের হাসি পেল কথাটা ভেবে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে বার হয়েই জামাতুল্লা খালাসির সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মাঠের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে আছে। সুশীলকে দেখে সে বললে, আসুন বাবু, কাল রাতে এক কাণ্ড হয়ে গেছে!—আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে—

সুশীল বাধা দিয়ে বললে, কী—কী?

জামাতুল্লা বললে—সে এক আজগুবি কাণ্ড বাবু—

—কীরকম ব্যাপার?

—আপনার সেই বন্ধুর বাড়ি থেকে পাথরখানা নিয়ে কাল ফিরছি বাবু, মেটেবুরুজের কাছে ছোটো মোল্লাখালি বলে যে বস্তি, সেই বস্তির কাছে আমার এক দোস্ত থাকে। ভাবলাম, চা খেয়ে যাই। সেখানে একেবারে মানুষ নেই—ফাঁকা মাঠ, সিকি মাইল দূরে ছোটো মোল্লাখালি বস্তি। হঠাৎ বাবু আমার মনে হল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কে যেন আমার গলা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে—আমি তো চেঁচিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু পড়ে গেলাম চিৎপাত হয়ে মাঠের মধ্যে—পেছনে সে সময় পায়ের শব্দ শুনলাম যেন—

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বললে, পাথরখানা আছে তো?

—শুনুন বাবু, তারপর। আমি এমন কাণ্ড কখনো দেখিনি। চিৎপাত হয়ে পড়ে আর জ্ঞান নেই। যখন

জ্ঞান হল তখন দেখি আমার চারপাশে দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে, তারা কেউ পানি এনে আমার চোখে-মুখে দিচ্ছে, কেউ গামছা নেড়ে বাতাস করছে। আমার দোস্তের নাম বলতে তারা আমায় ছোটো মোল্লাখালি নিয়ে গেল তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে যখন আমার হুঁশ বেশ ভালো ফিরে এল, আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি—পাথরখানা নেই।

—বলো কী? নেই! গেল সেখানা!

—শুনুন বাবু, আজগুবি কাণ্ড! পাথর নেই দেখে তো আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দোস্তের বাড়ি তো শোরগোল পড়ে গেল। কত লোক দেখতে এলে, আমার দোস্ত কতবার মুখে-চোখে পানি দিয়ে ডাক্তার ডেকে আমায় চাঙ্গা করলে। আমি সেই রাত্রেই বাড়ি চলে গেলাম—

—তারপর?

—বাবু, আপনি বলুন একটা কথা। আমি কাল আপনার দোস্তের কাছে দেখাতে গিয়েছিলাম কী নিয়ে? যে ছাঁচ তৈরি হয়েছিল তাই নিয়ে—না আসল পাথরখানা নিয়ে? আপনার ওই যে দোস্ত খুব এলেমদার লোক, তার কাছে?

—ও, ড. বসুর কাছে তুমি আসল পাথরখানা নিয়ে গেছলে।

—ছাঁচখানা নিয়ে যাইনি তো? কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখি আসল পাথরখানা পকেটে রয়েছে, ছাঁচখানা নেই।

সুশীল হো-হো করে হেসে বললে, এ কোনো আজগুবি কাণ্ড হল না জামাতুল্লা। তুমি দুখানাই নিয়ে গেছলে। যে তোমার গলা টিপেছিল সে ছাঁচখানাকে ভুল করে নিয়ে গেছে—আসলখানা তোমার পকেটেই রয়ে গিয়েছিল। কোন পকেটে কোনটা রেখেছিলে মনে আছে?

—বাবু, আমি ছাঁচটা নিয়েই যাইনি।

—আমি বলছি শোনো। তুমি ভুলে দুটোই নিয়ে গেছলে। কিন্তু এ থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে। কেউ আমাদের পাথরের খবর পেয়েছে—কলকাতা গুন্ডা-বদমাইসের জায়গা—আমরা কদিন ধরে এখানে পাথরের কথা বলেছি, তত সাবধান হইনি। এখানেও শুনতে পারে; সেদিন ড. বসুর ওখানে দুটো আরদালি দাঁড়িয়েছিল—আমার সন্দেহ হয়, তাদের মধ্যে কেউ শুনতে পারে। যাক, ভালোই হয়েছে যে আসলখানা চুরি যায়নি! আজ তোমার সঙ্গে নেই তো সেখানা?

—না বাবু। আমি কি আর তেমনি উজবুক?

—লোক লেগেছে আমাদের পেছনে। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে।

জামাতুল্লা হেসে বললে, বাবু, লোক লেগে আমায় হঠাৎ কিছু করতে পারবে না। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি, কত বদমাইস লোকের সঙ্গে কতবার কারবার করেছি। এই হাত দুটো যে দেখছেন—এ দুটো ঠিক থাকলে এর সামনে কেউ এগুতে পারবে না জানবেন খোদার দোওয়ায়।

সুশীল একবার চেয়ে দেখলে, কোনোদিকে কোনো লোক নেই। সঙ্গীকে চুপিচুপি বললে, এসব কথা এখন নয়। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

—কোথায় বাবুজি?

—আমার বাসায়। সেখানে ঘরের মধ্যে বসে সব কথা হবে এখন।

জামাতুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সুশীল তাদের বাসায় এল। আসার পথে কোনো কিছু অঘটন ঘটেনি দেখে সুশীলের মন থেকে ভয় ও বিপদাশঙ্কা অনেকখানিই চলে গেল। জামাতুল্লাকে কিছু খেতে দিয়ে ও তার জন্যে বাইরের ঘরের কোণে বিছানা করে দিলে।

জামাতুল্লা বললে, বাবুজি, বিছানা কেন?

—রাত্রে এখানে তোমায় রাখব। যেতে দেব না মেটেবুরুজে। সাবধানের মার নেই। খিদিরপুরের মাঠ থেকে মেটেবুরুজ পর্যন্ত জায়গা বড্ড নির্জন—গুন্ডা-বদমাইসদের আড্ডা। রাত্রে সে-পথে গেলে বিপদ আছে। তোমার যত সাহসই থাকুক, রাত্রে যাওয়া হবে না।

সুশীলের এ সতর্কতার জন্যে জামাতুল্লাকে বললে, আমার মতলব তোমাকে বলব বলেই তোমায় ডেকেছি। আমার মনে হয়েছে—আমরা যে করেই হোক, চলো সেই বনের মধ্যে প্রাচীন নগরের সন্ধানে বেরুই। টাকাকড়ির সন্ধান আমি করছিনে—পাই ভালো, তা আমি একা নেব না—নটরাজনের স্ত্রীর শেষ দিনগুলো যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটে, তার ব্যবস্থা করব তা দিয়ে। তারপরে তুমি আছ, আমি আছি। ভগবানের আশীর্বাদে আমার ঘরে খাবার ভাবনা নেই।

জামাতুল্লা খালাসি ঘাড় নেড়ে বললে, সে আমি আগেই জানি বাবু, আপনি রইস আদমি—মানুষ দেখেই চিনতে পারি। নইলে আপনাকে এত বিশ্বাস করতাম না। বড়ো ঘরানা আপনার, আপনাদের নজর হবে বড়ো।

—তা ছাড়া কী জানো জামাতুল্লা? এই বয়স হচ্ছে বিদেশ বেড়ানোর সময়। চিরকাল বাড়ি বসে থাকব যদি, তবে দুনিয়া দেখবে কবে? তোমার সাহস আছে আমায় সেখানে নিয়ে যাবার তো?

—এ বাবুজি সাহসের কথা নয়। জাহাজ চালানো বিদ্যের কথা—কৌশলের কথা। সিঙ্গাপুরে আমার এক দোস্ত আছে তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সে সুলু-সিতে জাহাজ চালিয়েছে অনেকদিন। আপনার কাছে ছিপাবো না, বোম্বেটের কাজ করত সে। এখন বড্ড কড়া শাসন, ওলন্দাজ সরকার আর আমাদের ইংরাজ সরকারের। মানোয়ারি জাহাজ সর্বদা ঘুরছে। বোম্বেটে জাহাজ ধরতে পারলেই ধরে নিয়ে আসবে, আর গুলি করবে। সেজন্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকান করে বসে আছে সিঙ্গাপুরে। তাকে সঙ্গে নিতে হবে।

—তাহলে কীরকম ব্যবস্থা করবে যাবার?

—আপনি টাকা কত নিতে পারবেন বলুন?

—শ-পাঁচেক। তার বেশি এক পয়সা নয়।

—তাও নেবেন না। আপনি আমার দোস্ত—দুশো নিয়ে চলুন। আমি পাথর বিক্রি করে ফেলি—সেই টাকায় চালাব।

—সে টাকা তোমায় আমি নিতে দেব না জামাতুল্লা। নটরাজনের স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সে পাথর নিয়ে আমাদের ফল ভালো হবে না। নটরাজন স্বর্গ থেকে দেখবে আর অভিশাপ দেবে।

—এইজন্যেই তো বলি, রইস আদমির বুদ্ধি আর আমাদের বুদ্ধি! আপনি যা বলবেন বাবুজি।

অনেক রাত হয়েছিল। জামাতুল্লার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দিয়ে সুশীল নিজে শোবার জন্যে চলে গেল বটে, কিন্তু তার সারারাত ঘুম এল না চোখে। এবার কী ক্ষণে সে বাড়ি থেকে বার হয়েছিল। সাগর-পারের যাত্রী হয়ে যদি সেই অজানা দ্বীপে অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন যুগের হিন্দু-কীর্তি শুধু চোখের দেখা দেখে

আসতে পারে, তবেই সে জীবন সার্থক বিবেচনা করবে। চম্পারাজ্যের মতো সেখানেও আর এক হিন্দু উপনিবেশ ছিল নিশ্চয়ই—মহাকালের চক্রনেমিময় আবর্তনে অরণ্য গ্রাস করেছে সে নগরী। তবুও ভারতের সন্তান সে, প্রাচীন যুগের সেই পুণ্যভূমির পবিত্র ধূলি স্পর্শ করে সে ধন্য হতে চায়।

অর্থের জন্যে সে যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে উঠে সুশীল জামাতুল্লাকে চা ও খাবার খেতে দিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে বসেছে, এমন সময় কাগজওয়ালা খবরের কাগজ দিয়ে গেল; সুশীল কাগজ খুলে সংবাদগুলোর ওপর সাধারণভাবে চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত সুরে বলে উঠল, জামাতুল্লা! আরে, তোমাদের মেটেবুরুজে খুন!

জামাতুল্লা চা খেতে খেতে উঠে চমকে বললে, কোথায় বাবু, কোথায়!

—দু-নম্বর মফিজুল সর্দারের লেন, একটা কুঠুরিতে নূর মহম্মদ নামে একটা লোককে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—

সুশীল কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখলে, জামাতুল্লা তালপাতার মতো কাঁপছে। অতি কষ্টে সে সুশীলকে জিজ্ঞেস করলে, কী নাম লোকটির বাবুজি?

—নূর মহম্মদ—

জামাতুল্লা চা ফেলে উঠে এসে সুশীলের হাত ধরে বললে, আপনি আমার সবচেয়ে বড়ো দোস্ত, কাল এখানে রেখে আপনি আমার জান বাঁচিয়েছেন! নূর মহম্মদ আমার ঘরেই থাকে। এক বিছানাতে দুজন শুই, কাল আমি থাকলে আমাকেই মারত, আমি ভেবে ভুল করে ও বেচারিকে খুন করে গিয়েছে—

সুশীল বললে, তুমি এখুনি বাড়ি যাও—সেই জিনিসটা—

—না বাবু, সে আমি অন্য জায়গায় রেখেছি, সেখান থেকে কেউ সেটা বের করতে পারবে না।

সুশীল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, তবুও একবার যাও—

—সেটা নিয়ে বাবুজি আপনাদের বাড়িতে রেখে দিন আপনি—মেহেরবানি করে যদি রেখে দিন—

—নিশ্চয় রাখব। তুমি একা যেয়ো না—চলো, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আমার ভাই সনৎকে সঙ্গে নেব।

পাথরখানা এনেই সুশীল কয়েকদিনের মধ্যে তার আরেকখানা ছাঁচ করিয়ে নিয়ে সেখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এল। ওসব জিনিস সঙ্গে রাখলেই যত গোলমাল।

কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখবার কয়েকদিন পরেও ঘটে গেল এক বিপদ।

সুশীল তখন হাজার দুই টাকার ব্যবস্থা একরকম করে ফেলেছে। তার কাকাই টাকাটা তাকে দেবেন, তবে সে বলেছে—ব্যবসার জন্যই ওটা দরকার। বিদেশে যাওয়ার কথা শুনলে কেউ উৎসাহ দিত না। ওর সঙ্গে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাজি—সনৎ একথা জানিয়েছে।

সুশীল বউবাজার দিয়ে গিয়ে জামাতুল্লাকে ট্রামে দিয়ে এল। ট্রাম পরবর্তী থাকবার জায়গায় যাবার পূর্বেই ট্রামে শোরগোল উঠল।

জামাতুল্লা ট্রামের বেঞ্চিতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের একজন লোক নেমে গেল, নেমে যাবার সময় একবার যেন তার হাতখানা জামাতুল্লার পিঠের দিকে ঠেকল—অন্তত জামাতুল্লার তাই মনে হল। পরক্ষণেই জামাতুল্লা রক্তাক্ত দেহে চিৎপাত ট্রামের মেঝেতে।

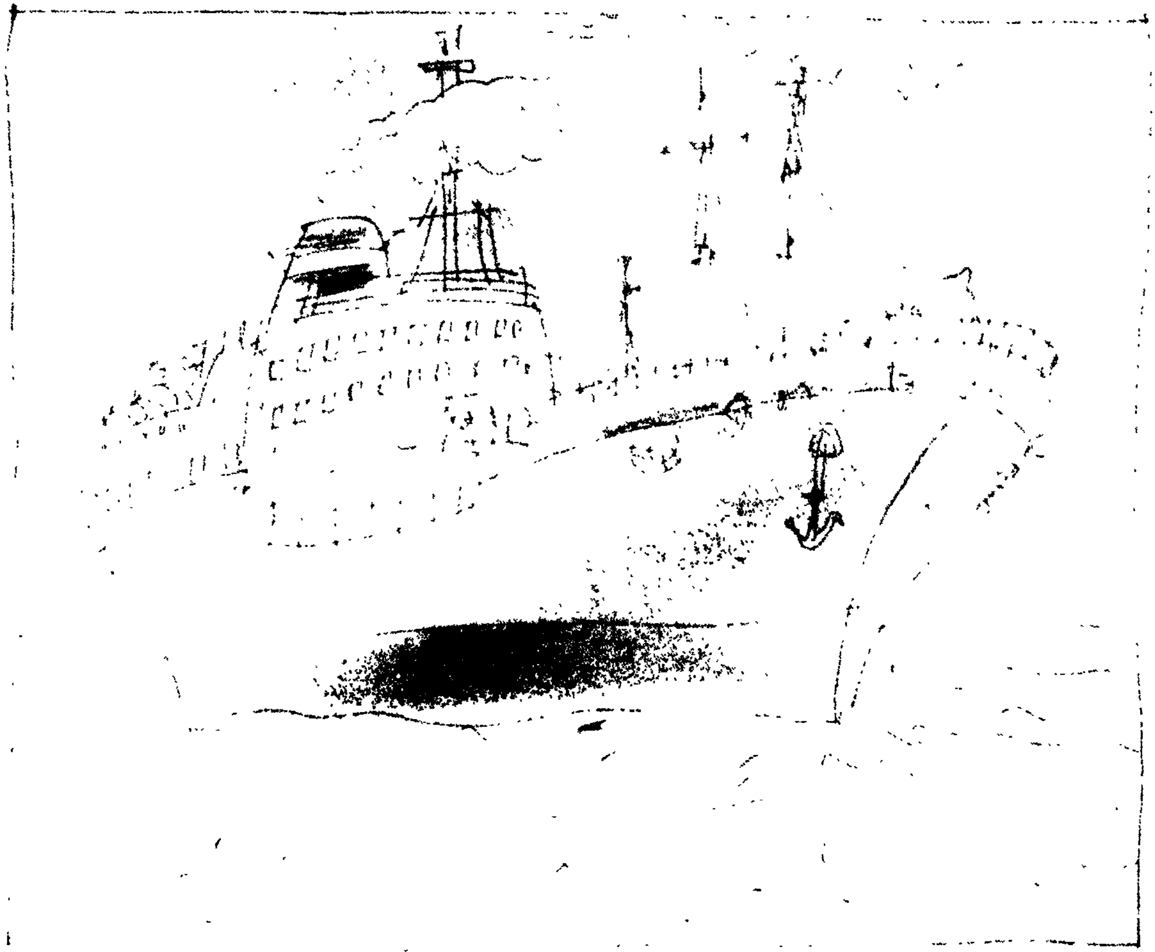

লোকজন হইহই—পুলিশ! পুলিশ! সবাই মিলে ওকে ধরাধরি করে নামিয়ে ফেললে।

শেষে দেখা গেল ওর বিশেষ কিছু লাগেনি এবারও। একখানা ধারালো ছুরি দিয়ে বোধ হয় আততায়ী কোমরের থলে কাটতে চেষ্টা করেছিল। ছুরিখানা দৈবাৎ পাশের দিকে লেগে খানিকটা অগভীর রেখা সৃষ্টি করে লম্বালম্বিভাবে কেটে গিয়েছে।

এই ঘটনার ঠিক সাতদিন পরে সুশীল, সনৎ ও জামাতুল্লা তিনজনে একখানা রেঙ্গুনগামী জাহাজে চড়ে বসল, আপাতত সিঙ্গাপুর এবং সেখান থেকে ব্যাটেভিয়া যাবে—এই হল উদ্দেশ্য ওদের।

মাস দুই পরের কথা। সকালেবেলা।

সুশীল সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একটি ছোটো শিখ হোটেলের একটা ঘরে বসে সনৎকে বলছিল, আমরা এখানে এসে ভালো করলাম কি মন্দ করলাম, এখনও বুঝিনি সনৎ। জামাতুল্লার বোম্বেটে বন্ধু তো দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির লোক; ও হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। ওকে কি খুব বিশ্বাস করা উচিত হল?

—বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী দাদা? ও ছাড়া সুলু সমুদ্রে জাহাজ চালাবে কে? তবে আমার মনে হয়—যখন আমাদের কাছে এমন কোনো মূল্যবান জিনিস নেই—তখন সে অনর্থক মানুষ খুনের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে যাবে কেন?

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা তার বোম্বেটে বন্ধু মি. ইয়ার হোসেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল; ইয়ার হোসেন ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে একটা চুল-ছাঁটা দোকান করে ভাড়াটে চীনে নাপিত দিয়ে চুল ছাঁটায়—রোজগার মন্দ হয় না। বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর বয়স হবে, রোগা চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভালোমানুষ ও নিরীহ ধরনের বলে মনে হয়—পরনে সাহেবি পোশাক। লোকটা ভারতীয় নয়, মালয়ও নয়—কোন দেশের লোক তা কখনো বলেনি। তবে তার কথাবার্তা থেকে মনে হয় ভারতের ওপর টানটা তার বেশি। কথাবার্তা বলে ইংরেজিতে, নয় মালয় ভাষায়। তার ভাঙা ইংরাজি জামাতুল্লা বেশ বোঝে।

এ ধরনের লোকের সঙ্গে কখনো সুশীল বা সনৎ-এর পরিচয় ঘটেনি ইতিপূর্বে। বাইরে মোটামুটি ভদ্রলোক, এমনকী বেশ নিরীহ প্রকৃতির প্রৌঢ় ভদ্রলোক, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইয়ার হোসেন দুর্দান্ত দস্যু। মুহূর্তের মনোমালিন্যের ফলে যারা বন্ধুর বুকে অতর্কিতে তীক্ষ্নধার কিরীচ বসিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না—এ সেই জাতীয় লোক।

ইয়ার হোসেন ঘরে ঢুকে বললে, বসে আছেন? আমায় আর দুশো দিতে হবে—দরকার রয়েছে।

সুশীল জামাতুল্লার মুখের দিকে চাইলে অতি অল্পক্ষণের জন্যে। জামাতুল্লা চোখের ইঙ্গিতে তাকে বলে দিলে—ইয়ার হোসেনকে যেন সে প্রত্যাখ্যান না করে!

—কত টাকা বললেন মি. হোসেন?

—দুশো কি আড়াইশো—

—বেশ, নেবেন। সেদিন নিয়েছেন একশো—

ইয়ার হোসেন যেন খানিকটা উদ্ধত সুরে বললে, নিয়েছি তো কী হবে? তোড়জোড় করতেই সব টাকা যাচ্ছে—

—জাহাজের কী হল? চার্টার করবেন?

—জাহাজ চার্টার করবার টাকা কোথায়? কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা বলি। আপনারা সে বিষ্মমুনির দেশে যেতে চাইছেন কেন? টাকা-কড়ি হিরে-জহরত সেখানে সত্যি আছে?

—কী করে বলি সাহেব! তবে, তোমার কাছে লুকাব না। খুব বড়ো রত্নভাণ্ডার সেখানে লুকানো আছে। এই আমাদের বিশ্বাস। এই মণির আঁকজোঁক আছে—ওটাই তার হদিস, অন্তত নটরাজন তাই বলেছিল।

—আমি চেষ্টা করে দেখব—কিন্তু আমার ভাগ—ঠিক তিন ভাগের এক ভাগ চাই। ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলেই বিপদ ঘটবে। এই হাতে অনেক মানুষ খুন করেছি—সেকথা কে না জানে? মানুষ মারাও যা, আমার কাছে পাখি মারাও তা।

সুশীলের গা যেন শিউরে উঠল। কাজের খাতিরে এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আজ তাকে মিশতে হচ্ছে—ভাগ্য কী জানি কোন পথ তাকে নির্দেশ করছে! মুখে বললে, না সাহেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—ফাঁকি তুমি পড়বে না।

ইয়ার হোসেন বললে, একটা গল্প বলি, শোনো তবে। একবার আমার জাহাজে ছ-সাতজন মাল্লা মদ খেয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। তাদের দলে একজন সর্দার ছিল, সে এসে আমায় জানালে, এই-এই শর্তে আমি রাজি না হলে তারা আমার হাত-পা বাঁধবে—মেরে ফেলতেও পারে। আমি ওদের সান্ত্বনা দিয়ে শর্তে সই করে দিলাম। তারপর ইঞ্জিনরুমের বড়ো কর্মচারীকে ডেকে বললাম—জাহাজে কয়লা দিয়েই স্টিম ফার্নেসের মুখ খুলে রাখবে।

ইঞ্জিনিয়ার বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিয়ে চেয়ে বললে, কেন কাপ্তেন সাহেব—এ তো বিপজ্জনক ব্যাপার—সেই ভীষণ উত্তাপে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখব?

সে বেচারি আমার মতলব কিছু বুঝলে না। আমি সেই বিদ্রোহী সর্দারকে আর তার চারজন অনুচরকে বললাম ফার্নেসে কয়লা দিতে। এদিকে ইঞ্জিনরুমে টেলিগ্রাফে ইঞ্জিনিয়ারকে পুরোদমে স্টিম দিতে বলেই ওরা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে পুলি ঘুরিয়ে জাহাজ প্রায় পঁচিশ ডিগ্রি কোণ করে স্টারবোর্ডের দিকে কাত করে ফেললাম। টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ গিয়ে পড়ল খোলা ফার্নেসের মুখে। লোক ঠিক করা ছিল, তক্ষুনি তারা ওদের ফার্নেসের আগুনে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে ফার্নেসের দরজা ঘটাং করে বন্ধ করে দিলে।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, তারপর?

—তারপর? তারপর দু-দিন পরে কতকগুলো আধপোড়া হাড়, পোড়া কয়লার ছাইয়ের সঙ্গে ফার্নেস সাফ-করা কুলি সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। মিউটিনি শেষ হয়ে গেল।

—কেউ টের পেলে না?

—সবগুলো বদমাইস যখন ওপথে গেল—তখন বাকিগুলো আপনাআপনিই চুপ করে গেল। ভালমানুষির দিন চলে গিয়েছে জানবেন। নিষ্ঠুর হতে হবে, নির্মম হতে হবে—তবে মানুষের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পারবেন।

সুশীল বুঝল না এমন নিরীহ ভালোমানুষটির আড়ালে কী করে এমন দৃঢ় ও নির্মম চরিত্র লুকানো থাকতে পারে!

—আর একটা কথা, অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে আপনাদের?

—কিছু না, একটি করে অটোমেটিক আছে দুজনের—তার কার্টিজ নেই।

—রাইফেল নেই?

—ভারত থেকে রাইফেল কেনা? মি. হোসেন, এবার আপনি হাসালেন।

ইয়ার হোসেন দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা বড়ো রিভলভার নিয়ে এসে সুশীলের হাতে দিয়ে বললে, পছন্দ হয়?

—ওঃ, এ তো চমৎকার জিনিস।

—এই কিনব তিনটি তিনজনের আর একটা পুরোনো মেশিনগান—

—মেশিনগান কী হবে?

—অনেক দরকার আছে।

সুশীল ও সনৎ দুজনেই দেখলে, সে অনেকরকম জানেশোনে। জাহাজ চালানোর যন্ত্রাদি কিনবার

সময়, তার যে কিছু কিছু বিজ্ঞানের জ্ঞানও আছে—এ পরিচয়ও পাওয়া গেল। চালচলনে, ধরন-ধারণে—সে সর্বদাই মনে করিয়ে দেয় যে, সে সাধারণ নয়।

সুশীল জামাতুল্লাকে বললে, তুমি বলেছিলে দুশো টাকা হলেই হবে—এখন দেখছি পাঁচশো টাকাই মি. হোসেন নিয়ে নিলে নানা ছুতো করে; হাতে কিন্তু এক পয়সাও রইল না—

—কোনো ভয় নেই বাবুজি, আমি যখন আছি। ও তেমন লোক নয়!

—লোক নয় কীরকম? ভয়ানক লোক, আমরা বুঝেছি। ও দরকার মনে করলে তোমার মতো পুরোনো বন্ধুর গলা কাটতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

—বাবুজি দেখছি ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

—তা একটু পেতে হয়েছে। টাকাটা ও মেরে দেবে না তো? তুমি হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে ওর পেছনে।

—বাবুজি, আমি হাজার পেছনে থেকেও কিছু করতে পারব না—ও যদি ইচ্ছে করে, তবে সিঙ্গাপুর থেকে আজই পালিয়ে যেতে পারে, কেউ পাত্তাই পাবে না! ইয়ার হোসেন ছাঁচটার কথা জিজ্ঞেস করেছিল—

—তুমি কী বললে?

—বললাম, বাবুর কাছে আছে।

—মতলব কী?

—না বাবু, খারাপ কিছু নয়—ও একবার দেখতে চায়।

—ভাগ্যিস আসল পদ্মরাগখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়! নইলে সেই পাথর নিয়ে কলকাতাতেই খুন হয়ে গেল মেটেবুরুজে। এখানে আনলে সে পাথর আমরা হাতে রাখতে পারতাম না!

জামাতুল্লা গলার স্বর নিচু করে বললে, বাবুজি, এখানেও লোক পেছন নিয়েছে।

সুশীল ও সনৎ একযোগে সবিস্ময়ে বলে উঠল, কীরকম!

—এখন বলব না, আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন। সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে দিনদুপুরে মানুষের বুকে ছুরি বসায়—পরে শুনবেন।

সিঙ্গাপুরে যেদিকে বড়ো ডক তৈরি হয়েছে, ওর কাছে অনেক দূর পর্যন্ত সামরিক ঘাঁটি। সাধারণ লোককে সেসব রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। জামাতুল্লাকে পথপ্রদর্শকরূপে নিয়ে দুজনে সেই দিকে বেড়াতে বেরোল। সমুদ্রের নীল দিগন্তপ্রসারী রূপ এখান থেকে যেমন দেখায়, এমন আর কোথাও থেকে নয়। দুপুরের কাছাকাছি সময়টা প্রখর রৌদ্রকিরণে সমুদ্রজল ইস্পাতের ছুরির মতো ঝকঝক করছে। দুখানা মানোয়ারি জাহাজ বন্দর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

একজন চীনেম্যান এসে ওদের পিজিন ইংলিশে বললে, টি, স্যার, টি?

—নো টি।

—নো টি স্যার? মাই হাউস হিয়ার স্যার, ভেরি গুড হোম-মেড টি স্যার!

সনৎ বললে, চলো দাদা, চলো জামাতুল্লা, একটু খেয়ে আসি।

সবাই মিলে রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা চীনা বাঁশঝাড়ের আড়ালে একটা অ্যাসবেস্টস-এর ঢেউখেলানো পাত দিয়ে ছাওয়া ছোটো বাড়িতে এল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাঁশের টেবিল পাতা আছে বারান্দায়। তিনজনে সেখানে বসে দূরে সমুদ্রের দৃশ্য দেখছে, এমন সময় চীনেম্যানটি চা নিয়ে এল। ওরা

চা খাচ্ছে, সে লোকটা আবার কিছু কেক নিয়ে এসে ওদের সামনে রাখলে। ওদের বললে, তোমরা কোথায় যাবে?

সুশীল বললে—বেড়াতে এসেছি।

—কোথা থেকে?

—কলকাতা থেকে।

—ভেরি গুড। চমৎকার জায়গা সিঙ্গাপুর। এখান থেকে আর কোথাও যাবে নাকি?

—না, আর কোথাও যাব না।

—ভালো কিউরিও কিনবে?

—কী জিনিস?

—এসো না ঘরের মধ্যে।

ওরা তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বুদ্ধের মূর্তি, মালা, ড্রাগনের মূর্তি, পোর্সিলেনের পেটমোটা চীনে ম্যান্ডারিনের মূর্তি ইত্যাদি সাধারণ শৌখিন জিনিস আলমারিতে সাজানো—ওরা হাতে করে দেখছে, এমন সময়ে সনৎ একটা জিনিস হাতে নিয়ে অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল, দাদা দেখো!

সুশীল ও জামাতুল্লা দুজনেই চেয়ে দেখলে—একখানা জেড পাথরে তৈরি ছুরির গায়ে কী আঁক-জোঁক কাটা। ভালো করে দুজনেই দেখলে, অবিকল সেই আঁকজোঁক—নটরাজনের পদ্মরাগ মণির গায়ে যে আঁকজোঁক ছিল।

ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল।

সুশীল বললে, এ ছুরিখানার দাম কত?

—দু-ডলার, মিস্টার!

—এ ছুরি তুমি কোথায় পেলে?

—দেখি ছুরিখানা! ও, এ আমি একজন মালয়ের কাছে কিনেছিলাম।

—এখানেই?

—হ্যাঁ, একজন মাল্লা ছিল সে।

—কোথা থেকে সে ছুরিখানা পেয়েছিল তা কিছু বলেনি?

—না মিস্টার, তবে ছুরিখানা সে ভয়ে পড়ে বিক্রি করে। সে বলেছিল দু-দুবার সে প্রাণে মরতে মরতে বেঁচে যায়, ছুরিখানার জন্যে। তার পেছনে লোক লেগেছিল। লুকিয়ে আমার কাছে বিক্রি করে। কেউ জানে না যে এখানা আমার কাছে আছে।

—আমরা এখানা নেব!

—ওখানা বিক্রি হবে না।

—আমরা তিন ডলার দেব।

—নিয়ে বিপদে পড়বে তোমরা। ও নিয়ো না।

—তোমার দোকানের জিনিস বিক্রি করতে আপত্তি কী?

—আমি আর খরিদ্দারকে বিপদে ফেলতে চাইনে। শোনো মিস্টার, আমি জানি ও ছুরি কেন নিতে

চাইছ। ওই আঁকজোঁকগুলোর জন্যে—ঠিক কি না? প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে অনেকে জানে ওই আঁকগুলো কোথাকার এক গুপ্ত নগর আর তার ধনভাণ্ডারের হদিস। সকলে জানে না বটে, তবে পুরোনো লোক কেউ কেউ জানে। অনেক পুরোনো জেড পাথরের আংটিতে ওই আঁকজোঁক আমি দেখেছি। ও নিয়ে একটা গুপ্ত সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়ের বাইরে আর কারো কাছে এই আঁকজোঁকওয়ালা আংটি, কি ছুরি, কি কিরিচ দেখলে তারা পেছনে লেগে গুপ্তহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে—তবে তাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে, জিনিসটাকে হস্তগত করা।

—কেন?

—পাছে অন্য কেউ ওই আঁকজোঁকের হদিস পেয়ে সেই প্রাচীন নগর আর তার গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করে ফেলে। ওরা নিজেরা যখন বের করতে পারলে না, তখন আর কাউকে ওরা খোঁজ করতেও দেবে না। ও জিনিস কাছে রাখা মানে প্রাণ হাতে করে বেড়ানো। কিন্তু আমার মনে হয় কী জানো, মিস্টার? ওরকম নগর কোথাও নেই। ও একটা মিথ্যা প্রবাদের মতো এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কেউ দেখেছে এ পর্যন্ত বলতে পার? কেউ বলতে পারে সে দেখেছে? কেউ সন্ধান দিতে পারে? ও একটা ভুয়ো গল্প।

চা খেয়ে বাইরে এসে তিনজনে সমুদ্রের দিকে চলল।

চীনেম্যানটি পিছন থেকে ডেকে বললে, ওদিকে যেয়ো না মিস্টার, সামরিক সীমানা—যাওয়া নিষেধ। সমুদ্রের ধারে এদিকে বসবার জায়গা নেই।

একটু নির্জন স্থানে গিয়ে সুশীল বললে, জামাতুল্লা, শুনলে সব কথা? এখনও কি তোমার মনে হয় সে নগর আছে কোথাও? আমরা আলেয়ার পেছনে ছুটছিনে? নটরাজনের গল্প ভুয়ো নয়?

জামাতুল্লা বললে, তবে পদ্মরাগমণি এল কোথা থেকে?

—মণিখানা সে কোনোপ্রকার অসৎ উপায়ে হস্তগত করে, যার ওপরে প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী ওই চিহ্নটি আঁকা ছিল। এ ছাড়া ওর কোনো মানে নেই।

জামাতুল্লার ভাব হঠাৎ যেন বদলে গেল। কত বৎসর পূর্বের এক স্বপ্নভরা দিন, এক আতঙ্কভরা কৃষ্ণা-রজনীর স্মৃতি তার মুখের রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে।

সে বললে, কিন্তু বাবুজি, নটরাজন হয়তো দেখেনি, আমি তা দেখেছি। ভীষণ বনের মধ্যে অন্ধকার রাত কাটিয়েছি। আমি কারো কথা শুনিনি।

—খুব সাবধান জামাতুল্লা, আমাদের প্রাণের দাম এক কানাকড়িও না—যদি একথা কোনোরকমে প্রকাশ হয় যে আমরা ওই আঁকজোঁক-পড়া পাথরের ছাঁচ নিয়ে সেই নগর খুঁজতে বেরিয়েছি।

—ঠিক বাবুজি। সেকথা আমারও মনে হয়েছে। এই সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে পথে পথে রাত্রের অন্ধকারে খুন হয়। ভারী সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। ইয়ার হোসেনকে সাবধান করে দিতে হবে। মুশকিল হয়েছে লোকটা মাতাল, মদ খেয়ে কোনো কথা প্রকাশ করে না ফেলে। চলো, যাওয়া যাক।

তিনজনে সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বাসার দিকে রওনা হল।

পরদিন ইয়ার হোসেন এসে ওদের বাসায় খুব সকালে উপস্থিত হল। সনৎ তখন উঠেছিল। চায়ের জন্যে স্টোভ ধরিয়েছে। ইয়ার হোসেনকে দেখে বললে, আসুন মি. হোসেন, ঠিক সময়েই এসেছেন—চা তৈরি।

ইয়ার হোসেন রুক্ষ প্রকৃতির লোক। বলে উঠল, চা খাবার জন্যে ঠিক আসিনি। আরও দুশো টকা চাই।

হঠাৎ সনৎ-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরও দুশো! তাহলে তো আমাদের হাতে রইল না কিছু!

—তা আমি কী জানি? এ কাজে এসেছেন যখন, তখন পয়সার জন্যে হঠলে চলবে না। নয়তো বলুন ছেড়ে দিই।

—না-না, দাঁড়ান আমি দাদা ও জামাতুল্লাকে ডাকি।

সুশীল শুনে বললে, তাই তো ব্যাপার কী! চলো, দেখি ব্যাপার কী?

ইয়ার হোসেন বাইরে বসে আছে। সুশীল গিয়ে বললে, গুড মর্নিং মি. হোসেন। কী মনে করে এত সকালে?

—সব ঠিক। আজ রাত্রে রওনা হতে হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে।

সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে বলে উঠল, কীরকম?

ইয়ার হোসেনই গম্ভীর মুখে বললে, সব ঠিক। তার আগে সেই ছাঁচখানা একবার দেখি—এখুনি। আর দুশো টাকা—এখুনি।

সুশীলের ইঙ্গিতে সনৎ বাকসো খুলে প্যারিস-প্লাস্টারের ছাঁচ ওর হাতে দিলে। ইয়ার হোসেন ছাঁচখানা উলটেপালটে দেখেশুনে বললে, নাও। এসব বুজরুকি—অন্য কিছুই না। কিছুই হবে না হয়তো।—টাকা?

সুশীল বললে, টাকা রয়েছে জামাতুল্লার কাছে। সে আসুক।

—কোথায় সে?

—তা তো জানিনে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছে।

—আচ্ছা, আমি বসি।

—এখন কী ঠিক করলেন, বলুন মি. হোসেন।

—এখান থেকে ডাচ স্টিমার 'বেন্দা' ছাড়ছে আজ রাত দশটায়। আমাদের নামতে হবে সাঙ্গাপান বন্দরে—সুলু সমুদ্রের ধারে। সাঙ্গাপান মশলার বড়ো আড়ত—সেখান থেকে জাঙ্ক ভাড়া করে যাব।

—এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাচ স্টিমারে উঠতে দেবে? মেশিনগান কিনেছেন নাকি?

—সব ঠিক আছে। আপনি শুধু দেখুন, ইয়ার হোসেন কী করতে পারে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। জামাতুল্লা আর ফেরে না। সুশীল ও সনৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কাল বিকেলের সেই চীনাম্যানের কথা বার বার মনে পড়ছিল ওদের। কথাটা ইয়ার হোসেনকে বলা ঠিক হবে না হয়তো ভেবেই ওরা বললে না। কিন্তু জামাতুল্লা সব জেনেশুনে একা বেরুল কোথায়?

বেলা প্রায় দশটা। এমন সময় জামাতুল্লা ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে হাজির হল। ওর মুখের চেহারা দেখে তিনজনেই একসঙ্গে বললে, কী হল তোমার?

জামাতুল্লা ক্ষীণ হাসি হেসে বললে, কিছুই না।

—কিন্তু তোমার চেহারা দেখে—

—উনি বলছেন, আজ রাত্রে আমাদের রওনা হতে হবে।

জামাতুল্লা সেকথায় কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, টাকাটা দিয়ে দিন ওঁকে আগে।

টাকা নিয়ে ইয়ার হোসেন বিদায় নেবার পরমুহূর্তেই জামাতুল্লা নিম্নসুরে বললে, বড়ো বেঁচে গিয়েছি! ডকের পাশে যে গলি আছে ওখানে দুজন মালয় গুন্ডা আমাকে আক্রমণ করেছিল। দুজন দু-দিক থেকে কিরিচ হাতে। ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিত আর একটু হলে। আমি প্রাণপণে ছুটে বেঁচেছি। তোমরা অত ছুটতে পারতে না, মারা পড়তে ওদের হাতে। কালকের সেই চীনেম্যানের কথাই ঠিক। আমরা খুব বিপন্ন এখানে। বাড়ি থেকে কোথাও বেরিয়ো না। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে ওর কথা শুনছিল। কথা শেষ হলে সনৎ তাকে চা ও টোস্ট খেতে দিয়ে বললে, কিছু বলিনি আমরা। ও আজই যেতে বলছে—শুনেছ তো?

—যেতে হয়, আজই আমাদের পালাতে হবে। এখন প্রাণ নিয়ে জাহাজে উঠতে পারলে বাঁচি!

—বলো কী জামাতুল্লা! এত ভয় নেই! চীনেম্যানটার বাজে গল্পটা দেখছি তোমার মনে বড়ো দাগ কেটে দিয়েছে।

—বাবুজি, মেটেবুরুজের মাঠে খুনের কথাটা ভেবে দেখুন—সে পাথরখানার জন্য নয়, আঁক-জোঁকের জন্যে। এখন আমার তাই মনে হচ্ছে। অসাবধান হবেন না আজ দিনমানটা। জাহাজে উঠলে কতকটা বিপদ কাটে বটে।

সেদিন বিকেলে ইয়ার হোসেনের লোক আবার এল। একটা সিলমোহর করা চিঠি সুশীলের হাতে দিয়ে বললে—এর উত্তর এখুনি চাই। সুশীল চিঠিখানা পড়ে দেখলে, আজ কীভাবে কোথা থেকে রওনা হতে হবে, সেই ব্যবস্থা চিঠিতে লেখা। ইয়ার হোসেন অন্য পথ দিয়ে যাবে। ওদের যেন চেনে না, এভাবে। জাহাজে না উঠে এদের তিনজনের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলবে না।

সুশীল চিঠির উত্তর দিয়ে দিলে। জামাতুল্লা বললে, আমাদের জিনিসপত্র যদি কিনতে হয়, এইসময় কিনে নিয়ে আসি চলুন।

ওরা বেরিয়ে এল বাসা থেকে। ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটের বড়ো বাজারে জিনিসপত্র কিনবে—এই ওদের ইচ্ছা। জামাতুল্লা বললে, বাবু, কিছু ভালো জিনিস খেয়ে নেওয়া যাক। জানেন, কোনো অজানা রাস্তায় অনেক দূর যেতে হলে, ভালো খেয়ে নিতে হয়। অনেকদিন হয়তো ভালো খাবার অদৃষ্টে জুটবে না।

একটা শিখ রেস্টুরেন্টে ওরা গিয়ে বসল। মাংস, কাটলেট, চা, টোস্ট ইত্যাদি আনিয়ে খাওয়া শুরু করেছে, এমন সময় একজন ইয়োরোপীয় পোশাক-পরা মালয় এসে ওদের টেবিলে বসে বিনীতভাবে বললে—সে কি তাদের সঙ্গে বসে খেতে পারে?

সুশীল বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

সে আর কোনো কথা না বলে খাবার আনিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে খেতে লাগল। তারপর আবার ওদের দিকে চেয়ে বললে, আপনারা ভারতীয়?

সুশীল ভদ্রভাবে উত্তর দিলে—হ্যাঁ।

—এখানে এসেছেন বেড়াতে, না?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগছে সিঙ্গাপুর?

—বেশ জায়গা।

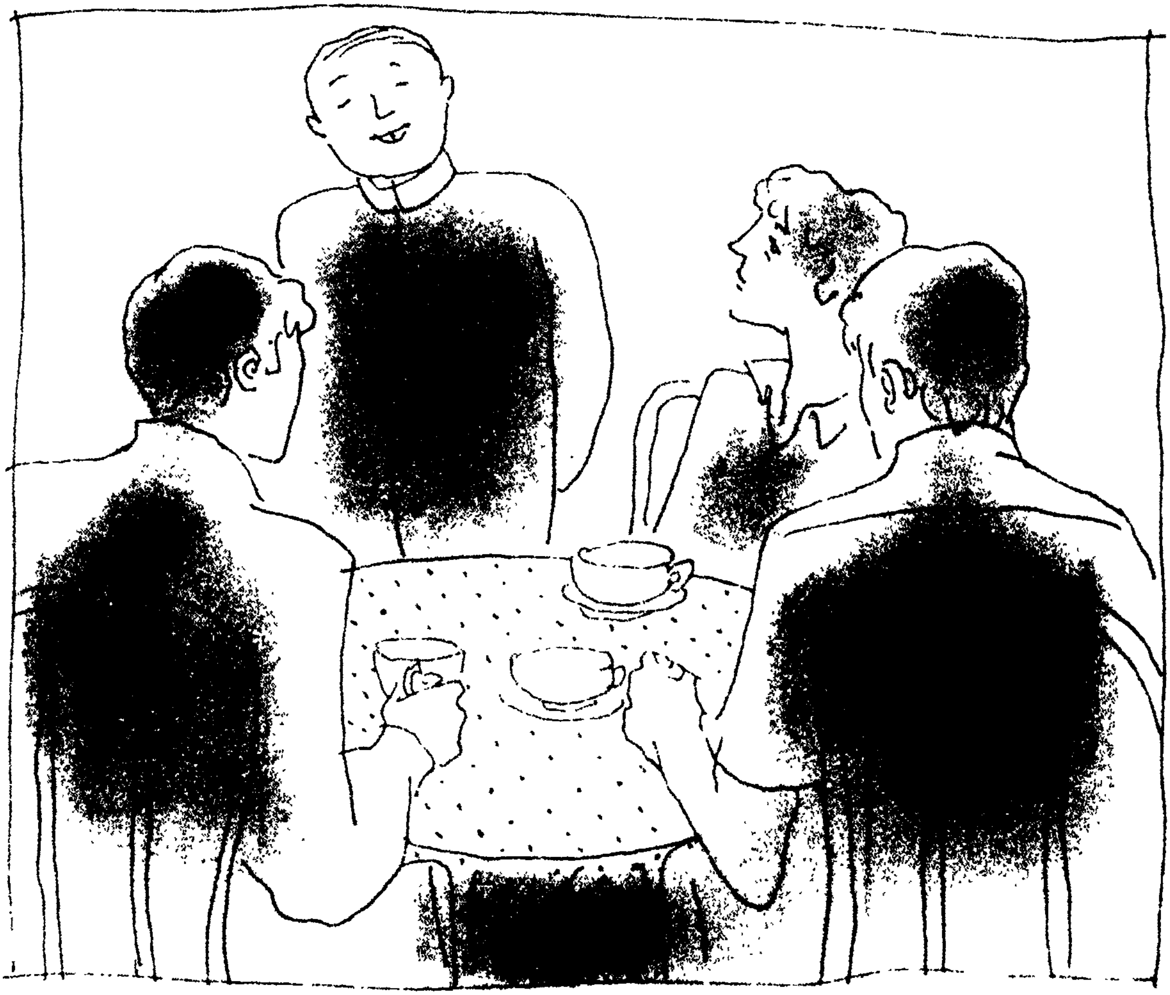

—এখান থেকে দেশে ফিরছেন বোধ হয়?

—তাই ইচ্ছে আছে।

—আপনারা তিনজনে বুঝি এসেছেন?

—না, আমরা এখানে এক হোটেলে থাকি—আলাপ হয়ে গিয়েছে।

—বেশ, বেশ।

—আপনারা কোন হোটেলে উঠেছেন জানতে পারি কি? আমাদের একজন ভারতীয় বন্ধুর একটা ভালো হোটেল আছে, সেখানে খাবারপত্র সস্তা। ঘরদোরও ভালো। যদি আপনাদের দরকার হয়—

সনৎ বলে উঠল, না, ধন্যবাদ। আমরা আজই চলে যাচ্ছি।

সুশীল টেবিলের তলা দিয়ে সনৎকে এক রামচিমটি কাটলে। মালয় লোকটার চোখে-মুখে একটা কৌতূহলের ভাব জাগল। সেটা গোপন করে সে বললে, ও! আজই যাবেন? কিন্তু ভারতের জাহাজ তো আজ ছাড়বে না।

সুশীল বললে, না, আমরা রেলে উঠে যাচ্ছি কুয়ালালামপুর।

—ও, কুয়ালালামপুর? দেখে আসুন, বেশ শহর।

আরও কিছুক্ষণ পরে লোকটা বিল চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সুশীল রাগের সঙ্গে সনৎ-এর দিকে চেয়ে বললে, ছি, ছি, এত নির্বোধ তুমি? ওকথা কেন বলতে গেলে?

সনৎ অপ্রতিভ মুখে বললে, আমি ভাবলাম ওতেই আপদ বিদেয় হয়ে যাবে! অত জিজ্ঞেস করার ওর দরকার কী? আমরা যদি বা যাই, তোর তাতে কী রে বাপু!

—তা নয়। কে কী মতলব নিয়ে কথা বলে, দরকার কী ওদের সব কথা বলার?

জামাতুল্লা বললে, ঠিক কথা বলেছেন বাবুজি।

সন্ধ্যার কিছু আগে ওরা রেস্টুরেন্ট থেকে বার হয়ে রাস্তায় নেমে দু-একটা জিনিস কেনবার জন্যে বাজারের দিকে চলেছে—এমন সময় জামাতুল্লা নিচু গলায় চুপিচুপি বললে—ওই দেখুন সেই লোকটা!

সুশীল ও সনৎ চেয়ে দেখলে—সেই মালয় লোকটা একটা দোকানে কী একটা জিনিস কিনছে, ওদের দিকে পিছন ফিরে।

সুশীল বলল, চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই, মোড়ের দোকানে জিনিস কিনিগে।

জিনিস কিনতে একটু রাত হয়ে গেল। ওরা বড়ো রাস্তা বেয়ে অনেকটা এসে ওদের হোটেল যে গলিটার মধ্যে, সেই গলিটাতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় কী একটা ভারী জিনিস সুশীলের ঠিক বাঁ হাতের দেওয়ালে জোরে এসে লেগে ঠিকরে পড়ল সামনে রাস্তায় ওপরে।

ওরা চমকে উঠল। জামাতুল্লা পথের ওপর থেকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে, সর্বনাশ!

ওরা দুজনে নিচু হয়ে জিনিসটা দেখতে গেল, কিন্তু জামাতুল্লা বললে, বাবুজি, ছুটে আসুন, এখানে আর দাঁড়াবেন না বলছি!

দুজনে জামাতুল্লার পিছনে পিছনে দ্রুতপদে চলতে চলতে বললে, কী, কী হয়েছে? কী জিনিস ওটা?

মিনিট পাঁচ-ছয় ছুটবার পর নির্জন গলিটার শেষ প্রান্তে ওদের হোটেলটা দেখা গেল। জামাতুল্লা হাঁফ ছেড়ে বললে, যাক খুব বেঁচে যাওয়া গিয়েছে! এখানা মালয় দেশের ছুঁড়ে-মারা ছুরি! ওরা দশ-বিশ গজ তফাত থেকে এই ছুরি ছুঁড়ে লোকের গলা দুখানা করে কেটে দিতে পারে। আমাদের তাগ করেই ছুরিখানা ছুঁড়েছিল, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক লাগেনি। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে—যে ছুঁড়েছে, তার আরেকখানা ছুরি ছুঁড়তেই বা কতক্ষণ?

সনৎ সেই ভারী ছোরাখানা হাতে করে বললে, ওঃ, এ গলায় পড়লে পাঠা কাটার মতো মুন্ডু কেটে ছিটকে পড়ত! কানের পাশ দিয়ে তির গিয়েছে!

সুশীল বললে, এ সেই গুপ্ত সম্প্রদায়ের লোকের কাজ। আমাদের পেছনে লোক লেগেছে।

জামাতুল্লা বললে, লোক লেগেছে, তবে আমাদের বাসাটা এখনও বার করতে পারেনি। আমি বলিনি যে, এখানে আমরা বিপন্ন। আমার না বলবার কারণ আছে।

রাতে ডাচ স্টিমার 'বেন্দা' ছাড়ল। ইয়ার হোসেন বড়ো বড়ো কেরোসিন কাঠের প্যাক-বাকসো ওঠালে গোটাকতক জাহাজে—তাদের বাইরে বিলিতি বিয়ার মদের বিজ্ঞাপন মারা। ওঠবার সময় অবিশ্যি কোনো হাঙ্গামা হল না, কিন্তু সুশীল ও সনৎ-এর ভয় তাতে একেবারে দূর হয়নি। সিঙ্গাপুরের বন্দর ও

প্রকাণ্ড নৌঘাঁটি ধীরে ধীরে দিকচক্রবালে মিলিয়ে গেল—অকূল জলরাশি আলোকোৎক্ষেপী ঢেউয়ে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

চারদিনের দিন সকালে জাহাজ এসে সাঙ্গাপান পৌঁছোল। এখানে এসে ওরা নেমে একটা চীনা হোটেলে আশ্রয় নিলে।

সাঙ্গাপান মশলার খুব বড়ো আড়ত, কতকগুলো নদী এসে সমুদ্রে পড়ছে, নদীর সেই মোহনাতেই বন্দর অবস্থিত—যেমন আমাদের দেশের চট্টগ্রাম।

ইয়ার হোসেন বাংলা জানে না, উর্দু বা হিন্দুস্থানিও ভুলে গিয়েছে—ও জামাতুল্লার সঙ্গে কথা বলে পিজিন ইংলিশে ও মালয় ভাষায়। বললে, জামাতুল্লা, এবার তুমি তোমার সেই দ্বীপে নিয়ে যেতে পারবে তো?

—পারব বলে মনে হচ্ছে, তবে এখনও ঠিক জানিনে—

সুশীল বললে, শুনুন মি. হোসেন। যখন আমার সঙ্গে জামাতুল্লার দেখা হয় গ্রামে, ও বলেছিল ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের একটা দ্বীপে ওর জাহাজ নারকেলের ছোবড়া ও কুচি বোঝাই করতে গিয়ে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায়। কেমন, তাই তো জামাতুল্লা? রাস্তার কথাটা একবার ভালো করে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

—ঠিক বাবুজি।

—তারপর বলে যাও—

—তারপর আমরা সাতদিন সেইখানে থাকি।

ইয়ার হোসেন বললে, সেখানে থাকি মানে কী বুঝিয়ে বলো। দ্বীপে, না সমুদ্রে?

—না সাহেব, দ্বীপে তো নয়—আমরা যাচ্ছিলাম এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে। মাঝ দরিয়ায় এ কাণ্ড ঘটে। তারপর সৌরাবায়া থেকে জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে।

—কতদিন পরে উদ্ধার করে?

—আট-দশ দিন কি ওইরকম।

সুশীল বললে, আগে বলেছিলে সাতদিন।

—বাবু, ঠিক মনে নেই। অনেক দিনের কথা। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে। সেই সময় সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে সব কলেরা হয়ে মারা গেল—বাকি ছিলাম কাপ্তান আর আমি। দ্বীপ ছিল নিকটেই—যেখানে ডুবো পাহাড়ে আমাদের জাহাজ ধাক্কা খেয়েছিল, সেখান থেকে ডাঙা নজরে পড়ে। জাহাজের রশির দু-রশি কি তিন রশি তফাতে। দ্বীপ দেখলে আমি চিনতে পারব, তার ধারে একটা পাহাড়, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরনা পড়েছে সমুদ্রে। বড়ো বড়ো পাথর পড়ে আছে, পাথরগুলো সাদা রঙের।

সুশীল হেসে বললে, তোমার সেই বিল্কমুনির দ্বীপ?

জামাতুল্লা গম্ভীর মুখে বললে, হাসবেন না বাবুজি। এসব কাজে নেমে এ দেশের সব দেবতাকে মানতে হবে। না মানলে বিপদ হতে কতক্ষণ? আমি খুব ভালো করেই তা জানি।

ইয়ার হোসেন বললে, বুঝলাম, ওসব এখন রাখো। সাঙ্গাপান থেকে কোনদিকে যেতে হবে, কত দূরে? একটা আন্দাজ দাও—একটা নটিক্যাল চার্ট করে দেওয়া যাক।

—আমরা সাঙ্গাপান থেকেই রওনা হয়ে যাই পূর্ব-দক্ষিণ কোণে—আন্দাজ দুশো মাইল—সেখান

থেকে পূর্বে উত্তর-পূর্ব কোণে যাই আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল। এইখানে সেই ডুবো পাহাড়ের জায়গাটা যতদূর আমার মনে হচ্ছে—

ইয়ার হোসেন অসহিষ্ণুভাবে বললে, যতদূর মনে হলে তো হবে না, আমাদের সেদিকে যেতে হবে যে। সুলু সমুদ্রের সর্বত্র তো ঘুরে বেড়াতে পারা যাবে না। আচ্ছা, তুমি সে দ্বীপ কতদূর থেকে চিনতে পারবে? নেমে, না জাহাজে বসে?

—জাহাজে বসে চিনতে পারব ওই সাদা পাথরের পাহাড় আর ঝরনা দেখে।

—কত সাদা পাথরের পাহাড় থাকে—

—না সাহেব, তা নয়। সে পাথরের পাহাড়ের বন্ধন অন্যরকম। দেখলেই চিনব।

ইয়ার হোসেন আর সুশীল দুজনে মিলে মোটামুটি ম্যাপ এঁকে নিয়ে সেদিন রাত্রে আরেকবার মিলিয়ে নিলে জামাতুল্লার সঙ্গে। চীনা জাঙ্ক ভাড়া করা হল। দু-মাসের মতো চাল, আটা, চা, চিনি বোঝাই করে নেওয়া হল জাঙ্কে—আর রইল বিয়ারের কাঠের বাকসো ভরতি অস্ত্রশস্ত্র ও মেশিনগান।

ইয়ার হোসেন প্রস্তাব করলে, এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ রাত্রেই যাওয়া যাক—শত্রু লাগতে পারে—

জামাতুল্লা বললে, সেকথা ঠিক। কিন্তু রাত্রে হারবার-মাস্টার জাহাজ কি নৌকো ছাড়তে দেবে না, পোর্ট পুলিসে ধরবে। এসব জায়গায় এই নিয়ম। বোম্বেটে ডাকাতের আড্ডা কিনা সুলু-সি। কড়া নিয়ম সব।

—তবে?

—কাল সকালে চলুন সাহেব—

ইয়ার হোসেন দ্বিধার সঙ্গে এ প্রস্তাবে মত দিলে। সুশীলকে ডেকে বললে, রাতের অন্ধকারে যাওয়া ভালো ছিল। দিনের আলোয় সকলের মনে কৌতূহল জাগিয়ে যাওয়া ভালো না। যাই হোক, উপায় কী?

সকাল আটটার পরে সাঙ্গাপান থেকে ওদের নৌকো ছাড়ল। মাত্র দেড় টনের চীনা জাঙ্ক—সমুদ্রে মোচার খোলার মতো। কিন্তু জামাতুল্লা বললে, জাঙ্ক হঠাৎ ডোবে না, এসব তুফান-সঙ্কুল সমুদ্রে পাড়ি দিতে চীনা জাঙ্কের মতো জিনিস নেই।

জাহাজ বন্দর ছেড়ে অনেক দূর এল, ক্রমে চারিদিকে শুধু সমুদ্রের নীল জলরাশি।

জামাতুল্লা নাবিক ও কর্ণধার—কিন্তু যে বৃদ্ধ চীনাম্যান জাঙ্কের সারেং, সেও দেখা গেল বেশ জাহাজ চালাতে জানে। দু-দিন জাহাজ চলবার পরে জামাতুল্লার সঙ্গে চীনা সারেং-এর ঝগড়া বেধে গেল।

ইয়ার হোসেন বললে, চ্যাঁচামেচি কেন? কী হয়েছে?

চীনা সারেং বললে, জামাতুল্লা সাহেব জাহাজ চালাতে জানে না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—

জামাতুল্লা বললে, বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। ও লোকটা একেবারে বাজে।

ইয়ার হোসেন ও সুশীল পরামর্শ করে জামাতুল্লার ওপরই কিন্তু জাহাজ চালানোর ভার দিলে। একদিন সন্ধ্যার সময় দূরে ডাঙা ও আলোর সারি দেখা গেল।

চীনা সারেং ছুটে গিয়ে বললে, ওহে, বড়ো যে জাহাজ চালাচ্ছ, ও ডাঙা আর আলো কোথাকার? এদিকে এত বড়ো ডাঙা কীসের?

জামাতুল্লাও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। চার্ট অনুসারে ওখান থেকে আলো আর ডাঙা দেখবার কথা

নয়। চীনা সারেং ইয়ার হোসেনকে আর সুশীলকে ডেকে বললে, ওকে বলতে বলুন স্যার, ও আলো আর ডাঙা কীসের?

জামাতুল্লাকে মাথা চুলকাতে দেখে চীনা সারেং বিজয়গর্বে বললে, আমি বলে দিচ্ছি স্যার—সান্ডা প্রণালীর মুখে পিয়েরপং বন্দরের আলো—তার মানে বুঝেছেন? আমরা আমাদের যাবার রাস্তা থেকে একশো মাইল পূর্ব-দক্ষিণে হঠে এসেছি—এইরকম করে জাহাজ চালালে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছুতে আমাদের আর বেশি দেরি লাগবে না স্যার!

চীনা সারেং সেদিন থেকে হল কাপ্তেন।

সুশীল বললে, রাগ কোরো না জামাতুল্লা। তুমি অনেকদিন এ কাজ করোনি, ভুলে গিয়েছ হে।

জামাতুল্লা বললে, তা নয় বাবুজি। আমি ভুলিনি জাহাজ চালানো। আমার চার্ট ঠিক ছিল, আমার মনে হয় কিছু গোলমাল হয়েছে বা চার্টে ভুল করে রেখেছে।

আরও তিন দিন পরে বিকেলের দিকে চীনা কাপ্তেন বললে—পারা নামছে স্যার, দড়িদড়া সামলে আর জিনিস সামলে আপনারা খোলের মধ্যে নেমে যান—ঝড় উঠবে।

তিন ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ ঝড় এল পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে। দড়িদড়া ছিঁড়ে পাল উড়িয়ে নিয়ে যায়, জামাতুল্লা চিৎকার করে বললে, সব খোলের মধ্যে যান—ভয়ংকর ঢেউ উঠেছে—

জাঙ্কের ডেকের ওপর বড়ো বড়ো ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়ে ক্ষুদ্র দেড় টনের জাঙ্কখানা যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙেচুরে সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দেবে মনে হল সবারই। কিন্তু দু-তিন বার জাঙ্কখানা ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল—নাকানি-চুবুনি খেয়েও আবার সমুদ্রের ওপর ঠেলে ওঠে। সাবাস মোচার খোলা।

হঠাৎ চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে উঠল, সামনে পাহাড়—সামলাও—

জামাতুল্লা হালে ছিল, ডাইনে সজোরে হাল মারতেই কান ঘেঁষে কতকগুলো বজবজে সমুদ্রের ফেনা ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেল, ফেনাগুলোর মাঝে কালো রঙের কী একটা টানা রেখা যেন ফেনারাশিকে দু-ভাগে চিরে দিয়েছে। ডুবো পাহাড়।

ঝড়ের শব্দে কে কী বলে শোনা যায় না—তবুও সুশীল শুনলে, চীনা কাপ্তেন চিৎকার করছে, খুব বাঁচা গিয়েছে। আর একটু হলেই সব শেষ হত আমাদের!

ইয়ার হোসেন ও সুশীল বাইরে একচমক দেখতে পেলে—জলের মধ্যে মরণের ফাঁদ পাতাই বটে! সাক্ষাৎ মরণের ফাঁদ!

জামাতুল্লা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হাল ধরে আছে। একটু আলগা হলেই এই ভীষণ জায়গায় জাঙ্ক বানচাল হয়ে ধাক্কা মারবে গিয়ে বাঁ দিকের ডুবো পাহাড়ে। খানিকটা পরে জামাতুল্লার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল ভয়ে—একী! দু-দিকেই যে ডুবো পাহাড়—ডাইনে আর বাঁয়ে!

চীনা কাপ্তেনকে হেঁকে বললে, কোথা দিয়ে চালাচ্ছ গাধার বাচ্চা! পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে যে! মারবে এবারে—

ঝড়ের তুফানের মধ্যে চীনা কাপ্তেনের কথাগুলো অট্টহাসির মতো শোনা গেল। কী যে সে বললে, জামাতুল্লা বুঝতে পারল না—কিন্তু যারই ভুল হোক, জাহাজ বাঁচাতে হবে।

সে সামনে পিছনে চেয়ে দেখলে—পাহাড়ের কালো রেখা অতিকায় শুশুকের শিরদাঁড়ার মতো

জলের ওপর স্পষ্ট জেগে; মাস্তুলের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা সারেং সব পাল গুটিয়ে ফেলেছে। কেবল মাঝের বড়ো মাস্তুলে যোলো ফুট চওড়া বড়ো পালখানা ঝড়ের মুখে ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে অসংখ্য সাদা নিশানের মতো উড়ছে। সে দেখলে নিশানগুলোর জন্যে জাহাজখানা এদিকে-ওদিকে হেলছে ঘুরছে। চক্ষের নিমেষে সে কোমর থেকে ছুরি বার করে পালের মোটা শনের কাছি কাটাতে লাগল। একবার করে খানিকটা কাটে, আবার ছুটে গিয়ে হাল টিপে ধরে।

অমানুষিক সাহস ও দৃঢ়তা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাঁচ-ছ মিনিটের মধ্যে সে অত বড়ো মোটা রশিটা কেটে ফেললে। ফেলতেই দড়িদড়া ঢিলে পড়ে পাল সড়াং করে অনেকখানি নেমে এল।

চীনে সারেং চিৎকার করে বললে—কে রশি কাটলে?

—আমি।

—খুব ভালো কাজ করেছ! এবার সামলাও ঠ্যালা! যদি জানো না কোনো কিছু, তবে সবটাতেই সর্দারি করতে আসো কেন?

চীনা সারেং মিথ্যে বলেনি। জামাতুল্লা সভয়ে দেখলে, পালে ঢিলে পড়াতে জাঙ্ক এবার জগদ্দল পাথরের মতো ভারী হয়ে পড়েছে যেন। পিছন থেকে বাতাস ঠেলা মেরেও তাকে নড়াতে পারছে না, সুতরাং দু-দিকের মরণ ফাঁদকে অতিক্রম করে বাহির সমুদ্রে পড়তে এর অনেক সময় লেগে যাবে। ইতিমধ্যে বাতাস দিক পরিবর্তন করলেই—বিষম বিপদ!

ইয়ার হোসেন পাকা লোক। সে বুঝেছিল কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। মাথা বার করে বললে—কী হল আবার? জাঙ্ক নড়ে না যে!

চীনা সারেং বললে, নড়বে কী স্যার, নড়বার পথ কি আর রেখেছে জামাতুল্লা? এবার বাঁচাতে পারলাম না বোধ হয়।

কিন্তু সুখের বিষয় আধ ঘণ্টার মধ্যে ভয় কেটে গেল। বাতাস পিছন হতেই বয়ে চলল একটানা এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে জাঙ্ককে ডুবো পাহাড়ের ফাঁদ পার করে বাহির সমুদ্রে তাড়িয়ে দিলে।

জামাতুল্লা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

চীনা সারেং টিটকিরি দিয়ে বললে, বাঁচলে সবাই আজ নিতান্ত বরাতের জোরে! তোমার হাতের গুণে নয়, মনে রেখো।

সমুদ্র শান্ত, জ্যোৎস্না উঠেছে—সুশীলদের দল খোলের ঢাকনি খুলে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ জ্যোৎস্নার মধ্যে কী একটা বিরাট কালো জিনিস দেখা গেল। জল থেকে উঁচু হয়ে আছে মাথা তুলে।

ইয়ার হোসেন বললে, কী ওটা?

সুশীলও জিনিসটা প্রথমে দেখতে পেলে না, তারপর দেখে বিস্মিত হল—অস্পষ্ট কুয়াশা-মাখা জ্যোৎস্নালোকে কিছু ভালো দেখা যায় না, তবুও একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় দৈত্যের মতো আকাশের গায়ে কী ওটা জল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে?

সনৎও সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

একমাত্র জামাতুল্লা দু-চোখ বিস্ফারিত করে জিনিসটার দিকে চেয়েছিল।

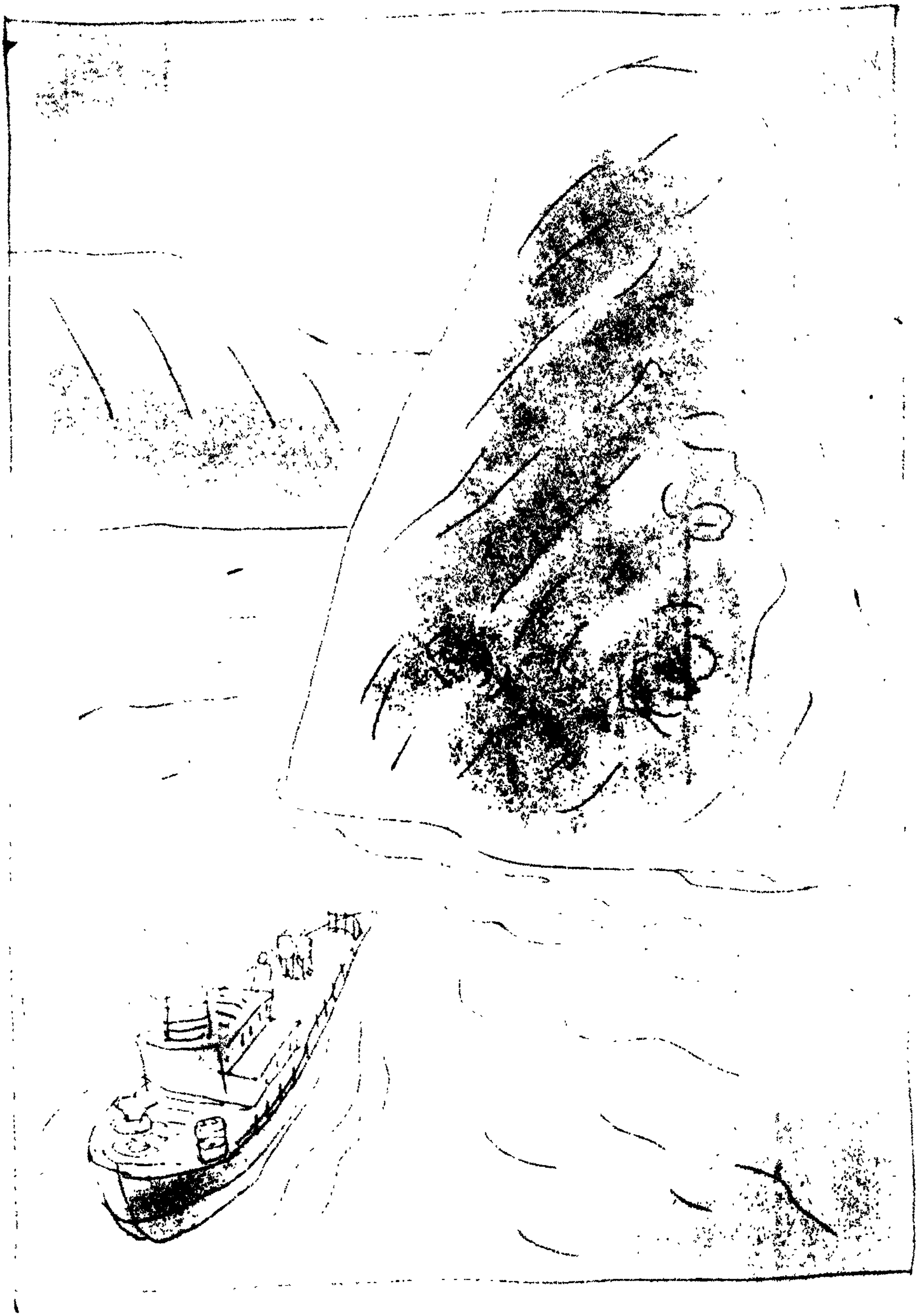

ইয়ার হোসেন কথার উত্তর না পেয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, জামাতুল্লা তাকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ডেকের সম্মুখভাগে এগিয়ে এসে কালো জিনিসটা ভালো করে দেখতে লাগল।

চীনা সারেং টিটকিরি দেওয়ার সুরে বললে, দেখছ কী, ওটা ডুবো পাহাড়—বুড়ো বয়সে চোখে ভালো দেখতে পাইনে, তবুও বলছি—

সুশীল বললে, জলের উপর জেগে রয়েছে যে! ডুবো পাহাড় কী করে হল?

চীনা সারেং বললে, ও পাহাড়ের চুড়োটা মাত্র জেগে আছে জলের ওপর স্যার। প্রকাণ্ড ডুবো পাহাড় ওটা—

জামাতুল্লা এইবার সুশীলকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, সারেং ঠিক বলেছে। এতক্ষণ পরে আমি চিনেছি, এই সেই পাহাড় বাবুজি—এই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েই—

সুশীল অবিশ্বাসের সুরে বললে, চিনলে কী করে?

—আমি এতক্ষণ তাই চেয়ে দেখছিলাম। এবার আমার কোনো সন্দেহ নেই—ওই ডুবো পাহাড়ের এক জায়গায় দক্ষিণ কোণে একটা শুয়োরের মুখের মতো ছুঁচলো গড়ন দেখছেন কি? আসুন আমি দেখাচ্ছি—এতকাল আমার মনে ছিল না, কিন্তু এবার দেখেই মনে পড়েছে।

—ইয়ার হোসেনকে বলি?

—কিন্তু ওই হলদেমুখো চীনাটাকে কিছু বলবেন না, বাবুজি। ওটাকে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না, আপনি বলুন হোসেন সাহেবকে—

—যদি ও-ই সেই ডুবো পাহাড়টা হয়, তবে তো ওখান থেকে জমি দেখা যাবে, আর সেই সাদা পাথরের পাহাড়টা—

—সে হল তিন-রশি চার-রশি তফাতে বাবুজি—চাঁদনি রাতে সাদা পাথরের পাহাড় অত দূর থেকে ভালো দেখা যাবে না। সকাল হোক—

চীনা সারেং চিৎকার করে উঠল, হাল সামলাবে না গল্প করে সময় কাটাবে—ডুবো পাহাড় সামনে, সে খেয়াল আছে?

জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে, আঃ, হলদেমুখো ভূতটা বড্ড জ্বালালে দেখছি—দাঁড়ান বাবুজি, আপনি হোসেন সাহেবকে বলুন, আমি দেখি ওদিকে কী বলে—

সুশীল হাসতে হাসতে বললে, তুমি যাই বলো, ও কিন্তু খুব পাকা জাহাজি, এসব অঞ্চল দেখছি ওর নখদর্পণে—ওস্তাদ জাহাজি—এ বিষয়ে ভুল নেই—

কিছু পরে চীনা সারেং তার নাবিকগিরির সুদক্ষতার এমন একটি প্রমাণ দিলে, যাতে জামাতুল্লাকে পর্যন্ত তারিফ করতে হল। জামাতুল্লার হাল পরিচালনায় জাঙ্ক যখন ডুবো পাহাড়ের একদিক দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তখন চীনা সারেং হুকুম দিলে, সামনে এগোও—পাশ কাটাবার চেষ্টা করছ কেন?

—সামনে এগিয়ে ধাক্কা খাবে নাকি?

—এই বিদ্যে নিয়ে মাঝিগিরি করতে এসেছ সুলু-সিতে? নিজের দেশে নদী-খালে ডোঙা চালাওগে যাও গিয়ে। ওই পাহাড়ের দু-পাশের ভীষণ চাপা স্রোতের মুখে পড়ে জাঙ্ক পাহাড়ের গায়ে সজোরে ধাক্কা

মারবে—সে খেয়াল আছে? তোমার হালের সাধ্যি হবে না সে স্রোতের বেগ সামলানো। দেখছ না, জল কীরকম ঘুরছে?

জামাতুল্লা তখন ইতস্তত করছে দেখে চীনা সারেং হেঁকে বললে, জামাতুল্লা এবার সবাইকে মারবে স্যার—ওকে বুঝিয়ে বলুন, একবার ওর হাত থেকে ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন, এবার বোধ হয় আর রক্ষে হয় না—

সুশীল আর ইয়ার হোসেন জামাতুল্লাকে বললে, ও যা বলছে, তাই করো না জামাতুল্লা—

—ও কী বলছে তা আপনারা খেয়াল করছেন না? ও বলছে—ওই ডুবো পাহাড়ের দিকে সোজাসুজি হাল চালাতে—মরব তো তাহলে—

চীনা সারেং জামাতুল্লার কথা শুনতে পেয়ে বললে, চালিয়ে দেখোই না কী করি। মরণের অত ভয় করলে মাল্লাগিরি করা চলে না সাহেব।

জামাতুল্লা চোখ পাকিয়ে বললে, হুঁশিয়ার! আমি আর যাই হই মরণের ভয় করি—তা তুমি বলতে পারবে না হলদেমুখো বাঁদর।

সুশীল ধমক দিয়ে বললে, ও কী হচ্ছে জামাতুল্লা? এ সময়ে ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কী? সারেং যা বলছে তাই করো—

জামাতুল্লা হাতের চাকা ঘোরাতেই জাঙ্ক পাহাড়ের একেবারে বিশ গজের মধ্যে পড়ল—ঠিক একেবারে সামনা-সামনি। সবাই দুরুদুরু বক্ষে চেয়ে আছে, সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর ঘাঁটি, এ থেকে কী করে চীনা জাঙ্ক বাঁচবে কেউ বুঝছে না। দেখতে দেখতে বিশ গজের ব্যবধান ঘুচে গেল—দশ—গজ—

আর বুঝি জাঙ্ক রক্ষা হয় না- -মতলব কী চীনাটার?...সবাই বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে আছে, বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে সবারই। হঠাৎ সারেং ক্ষিপ্রহস্তে প্রকাণ্ড একটা জাহাজি কাছি সুকৌশলে সামনের দিকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—ডাইনে হাল মারো—

সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল—যা ইয়ার হোসেন ও জামাতুল্লা তাদের জাহাজি মাল্লা জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনো দেখেনি। জাহাজ ডান দিকে ঘুরে পাহাড়ের গুঁড়িটা পেরিয়ে যেতেই সারেং-এর কাছি গিয়ে পাহাড়ের সরু অংশটি জড়িয়ে ধরল এবং পেছন দিক দিয়ে ঘড়ঘড় করে নোঙর পড়ার শব্দে সবাই বুঝল বড়ো সি-অ্যাঙ্কর অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে ফেলার বড়ো নোঙর তার সুদৃঢ় আঁকশির মুখ দিয়ে সমুদ্রের তলায় পাথর ও মাটি আঁকড়ে ধরলেই জাহাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

বোঁ করে অত বড়ো জাঙ্কখানা ডিঙি নৌকোর মতো ঘুরে গেল আর পরক্ষণেই স্থির, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল পাহাড় আর তিন-চার গজের মধ্যে। জাঙ্ক আর পাহাড়ের মধ্যে কেবল একফালি সরু সাগর-জল, একটা বড়ো হাঙর তার মধ্যে কষ্টে সাঁতার দিতে পারে।

ইয়ার হোসেন বলে উঠল, সাবাস সারেং!

সুশীল ও সনৎ নিশ্বাস ফেলে বললে, খুব বাঁচিয়েছ বটে—

জামাতুল্লা চুপ করে রইল।

চীনা সারেং হলদে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে, বিদেশি লোক এখানে জাহাজ চালাতে পারে

না, স্যার! জামাতুল্লা মাল্লাগিরি যা জানে, তা খাটে চাটগাঁয়ের বন্দরে—এসব সে জায়গা নয়—এখানে জাহাজ চালাতে হলে পেটে বিদ্যে চাই অনেকখানি—

ইয়ার হোসেন বললে, এখন কী করা যাবে বলো। জাহাজ তো আটকে গেল।

সারেং ওদের অভয় দিয়ে বললে, জাঙ্ক আটকায়নি—জোয়ার এলেই সকালে জাঙ্ক ছাড়া নিরাপদ।

সকলে দুরুদুরু বক্ষে সকালের প্রতীক্ষায় রইল। সুশীল আর জামাতুল্লা ভালো করে ঘুমুতেই পারলে না। খুব ভোরে উঠে জামাতুল্লাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে সুশীল বললে, এসো, চেয়ে দেখো—চলো বাইরে—

জামাতুল্লা বাইরে এসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে, ওই সেই সাদা পাহাড় আর সেই দ্বীপ! আমি কাল রাত্রেই বুঝেছিলাম বাবুজি, কাউকে বলিনি—

—কেন?

—কী জানি বাবুজি, চীনা সারেংটা আর এই হোসেন সাহেবকে আমার তেমন যেন বিশ্বাস হয় না, খোদার দিব্যি বলছি ওদের সামনে মুখ খোলে না আমার। হোসেন সাহেব আস্ত গুন্ডালোক, বাধ্য হয়ে ওর সাহায্য নিতে হয়েছে, কিন্তু সিঙ্গাপুরে ওর নাম শুনে সবাই ভয় পায়।

—সেকথা আর এখন ভেবে লাভ কী বলো। ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে যখন। ইয়ার হোসেনকে বলি কথাটা।

ইয়ার হোসেন সব শুনে জামাতুল্লাকে ডেকে বললে, কোনো সন্দেহ নেই তোমার এই দ্বীপ ঠিক?

—ঠিক।

—আমরা নেমে কিন্তু জাঙ্ক ছেড়ে দেব—ঠিক করে দেখো এখনও।

সুশীল ও জামাতুল্লা আশ্চর্য হয়ে বললে—জাঙ্ক ছেড়ে দেবেন কেন?

—আমি ওদের অন্য একটা গল্প বলেছি। আমি বলেছি জঙ্গলে মাঠের ইজারা নিয়েছি ডাচ গবর্মেন্টের কাছে—এখানে আমরা এখন থাকব কিছুদিন। ওদের বলতে চাইনে—চীনেরা লোক বড়ো ভালো না—

দুপুরের পর জালি বোটে জিনিসপত্র ও দুটি ছোটো ছোটো তাঁবু সমেত ওদের সকলকে অদূরবর্তী দ্বীপের শিলাবৃত তীরভূমিতে নামিয়ে জাঙ্কের সারেং তার ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে চলে গেল।

সুশীল ইয়ার হোসেনকে বললে, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের দ্বীপ তো? ডাচ গবর্মেন্টের কোনো অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু—

—সেসব বড়ো হাঙ্গামা। ডাচ গবর্মেন্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে তাহলে; কেন যাচ্ছি আমরা—ও দ্বীপে কতদিন আমরা থাকব? হয়তো আমাদের সঙ্গে পুলিশ পাহারা থাকত—সব মাটি হত!

জামাতুল্লা মাটিতে নেমে কেমন যেন স্বপ্নমুগ্ধের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। এতকাল পরে সে যে এখানে আসবে তা মেটেবুরুজের মাল্লাপাড়ার হোটেলে সান্‌কিতে ভাত খেতে বসে কখনো কী ভেবেছিল? সে ভেবেছিল তার দুঃসাহসের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই বিজ্ঞমুনির দ্বীপ আবার!

সুশীল ভাবছিল কী অদ্ভুত যোগাযোগ! বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের জমিদারের ছেলে সে, চিরকাল বসেই খাবে পায়ের পা দিয়ে, নির্বিঘ্নে জমিজমার খাজনা শোধ, দুপুরে লম্বা ঘুম দেবে, বিকেলে দুপুরে মাছ ধরবে, সন্ধ্যায় বৈঠকখানার পৈতৃক তাকিয়া হেলান দিয়ে তাস দাবা খেলবে, রাত্রে পিঠে-পায়েস খেয়ে আবার ঘুম দেবে—এই সনাতন জীবনযাত্রা প্রণালির কোনো ব্যতিক্রম হয়নি তার পিতৃপিতামহের বেলায়। তার বেলাতেও সে ধারা অক্ষুণ্ণই থাকত যদি দৈবক্রমে সেদিন গড়ের মাঠে জামাতুল্লা খালাসি তার কাছে 'ম্যাচিস' চাইতে না আসত। কত সামান্য ঘটনা থেকে যে জীবনের কত বৃহৎ ও গুরুতর পরিবর্তন শুরু হয়!

সুশীল ও সনৎ দ্বীপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ঘন বনানী এ পর্যন্ত তারা কোথাও দেখেনি—রীতিমতো ট্রপিক্যাল অরণ্য যাকে বলে, তা এতদিন সুশীল ছবিতেই দেখে এসেছে এবং ইংরেজি ভ্রমণের বইয়ে তার বর্ণনাই পড়ে এসেছে—এতকাল পরে তা সে দেখল। জলের ধার থেকেই অপরিচিত গাছপালার নিবিড় বন আরম্ভ হয়েছে—বনস্পতি-মাতার বড়ো বড়ো গাছের গায়ে অর্কিডের ফুলগুলি সুগন্ধে বাতাস মাতিয়েছে—মোটা মোটা লতা দুলছে এ গাছ থেকে ও গাছে। কত রঙের প্রজাপতি উড়ছে—সামনের সুনীল সমুদ্র প্রস্তরাকীর্ণ তীরভূমিতে এসে সজোরে ধাক্কা মারছে, একেবারে ঘোলা জলরাশি থইথই করছে, দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত একটা ব্রেক-ওয়াটার নেই কোথাও—যদি কেউ জলে পড়ে, তবে হাঙরের আহার্য হবে এ জানা কথা—এসব সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি, সুশীল আগেই শুনেছে। বনের মধ্যে অনেক জায়গায় এখনও অন্ধকার কাটেনি—কারণ প্রভাতের রৌদ্র তার মধ্যে এখনও অনেক জায়গাতেই ঢোকেনি, দুপুরেও ঢোকে কি না সন্দেহ।

ইয়ার হোসেন দেখেশুনে বললে, এ যে ভীষণ জঙ্গল দেখছি—

জামাতুল্লা বললে, আগে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়েও যেন জঙ্গল বেশি হয়েছে।

সুশীল জানতে চাইলে এ দ্বীপে লোক আছে কি না। ইয়ার হোসেন বললে, ম্যাপে তো কিছু দেয় না—এ দ্বীপের কিছুই দেখিনি ম্যাপে—কী জামাতুল্লা, তুমি কী দেখেছিলে?

—কোথাও কিছু নেই।

—বেশ ভালো জানো?

—আমার যাওয়ার পথে অন্তত তো কিছু দেখিনি—

—এখান থেকে তোমার সে নগর কতদূর হবে আন্দাজ?

—তিন-চার দিনের পথ।

—এত কেন হবে? এ দ্বীপের প্রস্থ তো খুব বেশি হবার কথা নয়।

সুশীল বললে, কত বলে আন্দাজ করছেন, মি. হোসেন?

—ত্রিশ মাইলের মধ্যে। তবে একটা কথা, এই জঙ্গল ঠেলে যাওয়ার পথ এগোবে না বেশি। অনেক জায়গায় পথ কেটে করে নিয়ে তবে এগোতে হবে। তিন দিন লাগা বিচিত্র নয়।

সেদিন তাঁবু খাটিয়ে দুপুরে বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে দ্বীপের মধ্যে ঢোকবার জন্যে ইয়ার হোসেন সবাইকে তৈরি হতে বললে। মালয় কুলি ওরা এনেছিল সাতজন জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—

এরা সবাই ইয়ার হোসেনের হাতের লোক এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এদের গতিক বড়ো সুবিধের বলে মনে হয়নি সুশীলের ও সনৎ-এর গোড়া থেকেই। দেখে মনে হয় সিঙ্গাপুরে এরা চুরি-ডাকাতি ও রাহাজানি করে চালিয়ে এসেছে এতদিন। যেমন দুশমনের মতো চেহারা, তেমনি ধূর্ত দৃষ্টি এদের চোখে। ইয়ার হোসেনের কথায় এরা ওঠে বসে। জামাতুল্লা এদের বিশ্বাস করত না। কিন্তু উপায় কী, ইয়ার হোসেনকে যখন দলে নিতে হয়েছে, তখন এদের রাখতে হবে।

দু-দিন সমুদ্রের ধারে তাঁবু ফেলে থাকবার পরে সকলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সুশীল-সনৎ এমন জঙ্গল কখনো দেখেনি। গাছপালা যে এত সবুজ, এত নিবিড়, এত অফুরন্ত হতে পারে—বাংলাদেশের ছেলে হয়েও এরা এ জিনিসটা এই প্রথম দেখলে। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো নদী বা খাঁড়ি—তার দু-পাশে যেন গাছপালা ও বনঝোপের সবুজ পর্বত—কত অদ্ভুত ও বিচিত্র ফুল।

একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বন কাটতে কাটতে ওরা মোটে মাইল-তিনেক এগিয়ে যেতে সক্ষম হল।

সন্ধ্যার দিকে ইয়ার হোসেন বললে, এখানে আজ তাঁবু ফেলা যাক।

কিন্তু তাঁবু ফেলবে কোথায়? সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে ভয়ানক ঘন জঙ্গলের মধ্যে বড়ো বড়ো দোলানো লতায় লতায় ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর রাত্রে বাস করতে হবে। আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতায় এরা দেখেছে এখানকার জঙ্গলে তিনরকম জীব সেখানে বাস করে—যে তিনটিই মানুষের শত্রু। প্রথম, বড়ো-বড়ো রক্তশোষক জোঁক; দ্বিতীয়, বিষধর সার্প; তৃতীয়, মৌমাছি। এই তিনটি শত্রুর কোনোটাই কম নয়—যে-কোনোটার আক্রমণ মানুষের জীবন বিপন্ন হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

কোনোরকমে তাঁবু খাটানো হল।

ঘুমের মধ্যে কখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল—ট্রপিক্যাল অরণ্যের এ অঞ্চলে বৃষ্টি লেগেই আছে, এমন দিন নেই যে বৃষ্টি হয় না। ঘুমের মধ্যে সুশীল দেখলে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে কখন বৃষ্টির জলের ধারা গড়িয়ে এসে ওদের বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে কোথায় এক গুরুগম্ভীর নিনাদ শোনা গেল—সমগ্র অরণ্য যেন কেঁপে উঠল।

সনৎ চমকে উঠে বললে, কে ডাকে দাদা?

অন্য তাঁবু থেকে ইয়ার হোসেন বলে উঠল, ও কীসের ডাক?

কেউ কিছু জানে না। না জামাতুল্লা না ইয়ার হোসেন—কেবল ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর বললে, ওটা বুনো হাতির ডাক স্যার।

আরেকজন অনুচর প্রতিবাদ করে বললে, ওটা গন্ডারের ডাক।

কিছুমাত্র মীমাংসা হল না এবং আবার সেই ডাক, সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক জানোয়ারের ভীষণ গর্জন। সেটা শুনে অবশ্য সকলেই বুঝতে পারলে—বাঘের গর্জন।

এরই ফাঁকে আবার বন-মোরগও ডেকে উঠল, সময়ে সময়ে একপাল বন্যকুকুরের ডাকও।

সনৎ বললে, ও দাদা, এ যে ঘুমুতে দেয় না দেখছি—

সুশীল উত্তর দিলে, কানে আঙুল দিয়ে থাকো—

ইয়ার হোসেন বলল, রাইফেল নিয়ে বসে থাকতে হবে—কেউ ঘুমিয়ো না—

এটা নিতান্ত প্রথম দিন বলে এদের ভয় ছিল বেশি, দু-একদিনের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের আওয়াজ গা-সওয়া হয়ে গেল। নিবিড় ট্রপিক্যাল জঙ্গলের মধ্যে প্রতি রাত্রেই নানা বন্য জন্তু-জানোয়ারের বিচিত্র আওয়াজ—আওয়াজ যা করে, তাঁবুর আশেপাশেই করে। কিন্তু তাঁবুর লোককে আক্রমণ করে না।

সুশীল দু-দিন ঘুমোতে পারেনি—কিন্তু তিন রাত্রির পরে সে বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পারল।

জঙ্গলের কূল-কিনারা নেই—ওরা পাঁচ দিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেও কোনো কিছুই দেখতে পেলে না সেখানে—ওই বন আর বন।

সূর্যের আলো না দেখে সুশীল তো হাঁপিয়ে উঠল। এ জঙ্গলে সূর্যের আলো আদৌ পড়ে না।

আগে দেশে থাকতে সে দু-একখানা ভ্রমণের বইতে পড়েছিল যে মেক্সিকোতে, মালয়ে, আফ্রিকায় এমন ধরনের বন আছে, যেখানে কখনো সূর্যালোক প্রবেশ করে না। কথাটা আলঙ্কারিকের অত্যুক্তি হিসেবেই সে ধরে নিয়েছিল, আজ সে সত্যই প্রত্যক্ষ করলে এমন বন, যা চির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পড়ন্ত বেলায় কেবল সুউচ্চ বনস্পতিরাজির শীর্ষদেশ অস্তমান সূর্যের রাঙা আলোয় রঞ্জিত হয় মাত্র। ক্বচিৎ নিবিড় লতাঝোপের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো, চাঁদের আলো সামান্য মাত্র পড়ে, নতুবা সকল সময়েই গোধূলি দিনমানে। চিরগোধূলির জগৎ এটা যেন।

একদিন সনৎ পড়ে গেল বিপদে।

তাঁবু থেকে বন্দুক হাতে শিকার করতে বার হয়ে সে একটা গাছের ডালে এক ভীষণ অজগর সাপ দেখে সেটাকে গুলি করলে। সাপটা দুলতে দুলতে গাছের ডাল থেকে পাক ছাড়িয়ে ঝুপ করে একবোঝা মোটা দড়াদড়ির মতো নীচে পড়ে গেল।

সনৎ সেটার কাছে গিয়ে দেখলে অজগরের মাথাটা গুলির ঘায়ে একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার ল্যাজটা হঠাৎ এসে সনৎ-এর পা দুখানা জড়িয়ে ধরে শক্ত কাঠ হয়ে গেল। সরীসৃপের হিমশীতল স্পর্শ সনতের স্নায়ুলোক যেন অবশ করে দিল, নিজের পা দুখানাকে সে আর মোটেই নাড়তে পারলে না—হাত দুটোকে যখন কষ্টে নাড়ালে তখন লোহার শেকলের মতো নাগপাশের শক্ত বাঁধনে তার পদদ্বয় গতিশক্তিহীন।

অজগর তো মরে কাঠ হয়ে গেল, কিন্তু সনৎ চেষ্টা করেও কিছুতেই নাগপাশ থেকে পা ছাড়াতে পারলে না। পা যেন ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে, এমনকী সনৎ-এর মনে হল আর কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে সে চলৎশক্তি চিরদিনের মতো হারাবে। এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, বেলা ক্রমশ পড়ে আসছে—এরই মধ্যে গোধূলি নিয়ে যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে বনে। কিছুক্ষণ পরে দিক ঠিক করে তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরও কিছু সময় কাটল, শেয়ালের দল বনের মধ্যে ডেকে উঠল—একটু পরেই বন্য হস্তীর বৃংহতি অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তুলবে, হায়েনার অট্টহাসিতে বুকের রক্ত শুকিয়ে দেবে।

সনৎ সবই বুঝেছে—কিন্তু কোনো উপায় নেই। বন্দুকটার আওয়াজ করলে তাঁবুর লোকদের তার সন্ধান দেওয়া চলত বটে—কিন্তু বন্দুকে গুলি নেই। শেষ দুটো টোটা অজগরের দিকে সে ছুঁড়েছে।

তিমিরময়ী রাত্রি নামল।

অসহায় অবস্থায় চুপ করে কাত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। প্রথমটা তার মনে খুব ভয় হয়—কিন্তু মরীয়ার সাহসে সাহসী হয়ে শেষ পর্যন্ত সে চুপ করে শুয়েই রইল। মৃত অজগরটাকে অন্ধকারে আর দেখা যায় না—কিন্তু তার হিমশীতল আলিঙ্গন প্রতিমুহূর্তে সনৎকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল যে প্রাণের বদলে সে প্রাণই নিতে চায়।

সারারাত্রি এভাবে কাটলে বোধ হয় সনৎ সে-যাত্রা ফিরত না—কিন্তু অনেক রাত্রে হঠাৎ সনৎ-এর তন্দ্রা গেল ছুটে। অনেক লোক আলো নিয়ে এসে ডাকাডাকি করছে। ইয়ার হোসেনের গলা শোনা গেল—হালু-উ-উ—মি. রায়—।

সনৎ-এর সর্বশরীর ঠান্ডায় অবশ হয়ে গিয়েছিল—সে গলা দিয়ে স্বর উচ্চারণ করতে পারলে না। কিন্তু ইয়ার হোসেনের টর্চের আলো এসে পড়ল ওর ওপরে। সবাই এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। পাশের মৃত অজগর দেখে ওরা ভেবেছিল সর্পের বেষ্টনে সনৎও প্রাণ হারিয়েছে—তারপর ওকে হাত নাড়তে দেখে বুঝলে ও মরেনি।

তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করতে সনৎ চাঙা হয়ে উঠল।

ইয়ার হোসেন সেদিন ওদের ডেকে পরামর্শ করতে বসল।

জামাতুল্লাকে বললে, কই, তোমার সে মন্দিরের বা শহরের ধ্বংসাবশেষ তো দেখিনে কোনোদিকে।

জামাতুল্লা বললে, আমি তো আর মেপে রাখিনি মশাই যে, ক-পা গেলে শহর পাওয়া যাবে—সবাই মিলে খুঁজে দেখতে হবে।

সুশীল একটা নকশা দেখিয়ে বললে, এ কদিনে যতটা এসেছি, জঙ্গলের খসড়া ম্যাপ তৈরি করে রেখেছি। এই দেখে আমরা যে-যে পথে এসেছি দেখতে হবে, সে পথে আর যাব না।

আবার ওদের দল বেরিয়ে পড়ল। দু-দিন পরে সমুদ্র-কল্লোল শুনে বনঝোপের আড়াল থেকে বার হয়ে ওরা দেখলে—সামনেই বিরাট সমুদ্র।

সনৎ চিৎকার করে বলে উঠল, আলাট্টা! আলাট্টা!

সুশীল বললে, তোমার এ চিৎকার সাজে না সনৎ। তুমি জেনোফনের বর্ণিত গ্রিক সৈন্য নও, সমুদ্রের ধারে তোমার বাড়ি নয়—

ইয়ার হোসেন বললে, ব্যাপার কী? আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারছিনে—

সনৎ বললে, জেনোফন বলে একজন প্রাচীন যুগের গ্রিক লেখক—নিজেও তিনি একজন সৈনিক—পারস্য দেশের অভিযান শেষ করে ফিরবার সমস্ত দুঃখ-কষ্টটা 'দশ সহস্রের প্রত্যাবর্তন' বলে একখানা বইয়ে লিখে রেখে গিয়েছেন—তাই ও বলছে—

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, ও!

জামাতুল্লা বললে, আমার একটা পরামর্শ শোনো। কম্পাসে দিক ঠিক করে চলো এবার উত্তর মুখে যাই—ওদিকটা দেখে আসা যাক।

সকলেই এ কথায় সায় দিলে। সূর্যের মুখ না দেখে সকলেরই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।

ওরা প্রথম দিনেই সমুদ্রের বালির ওপরে অনেকগুলো বড়ো বড়ো কচ্ছপ দেখতে পেলে। ইয়ার

হোসেনের একজন অনুচর ছুটে গিয়ে একটাকে উলটে চিত করে দিল, বাকিগুলো তাড়াতাড়ি গিয়ে সমুদ্রে ঢুকে পড়ল। মালয় দেশীয় দায়ের (মালয়েরা বলে 'বোলো') সাহায্যে কচ্ছপটাকে কাটা হল, মাংসটা ভাগ করে রান্না করে সকলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলে। ভাগ করার অর্থ এই যে, ইয়ার হোসেনের দল ও জামাতুল্লার রান্না হত আলাদা, সুশীল ও সনৎ-এর আলাদা রান্না সনৎ নিজেই করত।

একদিন সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে কী একটা জানোয়ার দেখে সনৎ ছুটে এসে সবাইকে খবর দিলে।

সকলে গিয়ে দেখলে প্রকাণ্ড বড়ো শুয়োরের মতো একটা জানোয়ার বালির ওপর চুপ করে শুয়ে। তার থ্যাবড়া নাকের নীচে বড়ো বড়ো গোঁপ—মুখের দু-দিকে দুটো বড়ো বড়ো দাঁত।

ইয়ার হোসেন বললে, এক ধরনের সিল—সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বটে।

সিলের মূল্যবান চামড়ার লোভে সনৎ ওকে গুলি করতে উদ্যত হল।

ইয়ার হোসেন নিষেধ করে বললে, ওটা মেরো না—ও সিলকে বলে সি লায়ন, ও মারলে অলক্ষণ হয়।

পরদিন তাঁবু তুলে সকলে উত্তর দিকের জঙ্গল ভেদ করে রওনা হল।

উত্তর দিকের জঙ্গলে সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেকটা গেল ওরা। এক গাছ থেকে আরেক গাছে বড়ো বড়ো পুষ্পিত লতা সারা বন সুগন্ধে আমোদ করে ঝুলে পড়েছে—সুবৃহৎ লতা যেন অজগর সাপের নাগপাশে মহীরুহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে—রাশি রাশি বিচিত্র অর্কিড। বিচিত্র ও উজ্জ্বল বর্ণের পাখির দল ডালে ডালে—অদ্ভুত সৌন্দর্য বনের। সুশীল বললে, মি. হোসেন, ও কী লতা জানেন? যেমন সুন্দর ফুল—লতা দেখা যাচ্ছে না ফুলের ভারে—গন্ধও অদ্ভুত। ইয়ার হোসেন লতার নাম জানে না—তবে বললে, সিঙ্গাপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ওরকম লতা সে দেখেছে।

সারা দ্বীপে গভীর বন। বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া কঠিন ও অনবরত গাছাপালা কেটে যেতে হয় পথ করবার জন্যে। কাজেই ওরা সমুদ্রের ধার বেয়ে চলছিল। এক জায়গায় একটা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে বনের মধ্যে দিয়ে, নদী পার হয়ে যাওয়া কষ্টকর বলে বাধ্য হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নদী সরু হবার নাম নেই—অনেক দূরে বনের মধ্যে ঢুকে এখনও নদী বেশ গভীর।

সুশীল বললে, ওহে, নদীটা আমাদের দেশের বড়ো একটা খালের মতো দেখছি। এ দ্বীপে এত বড়ো নদী আসছে কোথা থেকে? তেমন বড়ো পাহাড় কোথায়?

—নিশ্চয় বড়ো পাহাড় আছে বনের মধ্যে, সেইদিকেই তো যাচ্ছি—দেখা যাক—

আরও আধ ঘণ্টা সকলে মিলে গভীর জনহীন বনের মধ্যে দিয়ে চলল। বনের রাজ্য বটে এটা—সত্যিকার বন কাকে বলে এতদিন পরে প্রত্যক্ষ করল সুশীল-সনৎ।

হঠাৎ এক জায়গায় একটা নাগকেশর গাছ দেখে সুশীল বলে উঠল, এই দেখো একটা আশ্চর্য জিনিস! এই গাছ কোথাও এদিকে দেখা যায় না। নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে আমদানি এ গাছটা।

খুঁজতে খুঁজতে আশেপাশে আরও কয়েকটা নাগকেশর গাছ পাওয়া গেল। এই গভীর বনের মধ্যে নাগকেশর গাছ থাকার মানেই হচ্ছে এখানে কোনো ভারতীয় উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল পুরাকালে।

সনৎ বললে, কিন্তু এ গাছ তো পুরোনো না, দেখেই মনে হচ্ছে। আট-নশো বছরের নাগকেশর গাছ কি বাঁচে।

—তা নয়। ঔপনিবেশিক ভারতীয়দের নিজেদের হাতে পোঁতা গাছের চারা এগুলো। বড়ো গাছগুলোর থেকে বীজ পড়ে পড়ে এগুলো জন্মেছে। এ গাছ অধস্তন চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষ।

সেদিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সনৎ বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা কৃষ্ণপ্রস্তর মূর্তি দেখে চিৎকার করে সবাইকে এসে খবর দিলে। ওরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখলে গভীর জঙ্গলের লতাপাতার মধ্যে একটা ভাঙা পাষাণ-মূর্তি—মূর্তির মুন্ডু নেই, তবে হাত-পা দেখে মনে হয় শিবমূর্তি ছিল সেটা। দু-হাত উঁচু প্রস্তরবেদীর ওপর মূর্তিটা বসানো, এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে ডমরু, গলায় অক্ষমালা—এত দূর দেশে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির এই চিহ্ন দেখে সুশীল ও সনৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল—সেখান থেকে যেন সের যেতে পারে না। এই দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুধর্মের বাণী বহন করে এনেছিল একদিন এদেশে। সুলু সমুদ্রের ওই ডুবো পাহাড় অতিক্রম করত চীনা জাঙ্কওয়ালা যে কৌশল দেখালে, এই কম্পাস ও ব্যারোমিটারের যুগের বহু আগে তাদের পূর্বপুরুষেরা সে কৌশল যদি না দেখাতেন—তবে নিশ্চয়ই এ দ্বীপে পদার্পণ তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। মনে মনে সুশীল তাঁদের প্রণতি জানালে। নমো নমঃ দিগ্বিজয়ী পূর্বপুরুষগণ আশীর্বাদ করো—যে বল ও তেজ তোমাদের বাহুতে, যে দুর্ধর্ষ অনমনীয়তা ছিল তোমাদের মনে, আজ তোমার অধঃপতিত দুর্বল উত্তরপুরুষেরা যেন সেই বল ও তেজের আদর্শে আবার নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, ভারতের নাম বিশ্বের দরবারে।

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেনও চমৎকৃত হল। এ বনেও একদিন মানুষ ছিল তা হলে! এই যে গভীর বন আজ শুধু অজগর আর ওরাং-ওটাংয়ের বিচরণক্ষেত্র, এখানে একদিন সভ্য মানুষের পদধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে, মন্দির গড়েছে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে—এটা সকলের চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হল ওদের কাছে।

জামাতুল্লাকে সুশীল বললে, কেমন, এসব দেখেছিলে বলে মনে হয়?

—এসব দেখিনি। তবে এতে বোঝা যাচ্ছে মানুষের বাসের নিকট এসে পড়েছি!

—সে জায়গাটা কেমন?

—সে একটা শহর বাবুজি। তার বাইরে পাঁচিল ছিল একসময়ে। এখন পড়ে গিয়েছে।

—কম্পাস দেখে দিক ঠিক করেছিলে? ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড ঠিক করেছিলে?

—না বাবুজি, ওসব কিছু করিনি! কম্পাস ছিল না।

সকলের মনে আশার সঞ্চার হল যে এবার নিশ্চয়ই সে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি আসা গিয়েছে। কিন্তু তারপর তিন দিন কেটে গেল, চার দিন গেল, পাঁচ দিন গেল, আবার সামনে সমুদ্রের তীর আবার, সুনীল সুলু-সি। নগর কোথায়, কোথায়ই বা কী। একখানা ইট বা পাথরও জঙ্গলের মধ্যে কোথায়ও কারো চোখে পড়ল না আর। আবার হতাশ হয়ে পড়ল সকলে। জামাতুল্লাকে ইয়ার হোসেন বললে, জামাতুল্লা সাহেব, স্বপ্ন দেখোনি তো হিন্দু-মন্দিরের আর শহরের? জামাতুল্লা গেল রেগে। ইয়ার হোসেনের অনুচরেরা নিজেদের মধ্যে কী বিড়বিড় করে বকতে লাগল।

সুশীল সনৎ ও জামাতুল্লাকে গোপনে ডেকে বললে, ইয়ার হোসেনের ওই লোকগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে যদি কিছু চিহ্ন না পাওয়া যায়—দেখছি ওগুলো ভারী বদমাইস!

জামাতুল্লা বললে, ভাববেন না বাবুজি, আমি ছুরি চালাব, আপনাদের জন্যে প্রাণ দেব! ওরা কী করবে? কাঠের ভেলা তৈরি করে সুলু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিয়ে যাব। ওই হলদে-মুখো চীনে জাঙ্কওয়ালা বড়ো বাহাদুরি করে গেল আপনাদের কাছে—দেখব ও কত বাহাদুর!

একদিন সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে সুশীল বনের মধ্যে পাখি শিকার করতে বেরুল বন্দুক নিয়ে। কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে অস্পষ্ট গোধূলির আলোয় দূর থেকে একটা লম্বা পাহাড়মতো দেখতে পেলে। আরও কাছে গিয়ে সে দেখলে পাহাড় ও তার মধ্যে একটা খাল, তাতে জল আছে—গভীর খাল। জলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। ভালো করে চেয়ে দেখে সে বুঝলে ওপারে ওটা পাহাড় নয়, একটা উঁচু পাঁচিল হতে পারে ওটা। খাল নয়, মানুষের হাতে কাটা পরিখা হয়তো। পাঁচিলের ওপর বড়ো বড়ো গাছ গজিয়েছে, মোটা মোটা শেকড় পাঁচিলের গা বেয়ে এসে মাটিতে নেমেছে—ডালপালার ফাঁক দিয়ে জায়গায় জায়গায় পাঁচিলের গায়ে বড়ো বড়ো পাথরের চাঁইগুলো দেখা যাচ্ছে।

সুশীল আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল!

এই তবে সেই প্রাচীন নগরীর প্রাচীর ও পরিখা। এ বিষয়ে ভুল থাকতে পারে না—তবে, হয়তো সে উলটোদিক থেকে এটাকে দেখেছে। নগরীর সিংহদ্বার অন্যদিকে আছে কোথাও।

সে যখন সকলকে গিয়ে খবর দিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমগ্র বনভূমিকে আচ্ছন্ন করেছে। ইতিমধ্যেই ওরাং-ওটাং ও শৃগালের ডাক শোনা যাচ্ছে। দু-একটা নিশাচর পাখি ছাড়া অন্য পাখির কূজন থেমে গিয়েছে। ডালপালার ফাঁকে ঊর্ধ্বে কৃষ্ণ আকাশে নক্ষত্রাদি দেখা দিয়েছে।

ইয়ার হোসেন বারণ করলে, এখন না, এ রাত্রিকালে তাঁবু ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। কাল সকালে দেখা যাবে।

সুশীলের আনা পাখি দিয়ে তাঁবুতে ভোজ হল রাত্রে।

জামাতুল্লা বললে, পাঁচিল যখন বেরিয়েছে—তখন আমায় মিথ্যেবাদী বলে বদনাম আর কেউ দিতে পারবে না। পরদিন সকালে গিয়ে দেখলে, সত্যই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার অস্তিত্ব—সেখানে কোনো প্রাচীন নগরীর অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজমান।

পরিখার জলে পদ্মফুল দেখে সুশীল ও সনৎ ভাবলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক যেন ওই ফুল। আটশো বছর আগে যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ প্রথম পদ্মফুল এনে দুর্গ পরিখার জলে পুঁতে দেয়, তারা আজ কোথায়? কিন্তু জলে একবার শেকড় গেড়ে যে পদ্মলতা বেঁচে উঠেছিল, সে বংশানুক্রমে আজও অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে এই গভীর অরণ্যের মধ্যে। ইয়ার হোসেনের আদেশে তার দুজন অনুচর জল মেপে দেখলে, এখানে পার হওয়া অসম্ভব। পরিখার জল বেশ গভীর। পরিখার এক বাহু ধরে এক দল ও অন্যদিকে অন্য বাহুর সন্ধানে অন্য দল বার হল।

শেষের দলে গেল সুশীল।

উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা প্রাচীর-পরিখার উত্তরদিকে আধ মাইল ঢাকা। ওদের দল সবিস্ময়ে দেখলে প্রাচীরের এক স্থান ভগ্ন। মাঝখান দিয়ে বেশ একটা রাস্তা যেন ছিল সুপ্রাচীন কালে, এখন অবিশ্যি ঘন বন। দেখে মনে হয় শত্রু দ্বারা দুর্গ বা নগর-প্রাচীর হয়তো এখানে ভগ্ন হয়ে থাকবে, নতুবা এর অন্য কোনো কারণ নির্দেশ করা যায় না।

দেখা গেল পরিখার সেইখানে প্রাচীনকালে বোধ হয় কাঠের সেতু ছিল, এখন সেটা ভেঙে জলে। জলের গভীরতা সেখানে কম। কাঠের সেতু প্রথমে দেখা যায়নি। ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর প্রথমে জলের ধারে একটা শেকল দেখতে পায়। শেকলটা টেনে জলের মধ্যে থেকে একখণ্ড লোহার পাত বেরুল। আন্দাজ করা কঠিন নয় যে এই লোহার পাত কাঠের চওড়া তক্তার গায়ে লাগানো ছিল। অনুমানটুকু ছাড়া কাঠের সেতুর অস্তিত্বের জন্য কোনো নিদর্শন এতকাল পরে কীভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

ইয়ার হোসেন বললে, এখান দিয়ে পার হওয়া যাক—জল গভীর হবে না।

সুশীল সামান্য একটু আপত্তি করলে—অথচ কেন যে করলে তা সে নিজেই জানে না।

প্রথমে নামলে ইয়ার হোসেন নিজে—তার পেছনে নামল সুশীল। হাত তিন-চার মাত্র জলে যখন ওরা গিয়েছে তখন ওরা দেখলে সামনে জলের যা গভীরতা, তাতে আর অগ্রসর হওয়া চলবে না। ঠিক সেই সময় ওদের নিকট থেকে হাত পাঁচ-ছয় দূরে ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর যে শিকল টেনে তুলেছিল জল থেকে—সে নামল। উদ্দেশ্য, ওদের পাশাপাশি সেও পরিখা পার হবে। কিন্তু পরক্ষণেই এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল।

সুশীল চোখের কোণ দিয়ে অল্পক্ষণের জন্যে দেখতে পেলে, লোকটার ছ-সাত হাত দূরে ছোট্ট কাঠের মতো কালো কী একটা জিনিস যেন ভেসে আসছে। দু-সেকেন্ড মাত্র পরেই হঠাৎ যেন ভূমিকম্পে বিরাট জলোচ্ছ্বাস উঠল, একটা আর্তচিৎকার-ধ্বনি অল্পক্ষণের মধ্যে শোনা গেল...কীসের একটা প্রবল ঝাপটা এসে ওদের জলের ওপর কাত করে ফেললে...ওদের দুজনকে।

পরক্ষণেই ইয়ার হোসেনের সেই অনুচর অদৃশ্য।

কী হল ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারলে না। অবিশ্যি এক মিনিটও হয়নি, এর মধ্যে সব ঘটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায় যারা ছিল তারা চেঁচিয়ে উঠল, শয়তান! শয়তান!

ইয়ার হোসেন আকুলভাবে চিৎকার করে বললে, ডাঙায় ওঠো—ডাঙায় ওঠো।

হতভম্ব সুশীল কাদা হাঁচড়ে মরি-বাঁচি ডাঙায় উঠল—পাশাপাশি ইয়ার হোসেন উঠল, জলে চেয়ে দেখলে জল কাদা-ঘোলা হয়েছে, ইয়ার হোসেনের অনুচর নিশ্চিহ্ন।

সুশীল ও ইয়ার হোসেন তখনও হাঁপাচ্ছে; সুশীলের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে।

সে ভীত কণ্ঠে বললে, কী হল?

ইয়ার হোসেন বললে, আমাদের সাবধানে জলে নামা উচিত ছিল। এইসব প্রাচীনকালের জলাশয়ে কুমির থাকা সম্ভব, একথা ভুলে গিয়েছিলাম। খোঁজো সবাই—

কুমির! সুশীল অবাক হয়ে গেল। কে জানত নগরীর পরিখায় কুমির থাকতে পারে! দুর্গপরিখার প্রহরী এরা—হয়তো প্রাচীন দিনেই শত্রুরোধকল্পে জলের মধ্যে কুমির ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সুবিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এখনও তারা বাইরের লোকের অনধিকার প্রবেশে বাধাদান করছে।

খুঁজে কিছু হল না—জল কিছুক্ষণ পরে হতভাগ্য অনুচরের রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। ইয়ার হোসেন বললে, আজ থামলে আমাদের চলবে না—এগোও। নগরের ফটক খোঁজো—

সুশীল বললে, জলের মধ্যে অজানা বিপদ। জল পার হওয়ার দরকার নেই—হেঁটে বা সাঁতরে। কোথাও সেতু আছে কি না দেখা যাক।

আবার উত্তর মুখে সকলে চলল। মাইল দুই সোজা চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—কারণ ভীষণ জঙ্গল কেটে কেটে অগ্রসর হতে হচ্ছে! আগুন জ্বেলে তাঁবু ফেলে সেদিন সকলে সেখানে রাত্রি কাটাবার আয়োজন করলে। এমন সময় বহু দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল—তার উত্তরে ওরাও একটা আওয়াজ করলে। দুটি দলের মধ্যে যোগসূত্র রাখবার একমাত্র উপায় এই বন্দুকের আওয়াজ—অনেক দূর থেকে দক্ষিণগামী দলের এ হল সংকেতধ্বনি। পরদিন সকালে আরও এক মাইল গিয়ে প্রাচীরের উত্তর দিক থেকে পূর্ব দিকে মুখ ফেরালে। অর্থাৎ এদিকে আর শহর নেই। প্রাচীর ধরে সবাই বাঁকতে গিয়ে দেখলে পরিখার এপারে অনেকগুলো স্তূপ, স্তূপের ওপর বিরাট জঙ্গল। বড়ো বড়ো পাথর গড়িয়ে এসে পড়েছে স্তূপ থেকে নীচে—সেগুলো বেশ চৌরশ করে কাটা। সম্ভবত স্তূপের ওপর কোনো দুর্গ ছিল যা ঠিক নগর-প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম কোণ পাহারা দিত।

পশ্চিম মুখে কতটা যেতে হবে কেউ জানে না, কারণ তারা দৈর্ঘ্য ধরে যাচ্ছে, না প্রস্থ ধরে যাচ্ছে তা জানবার সময় এখন আসেনি। সেদিনও কেটে গেল বনের মধ্যে। সন্ধ্যা নামল। সন্ধ্যায় যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, তার আওয়াজ খুব ক্ষীণ ও অস্পষ্ট।

সুশীল বললে, আমরা দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছি—প্রস্থ ধরে চলেছি। বুঝেছেন মি. হোসেন?

—এবার বুঝলাম। ওদিকে যে দল গিয়েছে তারা ওদিকের শেষ প্রান্তে পৌছে বন্দুক ছুঁড়ছে। অন্তত সাত মাইল দূর এখান থেকে।

পরদিন বেলা দশটার মধ্যে নগরীর সিংহদ্বার পাওয়া গেল। সেখানটাতে পরিখার ওপর পাথরের সেতু। এপারে সেতু রক্ষার জন্যে দুর্গ ছিল, বর্তমানে প্রকাণ্ড ঢিবি।

সকলে ব্যস্ত হয়ে সেতু পার হয়ে সিংহদ্বার লক্ষ করে অল্প কিছু দূরে অগ্রসর হয়েই থেমে গেল।

সিংহদ্বারের খিলান ভেঙে পড়ত—যদি বটজাতীয় কয়েকটি বৃক্ষের শিকড় আষ্টেপৃষ্টে তাকে না জড়িয়ে ধরে রাখত! সিংহদ্বারের দু-পাশে অদ্ভুত দুই প্রস্তরমূর্তি—নাগরাজ বাসুকী ফণা তুলে আছে সামনে, পেছনে তিনমুখ-বিশিষ্ট কোনো দেবতার মূর্তি। সূর্যের আলো ওপরের বটবৃক্ষের নিবিড় ডালপালা ভেদ করে মূর্তি দুটির গায়ে বাঁকাভাবে এসে পড়েছে।

গম্ভীর শোভা। সুশীল শুধু নয়, দলের সকলেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল এই কারুকার্যময় সিংহদ্বার ও প্রাচীন যুগের শিল্পীর হাতের এই ভাস্কর্যের পানে।

সুশীল হাত জোড় করে প্রণাম করলে মূর্তি দুটির উদ্দেশে। যেন পুরাতত্ত্ব বা দেবমূর্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হলেও আন্দাজ করলে এ দুটি তিনমুখ-বিশিষ্ট শিবমূর্তি।

সুলু সমুদ্রের এক জনহীন অরণ্যাবৃত দ্বীপে প্রাচীন ভারতের শক্তি ও তেজ একদিন এই দেবমূর্তিকে স্থাপিত করেছিল। আজ ভারত অধঃপতিত দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। হে দেব, তোমার যে ভক্তগণ তোমাকে এখানে বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা আজ নেই—তাদের অযোগ্য বংশধরকে তুমি সেই শৌর্য ও সাহস ভিক্ষা দাও, তাদের বীরপুরুষদের বংশধর করে দাও, হে রুদ্রভৈরব!

ইয়ার হোসেন পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এই বিরাট ভাস্কর্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বললে, যদি আমার দিন আসে, এই মূর্তি সিঙ্গাপুরের মিউজিয়ামে দান করবার ইচ্ছে রইল—

সুশীল বললে, তা কখনো করবেন না মি. হোসেন, যেখানকার দেবতা সেইখানেই তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিন। অমঙ্গলকে ডেকে আনবেন না।

সিংহদ্বার অতিক্রম করে ওরা নগরীর মধ্যে ঢুকল। কিন্তু অল্প কিছুদূর গিয়েই দেখলে, এত দুর্ভেদ্য জঙ্গল যে দশ হাত এগিয়ে যাবার উপায় নেই বন না কাটালে। সিংহদ্বারের সামনেই নিশ্চয় প্রাচীন নগরের রাজপথ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে রাজপথের ওপরই তিন-চারশো বছরের পুরোনো বটজাতীয় বৃক্ষ, বন্য রবার, বন্য ডুমুর গাছ। এইসব বড়ো গাছের নীচে আগাছা ও কাঁটালতার জঙ্গল। ওরাং-ওটাংও ওই জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হতে পারে না—মানুষ কোন ছার।

ইয়ার হোসেনের হুকুমে মালয় অনুচরেরা 'বোলো' দিয়ে জঙ্গল কেটে কোনোরকমে একটু সুঁড়িপথ বার করতে করতে সোজা চলল।

সুশীল বললে, এ জঙ্গল তো দেখছি নগরের বাইরে যেমন ছিল এখানেও তেমনি। কেবল এটা পাঁচিলের মধ্যে এই যা তফাত। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—দেখুন। দেখুন!

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল সামনে প্রকাণ্ড একটা মন্দিরের চূড়া, লতাঝোপের আবরণ থেকে অনেক উঁচুতে মাথা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের কাছে যাবার কোনো উপায় নেই—অনেক দূর থেকে বড়ো বড়ো দেওয়াল-ভাঙা পাথর ছড়িয়ে জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে অন্তত দেড়শো হাত পর্যন্ত।

ওরা ডিঙিয়ে লাফিয়ে কোনো মন্দিরের সামনে বড়ো চত্বরের কাছে এল—কিন্তু সামনেই গোপুরমের মতো উঁচু পাইলন টাওয়ার। তার সুবিশাল পাথরের খিলান ফেটে চৌচির হয়ে সিংহদ্বারের মতোই আষ্টেপৃষ্ঠে বড়ো বড়ো শেকড় আর লতার বাঁধনে আজ কত যুগ যুগ ধরে ঝুলছে—তার ঠিকানা কারো কাছে নেই। গোপুরম ছাড়িয়ে মন্দিরের দেওয়াল। বিকটাকার দৈত্যের মুখের মতো সারি সারি অনেকগুলো মুখ দেওয়ালের গায়ে বেরিয়ে আছে—সুশীল আঙুল দিয়ে ওদের দেখিয়ে বললে, দেখো কী চমৎকার কাজ! হয় পাথরের কড়ি নয়তো পায়োনালি যাকে ইংরাজিতে বলে গর্গয়েল। অর্থাৎ বিকট জানোয়ারের মুখ বসানো নালি।

সকলেই অবাক হয়ে সেই কল্পনা-সৃষ্ট মুখগুলোর দিকে চেয়ে রইল। যে সুন্দরকে গড়ে তোলে সেও যেমন কৌশলী শিল্পী, ভীষণকে যে রূপ দেয়, সে শিল্পীও ঠিক ততো বড়ো। সুশীলের মনে পড়ল আনাতোল ফ্রান্সের সেই গল্প, শয়তানকে এমন বিকট করে আঁকলে শিল্পী যে, রাতের অন্ধকারে শয়তান এসে শিল্পীকে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি আমাকে এর আগে কোথায় দেখেছিলে যে অমন করে এঁকেছ? শিল্পী বললে, আপনি কে?

শয়তাল বললে, আমি লুসিফার। যাকে তোমরা বলো শয়তান। ও নামটায় আমার ভয়ানক আপত্তি তা জানো? তুমি কী বিশ্রী করে এঁকেছ আমায়! আমি কি অত খারাপ দেখতে? দেখো না আমার দিকে চেয়ে!

শিল্পী দেখলে শয়তানের মূর্তি দেখতে বেশ সুন্দর, তবে মুখশ্রী ঈষৎ বিষণ্ণ। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, আমায় মাপ করুন, আমি এর আগে দেখিনি আপনাকে। আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে। আমি ভুল শুধরে নেব—

শয়তান হাসতে হাসতে বলে, তাই শুধরে নাও গে যাও—নইলে তোমার কান মলে দেব—

যাক্। ওরা সবাই খিলানের তলা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মন্দিরের মধ্যেকার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। শুধু ভীষণ কাঁটাগাছ আর বেত, যা থেকে মলক্কা বেতের ছড়ি হয়।

সনৎ ছেলেমানুষ, ভালো বেত দেখে বলে উঠল, দাদা, একটা বেত কাটব?

ইয়ার হোসেন তাকে ধমক দিয়ে কী বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একটি সুন্দর পাখি এসে সামনের বন্য রবারের গাছের ডাল থেকে মন্দিরের ভাঙা পাথরের কার্নিসে বসল। সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল পাখিটার দিকে। কী সুন্দর! দীর্ঘ পুচ্ছ ঝুলে পড়েছে কার্নিস থেকে প্রায় একহাত—ময়ূরের পুচ্ছের মতো। হলদে ও সাদা আঁখি পালকের গায়ে—পিঠের পালকগুলো ঈষৎ বেগুনি।

ইয়ার হোসেন বললে, টিকাটুরা, যাকে সাহেব লোক বলে বার্ড অব্ প্যারাডাইজ—খুব সুলক্ষণ।

সনৎ বললে, বাঃ কী চমৎকার! এই সেই বিখ্যাত বার্ড অব প্যারাডাইজ! কত পড়েছি ছেলেবেলায় এদের কথা—

সুশীল বললে, সুলক্ষণ-কুলক্ষণ দুই-ই দেখছি। কুমির নিলে একজনকে, আবার বার্ড অব্ প্যারাডাইজ দেখা গেল এটা সুলক্ষণ—

মন্দিরের বিভিন্ন কুঠুরি। প্রত্যেক কুঠুরির দেওয়ালে সারবন্দি খোদাই কাজ। সুশীল একখানা পাথরের ইট মনোযোগের সঙ্গে দেখলে। একজন ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর পাশে বোধ হয় গ্রহবিপ্র পাঁজি পড়ছেন। সামনে এক সার লোক মাথা নিচু করে যেন রাজাকে অভিবাদন করছে। রাজার এক হাতে একটা কী পাখি—হয় পোষা শুক, নয়তো শিকারে বাজ।

ভারত! ভারত! কত মিষ্টি নাম, কী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার! তার নিজের দেশের মানুষ একদিন কম্পাস-ব্যারোমিটারহীন যুগে সপ্তসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এখানে এসে হিন্দুধর্মের নিদর্শন রেখে গিয়েছিল, তাদের হাতে গড়া এই কীর্তির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে গর্বে ও আনন্দে সুশীলের বুক দুলে উঠল। বীর তারা, দুর্বল হাতে অসি ও বর্শা ধরেনি, ধনুকে জ্যা রোপণ করেনি—সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে—এই অজ্ঞান বিপদসঙ্কুল মহাসাগর—হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিগ্বিজয় করে নটরাজ শিবের পাষাণ-দেউল তুলেছে সপ্তসমুদ্র-পারে।

পরবর্তী যুগের যারা স্মৃতিশাস্ত্রের বুলি আউড়ে টোলের ভিটেয় বাঁশবনের অন্ধকারে বসে বলে গিয়েছিল—সমুদ্রে যেয়ো না, গেলে জাতটি একেবারে যাবে, হিন্দুত্ব একেবারে লোপ পাবে,—তারা ছিল গৌরবময় যুগের বীর পূর্বপুরুষদের অযোগ্য বংশধর, তাদের স্নায়ু দুর্বল, মন দুর্বল, দৃষ্টি ক্ষীণ, কল্পনা স্থবির।

তারা হিন্দু নয়—হিন্দুর কঙ্কাল।

দু-দিন ধরে ওরা বনের মধ্যে কত প্রাচীন দেওয়াল, ধ্বংসস্তূপ, দরজা, খিলান ইত্যাদি দেখে বেড়াল। জ্যোৎস্না রাত্রে, গভীর রাত্রে যখন ওরাং-ওটাংয়ের ডাকে চারিপাশের ঘন জঙ্গল মুখরিত হয়ে ওঠে, অজ্ঞাত নিশাচর পক্ষীর কুস্বর শোনা যায়, বন্য রবারের ডালপালায় বাদুড়ে ঝটাপটি করে, তখন এই প্রাচীন হিন্দু নগরীর ধ্বংসস্তূপে বসে সুশীল যেন মুহূর্তে কোনো মায়ালোকে নীত হয়—অতীত শতাব্দীর হিন্দু সভ্যতার মায়ালোকে—দিগ্বিজয়ে বীর সমুদ্রগুপ্ত কবি ও বীনবাজিয়ে যে মহাযুগের প্রতীক, হূনবিজেতা মহারথ স্কন্দগুপ্তের কোদণ্ড-টঙ্কারে যে যুগের আকাশ সন্ত্রস্ত।

সুশীল স্বপ্ন দেখে। সনৎকে বলে, বুঝলি সনৎ, জামাতুল্লাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ যে, ও আমাদের এনেছে এখানে। এসব না দেখলে ভারতবর্ষের গৌরব কিছু বুঝতাম না।

সনৎ একথায় সায় দেয়। টাকার চেয়ে এর দাম বেশি।

ইয়ার হোসেন কিন্তু এসব বোঝে না। সে দিন দিন উগ্র হয়ে উঠছে। এই নগরীর ধ্বংসস্তূপে প্রায় দশ দিন কাটল। অথচ ধনভাণ্ডারের নামগন্ধও নেই, সন্ধানই মেলে না। জামাতুল্লাকে একদিন স্পষ্ট শাসালে—যদি টাকাকড়ির সন্ধান না মেলে তো তাকে এই জঙ্গলে টেনে আনবার মজা সে টের পাইয়ে দেবে।

জামাতুল্লা সুশীলকে গোপনে বললে, বাবুজি, ইয়ার হোসেন বদমাইস গুন্ডা—ও না কী গোলমাল বাধায়!

সুনীল ও সনৎ সর্বদা সজাগ হয়ে থাকে রাত্রে, কখন কী হয় বলা যায় না। ইয়ার হোসেনের সশস্ত্র অনুচরের দল দিন দিন অসংযত হয়ে উঠছে।

একদিন জামাতুল্লা বনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে একজায়গায় একটি বড়ো পাথরের থাম আবিষ্কার করলে। থামের মাথায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে পদ্ম তৈরি করা হয়েছে। সুশীলকে ডেকে নিয়ে গেল জামাতুল্লা। সুশীল এসব দেখে খুশি হল। সুশীল ও সনৎ দুজনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে থামটা দেখতে গেল।

সেখানে গিয়ে সুশীল দেখলে থামটার সামনে আড়ভাবে পড়ে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙ—যেন একখানা চৌরশ করা সামনের মেঝে। সুশীল ক্যামেরা এনেছে থামটার ফটো নেবে বলে, পাথরটা সরিয়ে না দিলে পদ্মটির ছবি নেওয়া সম্ভব নয়।

জামাতুল্লা বললে, পাথরটা ধরাধরি করে এসো সরাই—

সরাতে গিয়ে পাথরখানা যেই কাত অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠল, অমনি সনৎ চিৎকার করে বললে, দেখো, দেখো—

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, যেখানে পাথরটা ছিল, সেখানে একটা সুড়ঙ্গ যেন মাটির নীচে নেমে গিয়েছে। জামাতুল্লা ও সুশীল সুড়ঙ্গের ধারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সুড়ঙ্গটা হঠাৎ বেঁকে গিয়েছে, প্রথমটা সেজন্যে মনে হয় গর্তটা নিতান্তই অগভীর।

সুশীল বললে, আমি নামব—

জামাতুল্লা বললে, তা কখনো করতে যাবেন না, বিপদে পড়বেন। কী আছে গর্তের মধ্যে কে জানে।

সুশীল বললে, নেমে দেখতেই হবে। আমি এখানে থাকি, তোমরা গিয়ে তাঁবু থেকে মোটা দড়ি হাত-চল্লিশ, টর্চ আর রিভলবার নিয়ে এসো। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সব আনা হল। সুশীল জামাতুল্লা দুজনে সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলে। খানিক দূরে নামলে ওরা। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি পনেরো-ষোলো ধাপ নেমেই কিন্তু দুজনে হতাশ হল দেখে, সামনে আর রাস্তা নেই। সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে একটা গাঁথা দেওয়ালের সামনে।

সুশীল বললে, এর মানে কী জামাতুল্লা সাহেব?

—বুঝলাম না বাবুজি। যদি যেতেই দেবে না, তবে সিঁড়ি গেঁথেছে কেন?

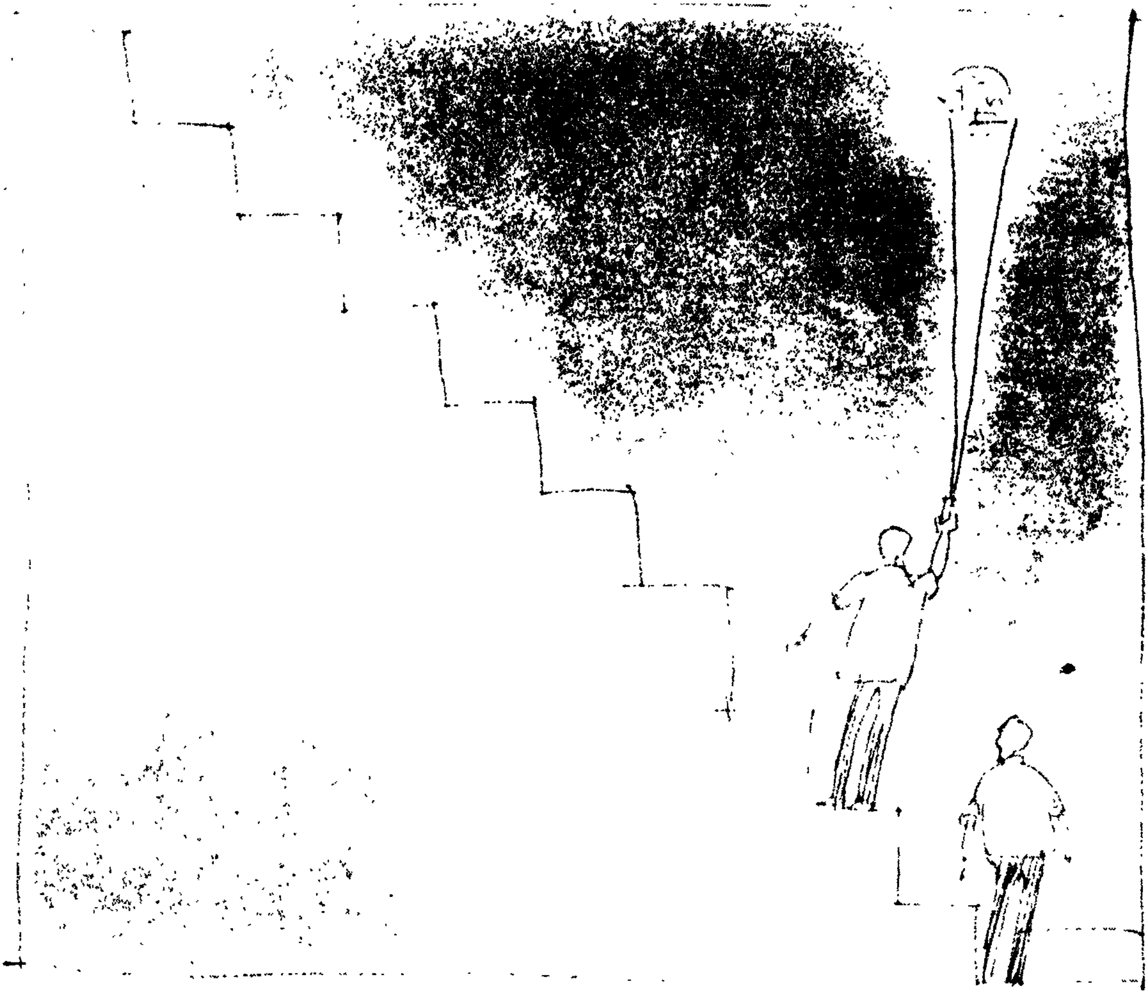

রাত হয়ে আসছে। ওরা দুজনে টর্চ ফেলে চারিদিক ভালো করে দেখতে লাগল। হঠাৎ সুশীল চেঁচিয়ে উঠে বললে, দেখো, দেখো। দুজনেই অবাক হয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে ওদের পরিচিত সেই চিহ্ন খোদা—পদ্মরাগমণির ওপর সে-চিহ্ন খোদা ছিল। ভারতীয় স্বস্তিক চিহ্ন, প্রত্যেক বাহুর কোণে এক জানোয়ারের মূর্তি—সর্প, বাজপাখি, বাঘ ও কুমির।

—এই সেই আঁকজোঁক বাবুজি। কিন্তু এর মানে কী, সিঁড়ি বন্ধ করলে কেন, বুঝলেন কিছু?

দুজনেই হতভম্ব হয়ে গেল। সুশীল সামনের পাথরখানাতে হাত দিলে, বেশ মসৃণ; মাপ নিয়ে চৌরশ করে কেটে কে রেখেছে।

কিছুই বোঝা গেল না—অবশেষে হতাশ হয়ে ওরা গর্ত থেকে উঠে পড়ে তাঁবুতে ফিরে এল সনৎকে নিয়ে। সেখানে কাউকে কিছু বললে না। পরদিন দুপুরবেলা সুশীল একা জায়গাটায় গেল। আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলে। ওর মনে একথা বিশেষভাবে জেগে ছিল, লোকে এইটুকু গর্তে ঢুকবার জন্যে এরকম সিঁড়ি গাঁথে না। এ সুড়ঙ্গ নিশ্চয় আরও অনেক বড়ো। কিন্তু তবে দশ ধাপ নেমেই পাথর দিয়ে এমন শক্ত করে বোজানো কেন?

এ গোলমেলে ব্যাপারের কোনো মীমাংসা করা যায় না দেখা যাচ্ছে। সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে সেই অদ্ভুত চিহ্নটি সুস্পষ্ট খোদাই করা আছে। চিহ্নই বা এখানে কেন? ভালো করে চেয়ে চিহ্নটি দেখতে দেখতে ওর চোখে পড়ল, যে পাথরের গায়ে চিহ্নটি খোদাই করা তার এক কোণের দিকে আরেকটা কী খোদাই করা আছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার খুব না হলেও আলোও তেমন নয়। সুশীল টর্চ ফেলে ভালো করে দেখলে—চিহ্নটি আর কিছুই নয়, ঠিক যেন একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখবার সামান্য খোল। খোলের চারিপাশে দুটি লতার আকারের বলয় কিংবা অন্য কোনো অলঙ্কার পরস্পর যুক্ত। সুশীল কী মনে ভেবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের খোলে নিজের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে দেখতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের পাথর যেন কলের দোরের মতো সরে একটা মানুষ যাবার মতো ফাঁক হয়ে গেল। সুশীল অবাক। এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত আলিবাবার গুহা!

সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে, সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে। সুশীল সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে উঁকি মেরে চাইলে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে। বহু যুগ আবদ্ধ দূষিত বাতাসের বিষাক্ত নিশ্বাস যেন ওর চোখে-মুখে এসে লাগল। তখন কিন্তু সুশীলের মন আনন্দে কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বসে ভাববার সময় নেই। ও তাড়াতাড়ি কয়েক ধাপ নেমে গেল।

আবার সিঁড়ি বেঁকে গিয়েছে কিছুদুর গিয়ে। এবার আর সামনে পাথর নেই, সিঁড়ি এঁকেবেঁকে নেমে চলেছে। সুশীল একবার ভাবলে তার আর যাওয়া উচিত নয়। কতদূর সিঁড়ি নেমেছে এই ভীষণ অন্ধকূপের মধ্যে কে জানে? কিন্তু কৌতূহল সংবরণ করা ওর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। ও আরও অনেকখানি নীচে গিয়ে দেখলে একজায়গায় সিঁড়ি হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে নীচের দিকে ঘুরিয়ে দেখলে, কোনোদিকে কিছুই নেই—পাথর বাঁধানো চাতাল বা মেঝের মতো তলাটা সব শেষ, আর কিছু নেই। ইংরাজিতে যাকে বলে dead end, ও সেখানে পৌছে গিয়েছে। সুশীল হতভম্ব হয়ে গেল।

যারা এ সিঁড়ি গেঁথেছিল তারা কী জন্যে এত সতর্কতার সঙ্গে এত কষ্ট করে সিঁড়ি গেঁথেছিল যদি সে সিঁড়ি কোথাও না পৌছে দেয়?

চাতালের দৈর্ঘ্য হাত তিনেক, প্রস্থ হাত আড়াই। খুব একখানা বড়ো পাথরের দ্বারা যেন সমস্ত মেঝে বা চাতালটা বাঁধানো। তন্নতন্ন করে খুঁজে চাতালের কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। সুশীল বাধ্য হয়ে বোকা বনে উঠে চলে এসে জামাতুল্লা ও সনৎকে সব বললে। ওরা পরদিন লুকিয়ে তিনজনে সেখানে গেল, সিঁড়ি দিয়ে নামলে। সামনে সেই চাতাল। সিঁড়ির শেষ।

জামাতুল্লা বললে, এ কী তামাশা আছে বাবুজি—আমি তো বেকুব বনে গেলাম।

তিনজনে মিলে নানাভাবে পাথরটা দেখলে, এখানে টিপলে, ওখানে চাপ দিলে—হিমালয় পর্বতের মতোই অনড়। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই পাথরের গায়ে। মিনিট কুড়ি কেটে গেল। মিনিট কুড়ি সেই অন্ধকার ভূগর্ভে কাটানো বিপজ্জনকও বটে, অস্বস্তিকরও বটে।

সুশীল বললে, ওঠো সবাই, আর না এখানে।

হঠাৎ জামাতুল্লা বলে উঠল, বাবুজি, একটা কথা আমার মনে এসেছে।

দুজনেই বলে উঠল, কী? কী?

—গাঁতি দিয়ে এই পাথরখানা খুঁড়ে তুলে দেখলে হয়। কী বলেন?

তখন ওরাও ভাবলে এই সামান্য কথাটা। যেকথা, সেই কাজ। জামাতুল্লা লুকিয়ে তাঁবু থেকে গাঁতি নিয়ে এল। পাথর খুঁড়ে শাবলের চাড় দিয়ে তুলে ফেলে যা দেখলে তাতে ওরা যেমন আশ্চর্য হল তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবার সিঁড়ির ধাপ। কিন্তু দশ ধাপ নেমে গিয়ে সিঁড়ি বেঁকে গেল—আবার সামনে চৌরশ পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গ বোজানো। মাথার ওপরকার পাথরে পূর্ববৎ চিহ্ন পাওয়া গেল। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে আবার সে পাথর ফাঁক হল। আবার সিঁড়ি। কিন্তু কিছুদূর নেমে আবার পাথর-বাঁধানো চাতাল—আবার সেই dead end—নির্দেশহীন শূন্য।

অমানুষিক পরিশ্রম। আবার পাথর তুলে ফেলা হল—আবার সিঁড়ি। সুশীল বললে, যারা এ গোলকবাঁধা করেছিল, তারা খানিকদূর গিয়ে একবার একখানা পাথর সোজা করে পথ বুজিয়েছে, তার পরে সিঁড়ির মতো পেতে বুজিয়েছে—এই এদের কৌশল, বেশ বোঝা যাচ্ছে। জামাতুল্লা ওদের সতর্ক করে দিলে। বললে, বাবুজি, অনেকটা নীচে নেমে এসেছি। খারাপ গ্যাস থাকতে পারে, দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারি সবাই। তাঁবুতে সন্দেহ করবে। চলুন আজ ফিরি।

তাঁবুতে ফিরবার পথে জামাতুল্লা বললে, বাবুজি, ইয়ার হোসেনকে এর খবর দেবেন না।

—কেন?

—কী জানি কী আছে ওর মধ্যে। যদি রত্নভাণ্ডারের সন্ধানই পাওয়া যায়, তবে ইয়ার হোসেন কী করবে বলা যায় না। ওর সঙ্গে লোক বেশি। প্রত্যেকে গুন্ডা ও বদমাইস। মানুষ খুন করতে ওরা এতটুকু ভাববে না। ওদের কাছে মশা টিপে মারাও যা মানুষ মারাও তাই।

ইয়ার হোসেনের মন যথেষ্ট সন্দিগ্ধ। তাঁবুতে ফিরতে সে বললে, কোথায় ছিলে তোমরা?

সুশীল বললে, ফটো নিচ্ছিলাম।

ইয়ার হোসেন হেসে বললে, ফটো নিয়ে কী হবে, যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা—তার সন্ধান করো।

ইয়ার হোসেনের জনৈক মালয় অনুচর সেদিন দুপুরে একটা পাথরের বৃষমূর্তি কুড়িয়ে পেলে গভীর বনের মধ্যে। খুব ছোটো, কিন্তু অতটুকু মূর্তির মধ্যেও শিল্পীর শিল্পকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় বর্তমান।

রাত্রে জ্যোৎস্না উঠল।

সুশীল তাঁবু থেকে একটু দূরে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসল। ভাবতে ভালো লাগে এই সমুদ্রমেলা দ্বীপময় রাজ্যের অতীত গৌরবের দিনের কাহিনি। রাত্রে যামঘোষী দুন্দুভি যেন বেজে উঠল—ধারাযন্ত্রে স্নান সমাপ্ত করে, কুঙ্কুমচন্দনলিপ্ত দেহে দিগ্বিজয়ী নৃপতি চলেছেন অন্তঃপুরের অভিমুখে। বারবিলাসিনীরা তাঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছে এইমাত্র—তারাও ফিরছে তাঁর পিছনে পিছনে, কারো হাতে রজত কলস, কারো হাতে স্ফটিক কলস...

আধো-অন্ধকার কালো মতো কে একটা মানুষ বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে সুশীলের দিকে ছুটে এল আততায়ীর মতো—সুশীল চমকে উঠে একখানা পাথর ছুঁড়ে মারল। মানুষটা পড়েই জানোয়ারের মতো বিকট চিৎকার করে উঠল—তারপর আবার উঠে আবার ছুটল ওর দিকে। সুশীল ছুট দিলে তাঁবুর দিকে।

ওর চিৎকার শুনে তাঁবু থেকে সনৎ বেরিয়ে এল। ধাবমান জিনিসটাকে সে গুলি করলে। সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দেখা গেল একটা ওরাং-ওটাং।

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেন দুজনে তিরস্কার করলে সুশীলকে।

এই বনে যেখানে সেখানে একা যাওয়া উচিত নয়, তারা কতবার বলবে একথা? কত জানা-অজানা বিপদ এখানে পদে পদে।

পরদিন ছুতো করে সুশীল ও জামাতুল্লা আবার বেরিয়ে গেল বনের মধ্যে সেই গুহায়। সনৎকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। কেননা সকলে গেলে সন্দেহ করবে ওরা।

আবার সেই পরিশ্রম। আরও দু-ধাপ সিঁড়ি ও দুটো চাতাল ডিঙিয়ে গেল। দিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন আর কাজ হয় না। আবার তার পরের দিন কাজ হল শুরু। এইরকম আরও তিন-চার দিন কেটে গেল।

একদিন সনৎ বললে, দাদা, তোমরা আর দিনকতক যেয়ো না।

সুশীল বললে, কেন?

—ইয়ার হোসেন সন্দেহ করছে। সে রোজ বলে, এরা বনের মধ্যে কী করে। এত ফটো নেয় কীসের?

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আর একদিনের কাজ বাকি। ওর শেষ না দেখে আমি আসতে পারছিনে।

—একা যাও—দুজনে যেয়ো না। জোট বেঁধে গেলেই সন্দেহ করবে। হাতিয়ার নিয়ে যেয়ো।

—তুই তাঁবুতে থেকে নজর রাখিস ওদের ওপর। কাল খুব সকালে আমি বেরিয়ে যাব।

সুশীল তাই করলে। প্রায় ষাট ফুট নীচে তখন শেষ চাতাল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেদিন দুপুর পর্যন্ত পরিশ্রম করে সে চাতালটা ভেঙে ফেললে।

তারপর যা দেখলে তাতে সুশীল একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ল।

সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে ক্ষুদ্র একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে।

কক্ষের মধ্যে অন্ধকার সূচিভেদ্য।

টর্চের আলোয় দেখা গেল কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি পাষাণবেদিকার ওপর এক পাষাণ নারীমূর্তি—বিলাসবতী কোনো নর্তকী যেন নাচতে নাচতে হঠাৎ বিটঙ্কবেদিকার ওপর পুত্তলিকার মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে কী দেখে।

একী!

এর জন্যে এত পরিশ্রম করে এসব কাণ্ড করেছে!

সুশীল আরও অগ্রসর হয়ে দেখতে গেল।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। পাথরের বেদির ওপর সেই চিহ্ন আবার খোদাই করা। ঘরের মধ্যে টর্চ ঘুরিয়ে দেখলে। তাকে ঘর বলা যেতে পারে, একটা বড়ো চৌবাচ্চাও বলা যেতে পারে। স্যাঁতসেতে ছাদ, স্যাঁতসেতে মেজে—পাতালপুরীর এই নিভৃত অন্ধকার গহ্বরে এ প্রস্তরময়ী নারীমূর্তির রহস্য কে ভেদ করবে!

কিন্তু কী অদ্ভুত মূর্তি! কটিতে চন্দ্রহার, গলদেশে মুক্তামালা, প্রকোষ্ঠে মণিবলয়। চোখের চাহনি সজীব বলে ভ্রম হয়।

সেদিন ও ফিরে গেল। জামাতুল্লাকে পরদিন সঙ্গে করে নিয়ে এল—তন্নতন্ন করে চারিদিকে খুঁজে দেখলে ঘরের মধ্যে কোথাও কিছু নেই।

জামাতুল্লা বললে, কী মনে হয় বাবুজি?

—তোমার কী মনে হয়?

—এই সিঁড়ি আর চাতাল, চাতাল আর সিঁড়ি ষাট ফুট গেঁথে মাটির নীচে শেষে নাচনেওয়ালি পুতুল! ছোঃ বাবুজি—এর মধ্যে আর কিছু আছে।

—বেশ, কী আছে, বার করো। মাথা খাটাও।

—তা তো খাটাব—এদিকে ইয়ার হোসেনের দল যে খেপে উঠেছে। কাল ওরা কী বলেছে জানেন?

—কীরকম?

—আর দু-দিন ওরা দেখবে—তারপর নাকি এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে। তা ছাড়া আর এক ব্যাপার। আপনাকেও ওরা সন্দেহ করে। বনের মধ্যে রোজ আপনি কী করেন? আমায় প্রায়ই জিজ্ঞেস করে।

—তুমি কী বলো?

—আমি বলি বাবুজি ফটো তোলে, ছবি আঁকে। তাতে ওরা আপনাকে ঠাট্টা করে। ওসব মেয়েলি কাজ।

—যারা এই নগর গড়েছিল, পুতুল তৈরি করেছিল, পাথরে ছবি এঁকেছিল তারা পুরুষমানুষ ছিল জামাতুল্লা। ইয়ার হোসেনের চেয়ে অনেক বড়ো পুরুষ ছিল—বলে দিয়ো তাকে।

সুশীলকে রেখে জামাতুল্লা ফিরে যেতে চাইলে। নতুবা ইয়ার হোসেনের দল সন্দেহ করবে। যাবার সময় সুশীল বললে, কোনো উপায়ে এখানে একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পার? টর্চ জ্বালিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? আর কিছু না থাক সাপের ভয়ও তো আছে।

জামাতুল্লা বললে, আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি লণ্ঠন নিয়ে বাবুজি। আপনি ওপরে উঠে বসুন, এ পাতালের মধ্যে একা থাকবেন না—

সুশীল বললে, না, তুমি যাও, আমি এখানেই থাকব। পকেটে একটুকরো মোমবাতি এনেছি—তাই জ্বালাব।

একটুকরো বাতি জ্বালিয়ে সুশীল ঘরটার মধ্যে বসে ভাবতে লাগল। বাইরে এত বড়ো রাজ্য যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, কোনো জিনিস গোপন করবার জন্যে তারা এই পাতালপুরী তৈরি করেছিল, এত কষ্ট স্বীকার করে নর্তকী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

হঠাৎ নর্তকী পুতুলটার দিকে ওর দৃষ্টি পড়তে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল! কী ব্যাপার এটা?

এতক্ষণ মূর্তিটার যতখানি তার দিকে ছিল, সেটা যেন সামান্য একটু পাক খেয়ে খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সুশীল চোখ মুছে আবার চাইলে।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। এই বাতিটার সামনে ছিল ওই পা-খানা—এখন পায়ের হাঁটুর পেছনের অংশ দেখা যায় কী করে? সে তো এতটুকু নড়েনি নিজে, যেখানে, সেখানেই বসে আছে।

সুশীলের ভয় হল। শ্মশানপুরীর ভূগর্ভস্থ কক্ষ, কত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দৈত্যদানোর দল জমা হয়ে আছে এসব জায়গায় কে বলতে পারে? কীসে মৃত্যু আর কীসে জীবন, এ বার্তা পৌঁছে দেবার লোক নেই। সরে পড়াই ভালো।

এমন সময় ওপর থেকে লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল, পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে ঘরের মধ্যে ওপর থেকে উঁকি মেরে বললে, বাবুজি, ঠিক আছেন?

—তা আছি। ঘরের মধ্যে নামো জামাতুল্লা—

জামাতুল্লা ঘরের মেঝেতে নেমে ওর পাশে দাঁড়াল। সুশীল ওকে মূর্তির ব্যাপারটা দেখিয়ে বললে, এখন তুমি কী মনে করো?

—কিছু বুঝতে পারছিনে বাবুজি—খুব তাজ্জব কথা।

—তুমি থাকো এখানে—বোসো—

কিন্তু জামাতুল্লা দাঁড়াল না। দুজনে এখানে বসে থাকলে ইয়ার হোসেনের দলের সন্দেহ ঘোরালো রকম হয়ে উঠবে, সে থাকতে পারবে না। জামাতুল্লা চলে যাবার পর সুশীল অনেকক্ষণ মূর্তিটার দিকে চেয়ে বসে রইল। মূর্তিটা এবার বেশ ঘুরে গিয়েছে, এ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ওর আগের ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে আসবার পর থেকে, এখন ভয়ের চেয়ে কৌতূহল বেশি।

খুব একটু একটু করে ঘুরছে, ঘূর্ণমান রঙ্গমঞ্চের মতোই, মূর্তির পদতলস্থ বিটঙ্কবেদিকা।

কেন? কী উদ্দেশ্য? অতীত শতাব্দীগুলো মূক হয়ে রইল, এর জবাব মেলে না। বেলা গড়িয়ে এল, সুশীলের হাতঘড়িতে বাজে পাঁচটা।

হঠাৎ সুশীল চেয়ে দেখলে আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

নর্তকী-মূর্তির সরু সরু আঙুলগুলির মধ্যে একটা আঙুল থেকে মুদ্রা রচনা করার দরুন অন্য সব আঙুল থেকে পৃথক এবং একদিকে কী যেন নির্দেশ করবার ভঙ্গিতে ছিল। এবার যেন আঙুলের ছায়া পড়েছে দেওয়ালের এক বিশেষ স্থানে।

এমন ভঙ্গিতে পড়েছে যেন মনে হয় মূর্তিটি তর্জনী-অঙ্গুলির দ্বারা ভিত্তিগাত্রের একটি স্থান নির্দেশ করছে।

তখনি একটা কথা মনে হল সুশীলের। লণ্ঠনের আলোর দ্বারা এ ছায়া তৈরি হয়েছে, না কোনো গুপ্ত ছিদ্রপথে দিবালোক প্রবেশ করছে ঘরের মধ্যে?

তা-ই বলে মনে হয়, লণ্ঠনের আলোর কৃত্রিম ছায়া এ নয়। ও লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিয়ে দেখলে—তখন অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্যেও তর্জনীর ছায়া ভিত্তিগাত্রে পড়ে একটা স্থান যেন নির্দেশ করছে।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে উঠে ও জায়গাটা দেখতে গেল।

দেওয়ালের সেই জায়গা একেবারে সমতল, চিহ্নহীন—চারিপাশের অংশের সঙ্গে পৃথক করে নেওয়ার মতো কিছুই নেই সেখানে। তবুও সে নিরাশ না হয়ে দেওয়ালের জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে দেখতে গেল।

হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। ঠিক যেখানে আঙুলের অগ্রভাগ শেষ হয়েছে সেই স্থানের খানিকটা যেন বসে গেল—অর্থাৎ ঢুকে গেল ভেকে। একটা শব্দ হল পেছনের দিকে—ও পেছন ফিরে চেয়ে দেখল বিটঙ্কবেদিকার তলাটা যেন ঈষৎ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও ফিরে এসে ভালো করে লক্ষ করে দেখলে, গোলাকার বেদিকাটি তার নর্তকী-মূর্তিটা সুদ্ধ যেন একটা পাথরের ছিপি। বড়ো বোতলের মুখে যেমন কাচের স্টপার বা ছিপি থাকে, এ যেন পাষাণ-নির্মিত বিরাট এক স্টপার। কীসের চাড় লেগে স্টপারের মুখ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও নর্তকী-মূর্তির পাদদেশে এবং গ্রীবায় দুই হাত দিয়ে মূর্তিটাকে একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই সেটা সবসুদ্ধ বেশ আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। কয়েবার ঘুরবার পর ক্রমেই তার তলার ফাঁক চওড়া হয়ে আসতে লাগল। কী কৌশলে প্রাচীন শিল্পী পাথরের উপরটাকে ঘূর্ণমান করে তৈরি করেছিল?

এই মূর্তিসুদ্ধ বেদিকা টেনে তোলা তার একার সাধ্যে কুলুবে না। জামাতুল্লা ও সনৎ দুজনকেই আনতে হবে কোনো কৌশলে সঙ্গে করে, ইয়ার হোসেনের দলের অগোচরে!

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার বিলম্ব নেই। বহু দিন-রাত্রির ছায়া অতীতের এ নিস্তব্ধ কক্ষে জীবনের সুর ধ্বনিত করেনি, এখানে গভীর নিশীথ রাত্রির রহস্য হয়তো মানুষের পক্ষে খুব আনন্দায়ক হবে না, মানুষের জগতের বাইরে এরা।

সুশীল লণ্ঠন হাতে উঠে এল আঁধার পাতালপুরীর কক্ষ থেকে। তাঁবুতে ঢুকবার পথে ইয়ার হোসেন বড়ো ছুরি দিয়ে পাখির মাংস ছাড়াচ্ছে।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে, কোথায় ছিলেন?

—ছবি আঁকতে, মি. হোসেন।

—লণ্ঠন কেন?

—পাছে রাত হয়ে যায় ফিরতে। বনের মধ্যে আলো থাকলে অনেক ভালো।

—এত ছবি এঁকে কী হয় বাবু?

—ভালো লাগে।

—আসল ব্যাপারের কী? জামাতুল্লা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। আমি ওকে মজা দেখিয়ে দেব।

—আমরা সকলেই চেষ্টা করছি! ব্যস্ত হবেন না মি. হোসেন—

—আমি আর পাঁচ দিন দেখব। তারপর এখান থেকে চলে যাব—কিন্তু যাবার আগে জামাতুল্লাকে দেখিয়ে যাব সে কার সঙ্গে জুয়োচুরি করতে এসেছিল!

—জামাতুল্লার কী দোষ? আপনি বরং আমাকে দোষ দিতে পারেন—

—আরে আপনি তো ছবি-আঁকিয়ে পুরুষমানুষ। এসব কাজ আপনার না।

সুশীল রাত্রে চুপিচুপি জামাতুল্লাদের নর্তকী পুতুলের ঘটনা সব বললে। ওদের দুজনকেই যেতে হবে, নতুবা ছিপি উঠবে না।

জামাতুল্লা বললে, কিন্তু আমাদের দুজনের একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয় বাবুজি।

—কেন?

—জানেন না,—এর মধ্যে নানারকম ষড়যন্ত্র চলছে। ওরা আপনাদের চেয়ে আমাকেই দোষ দেবে বেশি। আপনাকে ওরা নিরীহ, গোবেচারি বলে ভাবে—

—সেটা অন্যায়।

—আপনারা ভালো মানুষ, আমার হাতের পুতুল—পুতুল যেমন নাচায়, তেমনি আমার হাতে—

শেষের কথাটা শুনে সুশীলের আবার মনে পড়ল নর্তকী-মূর্তির কথা। কাল হয়তো বেরুনো যাবে না, ইয়ার হোসেনের কড়া নজরবন্দির দরুন। আজই রাত্রে অন্য দল ঘুমুলে সেখানে গেলে ক্ষতি কী?

সনৎকে বললে, সনৎ, তৈরি হও। আজ রাত্রে হয় আমাদের জীবন, নয়তো আমাদের মরণ। পাতালপুরীর রহস্য আজ ভেদ করতেই হবে। আজ আঁধার রাত্রে চুপিচুপি বেরুবে আমার সঙ্গে—দিনের আলোয় সব ফাঁস হয়ে যাবে।

জামাতুল্লা বললে, কেউ টের না পায় বাবুজি, জুতো হাতে করে সব যাবেন কিন্তু।

আহারাদির পর্ব মিটে গেল। দাবানল জ্বলে উঠেছে আজ ওদের মনে, বনের সাময়িক দাবানলকেও ছাপিয়ে তার শিখা সমস্ত মনের আকাশ ব্যেপে বেড়ে উঠল।

দুটো রাইফেল, একটা রিভলবার, একটা শাবল, একটা গাঁতি, খানিকটা দড়ি, চার-পাঁচটা মোমবাতি, কিছু খাবার জল, এক শিশি টিংচার আইডিন, খানকতক মোটা মোটা রুটি—তিনজনের মধ্যে এগুলো ভাগ করে নিয়ে রাত একটার পর ওরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাঁবু ফেলে বেরুল।

ইয়ার হোসেনের একজন মালয় অনুচর উলটোমুখে দাঁড়িয়ে 'বলো' (রামদাও) হাতে পাহারা দিচ্ছে! অন্ধকারে এরা বুক ঘেঁষে চলে এল...সে লোকটা টের পেল না।

সনৎ বললে, আমি সে পুতুলটা একবার দেখব—

অদ্ভুত রাত্রি! বনের মাথায় অগণিত তারা, বহুকালের সুপ্ত নগরীর রহস্যে নিশীথ রাত্রির অন্ধকার যেন থমথম করছে, সমস্ত ধ্বংসস্তূপটি যেন মুহূর্তে শহর হয়ে উঠতে পারে--ওর অগণিত নরনারী নিয়ে। লতাপাতা ঝোপঝাপ, মহীরুহের দল খাড়া হয়ে সেই পরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় যেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

অন্ধকারে একটা সরসর শব্দ হতে লাগল সামনের মাটিতে।

সকলে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে টর্চ টিপলে—প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ আস্তে আস্তে ওদের পাঁচ হাত তফাত দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলে পাথরের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল, সাপটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ওরা আবার চলল।

গহ্বরের মুখ ওরা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল, তিনজনে মিলে সেগুলো সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

সনৎ বললে, এ তো বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি—

কিন্তু পাতালপুরীর কক্ষের সে নর্তকী-মূর্তিটা দেখে ওর কথা সরল না। শিল্পীর অদ্ভুত শিল্পকৌশলের সামনে ও যেন হতভম্ভ হয়ে গেল।

সুশীল বললে, শুধু মূর্তিটি কিউরিও হিসাবে বিক্রি করলে দশ হাজার টাকায় যে-কোনো বড়ো শহরের মিউজিয়ম কিনে নেবে—তবে, আমাদের দেশে নয়—ইয়োরোপে।

জামাতুল্লা বললে, ধরুন বাবুজি নাচনেওয়ালি পুতুলটা সবাই মিলে—পাক খাওয়াতে হবে একে বারকয়েক এখনও।

মিনিট দুই সবাই মিলে পাক দিয়ে মূর্তিটাকে ঘোরালো, যেমন স্টপার ঘোরায় বোতলের মুখে। তারপর সবাই সন্তর্পণে মূর্তিটাকে ধরে উঠিয়ে নিলে। স্টপারের মতোই সেটা খুলে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বিটঙ্কবেদির নীচের অংশে বার হয়ে পড়ল গোলাকার একটা পাথরের চৌবাচ্চা। সুশীল উঁকি মেরে দেখে বললে, টর্চ ধরো, খুব গভীর বলে মনে হচ্ছে—

টর্চ ধরে ওরা দেখলে চৌবাচ্চা অন্তত সাত ফুট গভীর। তার তলায় কী আছে ওপর থেকে ভালো দেখা যায় না।

সনৎ বললে, আমি লাফ দিয়ে পড়ব দাদা?

জামাতুল্লা বারণ করলে। এসব পুরোনো কূপের মধ্যে বিষধর সর্প প্রায়ই বাসা বাঁধে, সমীচীন হবে না।

দু-একটি পাথর ছুঁড়ে মেরে ওরা দেখলে, কোনো সাড়াশব্দ এল না আধো-অন্ধকার কূপের মধ্যে থেকে। তখন জামাতুল্লাই ধুপ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ওর মধ্যে।

কিছুক্ষণ তার আর কোনো সাড়া নেই।

সুশীল ও সনৎ অধীর কৌতূহলের সঙ্গে বলে উঠল, কী—কী—কী দেখলে?

তবুও জামাতুল্লার মুখে কথা নেই। সে যেন কী হাতড়ে বেড়াচ্ছে চৌবাচ্চার তলায়। একটু অদ্ভুতভাবে হাতড়াচ্ছে—একবার সামনে যাচ্ছে, আবার পিছু হঠে আসছে।

সুশীল বললে, কী হল হে? পেলে কিছু দেখতে?

জামাতুল্লা বললে, বাবুজি, এর মধ্যে কিছু নেই—

—কিছু নেই?

—না বাবুজি! একেবারে ফাঁকা—

—তবে তুমি ওর মধ্যে কী করছ জামাতুল্লা?

—এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। নেমে এসে দেখুন—

সুশীল ও সনৎ সন্তর্পণে একে একে পাথরের চৌবাচ্চাটির মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। জামাতুল্লা দেখালে, এই দেখুন বাবুজি, এই লাইন ধরে একবার সামনে, একবার পিছনে গিয়ে দেখুন—তাহলেই বুঝতে পারবেন—

—সামনে পেছনে গিয়ে কী হবে?

সুশীল লক্ষ করে দেখলে চৌবাচ্চার ডানদিকের দেওয়ালে একটা কালো রেখা আছে; সেইটে ধরে যদি সামনে বা পেছনে যাওয়া যায় তবে চৌবাচ্চার তলাটা একবার নামে, একবার ওঠে। ছেলেদের 'see-saw' খেলার তক্তাটার মতো।

সনৎ বললে, ব্যাপারটা কী?

সুশীল বললে, অর্থাৎ এটা যদি কোনোরকমে ওঠানো যায়, তবে এর মধ্যে আর কিছু রহস্য আছে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

জামাতুল্লা বললে, বাবু, গাঁতি দিয়ে তলা ভেঙে ফেলতে পারি তো—অন্য কোনো পথ যদি না পাওয়া যায়। কিন্তু আজ থাকলে হত না বাবুজি? বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ—সকাল হয়-হয়—

হঠাৎ সুশীল চৌবাচ্চার এক জায়গায় টর্চের আলো ফেলে বলে উঠল, এই দেখো সেই চিহ্ন—

সনৎ ও জামাতুল্লা সবিস্ময়ে দেখলে, চৌবাচ্চার কালো রেখার ওপরে উত্তরদিকের কোণে দুখানা পাথরের সংযোগস্থলে তাদের অতিপরিচিত সেই চিহ্নটি আঁকা।

সুশীল বললে, হদিস পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে—

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ এই চিহ্নের ওপর টিপলেই চৌবাচ্চার তলার পাথরখানা একদিকে খুব বেশি কাত হয়ে ভেতরে কী আছে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল। আজ থাক, চলো।

জামাতুল্লাও তাতে মত দিলে। সবাই মিলে তাঁবুতে ফিরে এল যখন, তখনও ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্য 'বলো' হাতে তাঁবুর দ্বারে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। জামাতুল্লার ইঙ্গিতে সুশীল ও সনৎ উপুড় হয়ে পড়ে বুকে হেঁটে নিজেদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

জামাতুল্লা বললে, ঘুমিয়ে পড়ুন বাবুজিরা—কিন্তু বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমুবেন না, আমি উঠিয়ে দেব সকালেই। নইলে ওরা সন্দেহ করবে।

সুশীল বললে, আমাদের অবর্তমানে ওরা ঘরে ঢোকেনি এই রক্ষে—

সনৎ অবাক হয়ে বললে, কী করে জানলে দাদা?

—দেখবে? এই দেখো। তাঁবুর দোরে সাদা বালি ছড়ানো, যে-কেউ এলে পায়ের দাগ পড়ত। তা পড়েনি।

ওরা যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সুশীলকে কে যেন বললে, আমার সঙ্গে আয়।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষের পিছু পিছু ও গভীর বনের কতদূর চলল। ইয়ার হোসেনের ভৃত্যগণ ঘোর তন্দ্রাভিভূত, ঊষার আলোকের ক্ষীণ আভাসও দেখা যায় না পূর্ব দিগন্তে। বৃক্ষলতা স্তব্ধ, স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন। সারি সারি প্রাসাদ একদিকে, অন্যদিকে প্রশস্ত দিঘিটার টলটলে নির্মল জলরাশির বুকে পদ্মফুল ফুটে আছে। সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে দেউলে দেউলে ত্রিমূর্তি মহাদেবের পূজা হচ্ছে। সুগন্ধ দীপবর্তিকার আলোকে মন্দিরাভ্যন্তর আলোকিত। প্রাসাদের বাতায়ন বলভিতে শুকসার তন্দ্রামগ্ন।

সুশীল বললে, আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন?

—সেকথা বলব না। ভয় পাবি—

—তবুও শুনি, বলুন—

—বহুদিনের বহু ধ্বংস, অভিশাপ, মৃত্যুর দীর্ঘশ্বাসে এ পুরীর বাতাস বিষাক্ত। এখানে প্রবেশ করবার দুঃসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে।

—কী?

—একজনের প্রাণ। সমুদ্রমেখলা এ দ্বীপের বহু শতাব্দীর গুপ্ত কথা ঘন বন ঢেকে রেখেছিল। ভারত মহাসমুদ্র স্বয়ং এর প্রহরী, দেখতে পাও না?

—আজ্ঞে, তা দেখছি বটে।

—তবে সে রহস্য ভেদ করতে এসেছ কেন?

—আপনি তো জানেন সব।

—সম্রাটের ঐশ্বর্য গুপ্ত আছে এর মধ্যে। কিন্তু সে পাবে না। যে অদৃশ্য আত্মারা তা পাহারা দিচ্ছে, তারা অত্যন্ত সতর্ক। অত্যন্ত হিংসুক। কাউকে তারা নিতে দেবে না। তবে তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করব না আমি—রহস্য নিয়ে যাও, অর্থ পাবে না। যা পাবে তা সামান্য। তারই জন্যে প্রাণ দিতে হবে।

—আপনি ব্রহ্মমুনি?

—মূর্খ। আমি এই নগরীর অধিদেবতা ধ্বংসস্তূপ পাহারা দিচ্ছি শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনেকদিন পরে তুমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছ—আটশো বছর আগে তোমাদের সাহসী পূর্বপুরুষরা অস্ত্র হাতে এখানে এসে রাজ্যস্থাপন করেন। দুর্বল হাতে তাঁরা খড়্গ ধরতেন না। তোমরা সে দেশ থেকেই এসেছ কি? দেখলে চেনা যায় না কেন?

—সেটা আমাদের অদৃষ্টের দোষ, আমাদের ভাগ্যলিপি।

তারপরেই সব অন্ধকার। সুশীল সেই অদৃষ্টপূর্ব পুরুষের সঙ্গে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন চলেছে...চলেছে...মাথার ওপর কৃষ্ণা নিশীথিনীর জ্বলজ্বলে নক্ষত্রভরা আকাশ।

পুরুষটি বললেন, সাহস আছে? তুমি ভারতবর্ষের সন্তান—

—নিশ্চয়ই, দেব।

নগরী বহুদিন মৃতা কিন্তু বহু যুগের পুরাতন কৃষ্ণাগুরুর ধূপগন্ধে আমোদিত অরণ্যতরুর ছায়ায় ছায়ায় অজানা পথযাত্রার যেন শেষ নেই।

বিশাল পুরী, প্রেতপুরীর সমান নিস্তব্ধ। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষে, দামি নীলাংশুকের আস্তরণে ঢাকা স্বর্ণপালঙ্ক কোনো অপরিচিতের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। সুশীলের বুক গুরুগুরু করে উঠল, গুহার রত্নপ্রস্তরের ভিত্তিতে যেন অমঙ্গলের লেখা। ভবনদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে এখনই যে-কোনো বিভীষণা অপদেবীর বিকট মূর্তি!

পুরুষ বললে, ওই শোনো—

সুশীল চমকে উঠল। যেন কোনো নারীকণ্ঠের শোকার্ত চিৎকারে নিশীথ নগরীর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। সে নারীর কণ্ঠস্বরকে সে চেনে। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর! খুব নিকট আত্মীয়র বিলাপধ্বনি। সুশীলের বুক কেঁপে উঠল! ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে কে ডাকল, বাবুজি—বাবুজি—

তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ঘামে ভেসে গিয়েছে। জামাতুল্লা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। দিনের আলো ফুটছে তাঁবুর বাইরে।

জামাতুল্লা বললে, উঠুন বাবুজি।

সুশীল বিমূঢ়ের মতো বললে, কেন?

—ভোর হয়েছে, ইয়ার হোসেনের লোক এখনও ওঠেনি—আমাদের কেউ কোনো সন্দেহ না করে। সনৎবাবুকে ওঠাই—

একটু বেলা হলে ইয়ার হোসেন উঠে ওদের ডাকলে। বললে, পরশু এখান থেকে তাঁবু ওঠাতে হবে। জাঙ্কওয়ালা চীনেম্যান আমার নিজের লোক। ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। আর থাকতে চাইছে না। এখানে আপনারা এলেন ফটো তুলতে আর ছবি আঁকতে। এত পয়সা খরচ এর জন্যে করিনি।

সুশীল বললে, যা ভালো বোঝেন মি. হোসেন।

সনৎ বললে, তাহলে দাদা আমাদের সেই কাজটা এই দু-দিনের মধ্যে সারতে হবে—

ইয়ার হোসেন সন্দেহের সুরে বললে, কী কাজ?

সুশীল বললে, বনের মধ্যে একটা মন্দিরের গায়ে পাথরের ছবি আছে, সেটা আমি আঁকছি। সনৎ ফটো নিচ্ছে তার।

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললে, এই করতেই আপনারা এসেছিলেন আর কি! করুন যা হয় দু-দিন।

সনৎ বললে, তাহলে চলো দাদা আমরা সকাল-সকাল খেয়ে রওনা হই।

ইয়ার হোসেনের অনুমতি পেয়ে, ওদের সাহস বেড়ে গেল। দিনদুপুরেই ওরা দুজন রওনা হয়ে গেল—শাবল, গাঁতি, টর্চ ওরা কিছুই আনেনি, সিঁড়ির মুখের প্রথম ধাপে রেখে এসেছে। শুধু ক্যামেরা আর রিভলবার হাতে বেরিয়ে গেল।

জামাতুল্লা গোপনে বললে, আমি কোনো ছুতোয় এরপর যাব। একসঙ্গে সকলে গেলে চালাক ইয়ার হোসেন সন্দেহ করবে! আজ কাজ শেষ করতে হবে মনে থাকে যেন, হয় এস্পার নয় তো ওস্পার। আর সময় পাব না।

সনৎ বললে, মনে থাকে যেন একথা। আজ আর ফিরব না শেষ না দেখে।

সুশীলের বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল সনৎ-এর কথায়। সনৎ-এর মুখের দিকে ও চাইলে। কেন সনৎ হঠাৎ একথা বললে?

আবার সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে রহস্যময় গহ্বরে সুশীল ও সনৎ এসে দাঁড়াল। আসবার সময় সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকে ওরা গাঁতি ও টর্চ নিয়ে এসেছে। পাথরের নর্তকী-মূর্তি দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় কাত করে রাখা হয়েছে। যেন জীবন্ত পরি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। সুশীল সেদিকে চেয়ে বললে, আর কিছু না পাই, এই পুতুলটা নিয়ে যাব। সব খরচ উঠে এসেও অনেক টাকা লাভ থাকবে—শুধু ওটা বিক্রি করলে।

তারপর দুজনে নীচের পাথরের চৌবাচ্চাতে নামল।

সনৎ বললে, উত্তর কোণের গায়ে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ দাদা!

—এখন কিছু কোরো না, জামাতুল্লাকে আসতে দাও।

সনৎ ছেলেমানুষ, সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করে একদিন যে জীবনে এমন একটা রহস্যসঙ্কুল পথযাত্রায় বেরিয়ে পড়বে, কবে সে একথা ভেবেছিল? সুশীল কিন্তু বসে বসে অন্য কথা ভাবছিল।

গত রাত্রের স্বপ্নের কথা তার স্পষ্ট মনে নেই, আবছাভাবে এটুকু মনে আছে, সে যেন গত রাত্রে এক অদ্ভুত রহস্যপুরীর পথে পথে কার সঙ্গে অনির্দেশ যাত্রায় বার হয়েছিল, কত কথা যেন সে বলেছিল, সব কথা মনে হয় না। তবুও যেন কী এক অমঙ্গলের বার্তা সে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে; কী সে বার্তা, কার সে অমঙ্গল কিছুই স্পষ্ট মনে নেই—অথচ সুশীলের মন ভার ভার, আর যেন তার উৎসাহ নেই। এখন ফিরবার পথও তো নেই।

ওপরের ঘর থেকে জামাতুল্লা উঁকি মেরে বললে, সব ঠিক।

—এসেছ?

—হাঁ বাবুজি। অনেকটা দড়ি এনেছি লুকিয়ে—

—নেমে পড়ো।

—আপনার ক্যামেরা এনেছেন?

—কেন বলো তো?

—ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি দিতে হলে ক্যামেরাতে ফটো তুলে নিয়ে যেতে হবে—

—সব ঠিক আছে।

জামাতুল্লা ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার অল্পক্ষণ পরেই সনৎ হঠাৎ কী ভেবে দেওয়ালের উত্তর কোণের সেই চিহ্নটা চেপে ধরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথরের চৌবাচ্চার তলা একদিকে কাত হয়ে উঠতেই ফাঁক দিয়ে সনৎ নীচের দিকে অতলস্পর্শ অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ল।

সুশীল ও জামাতুল্লা দুজনেই চিৎকার করে উঠল। অমন অতর্কিতভাবে সনৎ লাফ মারতে গেল কেন, ওরা ভেবে পেল না।

কিন্তু লাফ মারল কোথায়?

জামাতুল্লা সভয়ে বললে, সর্বনাশ হয়ে গেল বাবুজি।

তারপর ওরা দুজনেই কিছু না ভেবেই পাথরের চৌবাচ্চার তলার ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল।

ওরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে।

সনৎ অন্ধকারের ভেতর থেকেই বলে উঠল, দাদা, টর্চ জ্বালো। আগে জায়গাটা কীরকম দেখতে হবে—

ওরা টর্চ জ্বেলে চারদিক দেখে অবাক হয়ে গেল। ওরা একটা গোলাকার ঘরের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে—ঘরের দু-কোণে দুটো পয়োনালির মতো কেন রয়েছে ওরা বুঝতে পারলে না। ছাদের যে জায়গায় কড়িকাঠের অগ্রভাগ দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার কথা, সেখানে দুটো বড়ো বড়ো পাথরের গাঁথুনি পয়োনালি, একটা এদিকে, আর একটা ওদিকে। সমস্ত ঘরটায় জলের দাগ, মেঝে ভয়ানক ভিজে ও স্যাঁতসেতে, যেন কিছুদিন আগে এ ঘরে অনেকখানি জল ছিল।

জামাতুল্লা বললে, এ ঘরে এত জল আসে কোথা থেকে বাবুজি?

সুশীল কিছু বলতে পারলে না; প্রকাণ্ড ঘর, অন্ধকারের মধ্যে ঘরের কোথায় কী আছে ভালো বোঝা যায় না।

সনৎ বললে, ঘরের কোণগুলো অন্ধকার দেখাচ্ছে, ওদিকে কী আছে দেখা যাক—

টর্চ ধরে তিনজনে ঘরের একদিকের কোণে গিয়ে দেখে অবাক চোখে চেয়ে রইল।

ঘরের কোণে বড়ো বড়ো তামার জালা বা ঘড়ার মতো জিনিস, একটার ওপর আর একটা বসানো, ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু। সেদিকের দেওয়ালের গা দেখা যায় না—সমস্ত দেওয়াল ঘেঁষে সেই ধরনের রাশি রাশি তামার জালা—ওরা এতক্ষণ ভালো করে দেখেনি, সেই তামার জালার রাশিই অন্ধকারে দেওয়ালের মতো দেখাচ্ছিল।

জামাতুল্লা বললে, এগুলো কী বাবুজি?

সুশীল বললে, আমার মনে হয় এটাই ধনভাণ্ডার।

সনৎ বললে, আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি—

জামাতুল্লা হঠাৎ অন্য দেওয়ালের দিকে গিয়ে বললে, এই দেখুন বাবুজি—

সেদিকে দেওয়ালের গায়ে বড়ো বড়ো কুলুঙ্গির মতো অসংখ্য গর্ত। প্রত্যেকটার মধ্যে ছোটো-বড়ো কৌটোর মতো কীসব জিনিস।

সুশীল বললে, যাতে-তাতে হাত দিয়ো না; এসব পাতালঘরে সাপ থাকা বিচিত্র নয়। এই ঘোর অন্ধকারে পাতালপুরী বিষাক্ত সাপের রাজ্য হওয়াই বেশি সম্ভব।

কিন্তু চারিদিকে ভালো করে টর্চ ফেলে দেখেও সাপের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনৎ ও জামাতুল্লা কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটো বার করে দেখলে। ভেতরে যা আছে তা দেখে ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল না। এ কী সম্ভব, এত বড়ো একটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের গুপ্ত ধনভাণ্ডারে এত কাণ্ড করে পাতালের মধ্যে ঘর খুঁড়ে তাতে পুরোনো হর্তুকি রাখা হবে?

ওদের হতভম্ব মুখের চেহারা দেখে সুশীল বললে, কী ওর মধ্যে?

সনৎ বললে, পুরোনো হরতুকি দাদা।

—দূর পাগল—হরতুকি কী রে?

—এই দেখো—

সুশীল গোল গোল ছোটো ফলের মতো জিনিস হাতে নেড়েচেড়ে বললে, আমি জানিনে এ কী জিনিস, কিন্তু যখন এত যত্ন করে রাখা হয়েছে, তখন এর দাম আছে। থলের মধ্যে নাও দু-একটা বাকসো—

সব কৌটোগুলোর মধ্যে সেই পুরোনো হর্তুকি!

ওরা দস্তুরমতো হতাশ হয়ে পড়ল। এত কষ্ট করে পুরোনো হরতুকি সংগ্রহ করতে ওরা এতদূর আসেনি।

হঠাৎ সুশীল বলে উঠল, আমার একটা কথা মনে হয়েছে—

সনৎ বললে, কী দাদা?

—এ জিনিস যাই হোক, এ-ই ছিল পুরোনো সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রা কারেন্সি—এই আমার স্থির বিশ্বাস। সঙ্গে নাও কিছু পুরোনো হরতুকি—

জামাতুল্লা অনেক কৌশল করে একটা তামার জালা পাড়লে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তার ঢাকনি খোলা গেল না। জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে, এ কি রিবিট করে এঁটে দেওয়া বাবুজি? এ খুলবার হদিস পাচ্ছিনে যে—

টানাটানি করতে গিয়ে একটা ঢাকনি খটাং করে খুলে গেল।

সনৎ বললে, দেখো ওর মধ্যে থেকে আবার পুরোনো আমলকি না বার হয় দাদা—

কিন্তু জালাটা উপুড় করে ঢাললে তার মধ্যে থেকে বেরুলো রাশি রাশি নানা রংবেরঙের পাথর। দামি জিনিস বলে মনে হয় না। সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে যে-কোনো নদীর ধারে এমনি নুড়ি অনেক পাওয়া যায়।

জামাতুল্লা বললে, তোবা! তোবা! এসব কী চিজ বাবুজি?

কতকগুলো কৌটোর মধ্যে শনের মতো সাদা জিনিসের গুলির মতো। মনে হয় বহুকাল আগে শনের নুড়িগুলিতে কোনো গন্ধদ্রব্য মাখানো ছিল—এখনও খুব মৃদু সুগন্ধ শনের নুড়িগুলোর গায়ে মাখানো।

সনৎ বললে, দাদা, এটা তাদের ওষুধ-বিষুধ রাখার ভাঁড়ার ছিল না তো?

জামাতুল্লা বললে, কী দাওয়াই আছে এর মধ্যে বাবুজি?

—তা আমি কী জানি? প্রাচীন যুগের লোকের কত অদ্ভুত ধারণা ছিল। হয়তো তাদের বিশ্বাস ছিল এই সবই অমর হওয়ার ওষুধ।

হঠাৎ সুশীল একটা জালার মুখ খুলে বলে উঠল, দেখি, বোধ হয় টাকা। জালা উপুড় করলে তার মধ্যে থেকে পড়ল একরাশ বড়ো বড়ো চাকতি, বড়ো বড়ো মেডেলের আকারের প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু।

সুশীল একখানা চাকতি হাতে করে বললে, সোনা বলে মনে হয় না?

জামাতুল্লা বললে, আলবত সোনা—তবে টাকা বা মোহর নয়।

সুশীল বললে, কোনোরকম ছাপ মারা নেই। মুদ্রা করবার জন্যে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল—কিন্তু তারপর ছাপ এতে মারা হয়নি। এ অনেক আছে—

সনৎ বললে, সবরকম কিছু কিছু নাও দাদা—

জামাতুল্লা বললে, এ যদি সোনা হয়—এই এক জালার মধ্যেই লাখ টাকার সোনা—

সুশীল আর একটা জালা পেড়ে ঢাকনি খুলে উপুড় করে ঢাললে। তার মধ্যেও অবিকল অমনি ধাতব চাকতি ওই আকারের, একই মাপের।

জামাতুল্লা বললে, শোভানাল্লা! দু-লাখ হল—যদি আমরা দেখি সব জালাতেই এরকম—

এই সময় সুশীল প্রায় চিৎকার করে উঠল, শিগগির এদিকে এসো—

ওরা গিয়ে দেখলে অন্ধকার ঘরের কোণে কতকগুলো মানুষের হাড়গোড়—ভালো করে টর্চ ফেলে দেখা গেল, দুটো নরকঙ্কাল।

সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার পাতালপুরীর মধ্যে নরকঙ্কাল দুটো যেন ওদের সমস্ত আশা ও চেষ্টাকে দাঁত বার করে উপহাস করছে। কাল রাত্রের স্বপ্নের কথা ওর মনে এল, মৃত্যুর চেয়ে মহা রহস্য জগতে কী আছে? মূঢ় লোকে চারিপাশে মৃত্যু অহরহ দেখছে, অথচ ভাবে না, কী গভীর রহস্যপুরীর দ্বারপাল-স্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের পথে মৃত্যু আছে দাঁড়িয়ে...

নরকঙ্কালটি কী কথা না জানি বলত যদি এরা এদের মরণের ইতিহাস ব্যক্ত করতে পারত? সে হয়তো দুর্নিবার লোভ ও নৃশংস অর্থলিপ্সার ইতিহাস, হয়তো রক্তপাতের ইতিহাস, জীবন-মরণ নিয়ে খেলার ইতিহাস, ভাই হয়ে ভায়ের বুকে ছুরি বসানোর ইতিহাস...

জামাতুল্লা কঙ্কালগুলো সরিয়ে রাখতে গিয়ে বললে, হাড় ভেঙে যাচ্ছে বাবুজি, বহুত পুরোনো আমলের হাড়গোড় এসব। কমসে কম একশো-দেড়শো বছরের পুরোনো—কিন্তু দেখুন বাবুজি মজা, হাড়ের গায়ে এসব কী?

ওরা হাতে করে নিয়ে দেখলে।

প্রায় এক ইঞ্চি করে লবণের স্তর শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে আছে কঙ্কালের ওপরে। সুশীল ভালো করে টর্চের আলো ফেলে বললে, চোখের কোটরগুলো নুনে বুজানো—দেখো চেয়ে।

এটা যে কী কারণে ওরা কিছুই ঠিক করতে পারলে না।

অন্ধকার পাতালপুরীর শহরে ওদের হাড়ে নুন মাখাতে এসেছিল কে?

সে সময়ে সনৎ বললে, দেখো দাদা, দেখো জামাতুল্লা সাহেব—এটা কীসের দাগ?

ওরা পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে সনৎ টর্চ ফেলে দেওয়ালের গায়ের একটা সাদা রেখার দিকে চেয়ে কথা বলছে। রেখাটা লম্বা অবস্থায় দেওয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টানা। জামাতুল্লা বললে, এ দাগ নোনা জলের দাগ।

সুশীল ও সনৎ হতভম্ব হয়ে বললে, তার মানে?—তার মানে? জল আসবে কোথা থেকে?

জামাতুল্লা বললে, বড্ড অন্ধকার জায়গা, ভালো করে কিছুই তো মালুম পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একবার ভালো করে ঘরের চারিধারে দেখা দরকার। অজানা জায়গায় সাবধান থাকাই ভালো। এত স্যাঁতসেতে কেন ঘরটা, আমি অনেকক্ষণ থেকে তাই ভাবছি।

জামাতুল্লা ও সনৎ হাতড়ে হাতড়ে সোনার চাকতি বের করে থলের মধ্যে একরাশ পুরে ফেললে—পাথরের নুড়িও কিছু নিলে—বলা যায় না যদি এগুলো কোনো দামি পাথর হয়ে পড়ে! বলা যায় কী! সনৎ ছেলেমানুষ, সে এত সোনার চাকতি দেখে কেমন দিশেহারা হয়ে গেল—উন্মত্তের মতো আঁজলা ভরে চাকতি সংগ্রহ করে তামার জালার মধ্যে ভরতে থাকে, আর থলের ভেতর পুরে নেয়। যেন আরব্য উপন্যাসের একটি গল্প—কিংবা রূপকথার মায়াপুরীর ধনভাণ্ডার! বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার বেলা দশটা থেকে বিকেল ছটা এন্তেক কলম পিষে সাঁইত্রিশ টাকা ন-আনা রোজগার করতে হয় সারা মাসে। সেই

হল রূঢ় বাস্তব পৃথিবী—মানুষকে ঘা দিয়ে শক্ত করে দেয়। এখানে কী, না—হাতের আঁজলা ভরে যত ইচ্ছে সোনা নিয়ে যাও, হিরে নিয়ে যাও—এ আলাদা জগৎ—পৃথিবীর অর্থনৈতিক আইন-কানুনের বাইরে।

বহু প্রাচীনকালের মৃত সভ্যতা এখানে প্রাচীন দিনের সমস্ত বর্বর প্রাচুর্য ও আদিম অর্থনীতি নিয়ে সমাধিগর্ভে বিস্মৃতির ঘুমে অচেতন—এ দিন বাতিল হয়ে গিয়েছে, এ সমাজ বাতিল হয়ে গিয়েছে—একে অন্ধকার থেকে টেনে দিনের আলোয় তুলে বিংশ শতাব্দীর জগতে আর অর্থনৈতিক বিভ্রাট ঘটিয়ো না।...

হঠাৎ কীসের শব্দে সুশীলের চিন্তার জাল ছিন্ন হল—বিরাট, উন্মত্ত, প্রচণ্ড শব্দ—যেন সমগ্র নায়েগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে ছুটে আসছে কোথা থেকে—কিংবা শিবের জটা থেকে যেন গঙ্গা ভীমভৈরব বেগে ইন্দ্রের ঐরাবতকে ভাসিয়ে মর্ত্যে অবতরণ করছেন।

জামাতুল্লার চিৎকার শোনা গেল সেই প্রলয়ের শব্দের মধ্যে, জল! জল! পালান—ওপরে উঠুন—

জামাতুল্লার কথা শেষ না হতে সুশীলের হাঁটু ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত জল উঠল—কোমর থেকে বুক লক্ষ করে দ্রুতগতিতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে জামাতুল্লা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওই দেখুন বাবু!

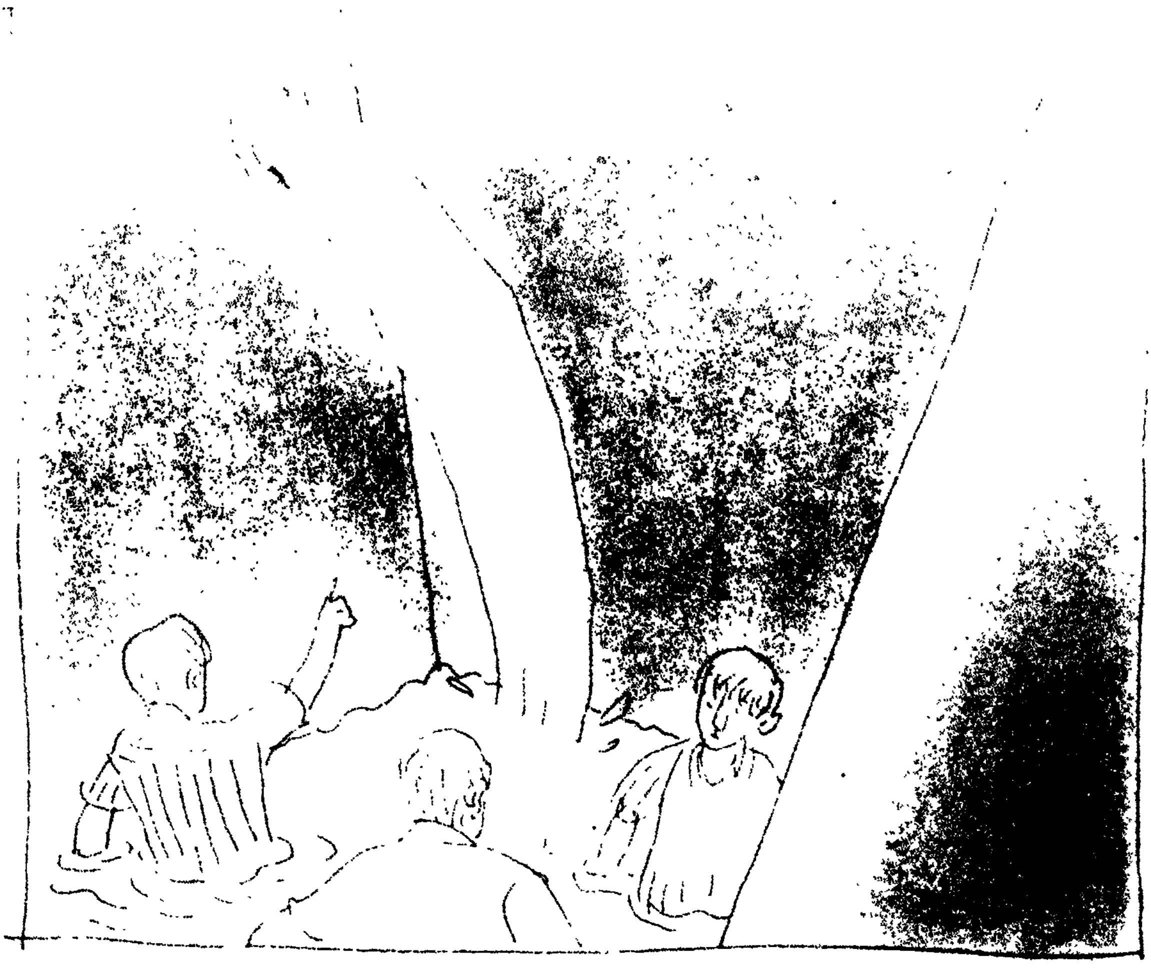

সুশীল সবিস্ময়ে ও সভয়ে চেয়ে দেখলে ঘরের ছাদের কাছাকাছি সেই দুটো পয়োনালি দিয়ে ভীষণ তোড়ে জল এসে পড়ছে ঘরের মধ্যে। চক্ষের নিমেষে ওরা ইঁদুরকলে আটকা পড়ে জলে ডুবে দগ্ধ হয়ে মরবে! কিন্তু উঠবে কোথায়! উঠবে কীসের সাহায্যে? এ ঘরে সিঁড়ি নেই আগেই দেখে এসেছে।

সুশীল চিৎকার করে বললে, সনৎ—সনৎ—ওপরে ওঠো—শিগগির—

সনৎ বললে, দাদা! তুমি আমার হাত ধরো—হাত ধরো—

তারপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল—পুরোনো রাজাদের পোষমানা বেতাল যেন কোথায় হা-হা করে বিকট অট্টহাস্য করে উঠল—সম্মুখে মৃত্যু! উদ্ধার নেই! উদ্ধার নেই!

এ জলে সাঁতার দেওয়া যাবে না সুশীল জানে—এ মরণের ইঁদুরকল। বুক ছাপিয়ে জল তখন উঠে প্রায় নাকে ঠেকে ঠেকে—

কে যেন অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল, দাদা—দাদা আমার হাত ধরো—দাদা—

একজোড়া শক্ত বলিষ্ঠ হাত ওকে ওপরের দিকে তুললে টেনে! ঘন অন্ধকার। টর্চ কোথায় গিয়েছে সেই উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে। সুশীলের প্রায় জ্ঞান নেই। কে ডাকছে—কে? সনৎ?

কোনো উত্তর নেই। কেউ কাছে নেই।

সুশীলের ভয় হল। সে চেঁচিয়ে ডাকলে, সনৎ! জামাতুল্লা!

তার পায়ের তলায় উন্মত্ত গর্জনে যেন একটা পাহাড়ের মাথায় হ্রদ খসে পড়েছে! উত্তর দেয় না কেউ—না সনৎ, না জামাতুল্লা।

প্রায় দশ মিনিট পরে জামাতুল্লা বললে, বাবু, জল্‌দি আমার হাত পাকড়ান—

—কেন?

—পাকড়ান হাত—উপরে উঠব—সাবধান!

—সনৎ, সনৎ কোথায়? তাকে রেখে এলে উপরে!

—জল্‌দি হাত পাকড়ান—হুঁ—

কত যুগ ধরে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে সে ওঠা প্রলয়ের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে—তারপর কতক্ষণ পরে পৃথিবীর ওপর এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা পাতালপুরীর গহ্বর থেকে! বনের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ঘনিয়ে এসেছে। সুশীল ব্যগ্রভাবে বললে, সনৎ কই? তাকে কোথায়—

জামাতুল্লা বিষাদ-মাখানো গম্ভীর সুরে বললে, সনৎবাবু নেই—আমাদের ভাগ্য বাবুজি—

সুশীল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বললে, নেই মানে?

—সনৎবাবু তো পাতালপুরী থেকে ওঠেননি—তাঁকে খুঁজে পাইনি। আপনাকে তুলে ওপরে রেখে তাঁকে খুঁজতে যাব এমন সময়ে ঘরের মেঝে দুলে উঠে এঁটে গেল। তিনি থেকে গেলেন তলায়—আমরা রয়ে গেলাম ওপরে। তাঁকে খুঁজে পাই কোথায়?

—সে কী? তবে চলো গিয়ে খুঁজে আনি!...

জামাতুল্লা বিষাদের হাসি হেসে বললে, বাবুজির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, এখন কিছু বুঝবেন না। একটু ঠান্ডা হোন, সব বলছি। সনৎবাবুকে যদি পাওয়া যেত তবে আমি তাঁকে ছেড়ে আসতাম না।

—কেন? সনৎ কোথায়? হ্যাঁরে, আমি তাকে ছেড়ে বাড়ি গিয়ে মার কাছে, খুড়িমার কাছে কী জবাব দেব?—কেন তুমি তাকে পাতালে ফেলে এলে?

জামাতুল্লা নিজের কপালে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে, নসিব, বাবুজি।

উদ্‌ভ্রান্ত সুশীলের বিহ্বল মস্তিষ্কে ব্যাপারটা তখনও ঢোকেনি। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে দম বন্ধ হয়ে সনৎ ওপরে উঠবার চেষ্টা করেও উঠতে পারেনি। অন্ধকারের মধ্যে জামাতুল্লাও ওকে খুঁজে পায়নি। ওরই হাত ধরে টেনে তুলবার পরে ঘরের মেজে এঁটে গিয়ে রত্নভাণ্ডারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ওই ঘরে ছাদ পর্যন্ত জল ভরতি হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ—সেখানে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে!...

সুশীল ক্রমে সব বুঝলে ওপরে উঠে এসে মাথায় ঠান্ডা হাওয়া লাগানোর পরে। একটা গভীর শোক ও হতাশায় সে একেবারে ডুবে যেত হয়তো, কিন্তু ঘটনাবলির অদ্ভুতত্ত্বে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। কোথায় অন্ধকার পাতালপুরীতে পুরাকালের ধনভাণ্ডার অসাধারণ উপায়ে সুরক্ষিত...এমন কৌশলে, যা একালে হঠাৎ কেউ মাথায় আনতেই পারত না।

জামাতুল্লা বললে, পানি দেখে তখন আমার সন্দেহ হয়েছে। আমি ভাবছি, এত নোনা পানি কেন ঘরের মধ্যে?

সুশীল বললে, আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল জামাতুল্লা। তাহলে সনৎ আজ এভাবে—

—তখন কী করে জানব বাবুজি? এ নালি দুটো গাঁথা আছে—ও দিয়ে জোয়ারের সময় সমুদ্দুরের নোনা পানি ঢোকে—দিনে একবার রাতে একবার। আমার কী মনে হয় জানেন বাবুজি, ওই দুটো নালি এমন ফন্দি করে গাঁথা হয়েছিল যে—

সুশীল বললে, আমার আর একটা কথা মনে হয়েছে জানো? ওই দুটো নরকঙ্কাল যা দেখলে, আমাদেরই মতো দুটো লোক কোনোকালে ওই ধনরত্ন চুরি করতে গিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরেছে। মূর্খের মতো ঢুকেছে, জানত না। যেমন আমরা—সনৎ যেমন—

—কী জানত না?

—যে স্বয়ং ভারত মহাসমুদ্র প্রাচীন চম্পারাজ্যের রত্নভাণ্ডারের অদৃশ্য প্রহরী। কেউ কোনোদিন সে ভাণ্ডার থেকে কিছু নিতে পারবে না, মানমন্দিরের রত্নশৈল তার একখানি সামান্য নুড়িও হারাবে না—সুশীল বললে, কিন্তু জল যায় কোথায় জামাতুল্লা? এত জল? আমার কী মনে হয় জানো—

—আমারও তা মনে হয়েছে। ওই ঘরের নীচে আর একটা ঘর আছে, সেটা আসল ধনভাণ্ডার। বেশি জল বাধলে ঘরের মেঝে একদিকে ঢাল হয়ে পড়ে জলের চাপে—সব জল ওপরের ঘর থেকে নীচের ঘরে চলে যায়।

সুশীল বললে, স্টিম পাম্প আনলেও তার জল শুকোনো যাবে না, কারণ—তাহলে গোটা ভারত মহাসাগরকেই স্টিম পাম্প দিয়ে তুলে ফেলতে হয়—ওর পিছনে রয়েছে গোটা ভারত সমুদ্র। সে জামাতুল্লার দিকে চেয়ে বিষাদের সুরে বললে—এই হল তোমার আসল বিল্বামুনি—সমুদ্র, বুঝলে জামাতুল্লা?

ওরা সেই বনের গভীরতম প্রদেশের একটা পুরোনো মন্দির দেখলে। মন্দিরের মধ্যে বিরাট দেবমূর্তি, সুশীলের মনে হল, সম্ভবত বিষ্ণুমূর্তি।

যুগযুগান্ত কেটে গেছে, ওপরকার আকাশে শত অরণ্যময়ূরীদের নর্তন শেষ হয়ে আবার শুরু হয়েছে, রক্তাশোকাতুর তলে কত সুখসুষুপ্ত হংসমিথুনের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে—সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে ঘৃতপক্ক অমৃতচরুর চারু গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর কতদিন হয়েছে আমোদিত—কত উত্থান, কত পতনের মধ্যে দেবতা অবিচল দৃষ্টিতে বহুদূর অনন্তের দিকে চেয়ে আছেন, মুখে সুকুমার সর্বাঙ্গ মৃদু চাপা হাসি—নিরুপাধি চেতনা যেন পাষাণে লীন, আত্মস্থ।

সুশীল সসম্ভ্রমে প্রণাম করল, দেবতা. সনৎ ছেলেমানুষ—ওকে তোমার পায়ে রেখে গেলুম—ক্ষমা করো তুমি ওকে!

সুশীল কলকাতায় ফিবেছে।

কারণ যা ঘটে গেল, তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ইয়ার হোসেন সন্দেহ করেনি। সনৎ একটা কূপের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছে শুনে ইয়ার হোসেন খুঁজে দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। চীনা মাঝি জাঙ্ক নিয়ে এসেছিল—তারই জাঙ্কে সবাই ফিরল সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ান মেলবোট ধরে কলম্বো।

কলম্বোর এক জহুরির দোকানে জামাতুল্লা সেই হরতুকির মতো জিনিস দেখাতেই বললে, এ খুব দামি জিনিস, ফসিল অ্যাম্বার—বহুকালের অ্যাম্বার কোনো জায়গায় চাপা পড়েছিল।

দুখানা পাথর দেখে বললে, আনকাট এমারেল্ড, খুব ভালো ক্যারেটের জিনিস হবে কাটলে। আন্নামালাইয়ের জহুরিরা এমারেল্ড কাটে, সেখানে গিয়ে কাটিয়ে নেবেন। দামে বিকোবে।

সবসুদ্ধ পাওয়া গেল প্রায় সত্তর হাজার টাকা। ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি না দিয়ে ওরা তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দশ হাজার টাকা পাঠালে—সেই মাদ্রাজি বিধবাকে পাঠালে বিশ হাজার—বাকি টাকা তিন ভাগ হল জামাতুল্লা, সনতের মা ও সুশীলের মধ্যে।

টাকার দিক থেকে এমন কিছু নয়, অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেকখানি। কত রাত্রে গ্রামের বাড়িতে নিশ্চিন্ত আরাম-শয়নে শুয়ে ওর মনে জাগে মহাসমুদ্রপারের সেই প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের অরণ্যাবৃত ধ্বংসস্তূপ...সেই প্রশান্ত ও রহস্যময় বিষ্ণুমূর্তি...হতভাগ্য সনতের শোচনীয় পরিণাম... অরণ্যমধ্যবর্তী তাঁবুতে সে রাত্রির সেই অদ্ভুত স্বপ্ন। জীবনের গভীর রহস্যের কথা ভেবে তখন সে অবাক হয়ে যায়।

জামাতুল্লা নিজের ভাগের টাকা নিয়ে কোথায় চলে গেল, তার সঙ্গে আর সুশীলের দেখা হয়নি।

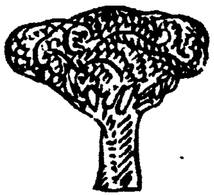

অরণ্য ও প্রকৃতি

বনে পাহাড়ে

সিংভূম জেলার বনজঙ্গল ও পাহাড়শ্রেণি ভারতবর্ষের মধ্যে সত্যিই অতি অপূর্ব। বেঙ্গল-নাগপুর-রেলপথ হওয়ার আগে এই অঞ্চলে যাবার কোনো সহজ উপায় ছিল না, কেউ যেতও না সে সময়ে—যা একটু-আধটু যেত—এবং যেভাবে যেত—তার কিছুটা আমরা বুঝতে পারি সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' পড়ে। সিংভূম জেলার ভেতরকার পাহাড়-জঙ্গলের কথা ছেড়ে দিই—বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার অনেক স্থান জনহীন অরণ্যসংকুল থাকার দরুন 'ঝাড়খণ্ড' অর্থাৎ বনময় দেশ বলে অভিহিত হত। লোকে প্রাণ হাতে করে যেত ওইসব বনের দেশে। কিন্তু না গিয়ে উপায় ছিল না—যেতেই হত।

ওই দেশের মধ্যে দিয়ে ছিল পুরী যাওয়ার রাস্তা। মেদিনীপুর জেলার বর্তমান ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্যে দিয়ে এই পুরোনো পথ এখনও বর্তমান আছে। শ্রীচৈতন্য সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এই পথে একদিন পুরী গিয়েছিলেন। কত লোকে যেত সেকালে। সাধু ঈশ্বরপুরী একা এই পথে পুরী রওনা হন।

ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ির সামনে দিয়ে এই পথ আজও আছে, আজকাল জেলাবোর্ডের রাস্তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। রাজবাড়ি থেকে পাঁচ মাইল কিংবা তার কিছু বেশি গেলেই বম্বে রোডের সঙ্গে এইরাস্তা মিশে গিয়েছে এবং তারপর সোজা চলেছে ওড়িশার দিকে, ময়ূরভঞ্জের মধ্যে দিয়ে। এই রাস্তাকে কেন যে বম্বে রোড বলা হয় তা জানিনে—কারণ বম্বের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক চর্মচক্ষে আবিষ্কার করা যায় না। তবে যদি কেউ বলে, এ রাস্তা দিয়ে কি মশাই তবে বম্বে যাওয়া যায় না? আমায় বলতে হবে—বিশেষ করে বম্বে যাবার জন্যে এ রাস্তা নয়। ময়ূরভঞ্জের মধ্যে দিয়ে এ রাস্তা সোজা চলে গেল সমুদ্রতীরের দিকে। তবে এ রাস্তা থেকে অন্য একটা রাস্তা বেরিয়েছে ময়ূরভঞ্জের বাঙ্গিপোস নামক জায়গায়। সে রাস্তায় বেঁকে গেলে কী হয় বলা যায় না—হয়তো বম্বে যাওয়া যেতে পারে, সেরকম দেখতে গেলে তো যেকোনো রাস্তা দিয়েই বম্বে যাওয়া যায়। যেকোনো জেলার যেকোনো রাস্তাকে তবে বম্বে রোড কেন বলা হবে না?

চিরকাল পথে পথে বেরিয়ে অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছে খারাপ। পথ যেন ডাকে, হাতছানি দেয়।

সেদিন ছিল অষ্টমী তিথি।

সন্ধ্যার পরেই কী চমৎকার জ্যোৎস্না উঠল। ঝাড়গ্রামে আমার এক আত্মীয়বাড়িতে গিয়ে দিন দুই আছি—হঠাৎ ইচ্ছে হল এমন জ্যোৎস্নায় একটুখানি বেড়িয়ে আসি।

জায়গাটা রাজবাড়ির পাশে—পুরোনো ঝাড়গ্রাম। স্টেশনের কাছে হয়েছে নতুন কলোনি, কলকাতার অনেক ভদ্রলোক বাড়ি করেছেন সেখানে, কিন্তু পুরোনো ঝাড়গ্রামের একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। এখানে পুরোনো দিনের রাজাদের গড়খাই ও দুর্গপ্রাচীরের চিহ্ন আজও দেখা যায়, আর আছে শালবন, আগাছার জঙ্গল, পুরোনো দেউল, দিঘি। দিব্যি রোম্যান্টিক পরিবেশ। পুরোনো দিঘির ধারে হাট বসে, তার আগে সাবিত্রী-মন্দির।

সাবিত্রী-মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেল গ্রামের বাইরে মাঠ ও বনের দিকে। একাই চলেছি, শালবনের কচি পাতা গজিয়েছে, কুসুম গাছের রঙিন কচি পাতার সম্ভার দূর থেকে ফুল বলে ভুল হয়। গ্রাম ছাড়িয়ে পায়ে-চলা মাঠের পথ শালবনের মধ্যে দিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে অদৃশ্য হয়েছে—সুঁড়ি পথের দু-ধারে শালবন।

একাই চলেছি। এপথে কখনো আসিনি, কোথায় কী আছে জানিনে। ভালুক বেরোবে না তো? শুকনো শালপাতার ওপরে খসখস শব্দ হলেই ভাবছি এইবার বোধ হয় ভালুকের দর্শনলাভ ঘটল। আরও এগিয়ে চলেছি—একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদী ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে পথের ওপর দিয়ে। হাঁটুখানেক জল, এমনি পার হয়ে ওপারের পাড়ে উঠলাম—উঁচু কাঁকরমাটির পাড়।

শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল চলে এসেছি। জ্যোৎস্নাস্নাত উদার বনপ্রান্তর আমার সামনে। ফিরবার ইচ্ছা নেই। আরও খানিক গিয়ে শালবন পাতলা হয়ে এল—মাঠের মধ্যে দূরে একটা আলো জ্বলছে দেখে সেদিকে গেলাম। ছোট্ট একখানা খড়ের ঘর, ফাঁকা মাঠের মধ্যে—একটু দূরে একটা গ্রাম আছে বলে মনে হল। ঘরখানার চারিদিকে বাঁশ-কঞ্চির বেড়া, আমার স্বর শুনে গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী ঘর থেকে বার হয়ে এসে বললেন, কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম, ঝাড়গ্রাম থেকে। এটা কি আপনার আশ্রম?

—হ্যাঁ, আসুন বসুন।

সন্ন্যাসী একখানা দড়ির খাটিয়া ঘরের সামনে মাঠে জ্যোৎস্নায় পেতে দিলেন। বেশ চমৎকার লাগছিল আমার, একদিকে অস্পষ্ট বনরেখা অন্যদিকে ধু ধু করছে জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তর। শহরের পথ চিনে ফিরতে পারব কি না এই রাত্রে, তাই বা কে জানে? পায়ে-চলা সরু আঁকাবাঁকা মাটির পথের সন্ধান যদি না-ই মেলে ফেরবার মুখে?

সন্ন্যাসী বললেন, রাতে বেরিয়েছেন একা?

—কেন, কোনো ভয়-ভীত আছে নাকি?

—নাঃ, কীসের ভয়। তবে ভালুক-টালুক দু-একটা—

—ওর জন্যে ভাবনা নেই। হাট থেকে হরদম লোক যাতায়াত করছে এপথে—মানুষের সাড়া পেলে ভালুক থাকে না।

আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই জ্যোৎস্নায় অপরিচিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করি, ওঁর জীবনের কাহিনির সব জেনে নিই। কোথায় বাড়ি, কোথায় দেশ, এসব শুনি। একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ আশ্রমের বেড়ার গায়েই মাটিতে পড়ে আছে—অথচ তাতে অনেক ফুলও ধরেছে।

বললাম, গত আশ্বিনের ঝড়েই বুঝি গাছটা পড়েছে?

—হ্যাঁ, এদিকে ততটা হয়নি, তবুও দু-দশটা গাছ পড়েছে বই কী।

—মেদিনীপুরের ওই দিকটার সর্বনাশ করে দিয়ে গেল, অথচ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিশেষ কিছু হয়নি দেখছি। এই গ্রামের নামটা কী?

—খানাকুই।

—কত দিনের আশ্রম আপনার? আছেন কতদিন এখানে?

—তা প্রায় আট-ন বছর। শিষ্য আছে জন-দুই কলকাতায়—তারাই আশ্রমের ঘর তৈরি করে দিয়েছে—মাসিক কিছু সাহায্যও করে।

—এ বনের মধ্যে ভালো লাগে?

—আছি বেশ। গ্রামের লোকের বড়ো জলকষ্ট। শিষ্যদের বলে আশ্রমে একটা পাতকুয়ো করে দিয়েছি, গ্রামের সবাই জল নিয়ে যায়। তবে খাওয়াদাওয়ার কষ্ট, কিছু মেলে না এসব গাঁয়ে। কপি আর টোমাটোর খেত করেছি ওই দেখুন। ওই ভরসা। তাও গরমকালে জলাভাবে সব শুকিয়ে যায়। দারুণ জলাভাব।

বসে গল্প করছি, গেরুয়া কাপড়-পরা একজন সন্ন্যাসিনী এসে এক পেয়ালা চা দিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী বললেন, মা ঠাকরুন।

বললাম, ও আপনার মা?

—না, আমার শিষ্যা। ওঁরও কেউ নেই। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি। ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। আমি কাছে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছি আজ পাঁচ বছর। আমার রান্না করে দেন। আশ্রমের কাজকর্ম করেন।

কেউ নেই? প্রশ্নটা যেন আপন মনেই জিজ্ঞেস করি। সংসারে যার কেউ নেই, এইভাবেই কোথাও না কোথাও তার আশ্রয় জুটে যায় বই কী। ভগবানই জুটিয়ে দেন।

সন্ন্যাসী বলছিলেন, আমার পাশে জমি কিনে রেখেছে কলকাতার একজন নার্স। তারও কেউ নেই। সে আমার শিষ্যাও নয়। অথচ এই আশ্রম দেখে আর মা ঠাকরুনকে দেখে বলেছে, এইখানেই আমার থাকার সুবিধে হবে। এইবার বোমার হাঙ্গামার সময়ে এসে আমার এখানে কিছুদিন ছিল।

—জমি পাওয়া যায়?

—কেন যাবে না, নেবেন?

আমার একটা খারাপ অভ্যেস, যেখানে যত ভালো জায়গা দেখব, সেখানেই আমার ইচ্ছে হবে যে বাড়ি তৈরি করি। সুতরাং অন্যমনস্কভাবে বলেই ফেললাম, ইচ্ছে তো আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন না! জমি আমিই দিচ্ছি। ঘরদোর আপাতত আমার আশ্রমের মতো খড়েরই করুন, সস্তায় হবে।

—বেশ, তবে ঘর তৈরির দেখাশুনো আপনাকে করতে হবে। আমি তো কালই চলে যাচ্ছি, টাকা পাঠিয়ে দেব।

সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন ও উদাস প্রান্তরের মধ্যে বসে আমি যেন ক্ষণকালের জন্য সেখানকার অধিবাসী হয়ে গিয়েছি মনে হল। কী সুন্দর হবে যখন এখানে নিজের ঘরের সামনে বসে থাকব এমনি নির্জন রাত্রির জ্যোৎস্নার মধ্যে।

একটু পরেই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আজ পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে সেখানে আর যাওয়া

ঘটেনি—যেমন ঘটেনি আরও কত ওর চেয়েও ভালো জায়গায় যাওয়া—যেখানে যেখানে বাড়ি করবার অদম্য ইচ্ছা একদিন মনে হঠাৎ জেগেছিল এবং হঠাৎই মিলিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মধ্যে আমার ঝাড়গ্রামের সেই আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, তুমি কি কোনো সাধুকে জমি কেনার কথা বলেছিলে? একদিন হাটে আমার সঙ্গে এক সাধুর দেখা। আমায় বললেন, আপনাদের বাড়িতে এসেছিলেন কলকাতার একটি বাবু, তিনি জমি নেবেন বলেছিলেন। জমি সব ঠিক করে ফেলেছি, তিনি যদি আসেন তবে জমিটা লেখাপড়া করিয়ে দিই! ভাবে বুঝলাম, তুমি।

মনে পড়ল আরও অনেক জায়গায় অমন জমি নেব বলেছিলাম। তখন সৌন্দর্য দেখে ভুলে যাই যে, অত জায়গায় বাড়ি করবার মতো পয়সা নেই আমার হাতে। সেবার দার্জিলিং গিয়ে ভাবলাম ঘুমে একটা বাড়ি না করলে আর জীবনে ঘুম নেই! কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করে জানা গেল অন্তত ছয় হাজার টাকার কমে ঘুম শহরে বাড়ি হবার জো নেই—তখনই শত হস্তেন বাজিনাম।

ঝাড়গ্রামের আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতায়। ব্ল্যাক-আউটের কলকাতায় বসে ক্ষণকালের

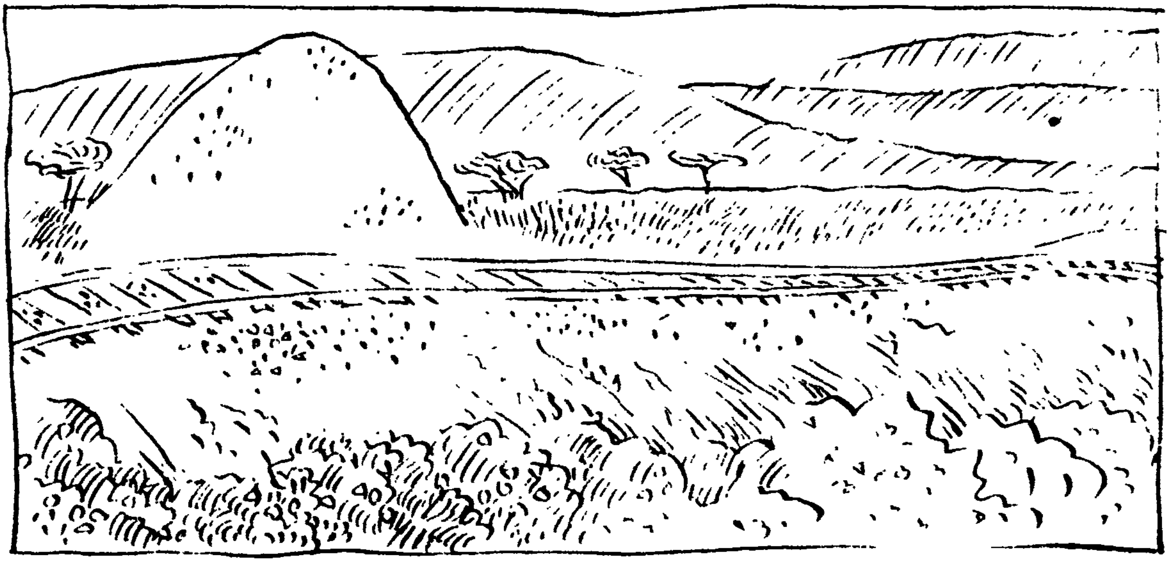

জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল খানাকুই গ্রামের প্রান্তে সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন ও উদাস প্রান্তর; বনে-ঝোপে অজস্র ফোটা ল্যান্টানা ফুল, নানা রংবেরঙের। এই ফুলটা ওখানকার জঙ্গলে যত দেখেছি তত বাংলাদেশের এঅঞ্চলে কোথাও দেখিনি। তবে আজকাল কিছু কিছু আমদানি হয়েছে, বিশেষত রেললাইনের ঢালুতে। রেললাইনের ঢালুতে অনেক বিদেশি ফুল দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো রেলগাড়ির সাহায্যে ওইসব বীজ দেশ-বিদেশে কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে—এ ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে আমি জানিনে।

জানুয়ারি মাস। আমি ঘাটশিলা আছি সেসময়। পাশের স্টেশন হল গালুডি। কয়েকটি বন্ধু সেখানে ইংরেজি নববর্ষের উৎসব করবেন, আমাকে তাঁরা নিমন্ত্রণ করেছেন।

হেঁটেই রওনা হই। বেশি নয়, ছ-মাইল রাস্তা। কিন্তু পথের দৃশ্য আমার কাছে বেশ ভালোই লাগে। উঁচু রেলপথের বাঁধ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, ডাইনে মাইল দুই-আড়াই দূরে এবং বাঁয়ে মাইল চারেক দূরে রেলপথের সঙ্গে সমান্তরাল শৈলমালা চলেছে বরাবর। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি শৈলমালা, বাঁদিকে কালাঝোড়।

বেলা পড়ে এসেছে। একস্থানে রেলওয়ে কাটিং, অর্থাৎ সেখানে উঁচু ডাঙার কঠিন পাথরের মধ্যে দিয়ে রেললাইন কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বড়ো বড়ো চুনাপাথর ও বালিপাথরের চাঁই পড়ে আছে, খুব উঁচু পাথরের স্তূপ দেখাচ্ছে অনুচ্চ পাহাড়ের মতো।

একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। জায়গাটাতে একটু বসে নিলাম। সূর্য হেলে পড়েছে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মোচাকৃতি শিখরদেশের মাথায়। কিছু দূরে জগন্নাথপুর বলে সাঁওতালি গ্রাম। একটা মাদার গাছ। ধু ধু করছে সিংভূমের উন্মুক্ত প্রান্তর। শীতের হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে বলে আলোয়ানটা মুড়িসুড়ি দিয়েছি।

হঠাৎ একটা লোক বাংলা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে : হরি দুখ দাও যে জনারে।

বাংলাদেশ থেকে এত দূরে নীলকণ্ঠের গান কে গাইতে গাইতে যায়? ছেলেবেলায় বাবার মুখে শোনা গান—এখন এসব গানের চলন আর কোথাও নেই। সিনেমার গানে দেশ গিয়েছে ভরে!

আমার ডাকে লোকটা কাছে এল। মলিন তালি-দেওয়া নীল প্যান্ট ও সার্ট পরা একজন সাঁওতাল যুবক। বললাম—বাড়ি কোথায় রে?

—বনকাটি।

—মৌ-ভাণ্ডারে কাজ করিস?

—হাঁ বাবু।

—এ গান শিখলি কোথায়?

—বুঢ়া লোকদের মুখে শেখা বাবু।

—সবটা জানিস? গা দিকি—

—বাবু, তোমাদের সামনে কি আমরা গান গাইতে পারি? উশ্চারণ হয় না—

—ঠিক হবে, তুই গা। কী কাজ করিস?

—স্মিলোটে (অর্থাৎ, স্মেলটিং বিভাগে)—

—হপ্তা কত পাস?

—চার টাকা সাত আনা বাবু—

—আচ্ছা গান গা—

গান গেয়ে ছোকরা চলে গেল। আমিও উঠে কাঁদোড় নামে ক্ষুদ্র পার্বত্য ঝরনা পার হয়ে গালুডি এসে পৌঁছোলুম। বড়ো বড়ো পাহাড়ে তখন ছায়া পড়ে এসেছে—দূর থেকে বেশ দেখাচ্ছে পাহাড়ের গাগুলো। কাঁদোড় নদীতে সাঁওতাল মেয়েরা মাছ ধরছে, কুলিরা মাঠ থেকে ঘুটিং পাথর কুড়ুচ্ছে গালুডির মাড়োয়ারি মহাজনদের জন্যে।

গালুডিতে পৌঁছুতে বন্ধুরা খুব খুশি হলেন। নববর্ষের উৎসবে স্থানীয় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা একটা অভিনয় করলে, যথেষ্ট খাওয়াদাওয়া গেল। ঘাটশিলাতে ফিরলাম সেই রাত্রেই, জনৈক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মোটরে। বাড়ি আসতেই শুনলাম, চাঁইবাসা থেকে মোটর নিয়ে লোক এসেছিল, সেখানে সভা করতে যেতে হবে। বললাম—তারা গেল কোথায়?

—তুমি গালুডি গিয়েছ শুনে ওরা মোটর নিয়ে সেখানে গেল খুঁজতে।

—পথে তো কোনো মোটরের সঙ্গে দেখা হয়নি, তবে আমরা মোড় ঘুরলে হয়তো ওরা পৌঁচেছে, এ হতে পারে।

আমার ভাবনা হল বিদেশি লোক রাত্রে থাকবে কোথায়? তাদের তো গালুডি যাবার কোনো দরকারই ছিল না।

সে রাতে কেউ এল না, খুব সকালে দেখি একখানা মোটর বাড়ির পাশে দাঁড়াল। আমি এগিয়ে গেলুম, চাঁইবাসার তারাই বটে।

—কাল গালুডি গিয়েছিলেন কখন?

—আর মশাই কী কষ্ট! তখন রাত দশটা।

—তারপর?

—খুঁজে তো বাড়ি বের করলাম, তাঁরা বললেন, এইমাত্র মোটরে ওঁরা চলে গিয়েছেন।

—রইলেন কোথায়?

—সেখানকার ডাকবাংলোয়।

যাহোক, খেয়েদেয়ে চাঁইবাসা রওনা হই। সুবর্ণরেখার ক্ষীণ জলধারা কংক্রিটের নিচু সাঁকোর ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে বইছে—আমরা মোটরে সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলাম—কিন্তু বর্ষাকালে সাঁকো ডুবে যায়, ডোঙা ছাড়া পার হওয়ার কোনো উপায় থাকে না।

মুসাবনির রাস্তা আরও দু-মাইল দূরে। চওড়া মোটর রোড়, একদিকে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি শৈলশ্রেণি, অন্যদিকে বন। টাটা কোম্পানি একজায়গায় পাহাড়ের গা থেকে schist পাথর কেটে নিয়ে যাচ্ছে; সেখানটাতে পাহাড়ের গায়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেন একটা দগদগে ঘা।

রাখা-মাইন্‌স্ পার হয়ে বন পাতলা হয়ে এল। চষা খেত, সাঁওতালি গ্রাম ডাইনে। বাঁদিকে কিন্তু সেই যে পাহাড় চলেছে তো চলেছেই। শীতকালে পত্রবিরল দীর্ঘ দীর্ঘ শালের গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে কারা যেন পাহাড়ের ওপরে শালের খুঁটি পুঁতে রেখেছে।

বাঁদিকে এক জায়গায় একটা নাবাল মতো উপত্যকা। সংকীর্ণ গিরিপথের বাঁদিকের পাথরে সিঁদুরের দাগ লেপা। এখানকার নাম কাপড়গাদি ঘাট। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় এইপর্যন্ত এসে আর নাকি এগোননি (পাণ্ডবেরা যাননি দুনিয়ার হেন জায়গা দেখিনি! পাণ্ডবদের পদচিহ্ন সর্বত্র), অতএব এরও আগের ভূভাগ হল পাণ্ডববর্জিত দেশ। আর এখানে কবে তাঁরা নাকি ময়লা কাপড় সাবান-সোডা দিয়ে কেচে পরিষ্কার করেছিলেন। তাই এর নাম কাপড়গাদি ঘাট। বেচারি পাণ্ডবেরা! বনেজঙ্গলে টো টো করে ঘুরে কাঁহাতক কাপড় পরিষ্কার রাখা যায়? আরও এগিয়ে গেলুম মাইল বারো—সবসুদ্ধ যেতে হবে ৪৭ মাইল রাস্তা এইরকম শোভাময় বনপথ দিয়ে।

একটা ক্ষুদ্র গ্রাম ছাড়িয়ে একটা রেললাইন আমাদের রাস্তার ওপর দিয়ে কোথায় যেন গেল। শুনলাম, এটা টাটা-বাদামপাহাড় লাইন। এর পরই দীর্ঘপ্রসারী মাঠের মধ্যে তিরিন্ বলে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বাড়িগুলো বিশাল প্রান্তরে দিক্‌হারা হয়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে যেন পরস্পর জড়াজড়ি করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।

একপাশে একটা ডাকবাংলোর মতো ঘর। সেখানে গিয়ে মোটর থামাতেই একটি বাঙালি বাবু এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাকে একবার নামতে হচ্ছে।

—কিন্তু বড়ো দেরি হয়ে যাবে চাঁইবাসা পৌঁছুতে।

—তা হোক, সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা—

কী করি, নামতেই হল। মাঝারি আকারের বাংলো, চারিদিকে ঘোরানো বারান্দা। ভদ্রলোকটির বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়; এখানে পি. ডব্লিউ. ডি.-তে চাকুরি করেন।

—কতদিন আছেন?

—তা প্রায় দু-বছর—

—কেমন লাগে?

—আমি একরকম যা হয় করে থাকি, কাজে পাঁচ জায়গায় ঘুরি, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের বড়ো কষ্ট।

—এ গ্রামে—

—গ্রামের কথা বাদ দিন। এখানকার মেয়েদের সঙ্গে খাপ খায় না—বাঙালির মেয়ে অন্য বাঙালি মেয়ের মুখ না দেখলে হাঁপিয়ে ওঠে, তাদের হয়েছে সত্যিকারের বনবাস।

—কিন্তু সিনারি বেশ, কী বলেন?

—সে আপনাদের চোখে হয়তো লাগতে পারে। আমাদের মন হাঁপিয়ে ওঠে—

মেয়েদের হাতে যত্নে সাজানো রেকাবে জলখাবার ও চা এল। আমরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বাবুটির কথা শুনে গৃহলক্ষ্মীদের জন্যে সত্যিই মনে কষ্ট অনুভব করছিলুম, এ যেন সেই আরিজোনার মরুভূমির মতো রুক্ষদর্শন ভূভাগ—কালো কালো বনাবৃত পাহাড়, টিলা, উন্মুক্ত দিকচক্রবাল, এখানে মেয়েদের মন হাঁপিয়ে ওঠবার কথা বটে।

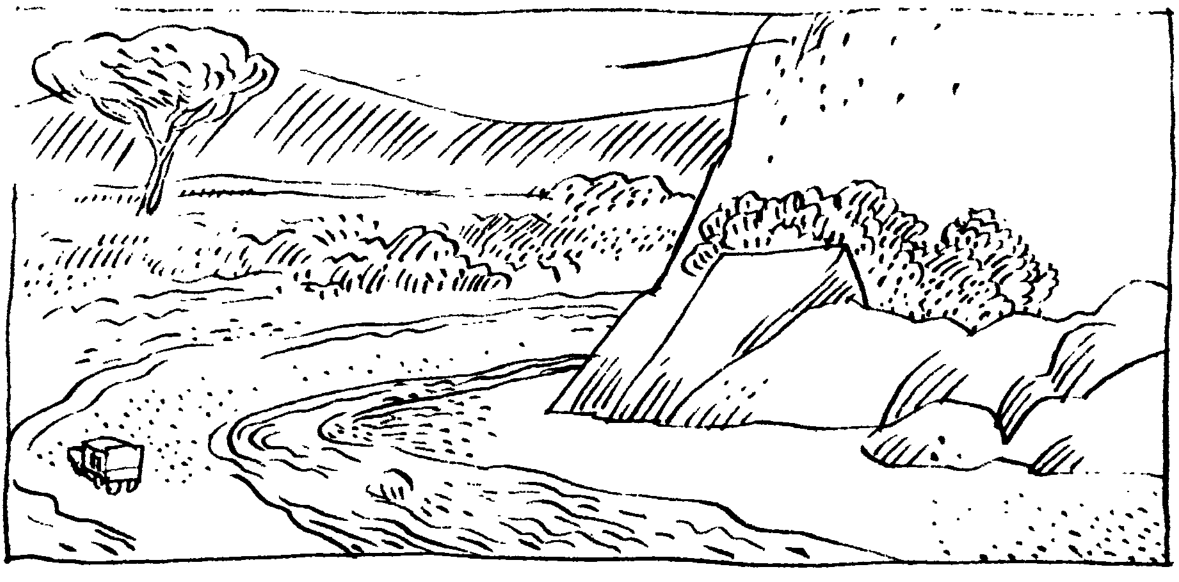

ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর আতিথেয়তার জন্যে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে আমরা গাড়িতে উঠলাম। আরও মাইল দশ-বারো গিয়ে খড়কাই নদী। নদী পার হয়ে মোটর থামলে সেই নির্জন বালুকাবিত নদীচরে অস্পষ্ট সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। দূরে একটা পাহাড়, সামনে কটা রঙের বালুরাশির মধ্যে নাতি-গভীর খাত সৃষ্টি করে ক্ষীণকায়া খড়কাই বয়ে চলেছে। কেমন একটি উদাস শোভা এই জনহীন প্রান্তরের, এই পার্বত্য তটিনীর, রহস্যময়ী সন্ধ্যার।

চাঁইবাসা পৌঁছে গেলাম রাত আটটার মধ্যে।

সভার কাজকর্ম পরদিন মিটে গেল। ওখানকার বন্ধুরা তখনও ছাড়তে চান না। দুজন ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়ে গেল। তাঁরা বললেন, আপনি বনের কথা লিখেছেন অনেক, কিন্তু সিংভূমের বন আপনি দেখেননি—

আমি বললাম, কেন, অনেক বন তো দেখা গেল—

তাঁরা মৃদু হাসলেন। বললেন, আমরা ফরেস্ট অফিসার হয়ে বন দেখিনি, আর আপনি বন দেখেছেন? হতেই পারে না!

—কোন বনের কথা বলছেন?

—আপনি বাঝিয়াচুর দেখেননি, চিটিমিটি দেখেননি, জাতে দেখেননি—

—জাতে? সে আবার কীরকম নাম? চিটিমিটিই বা কী নাম—

—হো-ভাষার নাম। ও অঞ্চলের বনের বাসিন্দা সবই হো—যেমন রাঁচির ওদিকে সব মুন্ডা। চলুন আপনাকে ওদিকটা দেখিয়ে আনি—

আমার আসল বনভ্রমণ এইভাবে শুরু।

তেসরা জানুয়ারি। বন্ধুরা মোটর নিয়ে এলেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হল। বেরো নদী পার হয়ে আমাদের গাড়ি সোজা চলল রাঁচি রোড বেয়ে প্রায় মাইল দশেক। তারপরেই বাঁদিকের ফরেস্ট রোড ধরে বরকেলা পাহাড়শ্রেণির দিকে চলল।

চাঁইবাসা ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের বড়ো শোভা। রাঙা মাটি, উচ্চবচ ভূমিভাগ, ছবির মতো দেখতে সমস্তটা। মুশকিল হয়েছে, যারা সেখানে অনেকদিন আছে, তারা সেখানকার সৌন্দর্য ভালো ধরতে পারে না। চাঁইবাসার বাসিন্দাদের অনেকের মতে এসব এমন আর কী?

এখানে একটা কথা মনে পড়ল। ঘাটশিলা থেকে সাত-আট মাইল দূরে বেশ একটি নির্জন বনভূমি ও ক্ষুদ্র একটি ঝরনা আছে। তার প্রবেশপথটি সত্যই অতি সুদৃশ্য। শরৎকালে পর্বতসানুর বনে অজস্র বনশিউলি ফুল ফুটে ঝরেছে শিলাতল বিছিয়ে, শিশিরার্দ্র বনস্থলীর সুগন্ধ মনে শান্তি আনে, তৃপ্তি আনে, নব নব কল্পনা জাগায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন আমাদের সঙ্গে এক বড়োঘরের বধূ ছিলেন, তিনি সারা পথ কেবল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে লাগলেন, এ কী আর এমন। কাশ্মীরে যা দেখেছি তার তুলনায় এ—

আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করছিনে। কাশ্মীর ভালো নয় কেউ বলছে না—তা বলে যে একবার কাশ্মীর দেখেছে তার কাছে সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিস্বাদ হয়ে যাবে, আর কিছু থেকে সে আনন্দ পাবে না, গাছপালা নদী প্রান্তরের সৌন্দর্য দেখবার সহজ চোখ সে হারিয়ে ফেলবে? এ যদি হয় তবে,. কাশ্মীর না দেখাই মঙ্গলজনক।

বরকেলা শৈলশ্রেণির মধ্যে বনপথে অনেকখানি গিয়ে সৈদবা নামে একটি বন্যগ্রাম আছে। সেখানে বনবিভাগের কর্মচারীদের জন্য একটি বাংলো আছে। বেলা প্রায় বারোটা। রান্নাবান্না করে খেয়ে নিতে হবে এখান থেকে। আমরা চা খেয়ে বাংলোর আরাম কেদারায় গল্প করি কিছুক্ষণ।

মি. সিংহ বললেন, আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন বলে ভাববেন না, এ বড়ো আরামের জায়গা।

—কেন?

—রাত্রে এই বাংলোর বারান্দাতেই আমি বাঘ চরতে দেখেছি।

—গ্রাম তো রয়েছে নিকটে।

—গ্রাম থেকে ছাগল-ভেড়া ধরে নিয়ে যায় বাঘে।

—মানুষও নাকি?

—সুবিধে পেলে ছাড়ে না।

ঘরের বাইরে এসে চারিদিকটা ভালো করে দেখে নিলাম।

বাংলোর পিছনে বোধ হয় একশো হাতের মধ্যে উঁচু পাহাড়। ঠিক এরকমই পাহাড় ও বাংলোর সম্মেলন এইবার আরেক জায়গায় দেখেছিলুম, সেকথা পরে বলব। সেটা হল মানভূম জেলায়। পাহাড়ের ঢালু থেকে বনানী নেমে এসে বাংলোর হাতায় মিশেছে, লোকজন তত চোখে পড়ে না।

একটা ছোটো খড়ের ঘরের সামনে এসে মোটর দাঁড়াল। বস্তি নয়, অন্তত আশেপাশে লোকজনের বাস দেখলাম না। শুনলাম ঘরটা গবর্নমেন্টের বাংলো, বনবিভাগের লোকজন সেখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতে পারে।

এখন থেকে বামিয়াবুরু প্রায় এগারো মাইল দুরে। এই এগারো মাইলের মধ্যে লোকজনের বাস নেই—ঘন বনের মধ্যে গাড়ি ঢুকে পড়ল ক্রমশ—মোটর রোড ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর উঠল—বড়ো বড়ো গাছ দু-ধারে, শাল আর প্রায়ই মহুয়া।

একজায়গায় বনের মধ্যে একটু ফাঁকা—চেয়ে দেখি আকাশ যেন অনেকখানি নীচে, বুঝলাম অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েছি।

মি. সিংহ বললেন, মুখ বার করে চেয়ে দেখুন, ওই ওপরে ফরেস্ট বাংলো!

সত্যিই অনেক উঁচুতে বাংলোটা। যে পাহাড়ে উঠছি, সেই পাহাড়ের মাথায় সর্বোচ্চ শিখরে একটা বাংলোঘরের লাল টালির ছাদ একটু একটু চোখে পড়ছে।

অনেকক্ষণ পরে পাহাড়ের মোড় ঘুরে মোটরটা অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে এক প্রকাণ্ড বাংলোর সামনে এসে থেমে গেল। তখন শীতের সন্ধ্যার রোদ নিকটে-দূরে ছোটো-বড়ো পর্বতশিখর সোনার পাতে মুড়ে দিয়েছে।

স্থানটির গম্ভীর দৃশ্যে মন মুগ্ধ হয়ে গেল। যেদিকে চোখ যায়, শুধুই বনাবৃত পর্বতশিখর, ছোটো বড়ো—নানা আকারের পর্বতচূড়া, কোনোটা গোল, কোনোটা মোচাকৃতি, কোনোটা সমতল, ঘন বনে ভরা, আবার কোনো কোনো পর্বতগাত্র অনাবৃত, কালো ব্যাসাল্ট পাথরের স্তর সাজানো, রাঙা রোদ পড়ে সোনার পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছে।

বললুম, নিকটে কোনো লোকালয় নেই?

—নিকটতম লোকালয় সেই কুইপা গ্রাম। এগারো মাইল দূর এখান থেকে—

—বড্ড নির্জন জায়গা। এখানে কি কেউ থাকে?

—বাংলোর চৌকিদার ফ্যামিলি নিয়ে বাস করে পাহাড়ের নীচের দিকে।

—অদ্ভুত বনের দৃশ্য বটে। বাঘ-ভালুকও আছে—

চায়ের টেবিল পাতা হল—আমি প্রস্তাব করলাম, টেবিল টেনে বাংলোর সামনে সমতল জায়গায় পাতা হোক। রাঙা রোদ-মাখানো অরণ্য ও পর্বতশিখরের দিকে চোখ রেখে বসে চা খাওয়া যাক। সত্যিই এমন গম্ভীর অরণ্য-দৃশ্যের মধ্যে চা খাওয়া হয়নি কতকাল। এই বাংলোর সামনে দিয়ে গভীর রাত্রে কত বন্য হাতি, বাঘ, ভালুক চলে বেড়ায়—গবর্নমেন্টের নোটিশ টাঙানো আছে, বেশি রাত্রে বাংলোর বারান্দায় কেউ না আসে—এমন নির্জন বন্য পরিবেশের মধ্যে রুটি, মাখন, চা প্রভৃতি সভ্য খাদ্য খাওয়ার নূতনত্ব আছে বই কী।

চা খাওয়ার পরে মি. সিংহ বললেন, অন্ধকার হওয়ার দেরি আছে এখনও। চলুন আপনাকে মাছ ধরার বাঁধ দেখাই—

আমরা পাহাড়ের নীচে নেমে এলুম। চারিধারে নির্জন ঘন অরণ্যানীর স্তব্ধতা; কয়েকটি হো কুলি-মেয়ে লতাপাতা দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরের সামনে বসে বুনো খেজুর পাতার চেটাই বুনছে।

আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাদের কী হাসি! আমি হো ভাষা জানি না, মি. সিংহ তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথাবার্তা বললেন।

আমি বললুম, কী বলছে ওরা?

—বলছে, বাবু এখানে কী দেখতে এসেছে!

—জিজ্ঞেস করুন ওদের নাম কী।

—একজনের নাম সামান্ কুই, একজনের নাম বুধন্ কুই—কুই অর্থাৎ মেয়ে।

—বেশ নাম। ওরা কী খায়?

—শুধু ভাত। না ডাল, না তরকারি, ওসব খেতে জানে না এদেশে।

—সারাদিনে কী রোজগার করে?

—চার আনা।

—এতেই সন্তুষ্ট থাকে?

—খুব। একটু পরে দেখবেন গান করবে সবাই একসঙ্গে। ওদের মতো অল্পে সন্তুষ্ট জাত নেই। মিথ্যা কথা বলতে জানে না, অত্যন্ত সরল। সভ্যতার সংস্পর্শে যারা এসেছে, তারা সবাই দুষ্টু, বদমাইশ হয়ে গিয়েছে। কোনো টাউন বা কারাখানার নিকটে যেসব হো বা ওঁরাও বাস করে, প্রায়ই সব খারাপ। কিন্তু এ বনের মধ্যে এরা অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত সৎ।

ওদের মুখের দিকে চাইলেই সেকথা বোঝা যায়। ছেলেমানুষের মতো পবিত্র সরল নিষ্পাপ মুখশ্রী। সরলতা ও নির্লোভতা ওদের মুখে সুকুমার রেখার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

মি. সিংহ বললেন, আরেকটা মজা, এরা বেশি রোজগার করতে চায় না। দিনের সামান্য মজুরি হাতে পেলেই খুশি। আর কিছুতেই কোনো প্রলোভনেই সেদিন খাটতে চাইবে না। একজায়গায় সবাই গোল হয়ে বসে চেটাই বুনবে, গান গাইবে। কিন্তু রাঁচি শহরে গিয়ে এদের দেখুন, অন্যরকম দেখবেন।

আমরা এগিয়ে গিয়ে একটা বড়ো ঝরনার কাছে এলাম। ঝরনার এক দিকে বাঁধ বাঁধা। বর্ষাকালে এখানে একটা পুকুরের সৃষ্টি হয়। মি. সিংহের মুখে শুনলাম, এটাই মাছ ধরার বাঁধ। কোথা থেকে মাছ আসে একথা আমি জিজ্ঞেস করিনি।

তখন সেসব তুচ্ছ প্রশ্নের অবকাশও ছিল না, সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে অরণ্যের অলি-গলিতে, সুঁড়িপথে ঘন হয়ে নামছে। যেখানটাতে মাছের বাঁধ তার চারিধারে বড়ো বড়ো শালগাছ উঁচু হয়ে আকাশকে ঢেকেছে—শুধু অন্ধকার আর জলপতনধ্বনি আর নির্জনতা আর মনের মধ্যে এক রকমের গা-ছমছম করা ভয়ের বিচিত্র অনুভূতি। মাছের বাঁধ ছেড়ে আরও প্রায় দু-রশি গিয়েছি তখন। দু-রশি কি তিন রশি, কিন্তু চারিদিকে চেয়ে আমার মনে হল এ পৃথিবীতে আমি আর এই দুই বনবিভাগের কর্মচারী ছাড়া (দুজনেই মি. সিংহ—হরদয়াল সিং ও যোগীন্দ্র সিংহ) আর বুঝি কেউ নেই—আফ্রিকার ঘন অরণ্যে নর-খাদক অসভ্য জাতিদের দেশে যেন এসে আটক পড়ে গিয়েছি। যেমন ঘন বনানী তেমনি ঘন অন্ধকার চারিপাশে।

হরদয়াল সিং হঠাৎ বললেন, এইখানটা একটু সাবধান, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখানকার ওই সুঁড়ি-পথটা দিয়ে জল খেতে নামে ঝরনায়।

জঙ্গলের একপাশ দিয়ে একটুখানি সরু পথরেখা অন্ধকারেও যেন বিভীষিকার সৃষ্টি করে রেখেছে মনে হল। বললুম, না গিয়ে এবার ফিরলে ভালো হত না? বাংলো থেকে প্রায় মাইল দেড়েক তো এসে গিয়েছি।

ফিরবার পথে আবার সেই হো মেয়েদের আস্তানা। বাঘের, হাতির, বুনো ভালুকের দেশের মেয়ে এরা। দিব্যি সেই অরণ্য-মধ্যে দরজাহীন, অর্গলহীন পাতার কুঁড়ের মধ্যে বসে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করছে। কেউ কেউ কুঁড়ের সামনে বসে চেটাই বুনছে, গল্প করছে, গান করছে।

আমাদের দেখে আবার ওরা হাসতে লাগল—অথচ হাসবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ছেলেমানুষের মতো সম্পূর্ণ অকারণে উচ্ছ্বসিত হাসির প্রবাহ।

আমাদের আপ্যায়ন করে বললেন, জোম্ পে—জোম্ পে—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কী বলে?

—বলছে, ভাত তৈরি—খাও।

—চলুন দেখা যাক—কী খাচ্ছে।

বড়ো বড়ো মেটে হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হয়েছে, অথচ কোনো দিকে কিছু দেখা গেল না। ওরা বড়ো কাঁসার উঁচু থালাতে একরাশ ভাত ঢেলেছে এক-একজনের জন্য। শুধু ভাত—নুনই বা কই! আশ্চর্য এই যে, ওই নিটোল স্বাস্থ্য শুধু এই উপাদানবিহীন ভাত খেয়ে। আমি মি. সিংহকে বললুম, ওদের জিজ্ঞেস করুন, ওরা ডাল-তরকারি খায় না কেন? আমার প্রশ্নের অর্থ যখন তাদের বোধগম্য হল, তখন তারা আর একপ্রস্থ হেসে উঠল—যেন আমি খুব একটা হাসির কথা বলেছি। উত্তর দিলে, এই খাই।

কারণ নেই, যুক্তি নেই, কথার বাহুল্য নেই। শুধু উত্তর দিলে—এই খাই।

অনেক ঘেঁটু গাছ বনের প্রান্তে, পাহাড়ি ঢালুর সীমানায়। তবে কিনা এখন ফুল নেই গাছে, তবুও আনন্দ হল গাছগুলো দেখে, এতদূর পাহাড়ি দেশে বাংলাদেশের নিজস্ব বন্যপুষ্পের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটল।

অত্যন্ত নির্জন স্থানটি, দূরে সৈদবা গ্রাম, কিন্তু বাংলো থেকে গ্রামের ঘরবাড়ি নজরে আসে না। আমরা কিছু দূরে একটি উপত্যকায় সাবাই ঘাসের চাষ দেখতে গেলুম, একটি পাহাড়ি ঝরনা পার হয়ে মোটর গিয়ে দাঁড়াল যেখানে, সে স্থানটি চারিদিকে বনে ঘেরা, মাঝখানে খানিকটা সমতল ফাঁকা মাঠ। গাঁট বাঁধা কলে হো কুলিরা সাবাই ঘাসের আঁটি একত্র করে গাঁট বাঁধছে। নিকটেই গাছতলায় একজন কেরানি বসে কুলিদের হিসেব রাখছে।

কেরানি সর্বত্রই বাঙালি। কাছে গিয়ে বললুম, মশাইকে বাঙালি বলে মনে হচ্ছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি এখানে ক্লার্ক? কতদিন আছেন?

—তা সাত বছর হল।

—এ সাবাই ঘাসের ব্যবসা কাদের?

—আজ্ঞে দেবীপ্রসাদবাবুর, সনুয়া স্টেশনের কাছে আপিস আর আড়ত—মাড়োয়ারি।

—মাড়োয়ারি তো নিশ্চয়ই। সে আপনি বলবার আগেও বুঝেছি। জায়গা কেমন এটা?

—ভালো। তবে বড্ড জঙ্গল—মানুষের মুখ দেখার জো নেই।

—থাকেন কোথায়?

—সৈদবা গ্রামেই বাবুদের বাসা আছে কর্মচারীদের জন্যে, সেখানে রেঁধে খাই।

—ভালো লাগে?

—নাঃ। তবে কী করি বলুন, চাকরির খাতিরে সবই করতে হয়। এই বাজারে চাকরিটুকু গেলে—

—সে তো বটেই।

বনবিভাগের দুজন বড়ো কর্মচারী আমাদের সঙ্গে। তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন পাহাড়ের ওপরে যেখানে সাবাই ঘাসের চাষ চলছে। পাহাড়ের ঢালু জমিতে বড়ো বড়ো ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে পাহাড় ঘিরে। তার আশেপাশে গোছা গোছা উলু ঘাসের মতো সবুজ সাবাই ঘাসের গোছা—আমন ধানের গোছার মতো।

বললুম—ট্রেঞ্চ কীসের?

দুজন বনবিভাগীয় কর্মচারীই অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বললেন, জানেন না, ওর নাম কনটুর ট্রেঞ্চ—ওই খালের মতো কাটা আছে বলে পাহাড়ের মাটি সরস হয়ে উঠছে। ও জিনিসটা নতুন বেরিয়েছে, আগে ও থিওরিটা ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে, কনটুর ট্রেঞ্চের হাওয়া যতদূর যায়, ততদূর সরস হয়ে ওঠে মাটি আর বাতাস।

একথা এদের মুখে আরও অনেকবার শুনেছি। কনটুর ট্রেঞ্চ থিওরির বড়ো ভক্ত এঁদের মতো আর দেখিনি। সেই ভীষণ শুষ্ক পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করা শক্ত যে কোনোদিন আবার এখানকার মাটি-বাতাস সরস হবে।

বললুম, আপনারা ইজারা দেন দেবীপ্রসাদ মাড়োয়ারিকে?

—ন-বছরের লিজ আছে ওর সঙ্গে। চার হাজার টাকা বছরে—

—তিনি কোথায় ঘাস বিক্রি করেন?

—বামার লরি কোম্পানির কনট্রাক্ট আছে—তারা সনুয়া স্টেশন থেকে মাল নিয়ে যায়।

—বেশ লাভ আছে, কী বলুন?

—খরচ-খরচা বাদে পাঁচ-ছ হাজার টাকা থাকে দেবীপ্রসাদবাবুর। নইলে কি কেউ ভূতের বেগার খাটে।

মনে ভাবলুম, ভূতের বেগার দেবীপ্রসাদবাবু খাটতে যাবেন কেন, সে যদি কাউকে খাটতে হয় তবে খাটছে, ওই বেচারি বাঙালি কেরানিবাবু। এই নির্বান্ধব স্থানে জঙ্গলের মধ্যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর খেটে হয়তো মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়—তাও পায় কি না কে জানে! ধনিক যিনি, তিনি প্রকাণ্ড অস্টিন গাড়িতে চেপে একবার এক ঘণ্টার জন্যে হয়তো এসে তদারক করেন।

সেই বনাবৃত উপত্যকার এক প্রান্তে সেই ঝরনাটির কুলুকুলু ধ্বনি বনপত্রমর্মরের সঙ্গে মিশে এক মধুর সংগীত রচনা করে চলেছে। আমরা তিনজনেই বটবৃক্ষের ছায়ায় শুকনো ছড়ানো সাবাই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি, আকাশ দেখি, বিহঙ্গ-কাকলী কান পেতে শুনি, খোশগল্প করি।

বেলা দুটোর পর বাংলোতে গিয়ে আহারাদি সেরে নিলুম। গরম গরম খিচুড়ি খেতে সেই বনের মধ্যে খুব মিষ্টি লাগল।

আবার বনের মধ্যে দিয়ে পথযাত্রা। দু-পাশের ঘন বন, একদিকের পাহাড়ের দেওয়ালের মধ্যেকার চওড়া রাস্তা দিয়ে মোটর ছুটেছে। বন ক্রমশ ঘন হতে ঘনতর হয়ে উঠেছে। যেতে যেতে একজায়গায় মনুষ্যকণ্ঠের সম্মিলিত সংগীত কানে এল। ব্যাপার কী? গান গায় কে?

মি. সিংহ বললেন, দেখবেন? এখানে কাইনাইটের খনি আছে—

—জঙ্গলের মধ্যে—

—বেশি দূর নয়, পথের ধারে।

মোটর থামিয়ে আমরা গাছপালা ঠেলে বনের মধ্যে ঢুকি। আমাদের সামনে একটা ধাওড়া চালাঘর, জংলিঘাসে ছাওয়া। ত্রিশ-চল্লিশজন তরুণী স্বাস্থ্যবতী হো কুলিরমণী সেখানে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে লোহার দুরমুশ দিয়ে পাথুরে কয়লার মতো কী জিনিস চূর্ণ করছে আর একসঙ্গে গান গাইছে হো ভাষায়।

মি. সিংহ বললেন, ওই কালো কয়লার মতো জিনিসটাই কাইনাইট।

—খনি কোথায়?

—আরও জঙ্গলের মধ্যে।

—এর মালিক কে?

—এও দেবীপ্রসাদ মাড়োয়ারির। বনের মধ্যে খনির কাছেই এর বাসা আর আপিস আছে। সেখানে দু-তিনজন বাঙালিবাবু—

—খাতা লিখছে—

—হ্যাঁ।

আবার মোটরে এসে উঠলুম। বন ছাড়িয়ে উঁচুনিচু মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে আবার ছোটোখাটো বন, আবার মাঠ, মাঝে মাঝে পাথর ছড়ানো হো গ্রাম। ফিল্মের ছবির মতো সুন্দর এই বন্য গ্রামগুলি। কালো মাটির দেওয়াল দেওয়া ছোটো নিচু ঘরগুলি, চালায় চালায় বসতি। এরা ফাঁকা ফাঁকা ভাবে বাড়ি তৈরি করতে জানে না; এক বাড়ির দেওয়ালের গায়ে অন্য গৃহস্থ চালা বসিয়েছে অন্যদিকে। বড়ো বড়ো পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদেকে—বোধ হয় সেগুলো পারিবারিক সমাধি বা দেবদেবীর স্থান। প্রত্যেক হো বন্য গ্রামেই এমন পাথর ছড়ানো দেখেছি—মোটা মোটা পাথর ডলমেন বা মেনহিরের ধরনে খাড়া করে পোঁতা—তাদের গায়ে হিন্দিতে কী লেখাও আছে।

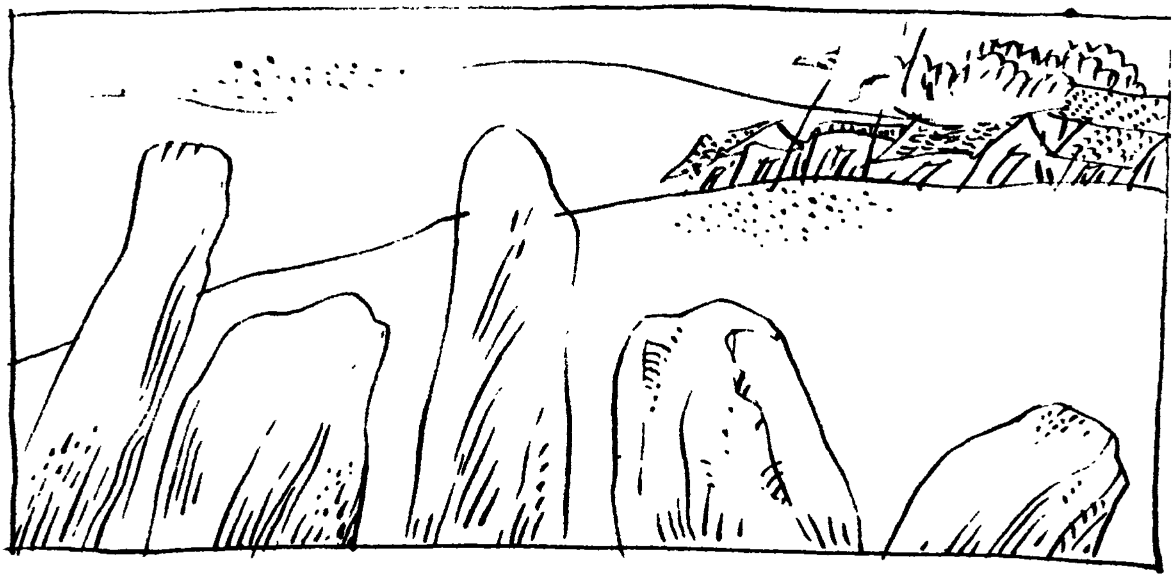

একখানা পাথরের গায়ে লেখা—

বনটু মালাইয়ের পুত্র অস্থিক মালাই।

ঘর—বনটুডি

জিলা—সিংভূম

জিজ্ঞেস করলুম, কাকে অমর করবার ব্যবস্থা এ? মি. সিংহ বললেন, কেন, বনটু মালাইয়ের পুত্র অস্থিক মালাইকে।

—তার কী হয়েছে?

—সে মারা গিয়েছে।

আবার ফিরলাম বামিয়াবুরু বাংলোতে। সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

পরদিন বামিয়াবুরু বনের মধ্যে বেড়াতে বার হওয়া ঠিক হয়েছে, আমরা একটু বেশি রাত্রে খাওয়াদাওয়া শেষ করলাম।

অন্ধকার রাত্রি; আমার চক্ষে ঘুম নেই, এমন বিশাল অরণ্যের মধ্যে কখনো রাত কাটাইনি। বসে বসে দেখছিলাম বাংলোকে ঘিরে চারিধারে শুধু বন আর পাহাড়, পনেরোশো ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের এই বাংলো, সুতরাং এখান থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে ছোটো-বড়ো পর্বতশিখর, আবছায়া অন্ধকারে ঘেরা।

যোগীন্দ্র সিংহ বনবিভাগের কর্মচারী বলেই যে বনশ্রী ভালোবাসেন তা নয়—তেমন যোগাযোগটি সব সময় ঘটে না—ভাবুক লোক। অন্ধকারময়ী রজনীর রূপ দেখবার জন্যে তিনিও আমার সঙ্গে জেগে বসে আছেন বাইরে।

কীসের একটা সুগন্ধ বাতাসে। সিংহ বললেন, পাচ্ছেন গন্ধটা?

—ভারী চমৎকার গন্ধ বটে। কীসের?

—কোনো অজানা বনফুলের—

আমি একটা ভয়ানক ভুল অনেকক্ষণ থেকে করছিলাম। বামিয়াবুরু এবং নিকটবর্তী অরণ্যে একপ্রকার গাছকে আমি বারবার কনকচাঁপার গাছ বলে আসছি এবং এই দুই বনবিভাগের উচ্চ কর্মচারীর সঙ্গে তর্ক করেছি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায়—কারণ ওঁরা বলছেন, চাঁপাগাছ নয়। ও হল ভেড়্লেন্ডিয়া—আর চম্পক হল মাইকেলিয়া চম্পক; তার পাতা হবে কালো কালো লম্বা লম্বা।

আমি বলে আসছি, না তা নয়। স্বর্ণচাঁপার পাতা অমন হবে না। এই যাকে বলছেন ভেড়্লেন্ডিয়া এই হল স্বর্ণচাঁপা। ওঁরা আমার জেদ দেখে বলেছিলেন, তা হতে পারে হয়তো। কিন্তু ও গাছকে আমরা আগাছাস্বরূপ বিবেচনা করি।

এ ভুল আমার ভেঙেছিল পরে—এখন আমার হঠাৎ মনে হল বনের সেই স্বর্ণচাঁপার সুগন্ধ নয় তো? কিন্তু এখন তো চাঁপাফুল ফোটবার সময়ও নয়।

বড়ো সুগন্ধ ফুলটার—যে অজানা ফুলই হোক বনের,—অন্ধকারের মধ্যে নির্জন আকাশতলে তার এই প্রাণঢালা আত্মনিবেদন নিশ্চয় ব্যর্থ নয়। বিশ্বের বড়ো গেরস্থালিতে এতটুকু জিনিসের অপচয় হবার জো নেই!

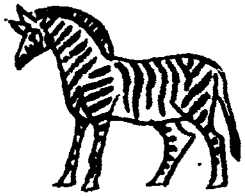

ভ্রমণ

বিপুলা এ পৃথিবী
(নির্বাচিত অংশ)

উত্তর কানাডার জলপথ

উত্তর আমেরিকার মধ্যে কানাডা যে শুধু একটি সুবৃহৎ দেশ তাহা নহে। প্রকৃতি ইহাকে নানা সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়াছেন। পৃথিবীর সুবৃহৎ হ্রদগুলির মধ্যে কয়েকটি এই দেশেই অবস্থিত। তাহা ছাড়া কয়েকটি বড়ো বড়ো নদীও এই দেশের শোভাবর্ধন করিয়াছে। কানাডার উত্তরাংশে বহু সহস্র একর জমি এখনও সম্পূর্ণ অনাবাদি অবস্থায় পতিত আছে। ইয়োরোপের জনবহুল দেশগুলি হইতে উৎসাহী ও সাহসী

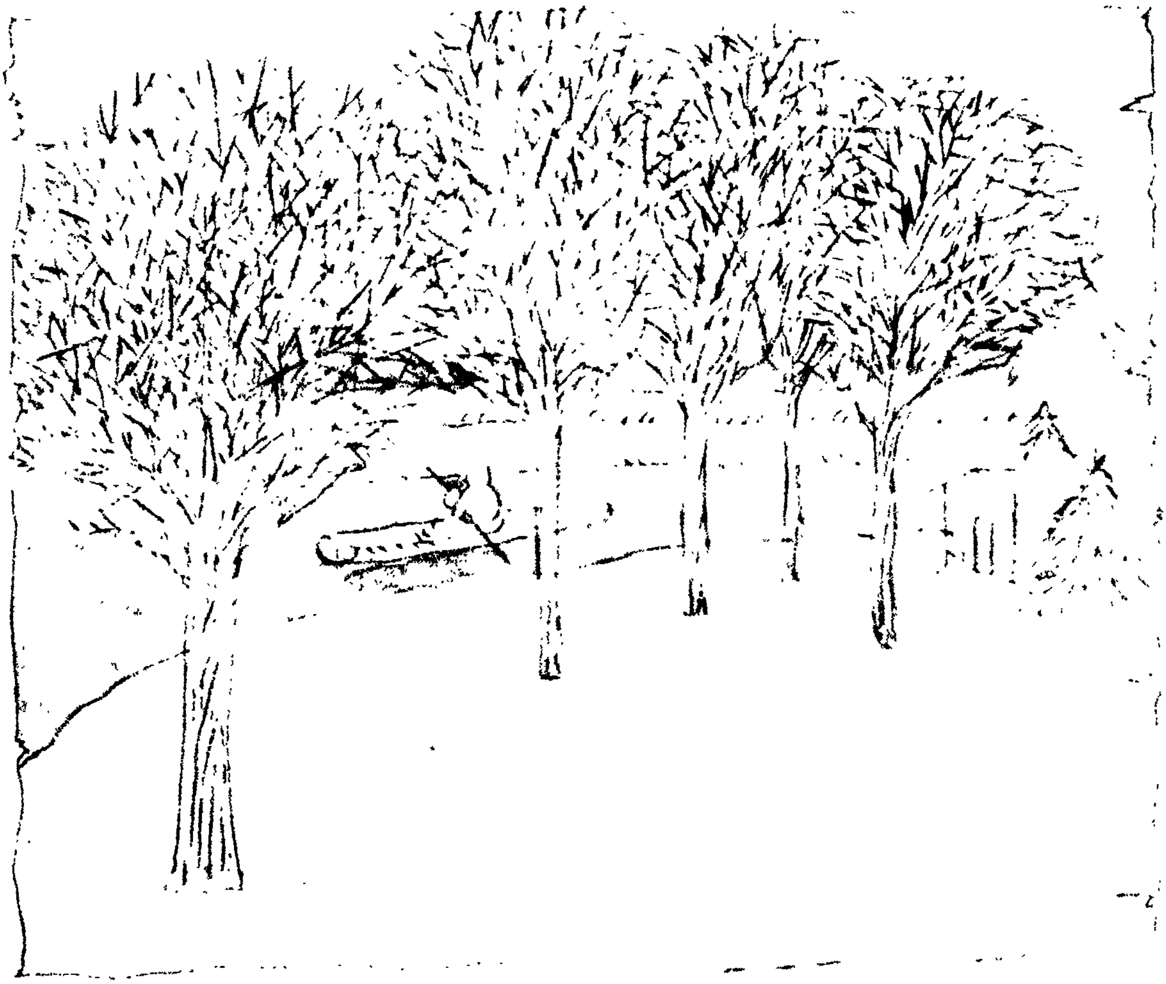

লোকেরা উত্তর কানাডার নানাস্থানে গিয়ে গবর্নমেন্টের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া বসবাস করিতেছে।

কানাডার জলপথগুলি বিচিত্র সৌন্দর্যময়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কানাডার পশুলোম ব্যবসায়ের প্রথম পত্তন হয়। তখন রেল স্টিমার ছিল না, এই জলপথগুলিতে ডোঙা চালাইয়া ইয়োরোপীয় বণিকদল এই বিস্তৃত দেশের নানা অজানা ও অনাবিষ্কৃত পথে যাইয়া আদিম অধিবাসীগণের সহিত ক্রমে সদ্ভাব স্থাপন করেন ও তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া ধীরে ধীরে এই বিস্তৃত পশুলোম ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে থাকেন। হডসন নদীর উত্তর তীর তখন জনমানবশূন্য ঘন অরণ্যে আবৃত ছিল, দুর্দান্ত ইন্ডিয়ান জাতির বিভিন্ন শাখা বর্শা ও ধনুর্বাণ হস্তে নদীর নানা ঘাঁটিতে বিদেশি শত্রুর বক্ষে লক্ষ্যভেদ করিবার আগ্রহে ওৎ পাতিয়া থাকিত, কিন্তু উক্ত বণিকদল তাহাতে ভয় খাইয়া পিছাইয়া যায় নাই—সকল বিপদ, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার উত্তরে হডসন উপসাগর ও উত্তর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সকল ভূভাগেই পশুলোম সংগ্রহ করিবার কুঠি ও আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। কালে বিখ্যাত হডসন বে কোম্পানি এইভাবেই গড়িয়া উঠে। শুনিলে আশ্চর্য হইবার কথা বটে কিন্তু ইহা সত্য যে, উত্তর কানাডার জলপথ সমূহে ডোঙায় চড়িয়া মেকেঞ্জি নদীর মুখ হইতে উত্তর মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চাবি হাজার মাইল একাদিক্রমে যাওয়া চলে।

রেলপথ নির্মিত হইবার পরে ডোঙায় চড়িবার সুবিধাও বর্ধিত হইয়াছে, কারণ বড়ো বড়ো নদীগুলির ধারের শহরগুলির সব প্রায় রেলপথের ধারে অবস্থিত। কেহ যদি ডোঙায় চড়িয়া উত্তর কানাডার জলপথগুলির বিচিত্র সৌন্দর্য, বৃহৎ হ্রদগুলির নীরব শান্তি ও জনমানবহীন পাইন অরণ্যের রহস্য উপভোগ করিতে চান, তবে যেকোনো শহরে রেল হইতে নামিয়া নদীপথ ধরিতে পারেন। যাঁহার সময় সংক্ষেপ তিনি চার-পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে মোটামুটি ভ্রমণ শেষ করিতে পারেন, কিন্তু সবটা খুঁটিনাটিভাবে দেখিতে গেলে দুই-তিন মাসের কমে হইবার কথা নহে। পূর্বে কোনো একটা বিশেষ পথ ধরিবার পূর্বে একশত-দেড়শত মাইল ডোঙা বাহিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইত, কিন্তু আজকাল ইউনাইটেড স্টেটসের পূর্ব বা উত্তরাংশে যেকোনো শহর হইতে রওনা হইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভ্রমণকারী অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া ডোঙাভ্রমণ শুরু করিতে পারেন।

ম্যানিটোবা প্রদেশের উত্তরার্ধ হইতে হডসন উপসাগর পর্যন্ত ভূভাগের জলপথ সমূহের সুবিধা বেশি থাকায় এই অংশই ডোঙাভ্রমণের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। ইহা প্রায়ই পর্বতসংকুল ও অরণ্যময়, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই অংশের উচ্চতা প্রায় বারো শত ফুট, স্থানে স্থানে আরও বেশি। বড়ো বড়ো নদীগুলির অধিকাংশই এই প্রদেশে অবস্থিত, মাঝে মাঝে বড়ো-ছোটো নানা আকারের হ্রদ আছে। নদীর তীরে ঘন অরণ্য, যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই উচ্চ উচ্চ পর্বতমালা—অপূর্ব রহস্যে আচ্ছন্ন বিচিত্র অরণ্য ভূভাগ। এই প্রদেশের অধিকাংশ কৃষিকার্যের উপযুক্ত নয়, কোনো কোনো অংশে একটিও মানুষ চোখে পড়ে না। নদীর এবাঁকে ওবাঁকে নব নব সৌন্দর্য প্রতি মুহূর্তে চোখে পড়িতে থাকে, কোথাও স্বচ্ছসলিল হ্রদ, গম্ভীরনাদি জলপ্রপাত, ছোটো-বড়ো দ্বীপ, পাইন ও সরল গাছের বন। বেশি পশ্চিম ঘেঁষিয়া যাওয়া চলে না, কারণ এই অংশ অত্যন্ত পর্বতময়, অনেক বাধা বিপত্তি ও মাঝে মাঝে প্রস্তরসংকুল rapid থাকার দরুণ এই দিকের নদীগুলিতে ডোঙা চালানো একরূপ অসম্ভব। কিন্তু এই অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্যই আবার সর্বাপেক্ষা রমণীয়।

কানাডার নদীপথগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের সৌন্দর্য কখনো একঘেয়ে হইয়া যায় না। কখনো হ্রদবক্ষের শান্তি, কখনো সুবাসিত পাইন অরণ্যের ঘন ছায়া, কখনো নৃত্যশীল জলপ্রপাত, কখনো উচ্চাবচ ভূমি, কখনো বা রুক্ষ গ্রানাইট শিলার বন্ধুর সৌন্দর্য, মাঝে মাঝে তাঁবু ফেলিয়া রাত্রি কাটাইবার উপযুক্ত মনোরম দ্বীপ। Rapid-গুলি কিছু বিপজ্জনক বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক সঙ্গে থাকিলে এপথে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই। তবে নিতান্ত যেখানে ডোঙা চালানো অসম্ভব, সেসকল স্থানে ডোঙা জল হইতে উঠাইয়া লইয়া অরণ্যের ভিতরকার পথ ধরিতে হয়—পথপ্রদর্শকেরা এই সকল পথ চিনে বা জানে। ভ্রমণের সময় ডোঙাগুলিতে বেশি বোঝাই না লওয়াই যুক্তিসঙ্গত, কারণ ডোঙা উঠাইয়া অরণ্যপথে বাহিয়া লইয়া যাইবার সময় বোঝাই বেশি থাকিলে বড়ো অসুবিধা ঘটে। সব সময় বাহক মেলে না।

কানাডার উত্তরতম প্রদেশগুলিতে এখনও রেল যায় নাই, ডোঙায় চড়িয়াই সেসব স্থানে পৌঁছিতে হয়। রেলে পৌঁছানো যায় না বলিয়াই এই প্রদেশের সৌন্দর্য আরও বেশি, রহস্য আরও বিচিত্র। ইন্ডিয়ান জাতিদের গাছের ছালের তৈয়ারি ডোঙাই এই দেশে যাতায়াতের একমাত্র সম্বল, অবশ্য আজকাল ভ্রমণকারীগণ নানারূপ উন্নত প্রণালিতে ডোঙা ব্যবহার করিতেছেন না এমন নহে। কিন্তু এ দেশের জলপথগুলি যে ধরনের, তাহাতে ইন্ডিয়ানদের গাছের ছালের ডোঙাই এদেশের পক্ষে বেশি উপযোগী। নদী ও হ্রদগুলি মৎস্য পরিপূর্ণ, সুতরাং যাঁহারা মাছ ধরিতে জানেন বা ভালোবাসেন, ভ্রমণকালে তাঁহারা নিছক ভ্রমণের আনন্দ ছাড়া শিকারের আনন্দও উপভোগ করিয়া থাকেন, খাদ্যবস্তুরও অভাব হয় না।

কিন্তু যাঁহারা পরগাছা সংগ্রহ করিতে ভালোবাসেন, তাঁহাদের আনন্দই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি হইবার কথা—কারণ এই প্রদেশের অরণ্যগুলিতে নানা অদ্ভুত ধরনের পরগাছা আছে। নদীপথগুলি হইতে কিছুদূরে নিবিড় অরণ্যমধ্যে খোঁজ করিলে বৈজ্ঞানিকগণের অজ্ঞাত নানাশ্রেণির পরগাছা পাওয়া যায়—ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে বিশেষজ্ঞগণ মাঝে মাঝে ইহার সন্ধানে আসেন ও সময়ে সময়ে জীবনকে বিপন্ন করিয়াও নতুন ধরনের পরগাছা ও অন্যান্য গাছপালা লইয়া যান।

যাঁহারা জনবহুল নগরগুলির কর্মকোলাহল হইতে কিছুদিন অবসর লইতে চান, প্রাণের শান্তি ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা করেন, এই নির্জন ভূভাগের শান্ত বনরাজি, স্তব্ধরাত্রির মোহিনী সৌন্দর্য, মুক্ত প্রকৃতির অবাধ লীলারঙ্গ তাঁহাদের ক্লান্ত দেহমনকে নূতন আয়ু দান করিবে সন্দেহ নাই।

তবে খুব বেশিদিন এপ্রদেশ এরূপ থাকিবে কি না বলা যায় না। পশুচর্ম ব্যবসা যেরূপ দিন দিন বাড়িতেছে ও নদীপথগুলির উত্তর পার্শ্বের কুঠিগুলির সংখ্যা বৎসরে বৎসরে যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে বোধ হয় দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যেই এইসকল অরণ্য জনপদে পরিণত হইবে। বড়ো বড়ো বনকাষ্ঠ ব্যবসায়ীগণ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে ইজারা লইতেছে এবং মৎস্য ব্যবসায়ীগণও কলের জাল প্রভৃতি লইয়া স্টিমার ও নৌকা আমদানি শুরু করিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া দক্ষিণ কানাডাতে জমি প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সেদিক হইতে লোকজন কৃষিকার্যের জন্য জমি খুঁজিতে আসিয়া ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে।

কিলিমান্‌জারো—আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত

আজ হইতে সাতাত্তর বৎসর পূর্বে জার্মান মিশনারি রেব্‌ম্যান তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়া যান যে তিনি দূর হইতে একটি উচ্চ পর্বতের চূড়া দেখিয়াছেন; প্রথমে উহা মেঘ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পথপ্রদর্শক বলে উহা মেঘ নহে 'বেরেডি'—ঠান্ডা। ক্রমে আরও নিকটে আসিয়া তিনি বুঝিতে পারেন উহা মেঘ নহে, বহু দূরবর্তী কোনো উচ্চ পর্বতের তুষারমণ্ডিত শিখরদেশ। এই সর্বপ্রথম কিলিমান্‌জারো পর্বত ইয়োরোপীয়দের নজরে পড়িল।

ইহার পূর্বে ইয়োরোপের কেহ জানিত না যে বিষুবরেখা হইতে মাত্র ৩ ডিগ্রি দূরে একটি বিশাল তুষারাবৃত পর্বতের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং মিশনারি রেব্‌ম্যানের কথা কেহ শোনে নাই, হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। রেব্‌ম্যানের পক্ষেও একটু মুশকিল হইয়াছিল—তিনি জোর করিয়া কোনো কথা বলিতে পারেন নাই। কিলিমান্‌জারোর শিখরদেশ বৎসরের অধিকাংশ সময় মেঘে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা মেঘ কি তুষার এসম্বন্ধে তাঁহার নিজের মনেও সকলের কথা শুনিবার পরে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এ লইয়া তিনি আর কোনো তর্ক করেন নাই।

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, এসম্বন্ধে এত রাশি রাশি প্রমাণ জমিতে শুরু করিল যে বৈজ্ঞানিকগণ ব্যাপারটাকে আর হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। ইহার কিছুকাল পরেই নানা দিক হইতে ভৌগোলিক অভিযান আরম্ভ হইল—শুধু কিলিমান্‌জারো আবিষ্কারের জন্য নয়, পৃথিবীর মধ্যে কোন কোন পর্বত উচ্চ তাহার একটি তুলনামূলক হিসাব প্রস্তুতের জন্য এবং আফ্রিকা মহাদেশে এরূপ কোনো উচ্চ পর্বত আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য। একটি দুইটি করিয়া উপরি উপরি কয়েকটি দল কিলিমান্‌জারো পর্বত খুঁজিয়া বাহির করিতে রওনা হন ও সেসম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করেন। ওই সকল অভিযানের বিবরণ পড়িলে বিস্মিত হইতে হয় শুধু এই ভাবিয়া যে, সাতাত্তর বৎসরের মধ্যে বর্তমান সভ্যতা কীরূপ ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া পৃথিবীর পর্বত ও অরণ্যময় প্রদেশেও নিজের অধিকার বিস্তার করিতেছে। পূর্বে কিলিমান্‌জারো পর্বত ছিল আফ্রিকার অতি দুর্গম স্থানে অবস্থিত—সেখানে পৌঁছাইতে হইলে জনবিরল অরণ্য, মরুভূমি, নানা পর্বত ও দুর্দান্ত জাতিদের দেশের মধ্য দিয়া বহুদিন ধরিয়া যাইতে হইত। আর এখন সেই কিলিমান্‌জারো পর্বত ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে ট্রেনে মাত্র আঠারো ঘণ্টার পথ। যে সকল ব্যক্তি এই পর্বত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ডা. হ্যান্‌স্‌ মেয়ারের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক দিন ধরিয়া কিলিমান্‌জারো পর্বতের সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া এখানকার বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু সম্বন্ধে যে বই লিখিয়া গিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত তাহাই কিলিমান্‌জারো সম্বন্ধে একমাত্র মূল্যবান গ্রন্থ। তখন ইহার নিকটবর্তী দেশসমূহে জার্মানেরা নিজেদের অধিকার বিস্তার কার্য শুরু করিয়াছিল এবং হয়তো কালে ইহার সমগ্র অংশই জার্মানদিগের অধিকারে আসিত। কিন্তু ইতিহাসজ্ঞ পাঠকেরা জানেন কীরূপে অল্পকাল মধ্যেই এইসকল প্রদেশে ইংরাজের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে কিলিমান্‌জারো পর্বত ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকার সীমার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। এই ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকার বর্তমান নাম কেনিয়া।

জার্মানি এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল—সেটা খুবই স্বাভাবিক; কারণ কিলিমান্‌জারো পর্বতের ম্যাপ প্রস্তুত করা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারকার্য সবটাই তাহাদেরই উদ্যোগে হইয়াছিল। ভূতপূর্ব জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়ম এই পর্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে নানা উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আত্মীয় মহারানি ভিক্টোরিয়াকে অনুরোধ করেন, পর্বতটা তাঁহাকে জন্মদিনের উপহার স্বরূপ দেওয়া হউক। ইহার অল্পদিন পরেই তৎকালীন ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকার সীমার কিছু পরিবর্তন ঘটিল এবং কিলিমান্‌জারো পর্বত পুনরায় জার্মানির অধিকৃত ভূভাগে ঢুকিয়া গেল।

সুবিখ্যাত পর্যটক স্যার হ্যারি জনস্টন ইংরাজদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম এই পর্বতে আরোহণ করেন এবং ইহার উদ্ভিদ সংস্থান বিষয়ে স্যার হ্যারি জনস্টনের যে বই আছে তাহা একখানি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। ১৯১৪ সালে মি. ওয়েস্ট নামে জনৈক ইংরাজ পর্যটক ইহার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন ও পর্বতের ক্রেটারেও নামেন, এবং দুর্গম বরফাবৃত অধিত্যকা পার হইয়া ইহার আর একটি উচ্চ শিখর যেখানে এ পর্যন্ত কেহ যায় নাই সেখানে গিয়া ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেন।

দূর হইতে কিলিমান্‌জারো পর্বতের দৃশ্য অতীব সুন্দর। অন্যান্য পর্বতের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না—

বিশেষ করিয়া এইজন্য যে, পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উচ্চ পর্বত আরও অনেক আছে কিন্তু সেগুলি কোনো একটি বড়ো পর্বতমালার অংশমাত্র। কিন্তু কিলিমান্‌জারো সেরূপ নহে। ইহা যেখানে অবস্থিত সেখানে অন্য কোনো পর্বত নাই। নিম্নের সমতলভূমি হইতে একেবারে খাড়া প্রায় বিশ হাজার ফিট উচ্চ ইহার তুষারাবৃত শিখরের সে অপূর্ব সৌন্দর্য না দেখিলে বোঝা যায় না। প্রধানত ইহার দুইটি শিখর—কিবো (উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ ফিট) ও মায়েনজি (১৭,০০০ ফিট)—মধ্যে প্রায় পাঁচ মাইল ব্যাপী একটি বিস্তৃত অধিত্যকা প্রদেশ। যেদিক হইতেই দৃষ্টিপাত করা যায়, এই পর্বতের দৃশ্য এত মনোমুগ্ধকর যে সমগ্র আফ্রিকা ভূখণ্ডে একমাত্র ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ছাড়া এত সুন্দর জিনিস আর নাই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই অধিবাসীগণ অসভ্য ও রক্তপিপাসু বর্বর ছিল। তাহারা সব সময়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত এবং কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না। নরবলি ও নরমাংস ভোজন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু এখন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও কৃষিজীবী জাতি হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে না ভুলিলেও প্রায়ই তাহার মধ্যে যায় না। ইহারা প্রধানত কলার চাষ করিয়া থাকে। উত্তর অংশের ঢালু জমি প্রায়ই কফিক্ষেত্র ও কলাবাগান। কৃষিক্ষেত্রসমূহের কিছু উপর হইতে ঘন অরণ্যময় ঢালুর আরম্ভ। এই অরণ্য সাধারণ শ্রেণিভুক্ত নহে—ইহা অত্যন্ত নিবিড় ও প্রায় এগারো হাজার ফিট পর্যন্ত বিস্তৃত। বনে হস্তী খুব বেশি—যদিও গরিলা, বানর ও অন্যান্য জন্তুও আছে। আদিম অধিবাসীগণ খুব ভালো শিকারি নয় বলিয়া বোধ হয় হস্তীবংশ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অনেক সময় অরণ্যের প্রান্তবর্তী কফিক্ষেত্রসমূহ ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করা শক্ত হইয়া পড়ে। অনেক সময় ইহারা দলবদ্ধভাবে কৃষিক্ষেত্রসমূহের উপর আসিয়া পড়ে এবং মাইলের পর মাইল ধরিয়া গ্রাম ও ফসল একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়া আবার বনে পলাইয়া যায়। একবার ইহাদের উপদ্রব এত বেশি বাড়িয়াছিল যে গবর্নমেন্ট ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ও এক বৎসরের মধ্যে বহু চেষ্টার ফলে পাঁচ শত হাতি মারা পড়ে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এত বেশি যে এত মারিয়াও তাহাদের উপদ্রব বিশেষ কিছু কমে নাই।

আজকাল কিলিমান্‌জারো পর্বতে আরোহণ খুব দুঃসাধ্য নহে। উত্তর ও পূর্ব দিকের ঢালু দিয়া যাওয়াই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক; একদিকে বড়ো বড়ো পথ তৈয়ারি করা হইয়াছে এবং অনেক ধনী ও অবস্থাপন্ন ইয়োরোপীয় কফিক্ষেত্রের মালিক পাহাড়ের উপরে তাঁহাদের বাসস্থান করিয়াছেন। এই বাসস্থান অবশ্য শিখরদেশে বা অরণ্যময় ঢালুর নিকটে নয়। তাহাদের অনেক নীচে। আশা করা যায়, অল্পদিনের মধ্যে এই পর্বত দেখিতে কৌতূহলি আমেরিকান টুরিস্টদের ভিড় হইবে।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অনাবিষ্কৃত ভূভাগ

অস্ট্রেলিয়ার মতো সুবৃহৎ দেশের কোথায় কী আছে এখনও পর্যন্ত সমুদয় আবিষ্কৃত হয় নাই বা সভ্য মানুষও সকল স্থানে এখনও বসতি স্থাপন করে নাই। বিশেষ করিয়া পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় এখনও সভ্য মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প; পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার এই অংশে একটিও সভ্য লোকের বাস ছিল না, এখনও যে খুব বেশি তাহা নহে। সর্বসুদ্ধ সাত হাজার লোকের উপর ইহাদের সংখ্যা হইবে না। অবশ্য

একদিক হইতে দেখিতে গেলে খুব অল্পদিনেই লোকসংখ্যা এত বাড়িয়াছে, কারণ ১৮৬৩ সালে এই অংশে রোবাক উপসাগরের উপকূলে (Roebuck Bay) সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। তখনও এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই অজ্ঞাত ছিল—১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত দেশ আবিষ্কারক ও পর্যটক স্যার জন ফরেস্ট এদিকে অনেকদিন ধরিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। উপকূল হইতে বহুদূরে দেশের অভ্যন্তরভাগে ঢুকিয়া গিয়া তিনি ইহার ম্যাপ তৈয়ারি করেন। কয়েক বৎসর পরেই খনিবিদ হল্ ও গ্ল্যাটারি যখন এদেশে সোনার খনি আবিষ্কার করিলেন তখন হইতেই হু-হু করিয়া লোকসংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিল।

অস্ট্রেলিয়ার এই অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার—যাঁহারা বারোমাস ঘরে বসিয়া কাটান, তাহারা পৃথিবীর এইসব অপূর্ব দেশের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করিতে পারিবেন না।

অস্ট্রেলিয়ার এ অংশে নদীর মুখেও সমুদ্রে যথেষ্ট মাছ পাওয়া যায়। তারের একপ্রকার ফাঁদ পাতিয়া মাছ ধরিবার পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত। নদীখালের মুখে ভাঁটার সময় তারের তৈয়ারি ফাঁদগুলি পাতিয়া রাখা হয়, জোয়ারের সময় মাছ ঢুকিয়া পড়ে কিন্তু আর বাহির হইতে পারে না—জোয়ারের জল নামিয়া গেলে দেখা যায় এক-একটা ফাঁদ মাছে ভরিয়া গিয়াছে। এই দেশের নিকটবর্তী সমুদ্রগর্ভ হইতে দশ বৎসরে এগারো লক্ষ ডলারের ঝিনুক ও মুক্তা সংগৃহীত হইয়াছে।

রোবাক উপসাগর হইতে কিং সাউন্ড পর্যন্ত প্রায় এগারো শত মাইল উপকূলভাগ আজকাল মুক্তা উত্তোলনকারী ব্যবসায়ীগণের উপনিবেশে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে বৎসরে যত ঝিনুক ও মুক্তা সংগৃহীত হয়—তাহার তিন-চতুর্থাংশ এখান হইতে পাওয়া যায়। মুক্তা ব্যবসায়ীগণ যে ডুবুরি নিযুক্ত করে, তাহাদের অধিকাংশ এশিয়াবাসী কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ জাতি অস্ট্রেলিয়ার আইনানুসারে তথায় ইহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ; কেবলমাত্র মুক্তা উত্তোলনের কার্যে ইহাদের লাগানো যাইতে পারে—আইনের একটি বিশেষ ধারা অনুসারে।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলভাগে প্রবালের ঝাড়ে পরিপূর্ণ। অত্যন্ত সাবধান হইয়া জাহাজ না চালাইলে—এইসকল স্থানে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা খুব বেশি। স্থানে স্থানে এরূপ আছে যে জাহাজ একেবারেই চলে না।

ডুগং নামক সামুদ্রিক জন্তু এ অঞ্চলে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ডুগং (Dugong) স্তন্যপায়ী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অনেকটা তিমির মতো দেখিতে অবশ্য তিমি অপেক্ষা অনেক ছোটো। ডুগং-এর গাত্রচর্ম অত্যন্ত মোটা ও দুর্ভেদ্য। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ অনেক সময় ছোটো ছোটো ভেলায় করিয়া ডুগং শিকার করিতে যাইয়া থাকে—তাহাদের অস্ত্রের মধ্যে বর্শা সম্বল কিন্তু বর্শা দ্বারা ডুগং প্রায়ই মারা পড়ে না, অনেক বর্শা ভাঙিবার পরে হয়তো কাহারো ভাগ্যে একটা জুটিয়া যায়। ডুগং-এর মাংস খাইতে সুস্বাদু—সভ্য ও অসভ্য তাবৎ লোকেই খুব আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। চর্বি হইতে একপ্রকার মূল্যবান তৈল পাওয়া যায়, ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার বাজারে ইহার মূল্য খুব বেশি। তিমি শিকারের ব্যবসায় যেরূপ লাভজনক, ডুগং শিকার তাহা অপেক্ষা কম লাভের নহে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্রই আজকাল এ ব্যবসায় ছড়াইয়া পড়িতেছে।

উপকূল হইতে কিছুদূরে পাহাড়ের উপর ঘন অরণ্য। এই সকল অরণ্যে নানা মূল্যবান কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তবে এখনও পর্যন্ত কাষ্ঠের ব্যবসায়ের দিকে কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই। নদীর মুখে নৌকা চালাইয়া

যাওয়া অনেক সময় বিপজ্জনক, কারণ এই সকল স্থান বড়ো বড়ো কুমিরে পরিপূর্ণ, তাহারা এত হিংস্র যে অনেক সময় নৌকায় উঠিয়া মানুষকে আক্রমণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। মুক্তা ব্যবসায়ীগণ আজকাল মোটরবোট ব্যবহার করে, মোটরবোটের শব্দে ইহারা ভয় পাইয়া তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

স্থানীয় আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। ইহারা নিজেদের পিঠ বা বুকে একপ্রকার ঝিনুক দিয়া চামড়ার উপর লম্বা লম্বা দাগ কাটে, পরে কোনো লতার রস মাখাইয়া তাহা সবুজ বর্ণে রঞ্জিত করে, কোনো কোনো স্থলে ম্যানগ্রোভ দেশের তলাকার কর্দমও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এক-এক জাতীয় চিহ্ন এক-এক রূপ—কেহ পিঠে গোল দাগ কাটে, কেহ কেহ কতকগুলি সমান্তরাল রেখা অঙ্কিত করে—পিঠের ও বুকের এই চিহ্ন দেখিয়া কে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা ধরিতে পারা যায়।

কয়েকটি ইয়োরোপীয় উপনিবেশিক এ অঞ্চলে ফলের চাষ করিয়া বেশ লাভবান হইতেছেন। তাঁহাদের বাগানে উষ্ণমণ্ডলের নানাবিধ ফুল-ফল পাওয়া যায়। ঘাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া ভেড়া ও ছাগল পোষাও এ অঞ্চলের একটি লাভজনক কারবার।

এ প্রদেশের আদিম অধিবাসীগণ ভারী দুর্দান্ত ও কলহপ্রিয়। ইহাদের মধ্যে মালয় রক্ত আছে, সম্ভবত

প্রাচীনকালে মুক্তাসংগ্রহের লোভে মালয়ের অধিবাসীরা এসকল অঞ্চলে আসিত। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য কয়েকটি পাদ্রি তাঁহাদের মিশন স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পোর্ট জর্জ মিশন খুব ভালো করিতেছে। এই মিশনের কর্তা মি. উইলসন সস্ত্রীক এখানে বাস করেন।

একপ্রকার সামুদ্রিক সাপকে প্রায়ই জলের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে দেখা যায়। এই সকল সাপ অত্যন্ত বিষধর, দৈর্ঘ্যে এক-একটা বারো-তেরো ফিটের কম নহে।

নেপিয়ার উপকূলে স্পেনীয়দিগের আর একটি মিশন আছে—ইহা প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়। এস্থানটি খুবই নির্জন, সারা বৎসরের মধ্যে হয়তো একবার কোনো সভ্য মানুষ এদিকে আসে। খাইবার দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না। মিশনের নিজেদের ছোটো জাহাজে করিয়া দুই শত মাইল দূরে ব্রুম নামক ছোটো শহর হইতে জিনিসপত্র আনিতে হয়। তবে আজকাল মিশন বাড়ির চারিপাশের জমিতে ইঁহারা ধান ও তামাকের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজ উপসাগরে লাক্রোস নামে একটি ছোটো বসতিশূন্য দ্বীপ আছে—এই দ্বীপের কূলে বড়ো বড়ো সামুদ্রিক কচ্ছপের আড্ডা। শুধুমাত্র চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দিলেই কচ্ছপেরা আর নড়িতে পারে না—এই উপায়ে একবার একরাত্রের মধ্যে জনৈক শিকারি তিরাশিটি কচ্ছপ ধরিয়াছিলেন। এই সকল কচ্ছপ এতবড়ো যে মানুষকে পিঠে অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। মি. জ্যাকসন নামক একজন ইংরাজ ভদ্রলোক এইসকল সামুদ্রিক কচ্ছপের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য এখানে বাস করিতেছেন।

ফরেস্ট নদীর ধারে আর একটি মিশন স্থাপিত হইয়াছে—ফরেস্ট নদীর তিরবর্তী অসভ্য জাতিগণের মধ্যে সভ্যতা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই এই মিশনের প্রতিষ্ঠা। ইঁহারাও সম্প্রতি কৃষিকর্ম আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ কেহ গোরু ও ভেড়ার ব্যবসায়ে মন দিতেছেন। তবে যাতায়াতের ভালো রাস্তা নাই, দেশ শুধু জঙ্গল ও পাহাড়ে ভরা, অভ্যন্তরভাগের অধিকাংশই ঊষর বালুকাময় মরুভূমি—এইসব অসুবিধার জন্য এখনও বিস্তৃতভাবে সভ্য জাতির উপনিবেশ এদেশে গড়িয়া উঠে নাই।

'যাচ্ছি-যাব'র দেশ আফ্রিকা

সোহালি ভাষায় 'বার্ডো কিডোগো' বলে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। আফ্রিকা মহাদেশের যেকোনো দেশের যেকোনো জাতই হোক সে জুলু, বাসুতো, মাটাবেল বা কাফির—ওদের মুখের বুলিই—'বার্ডো কিডাগো'। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত, কায়রো থেকে কেপ টাউন পর্যন্ত, এই কথাটাই সবাই বোঝে এবং এই কথার অলস ছন্দে নিজেদের জীবনের গতির লয় ওরা বেঁধেছে। কথাটার মানে 'একটুখানি অপেক্ষা করো'। আফ্রিকার প্রত্যেক কাজে কথায়, তার বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে, তার বড়ো বড়ো নদীতে, জলাভূমিতে, কর্দমাক্ত পথে—এই কথার প্রভাব বর্তমান।

যখন আমি কলোরাডো আফ্রিকান অভিযানের নেতৃত্ব নিয়ে আফ্রিকা যাই তখন যথেষ্ট উৎসাহ নিয়েই গিয়েছিলাম। আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল বন্যজন্তুর চলচ্চিত্র সংগ্রহ করা। আদিম অধিবাসীদেরও বটে। কিন্তু পূর্ব উপকূলের কিলিন্ডিলি বন্দরে যে দিনটিতে পদার্পণ করলাম, সেদিন থেকে

আর পশ্চিম উপকূলের লাপোস বন্দরে যেদিন আবার দেশে ফিরবার জন্যে জাহাজে চড়ি সে দিনটি পর্যন্ত প্রত্যেক কাজে পদে পদে অনুভব করেছি, আফ্রিকা ইয়োরোপ নয়, এখানকার জীবনের তাল দীর্ঘ বিলম্বিত, তাড়াতাড়ি এখানে কিছু করা যায় না। সবতাতেই দেরি, 'একটুখানি অপেক্ষা করো', 'বার্ডো কিডোগো'—এখানে জলে-হাওয়ায় এর প্রভাব।

কলোরাডো আফ্রিকান অভিযানে যোগদান করবার দু-বছর আগে আমি একবার একা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কাওকো ভেল্ড্ ও কালাজারি মরুভূমির মধ্যে ভ্রমণ করি। সিংহের দেশের মধ্যে দিয়ে হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করেও একবার একটি মাত্র ছাড়া আর কোনো সিংহই দেখিনি। তাই এবার যখন আবার আফ্রিকায় এসে পড়লাম তখন ভাবছিলাম, এ দেশের সেই 'যাচ্ছি যাব' বাণীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছি কি না।

কুলিদের মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে মোটর ট্রাক নিয়ে আমরা টাঙ্গানিয়াকা প্রদেশের সেরেঙ্গেটি প্রান্তরে তাঁবু ফেললাম। সেরেঙ্গেটি সমতলভূমি, বন্যজন্তু বিশেষ করে সিংহের প্রধান আড্ডা। সুতরাং আমরা আমাদের জায়গার নাম দিলাম ক্যাম্প সিম্বা—মাসাই ভাষায় সিম্বা কথার মানে সিংহ। আমাদের তাঁবু থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে একটা গভীর সংকীর্ণ উপত্যকার সন্ধান পাওয়া গেল, যেখানে সিংহ বাস করে।

একমাস ধরে আমরা ক্যামেরা নিয়ে সিংহদের চলচ্চিত্র তুললাম। একটি দুটি নয়, এক-একটি দলে পেয়েছিলাম চারটি সিংহ—এদের সংখ্যা কখনো বেড়ে ছয় এবং আটও দাঁড়াত। সিংহ ও সিংহী দুই-ই ছিল এদের দলে। সিংহ শিকার আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না—তার তোড়জোড়ও ছিল না। শুধু এদের ছবি সংগ্রহ করাই ছিল আমাদের কাজ। অনেক সময় মাত্র ছ-ফুট দূর থেকে এদের ছবি নিতে হয়েছে, অনেক সময় আমাদের ও সিংহের দলের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র একটা পাতলা বেড়া। জঙ্গলের ডালপালা দিয়ে তৈরি। এরকম বেড়াকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের ভাষায় বলে 'বোমা'।

আমরা একটি মৃত জেব্রাকে এক জায়গায় ফেলে রাখতাম। জেব্রার মাংস সিংহের অতি প্রিয় খাদ্য—মাংসের গন্ধ পেয়ে দুটি একটি করে সিংহ-সিংহী জড়ো হত মৃত জেব্রার চারধারে, আমরা সেই সময় ফটো নিতাম। আমাদের সঙ্গে ওদের যেন মিতালি গড়ে উঠেছিল, জেব্রার মাংস বিনামূল্যে খেতে পেয়ে হয়তো বা ওরা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়েই আমাদের কিছু বলত না, আমরাও ওদের কিছু বলতাম না।

সিংহের দল যে কত ধরনের খেলা, লাফালাফি, দৌড়ঝাঁপ করত জেব্রার মাংস খেতে খেতে, তা আমরাও চোখে দেখবার আগে বিশ্বাস করতাম না যে সিংহ এসব করতে পারে। তবে মৃত্যু নিয়ে খেলা করেছি একথা সব সময়েই আমাদের মনে সজাগ থাকত। নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়ে নাড়াচাড়া করা সিংহ নিয়ে কারবার করা দুই-ই সমান—কখন কী বিপদ ঘটবে, একথা কিছু বলবার জো নেই। মৃত্যু যখন আসবে তখন আসবে সম্পূর্ণ অতর্কিতে।

আফ্রিকায় একটা কথা প্রচলিত আছে, 'অনিশ্চয়তাই সিংহের চরিত্রের একমাত্র নিশ্চয়তা'—আমরা সব সময় একথাটি মনে রেখে চলতাম বটে, কিন্তু আমাদের কাজের প্রকৃতি ছিল যেরকম, তাতে দৈবের ওপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিল না আমাদের।

দশ ফুট বা বড়ো জোর পনেরো ফুট দূর থেকে ছবি তুলতাম। সিংহ এক লাফে যায় প্রায় আঠারো ফুট। সুতরাং ক্রুদ্ধ সিংহের প্রথম ঝম্পের সীমানার মধ্যেই আমরা আর আমাদের চলচ্চিত্রের ক্যামেরা—এস্থলে দৈবের উপর নির্ভর না করে উপায় কী?

একবার একটি সিংহী সম্পূর্ণ অকারণে আমার দিকে ছুটে এল এবং ততোধিক অকারণে আমার ছ-ফুট মাত্র দূরে থমকে গেল দাঁড়িয়ে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র পরে সে পনেরো ফুট দূরে বেশ শান্ত নিরীহ পোষ-মানা জন্তুটির মতো বিচরণ করছিল। কেন বা কী মনে করে সে হঠাৎ আমার দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল, কেনই বা সে আবার ফিরে গেল—এর খবর কেউ দিতে পারে না,—সিংহ ভয়ানক খামখেয়ালি প্রকৃতির জানোয়ার।

এত তাড়াতাড়ি সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে আমার মনে হওয়ার অবকাশই হয়নি—তারপর বিপদ যখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল তখন আমি বাতাহত বৃক্ষপত্রের মতো কাঁপতে লাগলাম এবং অনেক কষ্টে বন্দুকটা বাগিয়ে ওর দিকে ধরলাম। সিংহটা আর ছ-ফুট আমার দিকে এগিয়ে এলে আমার কাঁপুনি বা রাইফেল কোনো উপকারই দর্শাত না।

ক্যামেরাতে ছবি তোলবার কাজ যতদিন চলছিল ততদিন সিংহ শিকার করবার কোনো চেষ্টা করিনি বা কোনো কারণেই ওদের বিরুদ্ধে কোনো মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার করিনি। তাঁবুর সকলের ওপরও আমি এই মর্মেই আদেশ জারি করেছিলাম। এর আগেও আমি কখনো সিংহ শিকার করিনি এবং দু-দুবার আফ্রিকার সিংহবহুল অঞ্চলে ভ্রমণ করেও একটা মৃত সিংহের চামড়া ও মুণ্ড যে আমি গর্বের সঙ্গে সকলকে দেখাতে পারতুম না, এতে আমার নিজেরই লজ্জা বোধ হত।

আমরা তাঁবু খাটাবার দু-সপ্তাহ পরে একদিন আমাদের উপত্যকা থেকে কিছু দূরে একটা হলদে-কেশরওয়ালা বড়ো সিংহ দেখা গেল। এ সিংহটা আমাদের পরিচিত সিংহ দলের সভ্য নয়, যারা আমাদের ক্যামেরার সামনে খেলাধূলা করে, জেব্রার মাংস খেয়ে ছবি তুলতে দেয়। একটা সিংহীর সঙ্গে সে গাছের ছায়ার শুয়ে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিল, দূর থেকে শুভ্র সূর্যালোকের প্রখরতার মধ্যে ওদের দুটিকে দুটি কালো দাগের মতো দেখাচ্ছিল যেন।

আমি এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। ছোটো ছোটো ঘাসের বনের ওপর দিয়ে দু-জোড়া কান খাড়া হয়ে উঠতেই আমি বন্দুক বাগিয়ে ধরলাম। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে একটা প্রকাণ্ড সিংহ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ঘন ঘাসের বনের মধ্যে থেকে। তার লেজটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে চাবুকের মতো আন্দোলিত হচ্ছে—এইবার আক্রমণ করতে ছুটে আসবে আমার দিকে, এটা তারই চিহ্ন।

সিংহটা আক্রমণ করত হয়তো, কিন্তু সিংহীটা সেই সময় হঠাৎ লাফিয়ে বাঁদিকে পাহাড়ের ধারের বনের দিকে পালিয়ে গেল—আমার কাছ থেকে জায়গাটার দূরত্ব প্রায় কুড়ি গজ। সিংহটা সঙ্গিনীর ব্যবহারে সম্ভবত ক্ষুব্ধ হয়ে আক্রমণ স্থগিত রাখলে এবং ধীরে ধীরে তার অনুসরণ করলে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, বনের মধ্যে ঢোকবার আগে সে কৌতূহল চাপতে না পেরে আমার দিকে একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখতে গেল—আমি সেই সময় গুলি করলাম। সিংহটা তখন বজ্রাহতের মতই সেখানে পড়ে গেল, গুলি লেগেছে এটা বুঝতে দেরি হল না আমার। আমি আর কিছু এগিয়ে গেলাম।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে কয়েক ফুটের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে দু-একটা পাথর ছুঁড়ে মেরে দেখলাম, সিংহটা নড়েচড়ে না। বন্দুকটা একজায়গায় রেখে দিয়ে আমি মৃত সিংহের ফটো তুলবার ব্যবস্থা করছি, সেই সময় বন্দুকের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দলের সব লোক এসে সেখানে পৌঁছোল। আমাদের কুলির সর্দার মাইক ওর কেশরাশি সরিয়ে দেখতে চাইল গুলি কোথায় বিঁধেছে। দেখা গেল একটা চোখের মধ্য দিয়ে গুলি গিয়েছে। এমন সোজা চলে গিয়েছে যে চোখের ভ্রূ পর্যন্ত অক্ষত আছে।

ফটো তুলবার সুবিধের জন্যে কুলিরা লম্বা লম্বা ঘাস কেটে সামনে খানিকটা জায়গা ফাঁকা করতে ব্যস্ত হল—ওদের মধ্যে একজন কুলি মৃত সিংহের লেজটা ধরে একপাশে দেহটা সরাতে যাবে—এমন সময় সিংহটা ভীষণ গর্জন করে উঠল। সবাই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে লং জাম্পের প্রতিযোগিতার মতো লাফ দিয়ে পিছু হটে গেল। সিংহ ক্রমশ লম্বা নিশ্বাস ফেলতে লাগল—তার বুক উঠতে নামতে লাগল, ক্রমশ সে জেগে উঠবে। তাহলে সিংহটা মরেনি, মূর্ছা গিয়েছিল মাত্র। কালবিলম্ব না করে, আমি বন্দুকের নল প্রায় ওর গায়ে ঠেকিয়ে পুনরায় গুলি ছুঁড়লাম। তাতেই সেটা সাবাড় হল। নিগ্রো কুলিদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে বেগতিক বুঝে গাছে চড়ে বসেছিল, ভরসা পেয়ে তারা আবার নেমে এল।

আমার মনে হয় সিংহ যেন আফ্রিকার বিরাট বন্য প্রকৃতির প্রতীক। ও কাউকে ভয় করে না। যেখানে-সেখানে সগর্বে বিচরণ করে। নিজের তৈরি আইন ছাড়া কারো আইন মানে না। হত্যাই ওর জীবনের মূলমন্ত্র—আফ্রিকার বিশাল বন্য প্রান্তরে বনচারী জীবের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত না হয়ে পড়ে—এই তদারক করে বেড়াবার এবং বেড়ে গেলে তার প্রতিকার করবার দায়িত্ব দিয়েই প্রকৃতি যেন ওকে পাঠিয়েছে। সিংহ নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই, তবে প্রয়োজন না বুঝলে সে কখনো পশুহত্যা করে না। হায়েনার মতো নীচ প্রকৃতির হত্যাকারী এবং ভীষণ পেটুক নয় সিংহ। হায়েনার মতো ভীতু কাপুরুষ নয় সিংহ।

আমার পরিচিত এক নরওয়েবাসী ভ্রমণকারীর সিংহের ব্যাপারে একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল অল্পদিন পরেই। ওরা আফ্রিকায় এসেছে এই প্রথম, সঙ্গে একজন পাকা শিকারি নিয়ে। কুলিদের মাথায় তাঁবু ও মোট চাপিয়ে ওরা ঘুরতে ঘুরতে আমাদের অঞ্চলেই হাজির হল। ক্যাম্প সিম্বা থেকে আট মাইল দূরে একটা উপত্যকার মধ্যে আমরা 'ওয়াটার বাক' হরিণ শিকার করতে গিয়েছি—পাহাড়ি পথের মোড় ঘুরেই দেখলাম ওরা একজায়গায় তাঁবু ফেলেছে। কথায় কথায় আলাপ হল। জানা গেল ওরা নাইরোবি শহরে আমাদের কথা শুনেছে এবং আমাদের সঙ্গে অসংখ্য সিংহের প্রতিদিন দেখাশুনো হচ্ছে খবর পেয়েই এই দিকেই এসেছে সুলভ সিংহ শিকারের আশায়। ওদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলে, যে জায়গাটায় আমরা তাঁবু ফেলছি এর কাছাকাছি সিংহ আছে তো?

বুঝলাম লোকগুলি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। টাঙ্গানিয়াকায় সেরেঙ্গেটি প্রান্তরে ঘন ঘাসের বনের মধ্যে তাঁবু ফেলে জিজ্ঞেস করতে এসেছে, সিংহ এখানে আছে কি না। কদিন আগেও ঠিক এই জায়গায় ছটা সিংহকে একত্র দেখেছি। শুধু দেখা নয়, হরিণের মাংস পেটভরে খাইয়ে তাদের তৃপ্তিসাধন করেছিলামও বটে। ঘটনাটা এইরূপ।

সেদিন আমরা একটা হরিণ শিকার করেছিলাম এবং যখন আমাদের কুলি হরিণের ছালটা ছাড়াচ্ছিল, তখন ছটি সিংহ মৃত হরিণের কিছু দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে গর্জন করছিল। ছালটা ছাড়ানো হয়ে গেলে মৃতদেহটা আমরা ওদের জন্যে ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম।

এই স্থানে আরেকদিন আরেক কুলি একটা বড়ো সিংহীর দর্শন পায়—একটা জেব্রা মেরে সে মৃতদেহের দু-দিকে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল আর তাকে চক্রাকারে ঘিরে কতকগুলো শকুনি আর হায়েনা কলরব করছিল। আমি একদিন এক সিংহীর ফটোগ্রাফ নিয়েছিলাম আমাদের তাঁবুর নিকটবর্তী একটা ঝরনার কাছে।

আমার কুলিরা জানত আমি যে-সিংহের ফটো নিই—তাকে হত্যা করি না—সেজন্যে ওরা আমার

কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে ওকে মারবার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিতে হল এবং সিংহীর জীবলীলা সাঙ্গ হতে দশ মিনিটের বেশি সময় নিলে না এবং সে ঘটনাটা ঘটেছিল যে বড়ো কাঁটাগাছের তলায়, সেখানেই নরওয়েবাসী ভ্রমণকারীর নিগ্রো পাচক রান্নার বাসনপত্র সাজাচ্ছিল।

এই জায়গার চারিপাশে উঁচু পাহাড় ও পাষাণময় মালভূমি, জলের ধারাটি সব উঁচু জায়গাটা থেকে নেমে জমা হয় এই সংকীর্ণ উপত্যকার খোঁড়লে—সে জল থাকেও অনেক দিন। সুতরাং বন্যজন্তু জলপানের জন্যে এখানে সন্ধ্যার পর দলে দলে আসে। সিংহ এখানে দেখা যদি না যায় তবে টাঙ্গানিয়াকার আর কোনো জায়গায় দেখা যাবে না।

আমাদের নরওয়েবাসী বন্ধুটির সেরাত্রে ভালো নিদ্রা হল না। তিনি ইতিপূর্বে কখনো আফ্রিকায় আসেননি, আফ্রিকার বন্যপ্রান্তরের বিচিত্র নৈশ শব্দ তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল কি না জানি না। মোটের উপর নিদ্রার আশা পরিত্যাগ করে তিনি অবশেষে তাঁবুর বাইরে মুক্ত প্রান্তরে নক্ষত্রালোকিত আকাশতলে কিছুক্ষণ ইতস্তত পায়চারি করবার মতলবে তাঁবু থেকে বের হলেন।

এ পর্যন্ত ব্যাপারটা মোটামুটি মন্দ ছিল না।

কিন্তু বহুদূরবর্তী স্বদেশ নরওয়ে ত্যাগ করবার পূর্বে নিরীহ ভদ্রলোক একটি কাজ করেছিলেন, যার জন্যে সেরাত্রে তাঁকে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি একটি সাদা এবং কালো ডোরাদার পায়জামা কিনেছিলেন। নৈশভ্রমণের সময় এই পায়জামাটা ছিল পরনে।

হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে তাঁর কানে গেল, কোনদিকে যেন দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ হচ্ছে এবং শব্দটা ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে। মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে অস্পষ্ট নক্ষত্রালোক এক বৃহৎকায় জন্তুকে তিনি তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন কতকটা ভয়ে এবং কতকটা কৌতূহলে। যখন তিনি দেখলেন সেটা একটা বৃহদাকার সিংহ এবং সিংহটি এক্সপ্রেস ট্রেনের বেগে তাঁকে লক্ষ করেই ছুটে আসছে, তখন তাঁর চলৎশক্তি রহিত হবার উপক্রম হয়েছে।

সিংহটা তাঁর খুব কাছে এসে ধূলোর ঘূর্ণির মধ্যে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল এবং তাঁর দিকে বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে অল্পক্ষণ চেয়ে দেখে মুখ ফিরিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকেই প্রস্থান করলে। তার ধরন দেখে মনে হবার কথা যে, সে রীতিমতো বিরক্ত হয়েছে। এই ব্যাপারটি আমরা পরদিন শুনলাম। সিংহের এরকম অদ্ভুত ব্যবহারের একটিমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দেশ করতে পারা যায়, তা হচ্ছে এই যে, আধো-অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে পায়জামা পরিহিত বন্ধুকে জেব্রা বলে ভুল করেছিল এবং কাছে এসে যখন দেখল যে এই অদ্ভুত জীবটি জেব্রা নয়, তখন তার সন্দেহ হল এ হয়তো কোনোরকম ফাঁদ হবে। সুতরাং সে কালবিলম্ব না করে ফিরে চলে গেল। এ হল আমার অনুমান, অন্য কোনো কারণ যে নির্দেশ করা যেতে পারে না এমন কথা আমি বলব না। আফ্রিকায় ভ্রমণের ফলে অনেক সিংহের সংস্পর্শে এসে ওদের প্রচলিত জনপ্রবাদটির সত্যতা আমি খুব ভালো করেই উপলব্ধি করেছি যে, অনিশ্চয়তাই সিংহের একমাত্র নিশ্চয়তা। অমন খামখেয়ালি প্রকৃতির জীব আফ্রিকাতে আর দুটি পাওয়া যাবে না।

মোটের ওপর পরদিন সকালেই ওঁরা জায়গাটা থেকে তাঁবু উঠিয়ে আমাদের তাঁবুর কাছাকাছি একস্থানে এসে আড্ডা করলেন। অত যেখানে সিংহের চলাচল, সকলের পক্ষে সে স্থানটা বাসযোগ্য বলে বিবেচিত নাও হতে পারে।

ক্যাম্প সিম্বাতে যখন ছিলাম, মাসাই জাতির বাড়িঘর, গোরুবাছুর ও তাদের জীবনপ্রণালির ফিল্ম তোলবার প্রস্তাব করি ওদের জাতির সর্দারের কাছে। ওরা বড়ো দেরি করতে আরম্ভ করে—আফ্রিকার সে চিরন্তন বুলি 'বার্ডো কিডোগো'—'হচ্ছে হবে'! দু-মাস লেগেছিল ওদের ফিল্ম তুলতে।

মাসাইদের ব্যাপার যদি বাদ দিই, তবে আমাদের দিন ওখানে বেশ কেটেছিল। তারপর একটা দুর্দৈব উপস্থিত হল, ক্যামেরাটা একদিন বিগড়ে গেল। সেই জঙ্গলে ক্যামেরা সারানোর লোক কোথায় পাই? সন্ধান নিয়ে জানা গেল গিলগিল বলে একটা গ্রামে একজন ইংরেজ মিস্ত্রি থাকে, সে এ কাজ জানে।

মোটর ট্রাক নিয়ে গিলগিল যাবার পথে মোটর ইঞ্জিনের কী এক গোলমাল হল, সেটা সারাবার জন্যে যেতে হল নাইরোবি শহরে। এইসব ব্যাপারে কেটে গেল তিন সপ্তাহ। হিসেব করে দেখলাম এই তিন সপ্তাহে আমি বিষুবরেখা পারাপার হয়েছি ছ-বার এবং সবসুদ্ধ হাজার মাইল মোটর চালিয়েছি।

আফ্রিকার বন্য প্রকৃতি এ থেকে ভালোই বোঝা যাবে।

এই হাজার মাইল মোটর চালানো ও ছুটোছুটির সময় আমার একটা কথা মনে পড়ল। মাসাই ও পদি জাতীয় লোকেরা কী করে সিংহ শিকার করে, তার একটা ছবি তোলা—জন পনেরো মাসাই বর্শাধারী যোদ্ধাকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে ক্যাম্প সিম্বায় রওনা করতে হবে মোটর ট্রাকে, তারপর সেখানে ওরা ওদের

সিংহ শিকারের অভিনয় করবে—আমরা তাদের ছবি নেব। তদনুসারে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোক জোগাড় করলাম, তারা রাজি হল, মোটর ট্রাক যোগে তাদের সকলকে সুশৃঙ্খলায় ক্যাম্প সিম্বাতে পাঠিয়ে দেওয়াও গেল।

কিন্তু তারপর বাধল গোল।

ওরা তাঁবুতে এল বটে, কিন্তু কিছুতেই শিকারের অভিনয় করতে রাজি হয় না। তারা অভিনয় করতে রাজি নয়, সত্যকার সিংহ শিকার করবে। আমরা বললাম, ভালোই তো, তাই করো। সিংহের অভাব কী?

দু-তিন দিন পরে সিংহ শিকারের সুযোগ উপস্থিত হল ওদের। মাসাই জাতির শিকারিরা সিংহ শিকারের সময় যেরকম সাহস ও কৌশল প্রদর্শন করে, তাতে তাদের বদমেজাজকে সহজেই ক্ষমা করা যায়। এদের সিংহ শিকার একটা দেখবার জিনিস। আমরা এর নিখুঁত ছবি তুলেছিলাম এবং সভ্য জগতের প্রায় সকলেই আমাদের ছবিতে এই বিখ্যাত সিংহ শিকার দেখেছেন।

ক্যাম্প সিম্বা পরিত্যাগ করবার পূর্বে আমার মনে হল যাদের সাহায্যে আমার ছবি তোলার কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তাদের প্রতি কিছু সম্মান দেখানো দরকার। আমরা আশপাশের তাঁবুর সকলকে এক বিদায় ভোজে নিমন্ত্রণ করলাম। সবসুদ্ধ লোক হল সতেরোজন—মুক্ত আকাশের তলায় আমাদের লম্বা ডিনার টেবিল পাতা হল।

এই সতেরোজন লোকই অবশ্য ইয়োরোপীয়—এরা আফ্রিকা ভ্রমণে অভিজ্ঞ, নানা বিষয়ে এরা আমাদের সাহায্য করেছে। সন্ধ্যার পর আমাদের ভোজ আরম্ভ হল, আমাদের ঘিরে সেই বিস্তৃত বন্য প্রান্তরে হায়েনা ও শৃগালকুলের নৈশ চিৎকার যেন ইয়োরোপে আমেরিকার বড়ো হোটেলের ভোজের সময় ঐকতান বাদনের কাজ করছিল। সে অদ্ভুত রাত্রি এবং সেই বিদায় ভোজের বিচিত্র পটভূমি আমার বহুদিন মনে থাকবে। শুধু হায়েনা ও শৃগাল নয়, সিংহের গর্জনও শ্রুত হয়েছিল আমাদের ভোজের সময়।

এর কয়েকদিন পরে আমরা ক্যাম্প থেকে তাঁবু ওঠালাম। এখান থেকে চলে যাবার সময় আমরা চারিপাশে শুকনো ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিলাম। এখানকার সব ছিল ভালো কিন্তু এত উইয়ের উপদ্রব আর কোথাও দেখিনি। আমাদের সব জিনিসে তাদের ভাগ বসানো চাইই। তাঁবুর ওপরের কাঠ খেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলেছিল উইয়ের দল—টেবিল পেতে খাবার সময় খাদ্যবস্তুর সঙ্গে কাঠের গুঁড়ো খেতে হত রোজ। আগুন দিয়ে এই উইয়ের বংশ ধ্বংস করে যাবই।

সেরেঙ্গেটি প্রান্তরে নানারকম বন্যজন্তু আছে। এরা অনেক সময় এক-এক দলে অনেকগুলো করে থাকে। ইল্যাড, রিড্‌বাক্, হার্টিরিস্ট প্রভৃতি বড়ো বড়ো জানোয়ারের দল মানুষ দেখলে যে-খুব ভয় পায় তা নয়, তাদের কাছেও যাওয়া যায়—কিন্তু যেই ক্যামেরার ছবি তোলার জন্য তেপায়া ইত্যাদি খাটানো হচ্ছে—অমনি তারা ছুটে পালাবে। কিন্তু ছুটে বেশি দূরে যাবে না। ফটো নেবার পাল্লার বাইরে কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সকৌতূহলে আমার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করবে। আবার যদি আমরা এগিয়ে যাই, ওরাও আবার কিছুদূর সরে গিয়ে দাঁড়াবে।

অবশেষে আমরা এ সমস্যার মীমাংসা করেছিলাম। ওদের দিকে কখনো দ্রুত অগ্রসর হতে নেই বা চারিপাশের প্রান্তরের রংয়ের সঙ্গে মিশ খায় এমন কোনো আবরণের আড়ালে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। ঘাসের তৈরি বেড়া সামনে রেখে একজন বা দুজন ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়, তাড়াতাড়ি

করতে নেই। এভাবে আমরা বড়ো বড়ো দলের ছবি তুলতে পেরেছিলাম তারপর, জিনিসটা যখন বুঝতে পারলাম।

তবে যদি ওদের ক্লোজ আপ ফটো নিতে হয়, তবে কোনো জলের ধারে লতাপাতার আড়াল তৈরি করে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করাই বিধি। এ ব্যাপারেও আমাদের বিফল হতে হয়েছে অনেকবার, কিন্তু দিনের পর দিন কোনো জলের ধারে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করবার পরে অবশেষে দেখা গেল ইল্যাড বা হার্টিরিস্টের দল এ জলাটা ছেড়ে দিয়ে আজকাল অন্য কোনো জায়গায় জল খেতে যাচ্ছে।

জেব্রা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, জেব্রার গাত্রচর্মের বর্ণসংস্থান প্রকৃতির কী খেয়ালে হয়েছিল সে বিষয়ে যাঁরা বাড়ি বসে প্রাণীবিদ্যা আলোচনা করেন তাঁদের মতের সঙ্গে আফ্রিকা ভ্রমণকারী বা শিকারিদের মত মেলে না।

পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ বলেন, ও ধরনের সাদা-কালো ডোরাকাটা গাত্রচর্ম মরুপ্রান্তরের মধ্যে দৃষ্টিবিভ্রম জাগিয়ে নিরীহ জেব্রাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। যাঁরা একথা বলে থাকেন, তাঁরা কখনো জেব্রা দেখেননি কিংবা জেব্রাকে দেখলেও দেখেছেন সার্কাসে। তারা জানেন না যে, জেব্রার এই গায়ের রংটি তাকে সমতল প্রান্তরে বহু দূর থেকে শত্রুর কাছে ধরিয়ে দেয়, যদি সে আলোর বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে না থাকে এবং শত্রুর দিকে মাথা দিয়ে লম্বালম্বিভাবে দাঁড়িয়ে না থাকে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে শুধু জেব্রা কেন, যেকোনো জন্তু আফ্রিকার মরুপ্রান্তরের রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা ভেবে দেখতে হবে। আফ্রিকার বনপ্রান্তরে জেব্রার স্বাভাবিক শত্রু মানুষ নয়—সিংহ। সিংহ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে শিকার খুঁজে বার করে, দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তত নয়। সেরেঙ্গেটি প্রান্তরে কঙ্গোনি বলে এক প্রকারের হরিণ বা ষাঁড়ের মতো জানোয়ার আছে, ফোটোগ্রাফারের জীবন তারা অতিষ্ঠ করে তোলে। এরা অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত জানোয়ার, যখন কোনো বড়ো জানোয়ারের ছবি তোলার চেষ্টা করেছি, সব তোড়জোড় করে এবার কল ঘোরাতে যাব, অমনি কঙ্গোনি দলের সর্দারটি এক ভীষণ হুংকার ছাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে যত জানোয়ার যেখানে ছিল, সব নক্ষত্রবেগে এদিক-ওদিক ছুটতে আরম্ভ করলে। দিনটাই মাটি হয়ে যেত একেবারে। সেরেঙ্গেটি প্রান্তর ছাড়তে হল, কারণ আমায় যেতে হবে সাদা গন্ডারের ছবি নিতে বেলজিয়ান কঙ্গোতে। সাদা গন্ডার আফ্রিকা থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে, এখনও সামান্য যা অবশিষ্ট আছে, এইবেলা ওদের ছবি তুলে না রাখলে এরপর আফ্রিকার শ্বেত গন্ডার রূপকথার জীব হয়ে দাঁড়াবে।

ক্যাম্প সিম্বা ছেড়ে আমরা গেলাম ইতুরীয় অরণ্যপ্রদেশে বন্য বামনজাতির ফটো নিতে। ইতুরীয় গভীর অরণ্যে এই অদ্ভুত দর্শন বামনেরা বাস করে এবং সাধারণত এরা অত্যন্ত ভীরু ও লাজুক প্রকৃতির। বিদেশি লোক দেখলেই গহন বনে পালায়। তির-ধনুক এদের প্রধান অস্ত্র। ধনুকের ব্যবহারে এরা এমন দক্ষ যে, বড়ো বড়ো বন্য হস্তী অবলীলাক্রমে এদের নিক্ষিপ্ত তিরের মুখে প্রাণ দেয়।

ফরাসি অধিকৃত কঙ্গোতে উরাঙ্গি জাতির স্ত্রীলোক তাদের অধর ও ওষ্ঠ চিরে তার মধ্যে আট-ন ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ধাতুর গোল চাকতি পরিয়ে রাখে। এতে ওদের কুশ্রী দেখায়। পূর্বে যখন আরব দস্যুরা ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্যে উরাঙ্গি জাতির গ্রামসমূহে লুঠ করত, তখন গ্রামের স্ত্রীলোকদের এই বর্বর দস্যুদলের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যেই নাকি এই প্রথা উরাঙ্গি জাতির মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল।

আমার ইচ্ছা ছিল বেলজিয়ান ও ফরাসি কঙ্গোর মধ্যে দিয়ে ক্রমশ মধ্য-আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হব।

পথে নাইজিরিয়া প্রদেশ ও ক্যামেরুন পর্বতমালা পার হয়ে যাব। এই পথে যাবার সময় দীর্ঘসূত্রী আফ্রিকা তার 'যাচ্ছি যাব' মন্ত্র নিয়ে আমার পিছু লাগল বড়ো বেশি করে। প্রত্যেক কাজে পদে পদে বাধা পাওয়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সামিল হয়ে দাঁড়াল। লাগোস পৌঁছুবার পূর্বে ভ্রমণকারীর অদৃষ্টে যত প্রকার দুর্দৈব ঘটা সম্ভব, তার সবগুলিই আমাদের ঘটে গেল।

নেমে গেল ভীষণ বর্ষা, দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বৃষ্টির বিরাম নেই। রাস্তাঘাট কাদায় দুর্গম হয়ে উঠল, মোটর ট্রাক কাদায় ডুবে যায় তো আর উঠতে চায় না। কুলিরা দিন দিন অলস হয়ে উঠল, বোঝা বইতে কাজ করতে অত্যন্ত দেরি করতে থাকে। পথের মাঝখানে বড়ো বড়ো নদী পড়তে লাগল, পার হবার সেতু নেই সে নদীর ওপর। এর ওপর দলের লোকের মধ্যে দেখা দিল রোগ, ম্যালেরিয়া জ্বর, পেটের পীড়া। আমাদের সকলের মন ও শরীর ভেঙে গেল, উৎসাহ কমে গেল।

এখনও সেসব দিনের কথা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।

আফ্রিকার ভ্রমণপর্ব যখন আমাদের প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সেসময় আমি শহর থেকে সত্তর মাইল দূরে—আমাদের মোটর ট্রাক এক জলার মধ্যে কাদায় আটকে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত চেষ্টা করা হল, আমাদের কুলিরা একটুও নাড়াতে পারলে না গাড়িখানা। সারারাত্রি ধরে এই ব্যাপার চলল। অবশেষে সকাল হল। আমি আমাদের দলের কুলি সর্দারকে নিকটবর্তী গ্রামে পাঠিয়ে দিলাম লোক সংগ্রহ করে আনবার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরে আমার কানে প্রবেশ করল রণবাদ্যের আওয়াজ এবং বাজনার তালে তালে সম্মিলিত বহু কণ্ঠের যুদ্ধ-সংগীত। ক্রমে বাজনা ও গানের শব্দ নিকটবর্তী হল। ঘোড়ার পায়ের খুরের ধ্বনিও শুনতে পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোলের শব্দ। বনজঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একজন অশ্বারোহী আমাদের দিকে আসছে।

ব্যাপার কী, ক্রমে বোঝা গেল।

নিকটবর্তী গ্রামের আমির আমাদের বিপদের কথা শুনে তাঁর সৈন্য নিয়ে সাহায্য করতে আসছেন। এই সৈন্যদলের পুরোভাগে স্বয়ং আমির। তাঁর সুদর্শন কৃষ্ণকায় অশ্বটি সোনালি ও রূপালি সাজে সজ্জিত, আমিরের পরিধানে বহুমূল্য লাল ও নীল রেশমের রাজপরিচ্ছদ, সর্বাঙ্গে মণিমুক্তা ঝলমল করছে।

আমিরকে কোনো প্রাচীনকালের রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমির যে স্বপ্নরাজ্যেই বাস করেন না, পরক্ষণে বুঝলাম। তাঁর আদেশে অশ্বারোহী সৈন্যদল দাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে সবাই গিয়ে কাদার মধ্যে আটকানো মোটর ট্রাকে কাঁধ দিয়ে ঠেলতে লাগল, ওদিকে ওদের রণবাদ্য সমান তালেই বাজছে তখনও।

সৈন্যদলের সমবেত চেষ্টার ফলে চক্ষের নিমেষে আমাদের মোটর ট্রাক শুকনো ডাঙায় উঠল জলাভূমি ছেড়ে। তারপর আমির আমার নিকটে এসে ঘোড়া থামালেন এবং ঘোড়ার ওপর বসেই গম্ভীরভাবে করমর্দন করলেন। পরক্ষণে তাঁর মুখ থেকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ নির্গত হল, সৈন্যদল যেমন এসেছিল আবার ঠিক সেভাবেই গ্রামের অভিমুখে চলল।

এই অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্র রাজাকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরকাল মনে রাখব, আফ্রিকার আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতাকে ইনি জয় করেছেন অতি অদ্ভুতভাবে।

আরিজোনা মরুভূমির পর্বতগাত্রে প্রাচীন ছবি

পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন যে অতীতকালের অতিকায় সরীসৃপ বংশ লুপ্ত হইয়া যাওয়ার অনেক পরে পৃথিবীতে মনুষ্যের আবির্ভাব হয়। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের আরিজোনা স্টেটের অন্তর্গত মরুভূমিতে, পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা অনেকগুলি পশুপক্ষীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার সবগুলিই অধুনালুপ্ত সরীসৃপ ও অন্যান্য প্রাণীর। ছবিগুলি যেভাবে আঁকা তাহাতে মনে হয় এ এমন এক সময়ের দৈনন্দিন ইতিহাসের কাহিনি, যেসময়ে অতিকায় হস্তী, ডাইনোসর ও অন্যান্য অধুনালুপ্ত প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সদাসর্বদা বিবিধ প্রয়োজনে দেখাসাক্ষাৎ হইত। শিকার বা আত্মরক্ষার কার্যে মানুষকে তাহাদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে, এডওয়ার্ড ডোহানি নামক একজন তরুণ যুবক আরিজোনা প্রদেশে তৈলের খনির সন্ধান করিতে করিতে একস্থানে পর্বতগাত্রে প্রাচীন যুগের আঁকা কতকগুলি রঙিন ছবি ও খোদাই করা মূর্তি দেখিতে পান। ছবিগুলি সেসময় তাঁহাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে ও তিনি বিশেষজ্ঞ না হইলেও বুঝিতে পারেন যে, এগুলি বহু প্রাচীন কালের আদিম অধিবাসীগণ কর্তৃক অঙ্কিত। মি. ডোহানি বর্তমানকালে আমেরিকায় একজন ধনকুবের, গত ১৯২৪ সালের শেষে তিনি নিজের অর্থে একদল বিশেষজ্ঞকে আরিজোনা প্রদেশের নির্জন পর্বতগাত্রে অঙ্কিত এই ছবিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রেরণ করেন। এক বৎসর ধরিয়া এই বিশেষজ্ঞ দলটি সেখানে অবস্থান করেন ও বহু কৌতূহলপ্রদ তথ্যের আবিষ্কার করেন—তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক সিদ্ধান্ত এই যে, ডাইনোসর ও অন্যান্য সরীসৃপ বংশ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাওয়ার পূর্বেই মানুষ পৃথিবীতে আসে।

আরিজোনার যে-অঞ্চলে এইসকল ছবি আছে, তাহা অতি দুর্গম মরুভূমির অন্তর্গত, এখনও তাহার সকল অংশ আবিষ্কৃত হয় নাই, খুব কম লোকই সেসব স্থানে যায়। Dohney Expedition-এর দলপতি ছিলেন মি. হুবার্ড, ইনি ওকল্যান্ড মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ। ইঁহারা শুধু একস্থানে নয়, এই দুর্গম মরুপ্রদেশের নানা স্থানে এক বৎসর ধরিয়া বেড়াইয়া বহুস্থানের পর্বতগাত্রে এরূপ অনেক ছবি ও খোদাইকাজ আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর আর কোথাও এইসব অতিকায় সরীসৃপদিগের ছবি নাই, কী ইয়োরোপ, কী এশিয়া। একই সময়ে যে মানুষ ও ডাইনোসর পৃথিবীতে ছিল আমেরিকার মরুদেশের এই বিস্ময়কর ছবিগুলি হইতে তাহা অনুমিত হয়। শুধু ছবি নয়, কলোরেডো নদীর পর্বতময় তীরভূমিতে একস্থানে ইঁহারা ডাইনোসর ও অতিকায় হস্তীর প্রস্তরীভূত পদচিহ্নও আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই ছবি কে বা কাহারা আঁকিয়াছে বা সে লুপ্ত জাতির ইতিহাস কী, Dohney Expedition সে সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। ওই স্থানে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে যেসকল আদিম অধিবাসী বর্তমানে বাস করে, তাহারা Hava-supai রেড ইন্ডিয়ানদের শাখা। ইহারা নিতান্ত অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিজেদের অতীত ইতিহাসের কথা কিছুই জানে না, কোনোপ্রকার প্রাচীন গাথা ও কাহিনিও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। বস্তুত ইহাদের বুদ্ধি এত কম যে মনে হয়, পর্বতগাত্রের এসকল অদ্ভুত ছবি এই জাতির অঙ্কিত নহে।

বড়ো জোর হাজার বৎসর হইল ইহারা এ প্রদেশে বাস করিতেছে। কিন্তু যে জাতি কর্তৃক ছবিগুলি অঙ্কিত হইয়াছে তাহারা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে এখানে বাস করিত।

অনুমান করা যায় যে, প্রাচীনকালের এই জাতি যখন এখানে বাস করিত তখন এ অঞ্চলে জল এত দুষ্প্রাপ্য ছিল না। পাষাণময় নদীখাতগুলি দেখিলে মনে হয় এক সময়ে এখানে বড়ো বড়ো নদী ছিল, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত কারণে সেগুলি অন্তর্হিত হইয়া যায়, খুব সম্ভবত নদী শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চল হইতে মানুষের বাস উঠিয়া যায়।

এই অঞ্চলের পাহাড়গুলি লাল বেলে পাথরের। পাথরের সঙ্গে বহুল পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত আছে। বৃষ্টির জল চুঁয়াইয়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া পড়ার দরুণ এই লৌহের গুঁড়া জলের সহিত মিশিয়া তরল অবস্থায় পাহাড়ের গা বাহিয়া পড়িয়া থাকে এবং বহুকাল ধরিয়া এরূপ পড়ায় পাথরের উপর কালক্রমে লৌহরসের একটা কঠিন সর পড়িয়া গিয়াছে। এই লৌহরসের সর থাকার জন্যই প্রাচীনকালের শিল্পীদিগের এই প্রকারের ছবি আঁকা সম্ভব হইয়াছে।

একখণ্ড পাথর বা ধারালো চকমকির টুকরা লইয়া এই লৌহরসের সরের উপর আঁচড় কাটিলে পাহাড়ের আসল লাল রংটা বাহির হইয়া পড়ে—চারিপাশের লৌহরসের রং থাকে কালো আর আঁচড়টার রং লাল। তুলি ও রং দ্বারা ছবি আঁকার অপেক্ষা এ উপায়ে অনেক সুবিধা, কারণ ইহাতে প্রথমত ছবি হয় লাল বেলে পাথরের স্বাভাবিক রঙের, চারিপাশে থাকে লৌহসরের কালো রং—তাহা ছাড়া ঝড়-বৃষ্টি, শিশির, তুষারপাত প্রভৃতি কোনো প্রাকৃতিক উপদ্রবেই এ ছবি মুছিয়া যায় না। ছবি নষ্ট হইতে পারে একমাত্র একটি কারণে, যদি পাথরগুলা গুঁড়া হইতে ঝরিয়া পড়ে তাহা হইলে। কিন্তু সেরূপভাবে পাথর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেও লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়া যায়। এই স্থানটির নির্জন পাহাড়ের ফাটলে বহু সর্পের বাস। মানুষ বড়ো এদিকে একটা আসে না বলিয়া এই সর্পকুল সম্পূর্ণ শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে এখানে বংশবৃদ্ধির সুযোগ পাইয়াছে। Dohney Expedition-এর লোকজনকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইয়াছিল: এত সাবধানতা সত্ত্বেও একটি কুলিবালক সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপরপক্ষে আবার এই র‍্যাটল সর্পগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে ও মারিয়া ফেলিতে গিয়াও পাহাড়ের নানা নিভৃত অংশের বহু ছবি বাহির হইয়া পড়ে।

এই পর্বত হইতে কিছুদূরে মরুভূমির মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ ডাইনোসরের প্রস্তরীভূত পদচিহ্ন দেখিতে পান। ইঁহারা অনুমান করেন, মরুভূমির বালুরাশি সরাইয়া ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলে এই জাতীয় সরীসৃপের ডিম পাওয়াও খুব আশ্চর্যের বিষয় নহে। ছবি দেখিলে বোঝা যাইবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সকল শিল্পীর সহিত ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপের কীরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ছবিতে সেই বিরাটকায় জানোয়ার পিছনের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ইহা আঁকা হইয়াছে। ডাইনোসর যে এরূপ ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়ায়, শিল্পী নিশ্চয়ই ইহা দেখিয়াছিলেন, নতুবা তাহাকে এরূপভাবে আঁকিবার অন্য কী কারণ থাকিতে পারে?

ছবিটির উচ্চতা ১১.২ ইঞ্চি; বিস্তৃতি ৭ ইঞ্চি; পায়ের দৈর্ঘ্য ৩.৪ ইঞ্চি; লেজের দৈর্ঘ্য ৯.১ ইঞ্চি। এক খণ্ড পাথর বা চকমকির সাহায্যে এরূপ একটা ছবিকে কঠিন লৌহের সর কাটিয়া তৈয়ারি করিতে শিল্পীর বহুদিন সময় লাগিয়াছিল এবিষয়ে কোনো ভুল নাই।

নানা প্রশ্ন এখানে স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়। মানুষ কত প্রাচীন? সরীসৃপ যুগ বর্তমান সময় হইতে এককোটি বৎসরের পূর্বের কথা; তখন মানুষ পৃথিবীতে ছিল? না মানুষের আবির্ভাবের পরও অতিকায় সরীসৃপের দু-একটি উপজাতি এখানে-ওখানে নির্জন মরুভূমির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বাস করিত?

কে এসকল প্রশ্নের উত্তর দিবে? Dohney Expedition অন্তত এসকল প্রশ্নের কোনো সমাধান করেন নাই।

মেচিওবা নামক স্থানে পর্বতের উপর কতকগুলি প্রাচীনকালের মঠ আছে, পৃথিবীর মধ্যে সেগুলি সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। এগুলিতে উঠিবার কোনো রাস্তা বা সিঁড়ি নাই। দড়ি বা জীর্ণ মই ঝোলানো আছে, তাহাই ধরিয়া উঠিতে হয়।

নীল নদীবক্ষে ইজিপ্ট হইতে সুদান

জনৈক আমেরিকান ও তাঁর স্ত্রী কায়রো হইতে কেপটাউন ভ্রমণ করিয়া আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৩৫ দিনে ইঁহারা ভ্রমণ সম্পূর্ণ করেন, এবং এই দীর্ঘ পথের অধিকাংশই তাঁহাদিগকে পদব্রজে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, কারণ মধ্য আফ্রিকায় কোনো যানবাহনের বিশেষ সুবিধা নাই।

স্বামী স্ত্রী পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন। আন্ডিজ পর্বতমালা হইতে মলোলিয়ার সমতলভূমি, সাউথ সি হইতে ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান কিছুই বাদ রাখেন নাই। ভারতবর্ষে প্লেগ আরম্ভ হইবার খবর শুনিয়া তাঁহারা বম্বে বন্দরে পি এন্ড কোম্পানির জাহাজে চড়িয়া ইয়োরোপের দিকে রওনা হন। সেসময়ে টুটেনখামেনের সমাধি প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সমস্ত সংবাদপত্র লর্ড কারনারভন ও টুটেনখামেন সংক্রান্ত নানা চমকপ্রদ সংবাদে পরিপূর্ণ।

তাঁহারা প্যারিসে ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহাদের খেয়াল হইল কায়রো হইতে শুরু করিয়া সোজা আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া তবে প্যারিসে ফিরিবেন। প্যারিসের প্রশস্ত বুলভারগুলির অপেক্ষা আফ্রিকার জনবিরল মরু ও অরণ্যের ডাক প্রবল হইয়া উঠিল।

জাহাজে কথাটা তুলিতেই বন্ধুবান্ধবেরা বারণ করিল। চিরকালই করিয়া থাকে। বন্ধুবান্ধবে কখনো ভালো কাজ করিতে দেয় না।

আফ্রিকার মধ্যে এ সময় যায়? কী সর্বনেশে কথা! কায়রো থেকে কেপ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে! তা ছাড়া তখন এই গ্রীষ্মকালে। সামনে বর্ষা আসছে। মরুভূমিতে ঝড় বইবে, সুদান ও ইউগান্ডাতে বন্যা নামবার সময় এখন, জিজি মাছির উপদ্রবে মধ্য আফ্রিকার অনেক স্থান জনশূন্য হয়ে পড়বে, যাবে কী করে সেসব জায়গা দিয়ে এখন? বিশেষ করে তোমার স্ত্রী সাথে রয়েছেন। যেয়ো না, মারা পড়বে। এসো বরং এক গ্লাস বরফ লেমনেড খাও।

আমেরিকান ভদ্রলোকটির নাম পোর্টার শে। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পোর্ট সৈয়দে দুজনে নামিয়া পড়িলেন। সেখান হইতে কায়রো ও খার্টুম পর্যন্ত রেলের টিকেট কিনিলেন।

কায়রো আজকাল আর প্রাচ্যদেশীয় শহর নয়। কায়রো শহরে পৃথিবীর সর্বজাতিই মিলিয়াছে। কিন্তু স্থাপত্য, আদবকায়দায়, ভাষায় ও সভ্যতায় ফরাসি প্রভাব বড়ো বেশি। ইজিপ্ট ফরাসি প্রতিভার ও সভ্যতার দীপ্তিতে মুগ্ধ, তাহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে, ভালো লোক মরিলে প্যারিসে যায়।

কায়রো হইতে রাত্রি আটটায় ট্রেন ছাড়িল লুকসরের অভিমুখে। লুকসরে নীল নদী পার হইয়া

মরুভূমির মধ্যে কিছুদূর যাইলে প্রাচীন ফ্যারাওদের সমাধিস্থান, প্রসিদ্ধ 'ভ্যালি অফ্ দি কিংস' অনুচ্চ ও অনাদৃত শৈলমালা পরিবেষ্টিত নির্জন মরুপ্রান্তর।

পথে আরব বালক-বালিকা হাসিমুখে বখশিশ চাহিয়া ফিরিতেছে। ফেলাহিন কৃষক মাঠে লাঙল চষিতেছে। মাঝে মাঝে দু-একজন শ্মশ্রুযুক্ত প্রাচীন লোক গাধার পিঠে চড়িয়া গম্ভীর মুখে নিজের কাজে চলিয়াছে। ইজিপ্টের যে অংশ দিয়া নীল নদী প্রবাহিত, সে অংশ শস্যশ্যামল, যে অংশ নীল নদী হইতে যতদূরে তাহা ততই বৃক্ষ ও বৃক্ষলতাশূন্য, ঠিক মরুভূমি যদিও নয়, মরুভূমির ভূমিকা বটে।

সম্রাট ষষ্ঠ রামেসিসের কবরের নীচে টুটেনখামেনের কবর এতদিন লুকানো ছিল। এতকাল ধরিয়া ইটালিয়ান, ফরাসি, ইংরেজ, মার্কিন সকল জাতি 'ভ্যালি অফ দি কিংস' খুঁড়িয়া তন্নতন্ন করিয়াছিল, কোনো কবর বাদ দেয় নাই, অধিকাংশ রাজার কবর বহু প্রাচীন যুগেই দস্যুতস্করে লুণ্ঠন করিয়াছিল— কিন্তু ফ্যারাও টুটেনখামেনের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই কেহই এতকাল।

মি. শে ও তাঁহার পত্নী এখান হইতে ট্রেনে খাটুমের দিকে রওয়ানা হইলেন। লুকসর ছাড়িয়া কিছুদূর যাইলেই মরুভূমি শুরু হইল। গাড়িতে বেজায় গরম, দরজার হাতল ইত্যাদি তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিল, হাত দিলে মনে হয় ফোস্কা পড়িবে। গাড়ির জানালার বাহিরে শুধু বালি আর রৌদ্র আর উত্তাপ, মরুভূমি

ক্রমশ ভীষণতর হইয়া উঠিল, গাড়ির মধ্যে শুধু বালি আর উত্তাপ, অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু বালি আর উত্তাপ দুইই বাড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যায় তাঁরা একটা ছোট্ট স্টেশনে নামিয়া নীল নদীতে নৌকায় আরোহণ করিলেন। হালফা পর্যন্ত নৌকাপথে যাইয়া পুনরায় রেলপথ, খার্টুম পর্যন্ত। হালফা পর্যন্ত গোটা পথের অন্তত অর্ধেক শুধু মরুভূমি। সে মরুভূমির রং জাফরানের মতো—দুপুরের খররৌদ্রে তাহা দেখাইতেছিল সোনালি রঙের।

অনেকে ভাবেন সাহারা মরুভূমি সাদা ও ধূসর বর্ণের বালিরাশির সমষ্টি। আসলে সাহারার বর্ণবৈচিত্র্য অপূর্ব। আর কোথাও সমতল নয়, বালির পাহাড় চারিদিকেই, জমি সর্বত্র উঁচু-নিচু।

মরুভূমির আরবেরা অত্যন্ত অপরিষ্কারভাবে থাকে। নিকটেই নীল নদী, কিন্তু জীবনে কেহ কোনোদিন নদীতে স্নান করে কি না সন্দেহ, দেশ কীরূপ উত্তপ্ত তাহা ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বিস্ময়কর দাঁড়ায়। অধিকাংশ আরব চক্ষুরোগে ভুগিতেছে, অন্ধের সংখ্যাও খুব বেশি। ইহার কারণ দুইটি, তাহাদের অপরিষ্কার ভাবে বাস করিবার অভ্যাস, আর মরুভূমির প্রখর রৌদ্রদগ্ধ বালুরাশির দিকে সর্বদা চাহিয়া থাকা। চক্ষুর বিশ্রামদায়ক শ্যামলতা এ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

নীল নদীর ধারে গাছপালা নাই, এখানে-ওখানে দু-দশটা তাল গাছ ছাড়া। তাও জলের নিতান্ত কিনারায়। নদী হইতে একশো হাতের পরে শুধু জাফরান রঙের বালিয়াড়ি দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝে মাঝে নদীর ধারে আরব গ্রাম, কতকগুলি মৃৎকুটিরের সমষ্টি।

সুদান বাস করিবার উপযুক্ত দেশ নয়। কোনো না কোনো দুর্বিপাক লাগিয়াই আছে। কোনো বছর ঘোর অনাবৃষ্টি। পরের বছরেই নীল নদীতে প্রবল বন্যা নামিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া গেল। তৃতীয় বৎসরে হয়তো বেজায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কোনো বছরের ম্যালেরিয়াতে দেশ উজাড় হইল, পরের বছর স্লিপিং সিকনেসে মাছির মতো লোক মরিতে লাগিল।

খার্টুম শহর সুদানের রাজধানী। সেখানে দিন দুই কাটাইবার পরে তাঁহারা পুনরায় স্টিমারে করিয়া রেজাফ অভিমুখে চলিলেন। নীল নদীর এই অংশ 'শ্বেত নীল নদী' বলিয়া অভিহিত। জাহাজে অনেকগুলি আরোহী ছিল, তন্মধ্যে দুজন মিশনারি ডাক্তার সুদানের স্লিপিং সিকনেসগ্রস্ত অঞ্চলে রোগ সারাইতে যাইতেছেন। একজন সুইডিশ ব্যবসায়ী, দুজন ভবঘুরে ইংরেজ, একজন সিরীয়দেশীয় খর্জুর ব্যবসায়ী, একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার।

খার্টুম শহর ছাড়াইলেই মরুভূমি প্রায় শেষ হইল।

নদীর ধারে মাঝে মাঝে শ্যামল ক্ষেত্র, গৃহপালিত পশু চরিয়া বেড়াইতেছে। এ অঞ্চলে আরব অপেক্ষা নিগ্রো আরব বর্ণসংকর ও খাঁটি নিগ্রোজাতীয় লোক বেশি।

পাঁচ দিন নদীপথে যাইবার পর বন্যজন্তুর দেশ আরম্ভ হইল। জলে হিপোর দল মনের আনন্দে সাঁতার কাটিতেছে, নদীর দু-ধারের প্রান্তরে দলে দলে হরিণ, নদীর ধারের পাঁকে বড়ো বড়ো কুমির নিশ্চিন্তে শুইয়া ঘুমাইতেছে।

জলচর পাখি যে কত রকমের তাহার সংখ্যা নাই।

কিন্তু আফ্রিকার এই অঞ্চলে সভ্যতার আলোক এখনও প্রবেশ করে নাই। সুইডিশ ব্যবসায়ী একটি গল্প আরম্ভ করিল। এক সময়ে তাহার একটি নিগ্রো বালক ভৃত্য ছিল। বালকের গলায় ব্যথা হওয়ায়

সুইডিশ ভদ্রলোকটি তাহাকে ডাক্তারের কাছে লইয়া গেল। ডাক্তারের ঘর হইতে ছেলেটি ছুটিয়া জঙ্গলের দিকে পালাইতেছে। তাহার প্রভু ডাক্তারের ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। সে অবাক হইয়া বলিল, কী হয়েছে রে? পালাস কেন? বালক ছুটিতে ছুটিতে বলিল, আরে বাপ, ডাক্তার আমার সমস্ত গা টিপে টিপে দেখছে নরম কি না!

আফ্রিকার এ অঞ্চলে কীটপতঙ্গের মেলা। মশা দু-তিন রকমের; উই, কালো পিঁপড়ে, লাল পিঁপড়ে, উড়ন্ত পিঁপড়ে, নানা শ্রেণির মাকড়সা, মাছি যে কত বিভিন্ন ধরনের তার লেখাজোখা নাই। রাত্রে নিগ্রো খালাসিরা একটা মশাল জ্বালাইয়া রাখিত, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ুক্কু পিঁপড়ে আসিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া ঝলসাইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। নিগ্রোর দল মহা আনন্দে সেই ঝলসানো পোড়া পিঁপড়ের রাশ খাইতে শুরু করিয়া দিল।

এইবার স্টিমার যে অঞ্চল দিয়া চলিল, সেখানে নদীর দুই তীরে দীর্ঘ তৃণভূমি। মাঝে মাঝে বড়ো জলা—এইসব জলাভূমিতে প্যাপিরাসের বন। প্যাপিরাস নলখাগড়াজাতীয় গাছ, প্রাচীন মিশরে প্যাপিরাস হইতে লিখিবার পুঁথি তৈরি হইত। নীল নদীর এই অংশে পূর্বে এত ঘন প্যাপিরাসের বন ছিল যে, নৌকা যাতায়াত করিতে পারিত না। আসোয়ান বাঁধ নির্মিত হইবার পরে নদীপথ অনেক সুগম হইয়া উঠিয়াছে।

স্টিমারের ত্রিশ গজের মধ্যে তীরের লম্বা ঘাসের বনে বন্য হস্তী দাঁড়াইয়া অলস কৌতূহলের দৃষ্টিতে স্টিমারের দিকে চাহিয়া আছে। হঠাৎ স্টিমারের বাঁশি শুনিয়া ভয় পাইয়া আপনমনে একদিকে চলিতে শুরু করিল, কিন্তু হাতি কি দ্রুত যাইতে পারে? দশ-বারো মিনিটের মধ্যে তাহার বৃহৎ শরীরটা দূর চক্রবালে একটি কৃষ্ণবিন্দুতে পর্যবসিত হইল।

যাঁহারা মনে ভাবেন মশা জিনিসটা তাঁহারা ভালোই দেখিয়াছেন, তাঁহারা নীল নদীর এই জলাভূমি অঞ্চলে যেন একবার বেড়াইতে আসেন, মশা কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবেন। স্টিমারে যে ইংরেজ ভদ্রলোকটি ছিলেন, তিনি এই অঞ্চলের একটা ছোট্ট স্টেশনে নামিয়া গেলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে অসুখবিসুখ কেমন? মশা তো এদিকে খুব বেশিই মনে হল।

তিনি উত্তর দিলেন, আমি সম্প্রতি আছি একটা ছোটো নিগ্রো গ্রামে। সেখানে নেই এমন কোনো রোগ তো দেখি না। ম্যালেরিয়া আছে, প্লেগ আছে, বসন্ত আছে, স্লিপিং সিকনেস আছে। কিন্তু কী করব, ব্যবসায় উপলক্ষে সেখানে থাকি। বাঁচি তো ভালোই, দেশে ধনী হয়ে ফিরতে পারব, না বাঁচি অদৃষ্ট।

আফ্রিকার লোকে শীঘ্রই অদৃষ্টবাদী হইয়া দাঁড়ায়। না হইয়া উপায় নাই।

নীল নদীতে ঝড়ে মাঝে মাঝে স্টিমার ডুবিয়া যায়, সুতরাং ঝড় আসিবার সম্ভাবনা বুঝিলেই স্টিমারের কাপ্তেন ডাঙার ধারে জাহাজ ভিড়াইয়া নোঙর ফেলিত। ঝড় শেষ হইয়া যাইবার পরে আকাশের রং ও চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইত। চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত একটা অসীমতার মধ্যে সরু সাদা রেশমের ফিতার মতো হোয়াইট লাইন সবুজ প্যাপিরাসের বনের ধার দিয়া বহিয়া যাইতেছে। দূরে দূরে বেগুনি রঙের অনাবৃত শৈলমালা, মাথার উপর ইন্দ্রনীল আকাশ, স্টিমারের ডেকে সকলে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত।

এখান হইতে প্রত্যেক আরোহী দৈনিক পাঁচ গ্রেন কুইনাইন সেবন করিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের ডেকে একজন মিশনারি ডাক্তার বেশ মজার গল্প করিতেন। একদিন গল্পের সময় তীরবর্তী ঘাসের বনে

চোদ্দোটি বন্য হস্তী আসিয়া দাঁড়াইতে গল্প শোনা বন্ধ করিয়া সকলে সেদিকে চাহিয়া রহিল। হাতির ঘ্রাণশক্তি প্রবল, অনেক সময় দুই মাইল দূর হইতেও শিকারির অস্তিত্ব পূর্ব হইতে বুঝিতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি এত কম, যে একশো ফুট দূরের লোক স্পষ্ট দেখিতে পায় না।

অসভ্য নিগ্রোদের ডোঙা প্রায়ই দেখা যাইত। স্টিমারের ঢেউ লাগিবার ভয়ে তাহারা ডাঙার কাছে ঘেঁষিয়া থাকিত স্টিমারের বাঁশি শুনিলেই। স্টিমারের ঢেউকে তারা বড়ো ভয় করে।

নিগ্রোদের গ্রাম ছোটো ছোটো পর্ণকুটিরের সমষ্টি। কুটিরের চালা ছাতার মতো গোল। গ্রামগুলি চারিধারে নলখাগড়ার বেড়া। ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী অনেক জায়গায় এখনও কেনাবেচা হয়। কঙ্গোর মধ্যে এমন সব স্থান আছে, যেখানে একটি তরুণী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীর মূল্য দশখানা কোদাল।

রেজাফ হইতে মি. ও মিসেস শে পদব্রজে উত্তরমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর গিয়া তাঁহারা দস্তুরমতো বিস্মিত হইলেন এ অঞ্চলের দৃশ্য দেখিয়া। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন জনমানবহীন বনানী বা মরুভূমি দেখিবেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে দেখিলেন ইংল্যান্ডের পল্লিগ্রাম বা আমেরিকার নিউ জার্সি অঞ্চলের পরিচিত দৃশ্যাবলী।

গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট লোকের বাস। চাষিরা চাষবাস করিতেছে। মিশনারিগণ গ্রাম্য লোকদিগকে মৌমাছি পালন করিতে শিখাইয়াছে, অনেক গ্রামেই মৌমাছির চাষ দেখা গেল। গভর্নমেন্টের ট্যাক্স দিবার একটি সুন্দর নিয়ম এ অঞ্চলে প্রচলিত। যাতায়াতের রাজপথ বৎসরে কয়েকবার মেরামত করার ভার প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীগণের উপর। কোনো গ্রামের লোকে পথের ধারের আগাছা কাটিয়া পরিষ্কার করিতেছে, কোনো দল বা রাস্তায় মাটি দিতেছে। এই উপায়ে তাহারা গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দেয়।

পথিকদের বিশ্রামের সুবিধার জন্য পথের ধারে মাঝে মাঝে গভর্নমেন্টের তৈরি বাংলো আছে। এইসব বাংলো নির্মিত হইয়াছে জলাশয়ের সান্নিধ্যে। আফ্রিকার এ অঞ্চলে জল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, পাওয়া গেলেও সব স্থানের জল সভ্য মানুষের ব্যবহার করিবার উপযুক্ত নয়। বাংলোগুলি সাধারণত মাটির দেওয়াল ঘেরা খড়ের ছাউনি। মেঝেও মাটির। বন্যজন্তুর উপদ্রব নিবারণের জন্য বাংলোর চারিধারে শক্ত করিয়া কাঠের খুঁটির বেড়া। আফ্রিকায় এই রকমের বেড়াকে 'বোমা' বলে।

মাঝে মাঝে ছোটো-বড়ো পাহাড়। বড়ো বড়ো গাছ চারিধারেই। আফ্রিকার সূর্য এখানে তত উত্তপ্ত নয়, কেবলমাত্র দুপুরবেলাটা ছাড়া। সন্ধ্যার পর হইতে বিষম শীত পড়ে।

একজায়গায় বনের মধ্যে অসংখ্য বেবুন দেখা গেল। বেবুন মানুষকে বড়ো একটা ভয় করে না। অনেকসময় দাঁতমুখ খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া আসে। ধাড়ি বেবুনগুলি হিংস্র প্রকৃতির, বন্দুক হাতে না থাকিলে বেবুনের সান্নিধ্যে একটু সাবধান হইয়া চলাফেরা করা বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষ দেখিলে ধাড়ি বেবুন কুকুরের ডাকের মতো একপ্রকার ঘেউঘেউ চিৎকার করে। এক-এক দলে শত শত বেবুন থাকে।

সুদানের মধ্য দিয়ে পদব্রজে ভ্রমণ করার মতো কষ্ট দুনিয়ায় আর কিছু কি না সন্দেহ। একে তো মশার উৎপাতে বাংলোগুলিতে রাত্রে তিষ্ঠোবার উপায় নাই, তাহার উপর দারুণ জলকষ্ট আছে, ম্যালেরিয়া আছে, খাদ্যাভাব আছে—সকলের উপর আছে বন্যজন্তু, বিশেষত সিংহের উপদ্রব।

এক বিষয়ে মি. শে ও তাঁহার পত্নী একেবারেই নিরাশ হইয়াছিলেন। আফ্রিকায় বনে বন্যপুষ্পের

একান্ত অভাব। অন্তত বৎসরের যেসময়ে তাঁহারা ওই অঞ্চল দিয়া গিয়াছিলেন তখন কিছু দেখেন নাই। হয়তো সেটা বন্যপুষ্প ফুটিবার সময় নয়।

কেনিয়াতে কমলালেবুর বাগানের মালিকেরা নিজেদের চারিপাশে রঙের মেলা বসাইয়াছে বটে, কিন্তু তাদের আনীত বেশির ভাগ ফুলই বিলাতি মরশুমি ফুল। জুঁইলতা ছাড়া অন্য কোনো ট্রপিক্যাল ফুলের আদর তাহাদের মধ্যে নাই।

কাপ্তেন কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলম্বাস

একটি ক্ষুদ্র আনাড়ি গ্রাম্য বালক পথ হেঁটে হুইটবি বন্দরে আসছে।

তার চেহারা দেখে মনে হবার কথা নয় যে, সে জগতে কোনোদিন কিছু করতে পারবে।

আগে যেখানে কাজ করত, সেখান থেকে চাকরি ছেড়ে পালিয়ে আসছে সে। তার ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য, সমুদ্রে নাবিকের কাজ নেওয়া এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করা।

সবাই ভাবছে ছোকরার মাথা খারাপ আছে।

বহুকাল আগের হুইটবি। সরু সরু রাস্তা, দু-ধারে পুরোনো বাড়ি। নোংরা ড্রেন পথের ধারে। মাঝে মাঝে জাহাজি জিনিসপত্রের দোকান—নোঙর, পাল, দড়াদড়ি, কপিকল, শেকল।

জলের ধারে ছোটো-বড়ো পালের জাহাজ, তিমি মাছ-ধরা বোট—অমুক জাহাজখানা লোহা ও পাথর বোঝাই করে ব্রিটেন যাবে। ওখানা ড্যানজিগ, আরেকখানা ফটকিরি বোঝাই দিয়ে যাচ্ছে সেন্ট পিটার্সবুর্গ।

জেলেরা বন্দরে রোদ পোয়াচ্ছে, মুখে লম্বা পাইপ।

সারাদিন এরা গল্প করে কাটায়, দেখে মনে হয় এদের বুঝি কোনো কাজ নেই করবার নেই। কিন্তু এদের কাজ আরম্ভ হবে দুপুর রাতের পরে; তারপর থেকে জার্মান সমুদ্রের ঢেউ ও তুষারশীতল বায়ুর সঙ্গে এদের সংগ্রাম হবে শুরু।

গ্রাম্য বালকটির পিঠে একটা বোঁচকা, নিতান্ত গ্রাম্য ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ তার পরনে, যা দেখছে তাতেই অবাক হয়ে সেদিকে হাঁ করে চেয়ে আছে।

দু-একজন জেলে তার রকম-সকম দেখে কৌতুকপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলে, নাম কী ছোকরা?

ছেলেটি বললে, জেম্‌স কুক।

তারপর ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে, সে কোনো জাহাজে নাবিকের কাজ খুঁজছে। আছে তাদের সন্ধানে এমন কোনো চাকুরি খালি?

কেউ কেউ তার বাড়ি, বাপ-মার কথা, বয়েস জিজ্ঞেস করলে। সবাই তাকে বোঝাল, জাহাজের কাজে বড়ো কষ্ট। কুকুর বেড়ালের মতো জীবন নাবিকদের, জাহাজ যখন সমুদ্রের ওপর থাকে, খাটতে খাটতে প্রাণ যায়। খাওয়া অনেক জাহাজে এত খারাপ যে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। এত অল্প বয়সে জাহাজে কাজ কেন খুঁজছে সে?

ছেলেটি বললে, ওর বয়েস আঠারো। তার বাবা মাটি কাটা দিনমজুরি করে। তাদের গ্রামের একটি

দয়ালু মহিলার কাছে ছেলেটি সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। তারপর সে মাঠে মজুরের কাজ করেছে; দিনকতক একটা মুদির দোকানে খাতা লিখত। কিন্তু এসব তার ভালো লাগে না। সে সমুদ্রে নাবিকের কাজ করবে।

সবাই অবিশ্যি হেসে উঠল। জাহাজের চাকুরি জোগাড় করা অত সোজা নয়। বহুদিন জলের ধারে ঘোরাঘুরি করতে হবে, তবে যদি কিছু হয়।

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কেউ জানত না, সে ছেলেটি যে সাধারণ ছেলে নয়, ভবিষ্যতে সে হবে কাপ্তেন জেম্‌স কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলম্বাস।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের সেসময়ে কোনো নির্ভরযোগ্য ম্যাপ ছিল না। ১৭৬৮ সালের একখানা ওই অঞ্চলের ম্যাপের সঙ্গে বর্তমান কালের একখানা ম্যাপের তুলনা করলে এসকল বোঝা যাবে। দু-চারটা দ্বীপের নাম পুরোনো ম্যাপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাদের অবস্থিতি স্থান সম্বন্ধে মানচিত্রকরের কোনো ধারণা ছিল না। কাপ্তেন কুক প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ দ্বীপ আবিষ্কার করেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সেক্সপিয়ারের জীবনের অনেকখানি যেমন অজ্ঞাত, কুকেরও তাই। কিছুদিন হুইটবিতে আসার পর কুক একখানা ছোটো জাহাজে চাকরি পেয়ে সমুদ্রে বার হয়েছিলেন। কিন্তু সে জাহাজের দৌড় ছিল ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের উপকূলের বন্দরগুলো পর্যন্ত। এই জাহাজে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে তিনি তেরো বছর কাটিয়েছিলেন। এই তেরো বছরের বিশেষ কোনো বিবরণ জানা যায় না। তবে উপকূলবর্তী সমুদ্রে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অতি অপকৃষ্ট খাদ্য খেয়ে, সামান্য একটু জায়গার মধ্যে জড়সড় হয়ে শুয়ে থেকে এবং উত্তর সমুদ্রের ভীষণ শীতবাত্যা সহ্য করে তিনি এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রাহ্য করতেন না।

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে শুক্রগ্রহ ও পৃথিবী পরস্পরের খুব নিকটে এসেছিল। তখনকার বৈজ্ঞানিক মহলে এই ব্যাপার নিয়ে খুব একটা সাড়া পড়ে যায়। শুক্রগ্রহ যখন সর্বাপেক্ষা নিকটে আসবে পৃথিবীর, সেই সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানে ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছিল শুক্রগ্রহ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে।

ওই সালের ৩রা জুন ওই ঘটনার দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল। গ্লাসগো ও আরও দু-একটা বড়ো শহরের খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে শহরবাসীদের সন্ধ্যার পরে আগুন জ্বালাতে নিষেধ করা হল। কারণ অতিরিক্ত ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে শুক্রগ্রহ পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা হবে না।

ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটি রাজা তৃতীয় জর্জের সাহায্যে একখানা জাহাজ পাঠালেন প্রশান্ত মহাসমুদ্রের টাহিটি দ্বীপে, সেখান থেকে এই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বেশি সুবিধা হবে বলে। কাপ্তেন কুকের ওপরে এই জাহাজ চালানোর ভার পড়ল।

জাহাজ সেকালের দুজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস ও প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ লিনিয়াসের ছাত্র ডা. সোলানডার।

কুকের জাহাজে ৪১ জন সাধারণ মাল্লা ও ১২ জন জাহাজের কর্মচারী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাবিকেরা পশুত্বের জন্য প্রসিদ্ধ, কুকের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগল যে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন, মূর্খ লোকগুলো এত দীর্ঘদিন সমুদ্রে শান্তভাবে থাকবে কি না।

জাহাজ 'প্লিমথ সাউন্ড' ছাড়ল আগস্ট মাসের শেষে, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ম্যাডিরা দ্বীপে নোঙর করলে। ম্যাডিরাতে লোকে শুনলে জাহাজ দুজন বড় বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁরা প্রকৃতির সব বড়ো বড়ো রহস্য অবগত আছেন। বেজায় লোকের ভিড় হল তাঁদের দেখবার জন্যে। ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের একটি মঠ এখানে ছিল। মঠের কয়েকটি সন্ন্যাসিনী এসে তাঁদের বললেন, একটা উপকার করবেন আমাদের? ভালো জলের ঝরনা কোথায় আছে খুঁজে পাচ্ছিনে। ভালো জলের বড়ো অভাব রয়েছে। বলে দিন না কোথায় খুঁড়লে ভালো জল পাব?

বহু বৎসর পরে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা বুঝেছিলেন যে পানামা খাল কাটানোর পূর্বে ম্যালেরিয়া জ্বর ও পীতজ্বরের দমন আবশ্যক, নয়তো মজুর ও কর্মচারীর দল জ্বরে মরে গেলে খাল কাটবে কে? কুকও তেমনি বুঝেছিলেন শত সমুদ্র পার হয়ে যদি সুন্দর প্রশান্ত মহাসমুদ্রে তাঁকে পৌঁছোতে হয়; তবে প্রথম থেকেই সতর্ক হতে হবে জাহাজে স্কার্ভে রোগ না দেখা দেয়। টাটকা শাকসবজি বা ফলমূল দীর্ঘকাল না খাওয়ার দরুণ এই রোগ হয় বলে কুক যখন যে বন্দরে জাহাজ থামাতেন, সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ ফল ও তরিতরকারি কিনে নিতেন। কিন্তু জাহাজের মাল্লারা এসব খেতে রাজি হল না। তারা লবণাক্ত গোমাংসের বড়ো বড়ো টুকরা খেতে অভ্যস্ত এবং খোসা লাগা ওটমিলের বিস্কুট। কাপ্তেন কুক কড়া

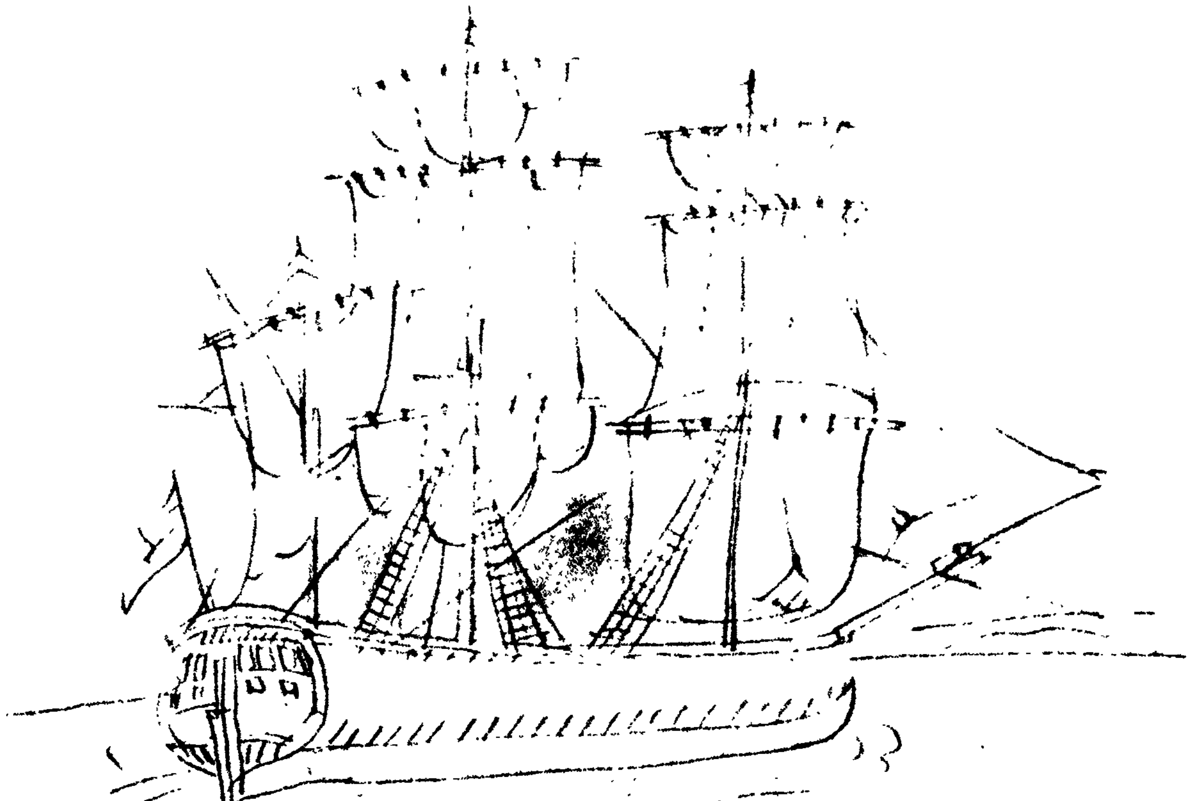

হুকুমজারি করলেন, প্রত্যেক মাল্লাকে সপ্তাহে দশ সের পিঁয়াজ খেতেই হবে। একজন মাল্লা আদেশ মানেনি, তাকে বারোটি বেত মারবার হুকুম হল।

কেপ হর্ন পার হবার পরে আর কোথাও টাটকা শাকসবজি পাওয়া গেল না। কাপ্তেন কুক জাহাজে রাশিকৃত নারিকেল নিয়েছিলেন বাহামা দ্বীপপুঞ্জ থেকে। এবার সমুদ্রের ধার থেকে বোঝা বোঝা সবুজ ঘাস উঠিয়ে জাহাজের খোল ভরতি করলেন। হর্ন পার হবার পরে সবাইকে কাঁচা নারকেল ও সেই ঘাস একত্রে সিদ্ধ করে তাই খেতে বাধ্য করলেন। জাহাজে হইচই পড়ে গেল।

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জাহাজ টাহিটি দ্বীপে পৌঁছে গেল। নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ পর্যবেক্ষণ করে কুক তাদের বিবরণ লিখলেন এবং রয়েল সোসাইটির সম্মানার্থে এদের নামকরণ করলেন 'সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ'।

পলিনেসীয় এইসব দ্বীপবাসীদের সরল আচারব্যবহার ফিল্মের কল্যাণে আমাদের সকলেরই সুপরিচিত।

কুক ও জাহাজের লোকেরা অধিবাসীদের এই প্রথম দেখে তো অবাক। একটা ছোটো দ্বীপের রানিকে ডা. সোলানডার একটা পুতুল উপহার দিলেন, তাতে সেই দ্বীপের বাহান্ন বছর বয়সের লম্বাচওড়া জোয়ান রাজা এই পুতুলটা দেখে এত মুগ্ধ হন যে উক্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে দূত পাঠিয়ে প্রস্তাব করলেন এ দেশের একটি ভালো মেয়ের সঙ্গে সে ডা. সোলানডারের বিবাহ দিতে রাজি, ওইরকম আরেকটা পুতুলের পরিবর্তে।

টাহিটি পরিত্যাগ করবার পূর্বে কুক সে দ্বীপে কমলালেবু, তরমুজ, লেবু ও আরও অনেকরকম ফলমূলের বীজ বপন করেন। বনে কয়েকটি মুরগি ও কুকুর ছেড়ে দিয়েছিলেন। যে যে দ্বীপে তিনি গিয়েছিলেন প্রায় সব স্থানেই সর্বাগ্রে তিনি কিছু ফলের বীজ ছড়িয়ে দিতেন। এ থেকে পরবর্তীকালে অনেক দ্বীপের উদ্ভিজ্জ সংস্থানের প্রকৃতি বদলে যায়। টাহিটি দ্বীপে দুজন মাল্লা জাহাজ ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেল।

কুক তাদের ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না, দ্বীপের সর্দারদের সাহায্যে অনেক অনুসন্ধানের পরে উপকূল থেকে বহুদূরে এক নিভৃত পার্বত্য অঞ্চলে তাদের পাওয়া যায়। তারা এর মধ্যে সেদেশের দুটি মেয়ে বিয়ে করে দিব্যি সংসার পাতিয়ে বসেছে।

তারা বললে, কী হবে জাহাজে চাকরি করে? বেশ আছি।

মেয়ে দুটি দেখা গেল বেশ গৃহকর্মনিপুণা। রুটিফলের গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে সেঁকতে পারে, বেশি কথাবার্তা বলে না, গাছের ছাল থেকে কাপড় তৈরি করতে ও নারকেলের ছোবড়া থেকে মাছ ধরবার সুতো পাকাতে তারা একেবারে ওস্তাদ। সুতরাং মাল্লা দুটি সুখেই আছে, কেবল অভাব অনুভব করে তামাকের জন্য। তামাক জিনিসটা এসব দেশে একেবারে অজ্ঞাত। এমন সুখের ঘরকন্না তাদের, কাপ্তেন কুক তা ভেঙে দিয়ে তাদের ধরে আনলেন জাহাজে। পালাবার শাস্তি বারো ঘা করে বেত। হায় নিষ্ঠুর সংসার!

একদিন একটা লোক ছুটে এসে জানালে দ্বীপের সর্দার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ—বোধ হয় আর বাঁচবে না। ডা. সোলানডার রোগী দেখতে গেলেন। সর্দার টবুরাই খুব অসুস্থ বটে, রোগ যে কী

কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল জাহাজের এক নাবিকের কাছে খানিকটা তামাকের পাতা চেয়ে নিয়ে সর্দার সেটা গিলে খেয়ে ফেলেছিল—তারপরই এই অবস্থা। ডা. ব্যাঙ্ক রোগীকে বেশি করে ডাবের জল খাওয়াতে বলে চলে এলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠল।

সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে কুক পশ্চিমমুখে রওনা হয়ে ১৫০০ মাইল সমুদ্র পার হয়ে নিউজিল্যান্ডে এসে পৌঁছুলেন। কুক নিউজিল্যান্ড যাবার পূর্বে ইয়োরোপের ভূগোলবেত্তাগণের নিকটও সেই অঞ্চলের ভূমি সংস্থান সম্বন্ধে ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না, অনেকে বিশ্বাস করত ইয়োরোপ বা এশিয়ার মতো দক্ষিণ দিকেও একটা মহাদেশ আছে। এইসব ধারণার সত্যতা পরীক্ষা করবার আগ্রহে কুক অনুকূল বাতাস পরিত্যাগ করে দূর অজানা মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি দেন।

প্রথমে তাঁরা নিউজিল্যান্ডের আদিম অধিবাসী খান্ডারিদের নরমাংস প্রিয়তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যেখানে পিকবর্ন শহর, নিউজিল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূলে ওই স্থানে কাপ্তেন কুক জাহাজ নোঙর করেন। কিন্তু কোনো মাওরি জাহাজের কাছে আসতে রাজি হয় না। তারা বলে পাঠালে, শ্বেতকায় মানুষেরা যে নরখাদক নয় তার প্রমাণ কী?

ক্রমে মাওরিদের ভয় দূর হল, জাহাজের নাবিকেরা মাওরিদের গ্রামে গিয়ে দেখলেন তারা অপ্রত্যাশিতরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাদের বড়ো বড়ো নৌকা আছে। দূর সমুদ্রপথে এইসব নৌকায় যাওয়া যায়। মাওরিদের গ্রাম অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং তাদের স্বাস্থ্যবিধি এত ভালো যে স্পেনের রাজার প্রাসাদেও তা দুর্লভ।

কুকের বিবরণ পড়লে জানা যায় মাওরিদের তিনি খুব অশ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। একবার জাহাজের এক নাবিক কী একটা জিনিস চুরি করে এনেছিল মাওরিদের গ্রাম থেকে। কুক অপরাধীর ওপর বারো ঘা বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

শুধু অজ্ঞাত অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কাপ্তেন কুককে কেউ দোষ দিতে পারত না। কারণ প্রকৃতপক্ষে কুকের প্রথম উদ্দেশ্য তাই ছিল বটে।

কিন্তু কুকের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কুক মাওরিদের সামাজিক ভোজের বর্ণনা করেছেন, 'ঘণ্টা পাখি'—বনের মধ্যে ঠিক যেন রুপোর ঘণ্টা বাজছে মনে হয়, পাখিটা যখন ডাকে। একটা পাহাড়ের ছবি এঁকেছেন এবং নিউজিল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলের বালিতে কত ভাগ লোহা, কত ভাগ সিলিকন মিশ্রিত আছে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেছেন। পৃথিবীর সাহিত্যে কুক একজন শ্রেষ্ঠ ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক, নতুন দেশের অত খুঁটিনাটি বর্ণনা খুব কম বইয়ে পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি ৪০০ শত প্রকারের গাছপালা ও নানা রকমের সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহ করেন।

কুকের পূর্বে প্রসিদ্ধ নাবিক আবেল টাসম্যান এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন, কিন্তু জগতের চোখের সামনে তাকে এমনভাবে তিনি ধরেননি।

কুক সাড়ে ছ-মাস ধরে সমস্ত নিউজিল্যান্ডের উপকূলভাগে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে প্রত্যেক স্থানের সমুদ্রজলের গভীরতা, চড়া বা প্রবালবাঁধের অবস্থান ইত্যাদি সহ তাদের চার্ট তৈরি করেন। তবুও তো সেসময় আধুনিক কালের অনেক উন্নততর যন্ত্রপাতির অভাব ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদল ফরাসি ভৌগোলিক এইসব অঞ্চল পরিভ্রমণ করে কাপ্তেন কুকের প্রস্তুত

চার্ট ও ম্যাপের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং তাঁদের দলপতি পরে বলেছিলেন, কাপ্তেন কুকের চার্ট এত নিখুঁত যে আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত হতে হয়েছে, সেকালে এত নিখুঁতভাবে চার্ট তৈরি করা কীরূপে সম্ভব হয়েছিল।

কুক দেশে ফিরবার সময়ে সোসাইটি দ্বীপের একজন অধিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। লোকটার নাম ওমাই। বিলেতে হইহই পড়ে গেল। তার আগে বিলেতের লোকে এমন ধরনের মানুষ দেখেনি। কাউপার তার উদ্দেশে কবিতা লিখলেন, সার জোশুয়া রেনল্ডস তার ছবি আঁকলেন, ডা. জনসন তাকে একদিন নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার সঙ্গে এক টেবিলে আহার করলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের খুব কম অধিবাসীর অদৃষ্টে এমন সম্মান জুটেছে।

বড়ো বড়ো লোকের ড্রইংরুমে, লন্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের বড়ো বড়ো পার্টিতে ওমাই নিমন্ত্রিত হয়ে খেতে লাগল। এমন সম্মান ও সুযোগ পেয়েও ওমাই কিন্তু একটুও বদলাল না। শেখার মধ্যে ওমাই খুব ভালো দাবা খেলতে শিখল। সে সময়ের অনেক ওস্তাদ দাবা-খেলোয়াড়কে ওমাই খেলায় হারিয়ে দিয়েছিল।

পুনরায় সমুদ্রভ্রমণে বহির্গত হয়ে কুক ওমাইকে এবার তার নিজের দেশে পৌঁছে দিলেন। তাকে বেশ ভালো একখানা বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হল, নাবিক বন্ধুরা তাকে সভ্য মানুষের ব্যবহার্য বাসনপত্র দিলে, কুক তাকে একখানা বাগান করে দিলেন এবং নানারকম ফলমূলের বীজ উপহার দিলেন। লোকটা কিন্তু ঘর-গৃহস্থালির কাজে আদৌ মন না দিয়ে বাড়ির সামনে লোক জড়ো করত ও দিনরাত তাদের বিশেষত গ্রামের তরুণীদের প্রশংসাদৃষ্টির সামনে মহা আনন্দে বিলেত থেকে আনা একটা হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইত।

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হাওয়াই দ্বীপবাসীদের হাতে কাপ্তেন কুক নিহত হন।

ফিজি দ্বীপের প্রাচীন রাজবংশ

গত শতাব্দীতে ফিজি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এমন দুজন লোকের আবির্ভাব হয়েছিল যে, সারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে তাদের জুড়ি আর কেউ খুঁজে পাবে না। একজন হচ্ছেন টোঙ্গা দ্বীপের রাজা প্রথম জর্জ টুবু এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্পকালস্থায়ী ফিজি রাজ্যের রাজা থাকওম্বু। হাওয়াই দ্বীপের সোমারি জাতিদের মতো ইঁহারাও বুঝেছিলেন যে, খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে মিলেমিশে না চলতে পারলে ক্ষতি ছাড়া লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। মিশনারিদের বন্ধুত্ব অর্জন করবার জন্যেই এঁরা সুযোগ বুঝে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। মিশনারিরাও বুঝতে পেরেছিল যে ফিজি দ্বীপে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সাফল্য নির্ভর করছে এদের ক্ষমতা বিস্তারের ওপর। তাই এঁদের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরাও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

প্রথমত থাকওম্বু ছিলেন ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মাবাউ দ্বীপের বংশানুক্রমিক মন্ডল। তাঁর স্থানীয় উপাধি ছিল 'ভু-নি-ভালু' অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা। মাবাউ একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ, ফিজি দ্বীপের বর্তমান প্রধান বন্দর ও রাজধানী সুভা থেকে আঠারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। 'ভু-নি-ভালু' উপাধিধারী রাজবংশ

বহুকাল ধরে এখানে রাজত্ব করে আসছিল। এরা ছিল নরমাংসভোজী মাবাউ জাতির সর্দার এবং নিকটবর্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সর্দারের কাছে এরা চিরকাল কর গ্রহণ করে এসেছে। এই মাবাউ দ্বীপে প্রচলিত কথ্যভাষা বর্তমান ফিজি ভাষার মেরুদণ্ড। নরমাংস ভোজনের সুবিধা আজকাল আর না হলেও মাবাউ জাতি তাদের অনেক পুরাতন আচারব্যবহার বজায় রেখেছে। মাবাউ দ্বীপের রাজধানী মাবাউ শহর, শহরের (আধুনিক অর্থে ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র) পশ্চিমপ্রান্তে বড়ো একটা পাহাড়ের ওপর মিশনারিদের বাসস্থান এবং পাহাড়ের তলে, বারা বা সবুজ তৃণভূমিতে, যেখানে পূর্বে উৎসব উপলক্ষে নরমাংস ঝলসানো হত সেখানে ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের গির্জা অবস্থিত। মিশনারিদের কড়া শাসনে এখানে বাৎসরিক উৎসবের সময় অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের যে নাচ হয়, তাতে বাজনার সুর পর্যন্ত খ্রিস্টান স্তোত্রগানের সুরের অনুকরণে বাঁধা, মেয়েদের পোশাক পরতে হয় লম্বা গাউন যাতে গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে।

মাবাউ দ্বীপটি ছোটো, সমস্ত দ্বীপের বর্গফল মাত্র বাইশ একর, তার আবার অর্ধেক জুড়ে আছে পশ্চিম প্রান্তের বড়ো পাহাড়টা। পাহাড়ের ওপারে সমুদ্রের যে সংকীর্ণ উপকূল তাতে ছোটো-বড়ো নারিকেল গাছের বন, তার তলায় অধিবাসীদের খড়ে-ছাওয়া কুটিরশ্রেণি।

রাজা থাকওম্বুর রাজত্বের ইতিহাসটা একটানা সুখসমৃদ্ধির ইতিহাস নয়।

নোট প্রচলন করাতেই যত গোলমাল বাধল।

সভ্য গবর্নমেন্টের নোট প্রচলনের মূলে যে অর্থবল থাকে রাজা থাকওম্বুর তা ছিল না, ফলে নতুন নতুন অর্থসংকট দেখা দিলে। বিদেশি ব্যবসায়ীরা রাজা থাকওম্বুর নোট নিতে চায় না, তাদের দেখাদেখি দ্বীপের আদিম অধিবাসীরাও নোটের উপর অনাস্থা প্রদর্শন করলে। একটা বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল।

১৮৭৪ সালে রাজা থাকওম্বু অর্থসংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে গ্রেট ব্রিটেনের সাহায্য প্রার্থনা করলে এবং উভয়ের মধ্যে একটা রফা হল, যার ফলে থাকওম্বু ব্যক্তিগত সকল প্রকার দাবিদাওয়া ত্যাগ করে মাবু ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জ গ্রেট ব্রিটেনের হাতে তুলে দিলেন।

মাবাউ দ্বীপের রাজবংশের বর্তমান উত্তরাধিকারীর নাম রাটু পোপি সেনিলোলি। ইনিই বর্তমান 'ভু-নি-ভালু' যুদ্ধের দেবতা। বনেদি বংশের মানুষ, এ ছাড়া এর গৌরব করবার কিছু নেই, নিতান্তই গরিব প্রজারা প্রথানুযায়ী যেসব উপঢৌকন নিয়ে আসে তাতেই কায়ক্লেশে চলে। রাটু পোপির চেহারা খুব ভালো। দীর্ঘাকৃতি, মুখশ্রী গর্বব্যঞ্জক, বলিষ্ঠ গঠন। ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া করার দরুণ রাটু পোপি চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন। যাঁরা একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য লাভ করবেন, তাঁরা সকলেই রাটু পোপির বর্তমান দুরবস্থার জন্য দুঃখিত হবেন। তাঁর স্ত্রী আন্ডি টৌরিকা রাজবংশের উপযুক্ত বধূ বটে।

মাবাউ ছোটো দ্বীপ হলেও এখানে দেখবার অনেক জিনিস আছে। প্রাচীন কালের তৈরি পাথর-বাঁধানো পোতাশ্রয় এখানকার একটা প্রধান দর্শনীয় বস্তু। পোতাশ্রয়ের সম্মুখে প্রকাণ্ড বড়ো পাথরের বাঁধ, বাইরের সমুদ্রের ঊর্মিমালা এই পাথরের বাঁধের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে কতকাল ধরে; কিন্তু এখনও আশ্চর্যরূপে অটুট রয়েছে গোটা বাঁধটা। অবশ্য এর একটা ভৌগোলিক কারণ এই যে, ফিজি দ্বীপপুঞ্জের

বৃহত্তম দ্বীপ ভিটি লেভুর সম্মুখে বিখ্যাত প্রবালের বাঁধ বহিঃসমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত থেকে ওই অঞ্চলের সব ছোটো-বড়ো দ্বীপের উপকূলভাগকেই রক্ষা করছে। ইয়োরোপীয়গণের আগমনের পরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের শিল্প ও সভ্যতার অবনতির যুগ আরম্ভ হয়েছে। এখন সকলেই সস্তা ধরনের ইয়োরোপীয় বা আমেরিকান শিল্পকলার অনুকরণ করতেই ব্যস্ত। মাবাউ দ্বীপের পাথরের বাঁধের মতো প্রবাল ও পাথরের চাঁই দিয়ে পোতাশ্রয় নির্মাণ করবার নিপুণতা এরা বর্তমানকালে হারিয়ে ফেলেছে। এই পাথরের বাঁধের ফাঁকে ফাঁকে এ দেশীয় ডোঙা চলাচলের সরু পথ আছে। বড়ো একটা গাছের মোটা গুঁড়িতে খোল করে এইসব ডোঙা তৈরি হত, এখনও হয়। একদিকে হেলে পড়বার সম্ভাবনা প্রতিরোধ করবার জন্যে বিপরীত দিকে বড়ো একখানা কাঠ বাঁধা থাকে ডোঙার পাশে, পাল খাটাবার মাস্তুল, মোড় ঘুরোবার সুবিধার জন্যে হাল, সবই এতে থাকে। ইংরাজিতে এ ধরনের ডোঙাকে বলে outrigger canoe—অনেক সময় দুখানা ডোঙা পাশাপাশি বাঁধা থাকে। বেশি মালপত্র বোঝাই দেবার জন্যে এসকল জোড়া ডোঙা ব্যবহৃত হত।

এই শ্রেণির ডোঙা এখন আর বড়ো একটা তৈরি হয় না, হলেও পূর্বের মতো মজবুত জিনিস আর এখন পাওয়া যায় না। ডোঙা তৈরির শিল্প এখন লোকে ভুলে যাচ্ছে। জোড়া ডোঙার ব্যবহার তো প্রায়ই উঠেই গিয়েছে। খুব বড়ো ডোঙাও গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে প্রায় অর্ন্তহিত হয়েছে।

সমুদ্রের যে খাড়ির বাইরে পাথরের বাঁধ অবস্থিত, তারই উপকূলে অনেকগুলো প্রাচীন দিনের মন্দির এখনও দেখা যায়। মাটি ও পাথরের বড়ো বড়ো বেদির ওপরে এইসব মন্দির তৈরি। সেকালে মন্দিরের দেবতার সম্মুখে নরবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। তারপর সেই নিহত ব্যক্তির দেহ পুড়িয়ে সকলে মিলে মহা আনন্দে ভক্ষণ করত।

একটা মন্দিরের এখন ভগ্নাবস্থা, এরই উচ্চবেদির একপ্রান্তে রাটু পোপি তাঁর দরবারগৃহ নির্মাণ করেছেন। রাজ্য শাসন সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ে তিনি এখানে দ্বীপের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। দরবারগৃহ বলতে সাধারণত আমাদের মনে যে ছবি জাগে, এ সে ধরনের কিছু নয়। এ ঘরের দেওয়াল চেরা-বাঁশের, চাল আখের পাতায় ছাওয়া। ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছানো। এখন সেখানে সভা ভঙ্গের পরে কাভা নামক পানীয় অভ্যাগতদের মধ্যে বিতরিত হয় এবং মাঝে মাঝে গানবাজনাও হয়।

প্রাচীনদিনের অনেক প্রথা পরিবর্তিত আকারে মাবাউ দ্বীপে প্রচলিত আছে, যদিও মিশনারিদের খরদৃষ্টি ও সতর্কতার ফলে ওইসব প্রাচীন রীতিনীতির ভয়ানকত্ব সম্পূর্ণরূপেই দূরে রয়েছে। রীতিনীতি বজায় আছে, কিন্তু খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পর থেকে তাদের ওপর সভ্যতার একটি প্রলেপ পড়েছে। খুব লক্ষ করে দেখলে প্রলেপটুকুর ক্ষীণ আবরণ ভেদ করে প্রাচীনকালের প্রথার আদিম রূপটি এখনও বার হয়ে আসে। প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট সময়ে মাবাউ দ্বীপের মিশনারি সম্প্রদায়ের বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয় এই দরবারগৃহেই। বহুদূর থেকে গ্রাম্য লোকেরা মাবাউ শহরে এই উপলক্ষে জমা হয় ও কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রার্থনা, ভজনগীত, নৃত্য, ভোজ, বাজি পোড়ানো ইত্যাদি চলতে থাকে। খুব বড়ো মেলা বসে এবং দেশীয় নানাবিধ শিল্পদ্রব্যও প্রদর্শিত হয়। সকলেই মিশনারি ফান্ডে এই সময়ে কিছু কিছু অর্থদান করে।

ভোজের মধ্যে বেশি কিছু আড়ম্বর নেই। গ্রাম থেকে আসবার সময়ে প্রত্যেকেই নিজের সাধ্যমতো কিছু কিছু মিষ্টি আলু, সাবু, রুটিফল ও কাভা প্রস্তুতের জন্যে ইয়ানসোনার মূল সংগ্রহ করে আনে। যাদের

অবস্থা কিছু ভালো, তারা একটা শূকর আনে। এই শূকর রন্ধনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ প্রাচীন প্রথানুযায়ী নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

একটি হৃষ্টপুষ্ট শূকর বেছে নিয়ে তার মাথায় ডান্ডা মেরে বধ করা হয়। তারপর তার পেট চিরে পেটের মধ্যে তপ্ত পাথরের নুড়ি পুরে পেট আবার সেলাই করে দেওয়া হয়। ঝিনুক আর প্রবালের খোসা দিয়ে তার গায়ের লোম চেঁচে ফেলা হয়।

এইবার শূকরটি উনুনে ঝলসাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যুদ্ধের দেবতা রাটু রোসির রাজকীয় রন্ধনশালা ছাড়া এই শূকর অন্য কোথাও রান্না হবার নিয়ম নেই। রাটু রোসির রন্ধনশালার উনুন একটু গোলাকার পাথর বাঁধানো কুণ্ড, তার ব্যাস হবে প্রায় আট ফুট, গভীরত্ব সাড়ে তিন ফুট। এই উনুনের তলায় একরাশ সরু সরু গাছের ডাল জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, এবং ঝুড়ি দুই ছোটো ছোটো পাথরের নুড়ি ওই আগুনের মধ্যে রেখে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হয়। পাথরের নুড়িগুলো ঠিকমত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মৃত শূকরটি তার ওপর চাপিয়ে তার চারিপাশে মিষ্ট আলু, টরো মূল, সামুদ্রিক হাঙরের ডানা, বড়ো কাঁচা ঝিনুক ইত্যাদি স্তূপীকৃত করে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সবসুদ্ধ মিলে ঢিমে আঁচে সিদ্ধ হতে থাকে।

নিয়ম এই যে, রন্ধনকার্য শেষ হলে যুদ্ধের দেবতা রাটু রোসি সর্বপ্রথম এই খাদ্য আস্বাদ করবেন। একখানা বড়ো ছুরি দিয়ে শূকরের মাংস তিনি কিছু কেটে নিয়ে মুখে তুলে দেবেন। সকলে সেই সময়ে জয়ধ্বনি করে উঠবে, মঙ্গলবাদ্য বাজতে থাকবে।

তিনি এইবার সমবেত প্রজাগণকে ভোজে যোগদান করবার অনুমতি দেবেন।

ইয়োরোপীয়গণ ফিজি দ্বীপে পদার্পণ করবার পূর্বেও এই উৎসব ঠিক এইভাবে সম্পন্ন হত, শুধু শূকরের পরিবর্তে তখন জীবন্ত মানুষকে ঠিক ওইভাবে মাথায় ডান্ডা মেরে বধ করা হত, ওইভাবেই আগুনে ঝলসানো হত এবং মহামহিম 'যুদ্ধের দেবতা' ঠিক ওইভাবেই ছুরি বার করে সর্বপ্রথম সেই নরমাংস আস্বাদ করতেন। তখন অবশ্য মিশনারিদের সঙ্গে এই উৎসবের কোনো সম্পর্ক ছিল না, এর নাম ছিল 'বোকোলা' অর্থাৎ নরমাংস ভক্ষণের উৎসব।

রাজকীয় উনুন থেকে মাংস খাবার ক্ষমতা নেই প্রজাদের। শূকরকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে তবে তার মাংস সকলের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। নারিকেল গাছের শিকড়ে তৈরি বড়ো বড়ো ঝুড়ি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভোজের পর মেয়েদের নাচ আরম্ভ হয়।

নাচের পোশাক বড়ো চমৎকার। গাছের ছালে তৈরি 'তাপা' বা 'মামি' বলে একপ্রকার পরিচ্ছদ এই উপলক্ষে মেয়েরা পরে। 'মামি' যেদিন ব্যবহৃত হবে, সেদিনই তৈরি করতে হয়। তা না হলে এই পরিচ্ছদ পরা চলে না।

মেয়েরা গলায় পরে রাঙা হিবিস ঘাস ও হলদে ফ্রালিপিনি ফুলের মালা, কোমরে জড়ায় কচি সবুজ পত্রযুক্ত বন্যলতা, মাথার চুলে গুঁজে রাখে সাদা রঙের পোনো ফুল। সাধারণত ছত্রিশটি নর্তকী দরকার হয় নাচের জন্যে, এরা দু-দলে ভাগ হয়ে সামনে-পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়ায় এবং বাজনা শুরু হবার পরে তালে তালে নাচতে আরম্ভ করে। উৎসবের পনেরো-ষোলো দিন আগে থেকে নাচের তালিম চলে এবং স্বয়ং রাটু রোসি তালিমের সময় উপস্থিত থেকে যাতে নাচ নির্ভুল ও ত্রুটিশূন্য হয় সেবিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন প্রথা ও রীতিনীতির বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে অনেকে মাবাউ দ্বীপে গিয়ে থাকেন। রাটু রোসি শিক্ষিত লোক ও উদার আতিথেয়তার জন্যে এ অঞ্চলে বিখ্যাত। নিজের বাড়িতে তিনি আগন্তুকদের স্থান দেন ও যথেষ্ট সমাদর করেন। কিন্তু কারো শুধুহাতে রাটু রোসির আতিথ্য গ্রহণ করতে যাওয়া উচিত নয়, কারণ প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত হলেও ইনি বর্তমানে দরিদ্র প্রজাদের আনীত উপঢৌকনে কোনোক্রমে দিন গুজরান করেন। অন্তত কিছু সিগারেট ও তামাক সঙ্গে করে নিয়ে গেলেও রাটু রোসিকে যথেষ্ট সাহায্য করা হয়, কারণ ফিজিদ্বীপে তাম্রকূট বড়োই দুর্মূল্য।

ইয়োরোপের ক্ষুদ্রতম রাজ্য এন্ডোরা

স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যে পার্বত্য অঞ্চল আছে, এন্ডোরা রাজ্য সেখানে একটা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। সম্রাট চার্লস দি গ্রেটের সময় থেকেই এন্ডোরা স্বাধীন। যাতায়াতের পথঘাট ভালো নয় বলে মার্কিন ভ্রমণকারীদের ভিড় ওখানে তেমন নেই। প্রকৃতপক্ষে এন্ডোরার অস্তিত্ব অনেকের কাছেই অজ্ঞাত।

কাজেই বিংশ শতাব্দী এই দেশে প্রবেশের সুযোগ পায়নি। এন্ডোরার অধিবাসীরা এখনও সে হিসেবে মধ্যযুগে আছে। অতি সহজ সাদাসিধে জীবনযাত্রাপ্রণালি এদের, কোনোপ্রকার বিলাসিতা এরা জানে না, বিলাসিতা করবার পয়সাও নেই। নির্জনতা যাঁর ভালো লাগে, অনাড়ম্বর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জীবন যাঁরা দেখতে ইচ্ছুক, তাঁরা এন্ডোরায় যেতে পারেন!

হাজার বছর ধরে এন্ডোরাতে একই ধরনের শাসনপ্রণালি চলে আসচে। একই রীতি এক হাজার বছর যে বজায় আছে, এতেই বোঝা যাবে অধিবাসীরা তাদের দেশ ও জাতীয় রীতিনীতি কতদূর ভালোবাসেন।

ভূমধ্যসাগরের দিকে পিরেনিজ পর্বতমালার যে প্রান্ত, এন্ডোরা সেখান থেকে হবে ষাট মাইল। উত্তর ও দক্ষিণে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি কুড়ি মাইল, পূর্বে ও দক্ষিণে প্রায় আঠারো মাইল। দেশের সর্বত্রই বন্যময় উপত্যকা। দু-দিকে উঁচু পর্বত, মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো পার্বত্য নদী ও ঝরনা, মাথার ওপরে সব সময়েই চিরতুষারবৃত পিরেনিজ পর্বতমালা।

এন্ডোরা যদিও স্বাধীন রাজ্য, তবুও ফ্রান্স ও স্পেনের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মেনে চলে। ফ্রান্সকে বার্ষিক নয়শো ফ্রাঁ ও স্পেনকে চারশো ষাট ফ্রাঁ নজরানা স্বরূপ দিতে হয়। তবে এই কর দেওয়ার ব্যাপারটা নিতান্তই নামমাত্র ও মামুলি ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ও স্পেন এন্ডোরার রাজনৈতিক ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করে না।

এন্ডোরার রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত আছে। কেউ বলে সম্রাট চার্লস দি গ্রেটের ছেলে লুই, মুরদের জয় করে এই জঙ্গলের পথে ফ্রান্স ফিরছিলেন, এই বনবেষ্টিত স্তব্ধ উপত্যকায় অনেকগুলো সৈন্য বসবাস করবার অনুমতি প্রার্থনা করে। লুই দেখলেন ব্যাপারটা বেশ হবে, ফ্রান্স ও মুর রাজ্যের মধ্যে এমন একটি শক্ত মানুষের দেওয়াল গড়ে রাখা মন্দ নয়। এন্ডোরার বর্তমান অধিবাসীগণ সেই প্রাচীনকালের ফরাসি সৈন্যদের বংশধর। অনেকে বলেন মুর দস্যুদল আইনের ভয়ে পালিয়ে ওই অরণ্যময় উপত্যকায় আত্মগোপন করে, তাদেরই দ্বারা এন্ডোরা রাজ্য স্থাপিত হয়। দস্যুরা মবুরাজকেও কর দিত, আবার ফ্রান্সকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে ফরাসি সম্রাটকেও কিছু কিছু উপঢৌকন পাঠাত। সেই

উপঢৌকনের মূল্য শেষে বার্ষিক ন-শো ফ্রাঁ নির্ধারিত হয়। মুরিশ ভাষায় 'আলডারা' কথার মানে অরণ্য, এন্ডোরা কথাটার উৎপত্তি সম্ভবত তা থেকেই। কেউ বলেন প্লিনি তাঁর ইতিহাসে এন্ডরিসি বলে একদল জিপসি জাতির উল্লেখ করেছেন। এরা ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির যাযাবর জাতি, অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়,। তারাই কোনো প্রাচীন যুগে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই ঘন অরণ্যময় উপত্যকায় বসবাস করে।

বর্তমানে এন্ডোরা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন একজন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর মন্ত্রণাসভা। চব্বিশজন সভ্য নিয়ে এই মন্ত্রণাসভা গঠিত, এঁরা কেউ মাইনে পান না। শাসনকার্য চালাবার অনেক খরচ কমে গিয়েছে এতে। বার্ষিক রাজস্বের অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। বিচার বিভাগের জন্যে একজনও বিচারক রাখবার দরকার হয় না। অপরাধীর সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। যা দু-একটা অভিযোগ আসে, রাজ্যের বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ অনুসারে তাদের বিচার করা হয়। লিখিত আইন বলে কিছু এখানে নেই।

ফ্রান্স ও স্পেন থেকে দুজন কর্মচারী এদেশে প্রেরিত হয়, তাদের কাজ উভয় দেশের প্রাপ্য বার্ষিক কর আদায়ের ব্যবস্থা করে স্ব স্ব দেশে পাঠানো। নরহত্যা সাধারণত ঘটে না, কিন্তু যদি কখনো হয়ে পড়ে তবে শহরের মেয়র এক মজার ব্যাপার অনুষ্ঠান করেন। বহুকাল থেকে এন্ডোরাতে এ প্রথা অনুষ্ঠিত হয়ে এসেচে; আজ তাকে বদলানো যায় না।

শহরের মেয়র ফ্রান্স ও স্পেনের প্রেরিত কর্মচারী দুজনকে ডেকে পাঠান, অন্যান্য গণ্যমান্য লোকও উপস্থিত থাকেন। তারপর মেয়র হত ব্যক্তির মৃতদেশের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, ওঠো হে, মৃত্যু থেকে জেগে উঠে বলো কে তোমাকে মেরেছে এবং তাকে কী শাস্তি দেব—বলাবাহুল্য মৃতদেহ মেয়রের প্রশ্নের জবাব দেবা: কিছুমাত্র আগ্রহ দেখায় না।

তখন মেয়র সমবেত দর্শকদের মুখের দিকে চেয়ে বলেন, লোকটা মরে গিয়েছে, ওর কাছে কথার উত্তর পাওয়া যাবে না।

এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে মেয়র অবিশ্যি আধুনিক যুগের পুলিশের হাতেই খুনের তদারকের ভার দেন।

এন্ডোরা পর্বতময় দেশ, আগেই সেকথা বলা হয়েছে—ওইটুকু তো দেশ, যেকোনো পথেই হাঁটা যাক না কেন, সর্বদা চোখে পড়বে পর্বত। কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে এন্ডোরার তফাত যে এন্ডোরাতে পথিকের দৃষ্টি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য; কারণ সামনে পেছনে এবং ওপরের দিকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি পাহাড়ের বিরাট দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খায়। অনেকসময় সামনে, পিছনেও পাহাড় থাকে, সেসব জায়গায় সত্যিই প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

যাঁরা আধুনিক ধরনের হোটেল খুঁজবেন, এন্ডোরাতে গিয়ে তাঁদের হতাশ হতে হবে। সেকেলে ধরনের সরাইখানা ছাড়া আর কোনো থাকবার স্থান মিলবে না। রেডিও ও টকি খুবই কম ঢুকেছে। এই জন্যেই মার্কিন ভ্রমণকারীর দল ওমুখো হয় না কখনো। এমনকী এন্ডোরার পর্বতগুলির মধ্যে লাবণ্যভরা সৌন্দর্যের অভাব আছে। এখানকার পাহাড়পর্বত যেন যোগী পুরুষ, নিরহংকার, নিস্পৃহ কিন্তু উদাস নয়। মানুষের অনিষ্ট করবার সুযোগ পেলে ছাড়বার পাত্র নয়, মানুষের মনের কঠিন প্রবৃত্তিগুলি এধরনের দৃশ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে, কোমল বৃত্তিগুলি কোথায় লুকিয়ে পড়ে।

আর কী সে গভীর নির্জনতা! সেখানে নির্জনতা যেন শব্দময়ী, পর্বতের ওপর থেকে ঝরঝর ধারে পতনশীল যে ঝরনা তার শব্দের সঙ্গে নির্জনতার শব্দ যেন পাল্লা দিয়ে চলতে চায়।

এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামের পথ প্রায়ই সংকীর্ণ পার্বত্য গিরিবর্ত্ম দিয়ে। পুলিশের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু পথে চুরি-ডাকাতির আদৌ ভয় নেই। মোটরগাড়ি এরকম রাস্তায় অচল, নীচের সমতলভূমিতে অবিশ্যি আধুনিক প্রণালির পিচঢালা রাস্তা আছে, কিন্তু তার সংখ্যা বেশি নয়।

পাহাড়ের ওপরে মাঝে মাঝে মাটি পাওয়া যায়, তাতে ছোটো ছোটো গমের খেত। তারও ওপরে কোনো কোনো স্থানে বড়ো বড়ো ফার গাছ, কিন্তু বেশির ভাগ পাহাড় অনাবৃত, রুক্ষ, সেখানে গাছপালা জন্মাতে পারে না। উপত্যকার শ্যামল বনানী নানা বর্ণের ফলে সমাচ্ছন্ন, সেখানে নাইটিংগেল ডাকে সব সময়। ছোটো ছোটো পাহাড়ি নদীর ধারে ও মাঠে ফুল খুব ফোটে।

এন্ডোরা যদিও খুব ছোটো দেশ, এখানে কয়েকটি ভালো লেখক ও সাহিত্যিক তাঁদের দেশ নিয়ে পিয়ের লোতির মতো সুন্দর বই লিখেছেন। ইসাবেল স্যান্ডি একজন লেখিকা, এন্ডোরার কৃষক ও শিকারিদের জীবনী নিয়ে ইনি একখানা ভালো উপন্যাস লিখেছেন। কয়েকটি ইয়োরোপীয় ভাষায় তাঁর বই মুদ্রিত হয়েছে।

এন্ডোরার লোকে বেশি কথাবার্তা বলতে ভালোবাসে না। দেশের নির্জনতা ও জীবনযাত্রা প্রণালির কঠোরতা তাদের কম কথা বলতে শিখিয়েছে। তা বলে তারা অসামাজিক নয়। সকল শ্রেণির লোকেই এখানে অতিথিসৎকারপ্রিয়। সব গ্রামে সাধারণের জন্যে সরাইখানা নেই—সেখানে গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া যায়। তারা খুব যত্ন করে এবং অনেকসময় টাকাকড়ি নিতে চায় না।

বার্নার্ড নিটিন তাঁর 'Round about Andora' নামে বইতে লিখেছেন: এন্ডোরার লোকদের প্রতি বাইরের লোকে ঠিক সুবিচার করতে পারে না, কারণ বাইরের লোকে তাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পায় খুব কম। একথা খুব খাঁটি যে, প্রথম দর্শনে এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা মনে জাগবে। এদের মুখশ্রী রূঢ়, গলার স্বর কর্কশ, কথ্যভাষা ফ্রেঞ্চ ও স্পেনিশে মিশ্রিত খিচুড়ি, কিন্তু ওদের বাড়িতে ওদের সঙ্গে মিলে কিছুদিন বাস করলেই বোঝা যাবে যে ওরা কত ভদ্র, কত সৎ, কত কর্মনিপুণ।

অধিবাসীদের মধ্যে খুব ধনী নেই, খুব দরিদ্রও নেই। যাব বেশি জমি আছে, এদেশে সেই বড়োলোক। পশুপালন, কৃষি ও বে-আইনি মদ বিক্রি করা এদেশের লোকের প্রধান উপজীবিকা। অনেকে সস্তা ইয়োরোপীয় মালের আমদানি করে। ভিখারি ও ফিরিওয়ালার সংখ্যা খুব বেশি নয়।

দেশটা শুধু পাথরের, মাটির পরিমাণ বেশি নেই, সুতরাং জমির দাম চড়া। শস্যক্ষেত্র বলতে অন্য দেশে যা বোঝায়, এখানকার শস্যক্ষেত্র ঠিক সে জিনিস নয়। কয়েকগজ মাত্র জমি পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা, এইমাত্র ব্যাপার।

চোরাই মদের ব্যবসার স্থান কৃষির পরেই।

স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্ত প্রদেশ নিকটেই হওয়াতে বে-আইনি মদ ও কোকেনের ব্যবসা করার সুবিধে বেশি। এদের উপদ্রবে স্পেন ও ফরাসি গবর্নমেন্ট মহা ব্যতিব্যস্ত, নানারকম নতুন আইন পাশ করে এদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে অনেকবার—কিছুতেই কিছু হয়নি।

গোলডেন গ্রামের ওপরে পর্বতের মালভূমিতে স্পেন থেকে অনেক মেষপাল চরাতে আসে। বহু

শতাব্দী ধরে গোলডেনের পশুচারণভূমি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে—তার ঘাসের জন্যে নয়, কারণ ঘাস বেশি জন্মায় না এখানকার পাথুরের মাটিতে—কিন্তু মে মাসের শেষদিকে দক্ষিণ স্পেনে বড়ো গরম পড়ে, সেখানে তখন ভেড়ার দল রাখলে তাদের নানারকম রোগ হয়, শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং লা খাঞ্চা প্রদেশের মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে এসে ঢোকানো হয় এনোরাতে এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গোলডেনের মালভূমির পশুচারণভূমিতে তারা মোলায়েম শীতের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে হৃষ্টপুষ্ট হয়।

বড়ো বড়ো গ্রাম দু-একদল লোক প্রায়ই পাওয়া যায় যারা স্পেনিশ কিংবা ফরাসি ভাষা বোঝে বা বলতে পারে। কিন্তু সাধারণত লোক কাটালান ভাষায় কথাবার্তা বলে। বাইরের লোকের পক্ষে এ ভাষা দুর্বোধ্য, তবে ইশারায় ইঙ্গিতে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। এরা খুব ভদ্র ও বিনয়ী, বিদেশিরা এদের কাছে খুব খাতির পায়, অনেকসময় বাড়িতে জায়গা দিয়ে ও খেতে দিয়ে অতিথির কাছে দাম নেয় না।

এন্ডোরা যাওয়ার কোনো ভালো রাস্তা ছিল না এতদিন, কিন্তু সম্প্রতি স্পেন ও ফ্রান্স পরস্পর পাল্লা দিয়ে দু-দিক থেকে দুটো রাস্তা তৈরি করেছে। ভ্যালিয়া নদীর ধার বেয়ে, একটা বিরাট পাহাড়ের তলা দিয়ে এক দুর্গম পার্বত্য পথ ছিল এন্ডোরা যাবার একমাত্র রাস্তা। সেপথে যে চওড়া পথ তৈরি করে দিয়েছে, তাতে মোটর চলবে। ইয়োরোপের সভ্য দেশসমূহ থেকে এন্ডোরা যাওয়ার ভালো চওড়া মোটরের রাস্তা তৈরি হলে মার্কিন ভ্রমণকারীরা কী করে বলা যায় না, কারণ দুনিয়ায় তাদের অগম্য স্থান নেই।

ইউগান্ডা

বর্তমান সভ্যতার আলোকে দুর্গম আফ্রিকার বহু রহস্যই আজ উদ্‌ঘাটিত। একদিন যে অনাবিষ্কৃত প্রস্তর ভূখণ্ডগুলি আবিষ্কার করিতে যাইয়া বড়ো বড়ো মহারথীগণ প্রাণপাত পর্যন্ত করিয়া গিয়াছেন, আজ একজন সাধারণ পর্যটকের কাছেও সেই স্থানগুলি অনায়াসলভ্য ও অত্যন্ত সুগম হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন ভূপর্যটকগণ দুর্লঙ্ঘ্য গিরিবন ও দুর্গম মরুকান্তার ভেদ করিয়া আফ্রিকার যেসব অংশের পরিচয়পত্র দিয়া গিয়াছেন আজ সেখানে নব নব রেলপথ নির্মিত হইয়া নূতন নূতন নামকরণ হইতেছে। ভ্রমণবিলাসী পর্যটকগণ এখন হামেশা সেইসব স্থানে যাতায়াত করিয়া অবাধে মনের আনন্দ মিটাইতে পারিতেছেন।

তাঙ্গানিকা, ইউগান্ডা ও কেনিয়া এই তিনটি প্রদেশ লইয়া বৃটিশ পূর্ব-আফ্রিকা গঠিত। তন্মধ্যে ইউগান্ডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অনন্ত বৈচিত্র্য সত্যই মনোমুগ্ধকর। বহু দেশ ঘুরিয়া একই জিনিস বহুবার দেখিতে দেখিতে ভ্রমণকারীর মনে সত্যই এমন এক একঘেয়ে অরুচির ভাব জন্মে। কিন্তু ইউগান্ডায় প্রবেশ করামাত্র সে অবসন্ন ভাব আপনি কাটিয়া যায়। প্রকৃতির অফুরন্ত বৈচিত্র্য সেখানে শতধারায় পরিপূর্ণ। কিবা উদ্ভিদজগৎ কিবা জীবজগৎ, সকল ক্ষেত্রেই সেখানকার নিত্যনূতন আবিষ্কার আজিও সভ্য দেশবাসীর চক্ষে চরম বিস্ময় উদ্রেক করিতেছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শ্যামল তৃণশোভা নানা জাতীয় উদ্ভিজ নানা বর্ণের সুদৃশ্য পুষ্পশোভা, এখানকার পাহাড়-পর্বত, নদনদী, পাখির গান, সবই চমৎকার এবং অনন্ত বৈচিত্র্যময়। ইউগান্ডায় প্রকৃতির নানা দিকদেশ ও বহুমুখী বিকাশের একত্র সমাবেশ দেখিয়া বিখ্যাত পর্যটক স্ট্যানলি মুগ্ধ হইয়া ইহাকে 'আফ্রিকার মণি' এই নামে ভূষিত করিয়াছেন।

ইউগান্ডায় হ্রদের দৃশ্য বড়োই সুন্দর। এখানে জলপ্রপাতগুলির অবিরাম বর্ষণশব্দ শ্রবণে হৃদয়ে এক গভীর ভাবের সঞ্চার করে। পৃথিবীর প্রাচীনতম নীলনদীর উৎসমুখ ইউগান্ডার পাদদেশ বাহিয়া স্ফীতধারায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সে দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়ামাত্র অপার্থিব অনুভূতিতে মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে।

ইউগান্ডার দেশীয় লোকদের সহজ সরল জীবনযাত্রা বড়োই অদ্ভুত। ইংরাজ অধিকার করার পর জাতিবিশেষের মতিগতি কিছু কিছু পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ লোকেরাই সেই আদিম অসভ্য যুগের রীতিনীতি এখনও পালন করিতেছে। বহু প্রাচীনকালের অসভ্য রাজাদের শাসনপদ্ধতি এখনও এখানকার আদিম অধিবাসীদের ভিতর প্রচলিত। অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ইউগান্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া যত প্রকারের বর্বর ও অসভ্য জাতি আছে সকলেই এখানে বাস করে। যাহাদের পরিধানে বৃক্ষাদির বল্কল তাহারা সভ্যপর্যায়ভুক্ত; আর যাহারা অর্ধ-উলঙ্গাকৃতি বা একেবারেই উলঙ্গ তাহাদের হাবভাব ও ব্যবহার হীনতম অসভ্যতার পরিচায়ক, নীলনদীর পার দিয়া উহাদের বসবাস। রাও এনজোরিতে আবার একদল আদিম অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বামনের বংশ বিশেষ; দেখিতে অতিশয় খর্বাকৃতি, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

পূর্বে বলিয়াছি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ইউগান্ডার প্রাকৃতিক সংস্থানের পরিচয় যতই পাইতেছেন ততই তাহারা অজ্ঞাত রহস্যের নব নব সন্ধান করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন। বহু স্থানের অজ্ঞাত সন্ধান বাহির করিয়া অনেক নূতন তথ্য তাঁহারা দিয়াছেন ও এখনও দিতেছেন। আবার অনেক জায়গায় এখনও তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই; সেখানকার গাঢ় যবনিকা আজিও অপসারিত হয় নাই।

ইউগান্ডায় প্রকৃতি-বৈচিত্র্য কিবা মধুর, কিবা বিরাট, কোথাও বিস্ময়বিহ্বল ভয়াবহ মূর্তি নানাভাবেই তাহার দৃশ্যপট লইয়া ধরা দেয়। কোথাও দেখিবে বহুদূর বিস্তৃত শ্যামল উন্মুক্ত ভূখণ্ড প্রখর সূর্যকিরণে দিকবলয়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; কোথাও অসূর্যম্পশ্য নিবিড় জঙ্গল, শ্বাপদসংকুল, দিনের বেলাতেও সেখানে আজ পর্যন্ত আলো প্রবেশ করে নাই। আবার এখানকার সুবিপুল পর্বতগাত্র, পাহাড়ের চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া আকাশে উঠিয়াছে; কোনো শিখরদেশ বিরাট মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে; সেখান হইতে গৈরিক ধাতু তপ্ত লাভার উষ্ণস্রাব গলিয়া পড়িতেছে। আবার চতুর্দিকের গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কোনো পর্বতগাত্র হইতে জলপ্রপাতের অবিরাম গর্জনধ্বনি শোনা যাইতেছে। সমুচ্চ শিখরদেশ হইতে নিম্ন অধিত্যকায় জলপ্রপাতের এই মধুর দৃশ্য কী মহিমময়।

ইউগান্ডার উৎপন্ন দ্রব্যাদির ভিতর প্রধান সম্পদ তুলা। ইহা ছাড়া চিনি, তামাক, লঙ্কা, চীনাবাদাম, কোকো, কফি, প্রভৃতি নানবিধ জিনিসই এখানে প্রভূত পরিমাণে জন্মে। বিষুবরেখার ভিতর ইউগান্ডার অবস্থিতি। সেজন্য এস্থানে সর্বদাই গ্রীষ্মের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। তবে আফ্রিকার অন্যান্য অংশের অপেক্ষা এখানকার গ্রীষ্ম একেবারে অসহ্য নয়; তাপ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় বিদেশি পর্যটকগণ এখানে অনেকটা সুখে স্বচ্ছন্দেই বাস করিতে পারেন। তবে মাথায় রৌদ্র নিবারণের জন্য সর্বদা টুপি কি ছাতা অবশ্য ব্যবহার্য। ম্যালেরিয়ার আশঙ্কাই এখানে খুব বেশি। তাহারও প্রতিকার আছে। রাত্রিতে মশারি খাটাইয়া ঠিকভাবে শুইতে পারিলে ম্যালেরিয়ায় আক্রমণের সম্ভাবনা কম।

পশুপক্ষী শিকারের পক্ষে এ স্থানটি খুবই উপযুক্ত। মৎস্য-শিকারিরা প্রত্যহ এখানে মাছ ধরিতে আসেন। এখানকার বিখ্যাত এলবার্ট হ্রদের জলে এবং রিপন জলপ্রপাতের তলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

ইউগান্ডার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রাজধানীর নাম এন্টেবি। ভিক্টোরিয়া হ্রদের তীরে অবস্থিত এন্টেবির

চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্য বড়োই মনোরম। চারিদিকে সবুজ তৃণঘাস। মাঝে মাঝে লাল সুরকির রাস্তা আঁকাবাঁকা চলিয়া গিয়াছে। সুদৃশ্য পুষ্পোদ্যান, নানা বর্ণের কত রকমের ফুল। তারই মাঝে ছোটো ছোটো বাংলো। বাংলো হইতে সুদূর পাহাড়ের শ্রেণিবদ্ধ চূড়াগুলির দৃশ্য অতীব সুন্দর। সে সৌন্দর্যের তুলনা নাই। দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইতে হয়। আবার এখানকার কতরকম যে পাখি তার ইয়ত্তা নাই। কলকণ্ঠ পাখিগুলির সুমিষ্ট স্বর শোনামাত্র প্রাণ জুড়ায়।

এন্টেবি ছাড়াইয়া পঁচিশ মাইল পথ মোটরে অতিক্রম করিলে কাম্পালায় পৌঁছানো যায়। কাম্পালা, ম্যাঙ্গো ইউগান্ডার দেশীয় রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এন্টেবির তুলনায় এই স্থানগুলির লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশি। কারণ শহরের বাজার, বাণিজ্য-ব্যবসায় সমস্তই কাম্পালায় কেন্দ্রীভূত।

কাম্পালার অনতিদূরে নেমিরেম্বি পাহাড় দেখা যায়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুলাই রবিবার সেখানে সর্বপ্রথম খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্মপ্রচার করেন। বহু কষ্ট ও বহু অর্থব্যয় করিয়া নেমিরেম্বি পাহাড়ের চূড়ায় প্রথম গির্জাটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু গির্জাটি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই! ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের প্রবল বাত্যায় গির্জাটি ভাঙিয়া যায়। পরপর আরও দুটি গির্জা নির্মাণ করা হয় কিন্তু বজ্রপাত হওয়ার ফলে তাহাও নষ্ট হয়। ১৯১৯ সনে যে গির্জাটি পুনরায় স্থাপিত হয়, উহাই সর্বাপেক্ষা আধুনিক। এই নবনির্মিত গির্জার পাশে মুটেসার বিখ্যাত সমাধিস্তম্ভ প্রোথিত। মুটেসা ইউগান্ডার সমৃদ্ধ রাজবংশীয়ের বহু প্রাচীন আদি রাজা ছিলেন।

দেশীয় রাজাকে ইউগান্ডার অধিবাসীরা 'কাবাকা' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কাবাকার রাজভবন ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত প্রধান অফিসগুলি মেঙ্গো পর্বতের উপর অবস্থিত। নলবনের মতো একজাতীয় উদ্ভিদের দ্বারা এই বাড়িগুলির চতুর্দিকে বেড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। মেঙ্গো পাহাড়ের নিকটে 'মেকারের' নামে যে পাহাড়টি দেখা যায়, সেখানে এখানকার জাতীয় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। পূর্ব আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় এই স্থানটিতেই এখন পরিবর্তন করিয়া আনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মুলাগো পাহাড়ে ইউগান্ডার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

ইউগান্ডার প্রধান পার্বত্যপ্রদেশ ও শহরগুলির দৃশ্য বাদ দিয়া তাহার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল ছাড়াইয়া একটু দূরে পল্লির ভিতর প্রবেশ করিলে আরও অনেক ছবি চোখে পড়ে। তাহার মধ্যে 'রাজার হ্রদ' নামে এক বহুদূর বিস্তৃত জলাশয় আছে। কাম্পালা এন্টেবি রাস্তার প্রায় তেরো মাইল দূরত্ব হইতে 'ভিক্টোরিয়া নায়ানজার' অপূর্ব দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম দেখায়। বম্বো আরও ২৪ মাইল দূরে। এখানে তুলার চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। 'কিংস কলেজ' নামক বিখ্যাত বিদ্যামন্দিরটি ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ছাড়া কিসুবিতে রোমান ক্যাথলিকদের প্রতিষ্ঠিত এক মস্ত কলেজ আছে। পর্যটকগণ অতি অল্প সময়ের ভিতরেই অল্প ভাড়ায় মোটরে করিয়া ওই স্থানগুলি ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

'বিয়ান ফলস' নামক অদৃশ্য জলপ্রপাতটি ইউগান্ডার প্রধান সৌন্দর্য। এটি স্বচক্ষে না দেখিলে পর্যটকের কাছে ইউগান্ডা ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। জলপ্রপাতের নিম্নে পর্বতগাত্রে অসম সাহসিক প্রখ্যাত ভূপর্যটক স্পিকের স্মৃতিতর্পণ স্বরূপ এক প্রস্তরফলক খোদিত আছে। ভৌগোলিকের কাছে স্পিকের নাম সত্যই চিরস্মরণীয়। যে সমস্ত ভূপর্যটকগণ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জাঞ্জিবারের ভিতর দিয়া নীল নদীর উৎপত্তিস্থলের সন্ধানে বাহির হইয়া অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন স্পিক তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে।

রাইডার হ্যাগার্ডের দেশে

রাইডার হ্যাগার্ডের রোমান্সগুলির ঘটনাস্থল ছিল প্রধানত উত্তর ট্রান্সভাল। উত্তর ট্রান্সভাল দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান, যেখানে এই বিংশ শতাব্দীতেও অসম্ভব ঘটনা ঘটতে পারে। এই দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, ইহার অতীত ইতিহাসও তেমনই কৌতূহলপ্রদ।

উত্তর ট্রান্সভালের জলহাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। আফ্রিকার নানা অঞ্চল থেকে লোকে আসে এখানে হাওয়া বদলাতে। খুব বড়ো বড়ো প্রান্তর, মাঝে মাঝে কমলালেবুর বাগান ও কফি খেত। বনজঙ্গল এদেশে তেমন নেই, কেবল আছে ছোটো বড়ো শৈলমালা ও পাহাড়ি নদী।

অনেক রক্তপাত হয়ে গিয়েছে উত্তর ট্রান্সভালের অধিকার নিয়ে। পূর্বে এ দেশ ছিল জেনারেল পাইট জুবার্টের প্রতিষ্ঠিত সাধারণতান্ত্রিক ট্রান্সভাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। জেনারেল জুবার্ট ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নেটালের শাসনকর্তা সার জর্জ কলিকে মাজুবার যুদ্ধে হারিয়ে দেন। প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ এতেই শেষ হয় এবং চার বছর পরে বিজয়ী সেনাপতি পাইট জুবার্টের নামে পিটার্সবুর্গ শহরের প্রতিষ্ঠা হয়।

এই শহর যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে অনেক আগে আদিম অধিবাসীদের একটা বড়ো গ্রাম ছিল, গ্রামের চারিপাশে বড়ো বড়ো বাওবাব গাছের তলায় ওদের উৎসবের দিনে নাচ হত, ওরা নাম দিয়েছিল জায়গাটার 'লালো কেয়োন' অর্থাৎ বিশ্রামের স্থান। এই বাওবাব গাছগুলি এখনও পিটার্সবুর্গ শহরের একটা বড়ো পার্কের মধ্যে দেখা যায়।

আদিম অধিবাসীদের দেওয়া এই নামেরও একটা ইতিহাস আছে।

তখন উত্তর-পশ্চিম জুলুল্যান্ডের রাজা ছিল চাকা। যদি কখনো জুলুল্যান্ডের বর্বর রাজাদের কোনো ইতিহাস লেখা হয় তবে এই নৃশংস রক্তপিপাসু দুর্বৃত্তদের নাম তাতে কৃষ্ণতম কালির অক্ষরে লিখিত হবে। সুটো জাতি আবার এই রাজার হাতে সকলের চেয়ে বেশি উৎপীড়িত হয়েছিল—শেষ পর্যন্ত আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ড্রাকেন্‌স্‌বার্গ পর্বতের বিরাট প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে তারা পালিয়ে এল এখানকার উর্বর সমতলভূমিতে।

বেশ নিরিবিলি জায়গা, ছোট্ট পাহাড়ি নদী অদূরে বয়ে যাচ্ছে—বেশি বনজঙ্গলও নেই, ভালো চাষবাস হবে, পশুচারণ ভূমিও যথেষ্ট—এইসব দেখে ওরা জায়গাটার নাম দিলে 'পালাকোয়ান্'—এতদিন পরে এখানে এসে ওরা বিশ্রামের অবকাশ পেলে।

কিন্তু হায়! বেশিদিন নিরুপদ্রবে বিশ্রাম ভোগ করা সুটো জাতির অদৃষ্টে বিধাতা লেখেননি।

১৮৩৫ সালে এল 'ভুর ট্রেকারস'-এর দল। এদের গায়ের চামড়া সাদা, চোখ নীল, হাতে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র, বুদ্ধিসুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। নতুনতর যুদ্ধের কৌশল তারা জানে—সুটো জাতির এত সাধের বিশ্রামের স্থানে ওরা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল।

অবশ্য সুটোরা এত নিরীহ নয় যে, ভালো মানুষের মতো শ্বেতকায় 'ভুর ট্রেকারস'দের জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। যথেষ্ট যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত হয়েছিল এ নিয়ে।

কিন্তু এই 'ভুর ট্রেকারস'রা অদ্ভুত লোক ছিল সবদিক দিয়ে। দেশের যেসব ছেলেদের সমুদ্রে পাড়ি

দিয়ে বিদেশে গিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, উপনিবেশ স্থাপন করে, তাদের কাঠামো থাকে বড়ো শক্ত ধাতুতে গড়া।

তারা দেশে অন্ন পায়নি বলে বিদেশে এসেছিল কৃষিক্ষেত্রের সন্ধানে। এসে তারা করলে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। লরেন্স হাউসমানের কথায় "out of the lives you cast away settlements were born."—সুটোজাতি ক্রমশ হটে যেতে লাগল। ১৮৩৫ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে দলে দলে ডাচ কৃষকেরা এসে একটা বড়ো জনপদের প্রতিষ্ঠা করলে। এরা যেমন সাহসী ছিল, তেমনি পরিশ্রমী ছিল। এদিকে আবার সবাই ছিল গোঁড়া খ্রিস্টান। কোনো বিপদকে তারা বিপদ বলে গ্রাহ্য করত না, অসীম ছিল এদের ধৈর্য, তেমনি অসাধারণ ছিল এদের কর্মশক্তি।

অরেঞ্জ নদীর তিরবর্তী সমস্ত অনাবিষ্কৃত ও জনহীন ভূমি দেখতে দেখতে জনপদে পরিণত হল—এর নাম হল অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট।

কিন্তু এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে 'ভুর ট্রেকারস'দের মূল্য দিতে হয়েছিল বড়ো বেশি। যত লোক প্রথমে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে ও উত্তর ট্রান্সভালে বসতি স্থাপন করে, তার সিকি মারা পড়ে ম্যালেরিয়া ও 'স্লিপিং সিকনেসে'-এ—আর সিকি প্রাণ দেয় হিংস্র বন্যজন্তু ও হিংস্রতর জন্তুদের আক্রমণে। কিন্তু তারা ক্রমশ এগিয়ে যেতে যেতে অরেঞ্জ নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছোল। তখন সমস্ত অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে মাত্র পঞ্চাশটা কৃষিক্ষেত্র ছিল কি না সন্দেহ। ক্রমে জমির দাম চড়তে লাগল—গ্রাম হয়ে পড়ল শহর।

এইসময় আর এক উৎপাত আরম্ভ হল।

যেসব ছোটোখাটো ফার্ম কিংবা গ্রাম উত্তর ট্রান্সভালের সীমান্ত দেশে অবস্থিত, সেখানে অসভ্য বাগাতি জাতি মরুভূমির দিক এসে মহা অত্যাচার শুরু করলে। খুন, জখম, গৃহদাহ, নারীহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল।

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট তখন সবে গড়ে উঠেছে। সেখানকার গভর্নমেন্ট এমন শক্তিশালী নয় যে এইসব দূরবর্তী জনপদকে উপযুক্ত সাহায্য করতে পারে। কিছুদিন একা একা যুদ্ধ করবার পরে তারা ঘরবাড়ি, খেতখামার ছেড়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলে পাইটার্সবুর্গ শহরের আশেপাশে। কারণ সমস্ত অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের মধ্যে এখানেই লোকের বসতি বেশ ঘন, পুলিশ আছে, মিলিশিয়া সৈন্যদল আছে, বাগাতি জাতির সাধ্য নেই যে এদিকে ঘেঁষে।

এইভাবে পাইটার্সবুর্গ শহরের পত্তন শুরু হল। আগে ছিল ডাচ কৃষকদের একটা ক্ষুদ্র গ্রাম, তা ক্রমে আকার ও আয়তনে বিরাট হয়ে উঠতে লাগল। ১৮৬৩ সালে আবার গ্রামও ছিল না, একটি মাত্র ফার্ম ছিল 'স্টার্কলুপ' বলে—ট্রান্সভাল গবর্নমেন্ট এই ফার্ম কিনে নিয়ে এখানে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম স্থাপন করেন। গ্রামটির নামও ছিল 'স্টার্কলুপ'।

এখন সেই 'স্টার্কলুপ' গ্রাম হয়েছে বিশাল পাইটার্সবুর্গ শহর।

কত দেশ থেকে কত লোক এসে শহরের হোটেল পরিপূর্ণ করে রাখে। বেশির ভাগ দর্শক বিখ্যাত ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক দেখতে যাবার পথে এই শহরে দু-একদিন থেকে বিশ্রাম করে যায়। পাইটার্সবুর্গ থেকে ক্রুগার ন্যাশানাল পার্কে সহজে পৌঁছানো যায় এবং সে পর্যন্ত ভালো মোটরের রাস্তা আছে।

পাইটার্সবুর্গ শহরে রাস্তাগুলির দৈর্ঘ্য মোট ৪০ মাইল। এখানে বড়ো একটি এরোড্রাম সম্প্রতি স্থাপিত

হয়েছে কেপ কায়রো বিমানপথের সুবিধার জন্যে। শহরের বাইরের প্রান্তর ও বনে বিভিন্ন ধাতুতে নানারকম রঙিন বন্য পুষ্প ফোটে, মরুভূমি শহর থেকে বিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যে, সেখানে সিংহ বিচরণ করে!

পাইটার্সবুর্গ থেকে ট্রান্সভালের মনোরম অঞ্চলগুলিতে যাওয়া অত্যন্ত সহজ। এখানকার রাস্তাগুলি দ্রুতগামী মোটরগাড়ির চলাচলের সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে তৈরি করা হয়েছে। সর্বত্র পেট্রল কিনতে পাওয়া যায় পথের ধারে, গাড়ি সারাই করবার কারখানা, যন্ত্রপাতির দোকানও মাঝে মাঝে আছে। এমন সুন্দর মোটরের রাস্তা ইয়োরোপ ছাড়া অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ—আমেরিকাতেও বেশি নেই, এমনকী মার্কিন যুক্তরাজ্যেও সর্বত্র নেই।

এখান থেকে হাটেনসবুর্গ আটত্রিশ মাইল। হাটেনসবুর্গ পর্বতবেষ্টিত একটি অতি মনোরম উপত্যকায় অবস্থিত। এটিকে গ্রাম ছাড়া আর কিছু বলা যায় না—কিন্তু এর প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর যে ভ্রমণকারীর দল এখানে একবার না এসে পারে না। ক্রুগার ন্যাশানাল. পার্ক থেকে ফিরবার পথে সকলেই হাটেনসবুর্গ হয়ে যায়।

হাটেনসবুর্গের চারিধারের পাহাড়ে অনেক ছোটো বড়ো ঝরনা থাকায় কতকগুলি পার্বত্য নদীস্রোতের সৃষ্টি করেছে। বনচ্ছায়ায় তীরস্থ শিলাখণ্ডে বসে এইসব নদীতে ট্রাউট মাছ ধরা জীবনের একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এইসব পাহাড় ও উপত্যকা, এই বনভূমি অমর হয়ে থাকবে রাইডার হ্যাগার্ড ও জন বুকানের লেখার মধ্যে দিয়ে।

কী অপূরপ শোভা বনবাসীর এই ক্ষুদ্র উপত্যকায় ও তার আশেপাশে। জনপদ থেকে দূরে এখানে সত্যিকার ট্রপিক্যাল অরণ্য বর্ধিত হয়েছে। অল্প খরচে ও অল্প পরিশ্রমে ট্রপিক্যাল অরণ্য দেখতে হলে হাটেনসবুর্গ উপত্যকায় আসতে হবে। আগাথা আরেকটি মনোরম স্থান, হাটেনসবুর্গ থেকে ২৮ মাইল দূরে।

এই পথে বনের মধ্যে যথেষ্ট শিকার মেলে—প্রধানত হরিণ ও চিতাবাঘ। ক্বচিৎ সিংহ দেখতে পাওয়া যায়। তবে পরিশ্রমের সঙ্গে সন্ধান করলে অজগর সাপও মেলে।

দু-মাইল গিয়েই পথ দু-হাজার ফুট নেমে গেল। এখানে পাহাড় কেটে বিখ্যাত গিরিবর্ত্ম মন্দুরা ক্লুফ তৈরি করা হয়েছে। পথে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম পড়ে, প্রাচীনকাল ধরে ইন্দ্রজাল বিদ্যার জন্যে এই গ্রামের অধিবাসীরা প্রসিদ্ধ। আগে এরা বৃক্ষদেবতার সামনে নরবলি দিত—এখন অবশ্য অনেক সভ্য হয়েছে, অনেকে পাইটার্সবুর্গ থেকে স্কুলে কলেজে পড়ে। কিন্তু ইন্দ্রজাল বিদ্যার চর্চা এখনও এদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অন্যান্য গ্রামের জুলু ও কাফির অধিবাসীরা এদের ভয় করে চলে।

তবে ট্রান্সভালের অধিকাংশ অঞ্চলে বন ছিল না, আজকাল গবর্নমেন্টের বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে সেখানে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। একজাতীয় বাবলা গাছ বেশির ভাগ রোপণ করা হয়েছে তাঁর মূল্যবান আঠার জন্যে। এর আঠা উৎকৃষ্ট আরবি গঁদের সমান দামে বাজারে বিক্রি হয়। নিকটেই জগদ্বিখ্যাত র‍্যান্ড স্বর্ণখনি—খনিতে ভূগর্ভে খুঁটি বসাবার জন্যেও প্রচুর পরিমাণে বাবলা গাছের গুঁড়ি চালান যায়।

উচ্চ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে উন্নত প্রণালিতে পিচ, পিয়ার, কলা, আম, পেঁপে ও আনারসের চাষ করা হয় ও জাহাজের ঠান্ডা কেবিনে পুরে পৃথিবীর সর্বত্র চালান দেওয়া হয়। ফলের ব্যবসা উত্তর ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের একটি অতি লাভজনক ব্যবসা।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার রাইডার হ্যাগার্ড তাঁর যৌবনে ট্রান্সভালের রাজকর্মচারী ছিলেন, এই অঞ্চলের পর্বত ও অরণ্য তাঁর কয়েকখানি রোমান্সের আবেষ্টনী রচনায় সাহায্য করেছে। বহুদূর থেকে টুরিস্টদের দল এই শৈলশৃঙ্গ দুটি দেখতে এসে ঘন বনের ছায়ায় তাঁবু পেতে ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম করতে করতে শক্তিশালী লেখকের সৃষ্ট 'রাজা সলোমনের রত্নাগার'-এর স্বপ্ন দেখে।

কুইন মেরি

গত ২৬শে মে সাদাম্‌টন বন্দর থেকে 'কুইন মেরি' জাহাজ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেন 'বড়ো জাহাজ তৈরি' প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

আটলান্টিক সাগরে পাঁচটি জাতি খেয়াপারের জাহাজকে কত বড়ো করতে পারে তাই নিয়ে অনেকদিন থেকেই প্রতিযোগিতা করছে। এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাপার যে সবাই ভাবছে জাহাজ আরও কত বড়ো করা যেতে পারে। বৃহৎকায় জাহাজ তৈরির একটা কি সীমা নেই?

এইসব বড়ো জাহাজ তৈরি করতে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় হয়। কিন্তু তার তুলনায় আয় হয় কেমন?

আটলান্টিক খেয়া জাহাজের এ প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ করে জার্মানি।

ভার্সাইয়ের সন্ধি অনুসারে জার্মানি মহাযুদ্ধের পূর্বে যে বাণিজ্য-জাহাজ ছিল তা হারিয়ে ফেললে। ১৯৩০ সালে তারা 'ব্রিমেন' আর 'ইয়োরোপ' বলে দুখানা বড়ো জাহাজ সমুদ্রে ভাসাল। আটলান্টিকে তখন এত বড়ো জাহাজ আর ছিল না। বাইশ বছর ধরে গ্রেট ব্রিটেন এক্ষেত্রে সকলের বড়ো ছিল 'মোরিটানিয়া' জাহাজের দরুণ। বাইশ বছরের মধ্যে এর চেয়ে বড়ো জাহাজ আর তৈরি হয়নি।

তারপর ইটালি কতগুলি বড়ো জাহাজ তৈরি করলে, তাদের মধ্যে 'রেক্স' আর 'কাস্ট ডি সাভোরিয়া' প্রসিদ্ধ। ফ্রান্স 'নরম্যান্ডি' নামে খুব বড়ো একখানা জাহাজ তৈরি করে এদের হারিয়ে দিলে। 'নরম্যান্ডি'র সমান বড়ো জাহাজ তখন পর্যন্ত কেউ আটলান্টিকে নামায়নি।

এর উত্তর দিলে গ্রেট ব্রিটেন 'কুইন মেরি' জাহাজে। কিন্তু এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাজ্যে দুখানা অতিকায় জাহাজ তৈরি হচ্ছে. এরা 'কুইন মেরি'র চেয়ে তত বড়ো হবে, 'মোরিটানিয়া'র চেয়ে 'কুইন মেরি' যত বড়ো।

এই প্রতিযোগিতার শেষ কোথায়? এইসব ভাসমান হোটেল তৈরি করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, তার সুদ পোষাবে কি না এ সন্দেহ এখন অনেকের মনে উঠেছে।

'নরম্যান্ডি' জাহাজ তৈরি করে ফ্রান্স যে লাভবান হয়নি, একথা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কারো অবিদিত নেই।

নরম্যান্ডি জাহাজ তৈরি যারা করেছিল, তাদের দুবার জাহাজখানা মেরামত করতেই অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে যায়। বিলাসের উপকরণ বাদ পড়েনি 'নরম্যান্ডি' জাহাজে।

বেগও ছিল খুব বেশি, সে হিসেবে দেখতে গেলে এর চেয়ে বেগবান জাহাজ জার্মানির 'ব্রিমেন'ও নয়।

কিন্তু প্রধান দোষ এর দাঁড়াল এই যে, বিরাট ইঞ্জিন চলবার সময় জাহাজখানা এত কাঁপে যে বাধ্য

হয়ে দু-বছর পরে ইঞ্জিন খুলে ফেলে আবার নতুন করে অন্য ইঞ্জিন বসাতে হল। তাতেও দোষ একেবারে গেল না—বছরখানেক পরে ইঞ্জিন আবার খুলতে হয়, আবার বসাতে হয়। গভর্নমেন্ট অর্থসাহায্য না করলে জাহাজ কোম্পানিকে এতে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করতে হত।

জার্মান ও ইটালিয়ান গভর্নমেন্টও নিজেদের দেশের জাহাজ কোম্পানিকে এর জন্যে যথেষ্ট সাহায্য করে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞ লোক বলেন, আটলান্টিক খেয়া-জাহাজ বেশি বড়ো করে আর কোনো লাভ নেই। এর একটা সীমা আছে এবং বর্তমানে সে সীমার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে সবাই। চাহিদার চেয়ে জিনিসের যদি বাজারে সরবরাহ বেশি হয়, তবে ব্যবসায়ীকে লোকসান সহ্য করতে তো হবেই। এক্ষেত্রেও ক্রমে সেই দশা হয়ে উঠেছে।

ইঞ্জিনের গতিবৃদ্ধি করার প্রতিযোগিতাই এখন প্রধান। ঘণ্টায় দু-দিন মাইল গতিবৃদ্ধি করার ব্যাপার সোজা নয়, কারণ এইসব বড়ো বড়ো জাহাজ এক-একটি বড়ো বড়ো হোটেলের সমান। এদের জোরে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিশেষত আটলান্টিকের ঢেউ কাটিয়ে—তার আবার প্রতিযোগিতা! সেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে আটলান্টিকের 'ব্লু রিবন' লাভ করা বড়ো সহজ নয়।

আর দু-তিন ঘণ্টা আগে যাত্রীকে সাদাম্‌টন থেকে নিউইয়র্কে পৌঁছে দেবার জন্যে একরাশ টাকা ব্যয় করেই বা কী হবে? অর্থনীতির দিক থেকে শুধু নয়, বিজ্ঞানের দিক থেকেও দেখলে এতে আর সুবিধে নেই। কারণ বিমানপথে যখন যেকোনো বর্তমান বেগবান জাহাজের এক তৃতীয়াংশ সময়ে ওই দূরত্ব অতিক্রম করা যায়, তখন জাহাজে আর অনর্থক অর্থব্যয় কেন?

বাইরের লোককে এরূপ স্বীকার করতেই হবে যে, প্রশ্নের উত্তর দিতে তারাই সকলের চেয়ে বেশি সক্ষম, যাদের অর্থব্যয় 'কুইন মেরি' তৈরি হয়েছে। যারা নিজেদের ও শেয়ার হোল্ডারদের টাকা এত বড়ো বিশাল জাহাজ তৈরি করতে লাগিয়েছে বা যারা বিশ্বাস করে যে এই জাহাজ চালিয়ে লাভ হবে বা তাদের অর্থব্যয় সার্থক হবে, তারাই জানে কেন এ জাহাজ তৈরি হল। তাদের জিজ্ঞাসাও করা হয়েছিল একথা।

তারা বলে, অন্য জাহাজের কথা আমরা জানিনে, কিন্তু 'কুইন মেরি' সে ধরনের প্রতিযোগিতার ফলে উৎপন্ন জাহাজ নয়। আমরা হুজুগে পড়ে কোনো কাজ করিনে। ১৮৪০ সালে আমাদের তৎকালীন মালিক স্যামুয়েল কুনাউ 'ব্রিটানিয়া' জাহাজ তৈরি করান, তখন এত বড়ো জাহাজ কেউ কখনো চোখেও দেখেনি—তখন তো আর এমন প্রতিযোগিতা ছিল না, কিন্তু তখনও তো আমরা বড়ো জাহাজ তৈরি করতে পয়সা খরচ করেছিলাম।

আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও জাহাজ নির্মাণের আধুনিক রীতির সুযোগ গ্রহণ করে লন্ডন-নিউইয়র্কগামী যাত্রীদের আরাম ও সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে আমরা আমাদের ফার্মের সেই প্রাচীন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করব।

বিগত মহাযুদ্ধের পরে জাহাজের আকার ও নির্মাণপ্রণালির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। হাইড্রো-মেকানিক্স বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সমুদ্রগামী জাহাজের ইঞ্জিন তৈরির অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের লাইনের জাহাজ ছিল সেকালে ধরনের, অথচ জার্মানি, ফ্রান্স ও ইটালিতে আমাদের চেয়ে অনেক ভালো জাহাজ তৈরি হয়েছে গত ১৫/১৬ বছরের মধ্যে। সুতরাং আমাদের নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকা আর সম্ভবপর নয়।

মিতব্যয়িতার দিক থেকে দেখতে গেলেও এতে আমাদের সুবিধা আছে। সাদাম্‌টন-নিউইয়র্ক লাইনে আমাদের তিনখানা জাহাজ চলছিল, আমরা সেখানে দুখানা জাহাজে কাজ চালাতে চাই। তিনখানা জাহাজের যাত্রী দুখানা জাহাজে ধরাতে গেলে জাহাজের আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে তার গতিও বৃদ্ধি করতে হবে। এইসব দিকে চোখ রেখেই 'কুইন মেরি' তৈরি হয়েছে।

দুখানা জাহাজ চালাতে আমাদের খরচ অনেক কম পড়বে, অথচ যাত্রীদেরও সময়ের সাশ্রয় হবে। বড়ো জাহাজে বেশি জায়গা থাকার দরুন যাত্রীদের আরামের সুব্যবস্থাগুলিও ভালোভাবে করতে পারা যাবে। অবশ্য এতে যদি আমরা আটলান্টিক খেয়া জাহাজের প্রতিযোগিতার 'ব্লু রিবন' লাভ করি, তাতে বিজ্ঞাপনের দিক থেকে খুব সুবিধা হবে, কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য তা নয়। 'ব্লু রিবন' পাওয়ার জন্যে এত পয়সা খরচ করবে, আমাদের ফার্ম এত কাঁচা নয়।

কুনার্ড-হোয়াইট স্টার লাইন কোম্পানির চেয়ারম্যান স্যার পার্সি বেটস তাঁর উপরোক্ত যুক্তির সঙ্গে আর একটা জুড়ে দিয়েছেন। যেটা অনেকটা হেঁয়ালির মতো শোনাবে। তিনি বলেন 'কুইন মেরি'র মতো আর একখানা জাহাজ তাঁরা যখন তৈরি করে জলে ভাসাবেন, তখন দেখা যাবে ব্যবসানীতি ও অর্থব্যয়ের দিক থেকে তাঁদের জাহাজ দুখানা সকলের চেয়ে ছোটো ও সকলের চেয়ে কম বেগবান। সেই ব্যবসানীতির দ্বারা নির্দিষ্ট যে সীমা তা ছাড়িয়ে গেলেই অমিতব্যয়িতার বিপদজনক পথে আমাদের পা দিতে হবে।

স্যার পার্সি বেটস তাঁর নিজের উক্তির সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ পোষণ করেন না। কিন্তু এটাও ভেবে দেখবার বিষয় যে, এ পর্যন্ত 'কুইন মেরি'র জুড়ি যে জাহাজখানা তৈরি হবার কথা, সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনো উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না।

এই সমস্যাকে ভালো করে বুঝতে হলে আটলান্টিক খেয়া-জাহাজগুলি কী কাজ হবে এবং গত একশত বৎসরের মধ্যে সেই কার্য সুসম্পন্ন করবার ক্ষেত্রে কী কী উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখা কর্তব্য।

বর্তমানে ইংল্যান্ডের সাদাম্‌টন বন্দর থেকে দুপুরবেলা যে জাহাজ নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, সোলেবট নামক সমুদ্রের ছোটো খাড়ি দিয়ে তাকে খুব আস্তে আস্তে যেতে হয় প্রায় কুড়ি মাইল পর্যন্ত।

নিডলস-এর বাতিঘর ছাড়িয়ে আইল-অফ-ওয়াইটকে বাঁদিকে রেখে অল্প দূরেই খোলা জায়গা ইংলিশ-চ্যানেল। এই চ্যানেলের পথে চেরবুর্গ পর্যন্ত ৬০ মাইল সে খুব জোরে যেতে পারে। চেরবুর্গ বন্দরে ইয়োরোপের অন্য দেশের যাত্রীদের জন্য দু-তিন ঘণ্টা তাকে অপেক্ষা করতে হয়।

সাদাম্‌টন ছেড়ে যাওয়ার আট ঘণ্টা পরে জাহাজ প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ আটলান্টিকের পথে যাত্রা শুরু করে—চেরবুর্গ থেকে সামব্রোজ চ্যানেল পর্যন্ত প্রায় ৩১৬০ মাইল সমুদ্রপথ।

আমব্রোজ চ্যানেল থেকে নিউইয়র্ক ডক পর্যন্ত জল-পুলিশ ও কোয়ারান্টাইন আইনের গোলযোগের জন্যে আরও ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। সুতরাং আটলান্টিকে পাড়ি দেবার সময়ের সাথে আরও প্রায় তেরো ঘণ্টা যোগ করলে সমস্ত জলযাত্রার প্রকৃত আন্দাজ পাওয়া যাবে।

১৯২৯ সালে 'মোরিটানিয়া' জাহাজ প্রথমবার যখন আটলান্টিকের খেয়া দেয় তখন ২৬ নট প্রতি ঘণ্টায় গিয়ে মোট ৪ দিন ২১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে সাদাম্‌টন থেকে নিউইয়র্কে পৌছায়। সেখানে অন্তত ছ-

দিন থাকার পরে তবে প্রত্যাবর্তন শুরু করে। যাত্রী ও মাল নামাতে এবং জাহাজের কলকবজা পরিষ্কার করতে যায় ৩ দিন। আর ৩ দিন লাগে ইঞ্জিনের তেল পুরতে, নতুন যাত্রী ওঠাতে। সুতরাং জাহাজ এ লাইনে যদি চালানো যায়, তাতে কুলায় না। কারণ ১৫ দিন অন্তর জাহাজখানার নিউইয়র্ক যাওয়া অসম্ভব।

পূর্বে এই লাইনে চারখানা জাহাজের কমে কাজ চলত না। ১৮৪০ সালে 'ব্রিটানিয়া' জলে ভাসানো হয়। তখনকার আমলে 'ব্রিটানিয়া' যত বড়োই হোক, এখনকার তুলনায় কিছুই নয়। আর তিনখানা এই আকৃতির জাহাজ ক্লাইড নদীর জাহাজ নির্মাণের কারখানায় কুনার্ড কোম্পানির জন্যে তৈরি হয়। তখনকার জাহাজ চলত প্যাড্‌ল দ্বারা। 'স্ক্রু' তখনও আবিষ্কার হয়নি।

'ব্রিটানিয়া' এই পথ ১৪ দিন ৮ ঘণ্টায় অতিক্রম করে এবং তখন এই সময়ই অল্প বলে গণ্য হয়। এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে আর কোনো জাহাজ সাদাম্‌টন থেকে নিউইয়র্ক যেতে পারত না।

বিগত নব্বই বছরের মধ্যে জাহাজ নির্মাণরীতির এত উন্নতি হয়েছে যে, সে ১৪ দিনের জায়গায় এখন জাহাজ ৪ দিনে যায়। এদিকে ইংলিশ চ্যানেল ও চেরবুর্গ, ওদিকে আমব্রোজ চ্যানেল ও নিউইয়র্কের ডকে জাহাজ বাধ্য হয়ে যতখানি বিলম্ব করে, সেটুকু বাদ দিয়ে আটলান্টিক সমুদ্রপথে জাহাজ যায় মাত্র ১২০ ঘণ্টা।

হোয়াইট স্টার ও কুনার্ড লাইনের প্রত্যেক জাহাজের প্রধান কর্মচারীকে উপদেশ দেওয়া আছে যে ১২০ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্র পার হতে হবে। প্রত্যেক জাহাজের কাপ্তেন এই সময়ের মধ্যে পাড়ি দিতে চেষ্টা করেন, তবে ঝড়বৃষ্টি বা অন্য দৈব দুর্বিপাকের কথা স্বতন্ত্র। সমুদ্রবক্ষে ঘন কুয়াশা হলে জাহাজ অনেক সময় পুরোদমে চালানো যায় না। যে সময় বরফের তাপ উত্তর সমুদ্র থেকে দক্ষিণ দিকে যায় তখনও খুব সাবধানে জাহাজ চালাতে হয়।

হোয়াইট স্টার লাইনের 'ম্যাজেস্টিক', 'ওলিম্পিক' ও 'হোসারিক'—এই তিনখানা জাহাজ ও কুনার্ড কোম্পানির তিনখানি জাহাজ 'একুইটানিয়া', 'মোরিটানিয়া' ও 'বেরেনজারিয়া' এই পথে বরাবর চলে আসছিল—কুনার্ড কোম্পানি হঠাৎ মতলব করলে যে দুখানা জাহাজে কাজ চালাব। 'একুইটানিয়া' ও 'বেরেনজারিয়া' জাহাজ দুখানা ওরা কিছুকাল চালিয়ে দেখলে যে এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। জাহাজ দুখানা খুব বেশি দ্রুতগামী নয়, নিউইয়র্ক বন্দরে সবসুদ্ধ দু-দিন মাত্র জাহাজ বিলম্ব করত, এতে অর্ধেক যাত্রী উঠতে পারত না। উত্তমরূপে পরিষ্কার না করার জন্যে জাহাজের কলকবজাও খারাপ হতে লাগল।

'একুইটানিয়া' জাহাজের সঙ্গে চালাবার জন্যে তাই 'কুইন মেরি' জাহাজের সৃষ্টি। 'মোরিটানিয়া' ও 'বেরেনজারিয়া' ভেঙে ফেলা হয়েচে, তাদের লোহালক্কড় অন্য জাহাজ তৈরি করতে লাগানো হবে।

একদল দুর্ভাগ্য ব্যক্তি আছে, তারা জাহাজে যতক্ষণ থাকে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য সমুদ্রকে ভুলে থাকা—কারণ সমুদ্রের ঢেউয়ের দুলুনি তারা সহ্য করতে পারে না। এদল বাদ দিয়েও সমুদ্রযাত্রায় সর্বসাধারণের পক্ষে প্রথম ও প্রধান যে অসুবিধা, সে হল এর নিষ্ক্রিয়তা।

যত বড়ো হোটেলই হোক এবং তাতে যত আরামই থাকুক, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যদি হাত-পা কোলে করে হোটেলের মধ্যেই বসে থাকতে হয় তা কারো ভালো লাগে না। 'কুইন মেরি' জাহাজের মধ্যে আটকে থাকা মানে শহরের মধ্যে কোনো একটা হোটেলে চুপচাপ বসে থাকা।

তবুও কোম্পানি যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছে যাত্রীদের অসুবিধা দূর করতে। জাহাজে দুটো গির্জা আছে, একটা রোমান ক্যাথলিক আর একটা অ্যাংলিকান। ইহুদিদের জন্যে পৃথক ভজনালয় আছে। দুটো সাঁতার দেবার পুকুর, পুকুরে বেড়াবার জন্যে ডেক, ফুলের বাগান, বড়ো বড়ো ব্রিটিশ চিত্রকরের আঁকা ছবি ওদের ডাইনিং হলের দেওয়ালে। কিন্তু এসব বাইরের ব্যাপার, আসল জিনিসটা হচ্ছে এই যে, 'কুইন মেরি' তার নির্দিষ্ট কাজ করে উঠতে পারবে কি পারবে না। যদি তা সম্ভব হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে 'কুইন মেরি'র চেয়েও বড়ো জাহাজ তৈরি হবে কি না?

কুনার্ড কোম্পানির কর্তৃপক্ষেরা বলেন, তা হওয়া অসম্ভব নয়। আটলান্টিকের পথে যত বড়ো জাহাজই হোক ভাসানো যেতে পারে। সুয়েজের পথে তা চলে না, কারণ ওপথে জাহাজের আয়তন সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, সুয়েজ খালের প্রস্থের সংকীর্ণতার দ্বারা।

আন্দ্রোথ

মি. ডেনিস পামার কিছুদিন পূর্বে কাগজে সেবিলিস দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্য বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেবিলিস্ ভারত মহাসমুদ্রে অবস্থিত। সম্প্রতি ভারত মহাসাগরে তিনি আর একটি দ্বীপ খুঁজে বার করেছেন, যা সেবিলিস দ্বীপপুঞ্জের মতোই সুন্দর অথচ ভারতের খুব কাছে বলে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সেখানে যাওয়া তত ব্যয়সাধ্যও নয়।

মি. পামারের লিখিত বর্ণনা থেকে আমরা কিছু উদ্ধৃত করে দিলাম।

আমি মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে একটা হোটেলে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে আমার সঙ্গে জনৈক দেশি জাহাজের মালিকের আলাপ হয়। লোকটি আমায় লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের কথা প্রথম বলে। এর আগে আমি লাক্ষাদ্বীপের নাম শুনেছিলাম, কিন্তু সেখানকার সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না।

এই লোকটির মুখে শুনলাম লাক্ষাদ্বীপ ভারত মহাসাগরের যে অংশে অবস্থিত, তার নিখুঁত চার্ট, এখনও তৈরি হয়নি, বড়ো বড়ো জাহাজ তো সে পথ দিয়েই চলে না, পালতোলা জাহাজ ভিন্ন স্টিমচালিত জাহাজ কচিৎ দেখা যায়। গবর্নমেন্ট কর্মচারী ভিন্ন অন্য কোনো ইয়োরোপীয় সেখানে যায়নি। তবুও আমি তার কথায় ততটা বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে নিজেও একটু অনুসন্ধান করলাম। অনুসন্ধানে জানা গেল আরব সমুদ্রের বাইরের অংশে মালাবার উপকূল থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। সবসুদ্ধ চোদ্দোটি ছোটোবড়ো দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। আন্দ্রোথ দ্বীপ এর মধ্যে বৃহত্তম, দৈর্ঘ্যে তিন মাইল, প্রস্থে দেড় মাইল।

এর অধিবাসী প্রায়ই মপলা, ধর্মে মুসলমান। তারা মালায়ালম ভাষাভাষী।

লাক্ষাদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গুজবও শোনা গেল। একটা গুজব এই যে, একদল বড়ো বড়ো ইঁদুর ওইসব দ্বীপে অত্যন্ত উৎপাত করেছে—সমস্ত খাদ্যশস্য তারা নিঃশেষ করে ফেলেছে। আরেকটা গুজব, সেখানকার মেয়েরা রাজনৈতিক ও সামাজিক শাসনের ভার নিজেদের হাতে নেওয়ার দরুণ সেখানে নারীরাজ্য স্থাপিত হয়েছে। নিজের চোখে জায়গাটা দেখে আসবার অত্যন্ত কৌতূহল হল।

কলিকট বন্দর থেকে সন্ধ্যাবেলা আমাদের জাহাজ ছাড়ল। এগুলিকে জাহাজ না বলে বড়ো নৌকো

বললে এর ঠিকমতো বর্ণনা করা হবে। এ দেশের মিস্ত্রির হাতে তৈরি হলেও সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার পক্ষে এগুলো বেশ উপযোগী।

পূর্ণিমা তিথি সেদিন। পশ্চিমঘাট পর্বতের মাথায় পূর্ণচন্দ্র উঠেছে, আরব সমুদ্রের জলে জ্যোৎস্না পড়ে কোথাও চিকচিক করছে, কোথাও জ্যোৎস্নায় আর কুয়াশায় মিশে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। আমাদের নৌকাখানা আরব সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে ডুবুডুবু অবস্থায় খাড়া পশ্চিম মুখে চলল। হাওয়া পেয়ে পাল ফুলে উঠল।

সে রাত্রের শোভা অবর্ণনীয়—ঘুম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকায় স্থির করলাম রাতটা ডেকে বসে জেগেই কাটিয়ে দেব। ঘুমের নানা বাধা, একে তো ডেকের ওপর লোকে লোকারণ্য, পা রাখবার স্থান নাই, তার ওপর তক্তার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য ছারপোকার আড্ডা, শুয়ে পড়লে রক্ষা নেই, সমস্ত গায়ে ছেঁকে ধরবে।

পরদিন সকাল থেকে বাতাস একদম পড়ে গেল। নৌকো আর চলে না। মপলা মাঝিরা দাঁড় বইতে আরম্ভ করলে। নৌকোর পালগুলো ছেঁড়া কাপড়ের মতো ঝুলতে লাগল। তিন দিন তিন রাত্রি একভাবে কাটল। আরব সমুদ্রের বক্ষ পুকুরের জলের মতো নিথর, নিস্পন্দ। সমুদ্রের কোনো দিকে অন্য কোনো জাহাজ বা নৌকো দেখলাম না।

তিনদিন পরে সকাল থেকে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর একজন মাল্লা মাস্তুলের ওপর উঠে দেখতে লাগল ডাঙা দেখা যায় কি না। এরকম দেখা অত্যন্ত দরকার, কারণ এই বিশাল সমুদ্রে লাক্ষাদ্বীপের মতো ক্ষুদ্র দ্বীপ দশফুট উঁচু একটা শৈবালস্তুপের মতো দূর থেকে প্রতীয়মান হয়—খুব সাবধান না থাকলে অনেক সময় গন্তব্য স্থান ছাড়িয়ে কয়েকশো মাইল বিপথে যাওয়ার পর বোঝা যায় যে পথ ভুল হয়েছে। এজন্যে প্রথমে যে ডাঙা দেখতে পাবে তাকে কিছু বখশিশ দেওয়ার নিয়ম আছে।

চতুর্থ দিন প্রাতে মাস্তুলের মাথা থেকে একজন মাল্লা চিৎকার করে বলে, ওই জমি দেখা গিয়েছে।

দু-ঘণ্টা বাদে আন্দ্রোথ বন্দরে আমরা নোঙর ফেলি।

কয়েক মিনিট মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি চেয়ে রইলাম।

আন্দ্রোথের তীরভূমি অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে বেঁকে গিয়েছে। বহুদূর পর্যন্ত বালি, তারপর দীর্ঘ নারিকেল গাছের বন। বন্দরের জল নীল ও স্বচ্ছ। নীচের তৃণাবলী ও প্রবালপুঞ্জ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নারিকেল বনের মধ্যে সারি সারি কুটির। এই সমস্ত ঘরের মধ্যে থেকে লোকজন আমাদের নৌকো দেখে ছুটে এল। আমায় দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। শুনলাম তিন বছর পূর্বে একজন সাহেব তাদের দ্বীপে নেমেছিল, তিন বছরের মধ্যে আর কোনো ইয়োরোপীয় এদিকে আসেনি।

আন্দ্রোথের শাসনকর্তা আমাকে অভ্যর্থনা করতে এলেন। তিনি মুসলমান, বহু বৎসর ধরে তাঁরা এই দ্বীপ শাসন করছেন। তাঁর আদেশে অধিবাসীরা আমায় একখানা নারিকেল পাতায় ছাওয়া কুটিরে নিয়ে গেল। সেখানে মেয়েরা আমার জন্য পাকাকলার কাঁদি, ডাব, মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দিলে।

অক্টোপাস শিকার এখানকার নিম্নবর্ণের লোকের একটি প্রধান ব্যবসা। এই কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক। হাঙর ও সোর্ডফিশ তো আছেই, তা বাদে হিংস্র অক্টোপাস দাঁড়া দিয়ে জড়িয়ে শিকারিকে অতল জলে নিয়ে ডুবিয়ে মারে। শিকারির যথেষ্ট কৌশল ও সাহসের আবশ্যক হয় এই হিংস্র কুদর্শন জীব শিকার

করতে। অক্টোপাসের দাঁড়া স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকের একটি উপাদেয় খাদ্য। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে অক্টোপাস একরকম কৃষ্ণবর্ণের তরল পদার্থ নিজের শরীর থেকে বার করে ছড়িয়ে দেয় শিকারির চোখে—তাতে অনেক সময় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।

সমুদ্রে নানাজাতীয় মাছ পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ সামুদ্রিক মৎস্য বিষাক্ত, সতর্ক না হয়ে যা-তা মাছ খেলে প্রাণসংশয় হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে সাধারণত হাটবাজার নেই, মালচেরিরা যখন মাছ ধরে আনে, দ্বীপের অধিবাসীরা সমুদ্রের তীরে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং সংসারের জন্যে যতটা তাদের দরকার, সেখান থেকে কিনে বাড়ি নিয়ে যায়।

আমার যাবার সময় উপস্থিত হল। আন্ড্রোথ ছেড়ে যেতে সত্যই কষ্ট হচ্ছিল। এখান থেকে গিয়ে সভ্যজগতের সভ্যজীবনে আমার খাপ খাওয়ানো যে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

মধ্য-আফ্রিকার বন্যজন্তু

কাপ্তেন পিটম্যান বহুদিন মধ্য-আফ্রিকার ইউগান্ডা প্রোটেক্টরেটে বন্যজন্তুর রক্ষক ও পরিদর্শক ছিলেন—এই অদ্ভুত পদ আমাদের দেশে নাই, সরকারি বনবিভাগের কর্মচারীরা ওই কার্য সাধারণত করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য দেশে বিশেষত যেখানে বনভূমি সুবিস্তীর্ণ ও বন্যজন্তু সুপ্রচুর (যেমন ইউনাইটেড স্টেটস, কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি) এবং আধুনিক ধরনের বন্দুক ও রাইফেলের সাহায্যে শিকার চলিয়া থাকে—স্থানীয় গবর্নমেন্টকে বাধ্য হইয়া সেসব স্থানে অবাধ প্রাণীহত্যা নিবারণ করিবার জন্য লোক রাখিতে হয়; ইহাদের game warden বলে। কাপ্তেন পিটম্যান বহু বৎসর ধরিয়া মধ্য-আফ্রিকার নানা স্থানে game warden-এর কাজ করিয়াছেন। ওখানকার বন্যজন্তু সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা যেমন ঘনিষ্ঠ তেমন বিচিত্র। তিনি সম্প্রতি তাঁহার এই সকল অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিবরণ অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক, সেখানে আমরা কাপ্তেন পিটম্যানকে শুধু বনরক্ষক কর্মচারী হিসাবে দেখি না, দেখি যে এই সকল বন্যজন্তুর জীবনযাত্রাপ্রণালি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিবার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মন তাঁর আছে। কাপ্তেন পিটম্যানের বিবরণ শুধু শিকারের গল্প নয়, naturalist-এর লিখিত বৈজ্ঞানিক কাহিনি। যে অসীম তৃণভূমির মধ্যে মুক্ত আকাশতলে তিনি জীবনের অধিকাংশ দিন কাটাইয়াছিলেন, যে অরণ্যপ্রকৃতিকে প্রাণ ভরিয়া তিনি ভালোবাসিয়াছেন, প্রকৃতির বুকে লালিত জন্তুজানোয়ারদিগকে ভালোবাসিয়াছেন—ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের কার্য, ইহাদিগকে ভালো না বাসিলে সম্ভব হইত না।

কুমিরের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইউগান্ডাতে একটি সুবৃহৎ মহিষকে একবার কুমিরে ধরে। মহিষটি গৃহপালিত, ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের কিনারায় জলজ ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় কুমিরটি তাহাকে আক্রমণ করে এবং গলার শিকলের একপ্রান্ত কামড়াইয়া ধরে, দেহের কোনো অংশ ধরিতে পারে নাই। উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া টানাটানি হয়, নিকটে একদল পশুপালক ছিল, তাহারা শব্দ শুনিতে পাইয়া আসিয়া মহিষের লেজ টানিয়া ধরিয়া টানিতে থাকে, ওদিকে কুমিরও টানিতে থাকে। কিছুক্ষণ টানাটানির পরে মহিষের দলই জয়লাভ করে, কিন্তু তার একমাত্র কারণ এই যে কুমিরটা ধরিবার কিছু পায় নাই, মহিষের অন্তত নাকটা ধরিতে পারিলেও কুমির হারিয়া যাইত না। নদীতে জলপানের সময়

একবার একটা বিরাটকায় গন্ডারের পা কুমির চাপিয়া ধরিয়াছিল—এবং অনেকক্ষণ টানাটানির পর কুমির গন্ডারটাকে নদীর মধ্যে হেঁচড়াইয়া লইয়া গিয়া ডুবাইয়া মারে।

কুমিরের সম্বন্ধে পিটম্যান একটা অদ্ভুত মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন কুমিরকে যত ভয় করা যায় আসলে তাহাদিগকে অতটা ভয় করিবার কারণ নাই। একথা সত্য যে আফ্রিকায় প্রতি বৎসরে অন্য সব জন্তুতে যত মানুষ মারে, একটা কুমির মারে তাদের সবগুলো জড়াইয়া যত হয় তার চেয়েও বেশি—কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে আফ্রিকার জলের ধারের গ্রামগুলি জনসংকুল এবং আফ্রিকার জলাশয় মাত্রেই কুমিরের অজস্র ভিড়। সে অনুপাতে হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে কুমির যে অতিশয় উগ্র ও হিংস্র প্রকৃতির এমন কথা বলা যায় না।

কিছুকাল পূর্বে গরিলা সম্বন্ধেও সাধারণের ধারণা ভ্রমপূর্ণ ছিল। দুশেলু প্রভৃতি কয়েকজন ভ্রমণকারী ইহাদের বিষয়ে যেসকল অতিরঞ্জিত বিবরণ লেখেন, তাহা পড়িয়া ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে গরিলা রাক্ষসের মতো হিংস্র প্রকৃতির, মানুষের গন্ধ পাইলে বুক বাজাইয়া জয়ঢাকের মতো আওয়াজ করিতে করিতে ছুটিয়া আসে, এক কামড়ে রাইফেলকে আখের পাঁপ বানাইয়া ছাড়িয়া দেয় ইত্যাদি। কিন্তু রাওয়েনজেরি পর্বতের উচ্চপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ভ্রমণকারী ও শিকারিদের যাতায়াতের পরে গরিলা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে; দুশেলু বর্ণিত গরিলার সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য অনেক। ইহারা মানুষের আওয়াজ পাইলে ছুটিয়া আসা দূরের কথা, নিবিড়তর বনের মধ্যে পালাইবার চেষ্টা করে। আকৃতিতে ইহারা দুশেলুর গরিলা অপেক্ষা ছোটো। যে নিবিড় বাঁশের বনে গরিলা বাস করে, সেখানে গিয়া অনেক খোঁচাখুঁচি করিয়াও ইহাদের বাহির করা দায়, এইজন্য কিন্তু পর্বতের দুর্গম অধিত্যকায় উঠিয়াও অনেকেরই গরিলা না দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, গরিলার সংখ্যা দিনদিন কমিয়া আসিতেছে—এবং এখন হইতে রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা বা অবাধ শিকার বন্ধ না করিলে আর চল্লিশ বৎসরের মধ্যে গরিলাকুল নির্মূল হইয়া যাইবে। এইচ. জি. ওয়েলস্ কিছুদিন পূর্বে স্ট্রান্ড ম্যাগাজিনে ইহা লইয়া একটি সুন্দর গল্প লিখিয়াছেন।

আজকাল বন্যজন্তু শিকার করা অপেক্ষা ক্যামেরার সাহায্যে তাদের ফটো লওয়ার প্রচলন বেশি হইয়াছে। এই কার্যে সাহস ও কৌশল উভয়েরই প্রয়োজন, নতুবা সাফল্যের আশা কম। পিটম্যানও এরূপ

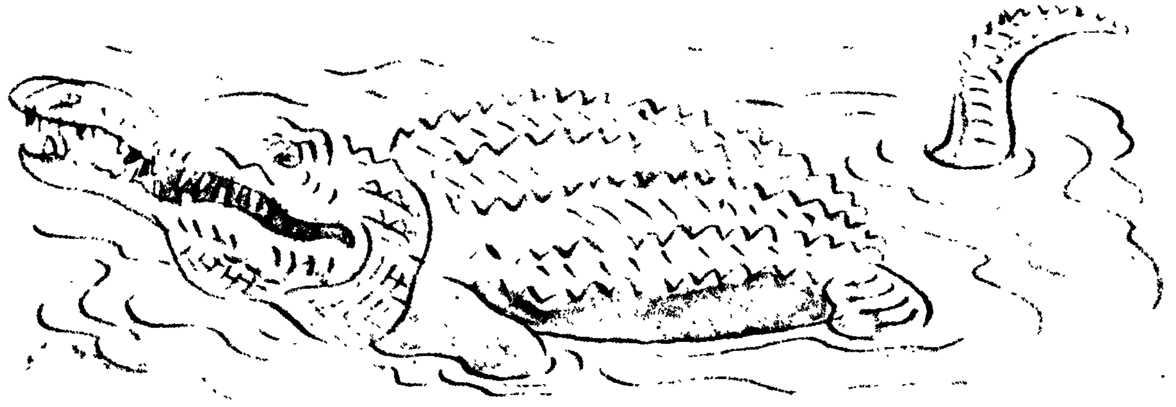

বহু ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন—তিনি প্রাণীশিকারের পক্ষপাতী নহেন, স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্তুদের ফটোগ্রাফ লওয়ার আমোদ তাঁর কাছে অনেক বেশি।

বন্য সাদা বেজির ধূর্ততা সম্বন্ধে পিটম্যান একটি চমৎকার গল্প বলিয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধু মুরগি পুষিতেন। মুরগির ঘরের চারিদিক তারের বেড়া দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই প্রতিরাত্রে কীসে দু-চারটি মুরগির ঘাড় মটকাইয়া রাখিয়া যাইত। অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা হইল কিন্তু উৎপাত বরং ক্রমেই বাড়িয়া চলে, কমিবার নামও নাই। অবশেষে পিটম্যান মুরগির খাঁচার পাশে গর্ত খুঁড়িয়া রাত্রে নিজে পাহারা দিতে লাগিলেন। একটুখানি তন্দ্রা আসিয়াছে মাত্র, হঠাৎ কীসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তারের বেড়ার গা ঘেঁষিয়া বেড়ার ওপাশে কী যেন একটা জানোয়ার। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় যেন একটা বড়ো বনবিড়ালের মতো দেখাইতেছে—খুব দীর্ঘ লোমবিশিষ্ট বনবিড়াল।

পরবর্তী ঘটনা পিটম্যানের নিজের কথায় বলি।

আমি অবাক হয়ে জানোয়ারটার দিকে চেয়ে রইলাম। ব্যাপার কী? জানোয়ারটা একটা অদ্ভুত কাজ করছিল। সেটা ধীরে ধীরে নাচের ভঙ্গিতে লোমগুলো খাড়া করে কখনো লাফিয়ে, কখনো খুঁড়িয়ে তারের সামনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

কখনো সেটা লাফাচ্ছে, কখনো লেজটা জমিতে আছড়াচ্ছে, কখনো বা হঠাৎ পিছু হটে যাচ্ছে, কখনো বা তারের বেড়া ঘেঁষে এগিয়ে আসছে, এতটুকু থামছে না, দম নিচ্ছে না—থিয়েটারি নাচের ভঙ্গিতে একবার এদিক-ওদিক ছুটছে—নানা ভঙ্গি করছে, কিন্তু সবই সেই মুরগির তারের ঘরের তারের বেড়ার সামনেটাতে।

সব জিনিসটা ঘটাচ্ছে কিন্তু নিঃশব্দে, এতটুকু শব্দ নেই কোনোদিকে।

একটু পরে এই চাঁদের আলোয় ভূতের নৃত্যটা মুরগিদের চোখে পড়ে গেল। বারে, কী ওটা। দু-চারটি মূর্খ মুরগি নিজেদের খোপ থেকে বার হয়ে লম্বা গলা বাড়িয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে তারের বেড়ার দিকে এগিয়ে চলল। তবু ভালো দেখা যায় না—ওটা নাচে কী ওখানে! বেড়ার ফাঁক দিয়ে দু-একটা মুরগি গলা বার করে দেখতে গেল। আর একটু হলে জানোয়ারটা মুরগিগুলোর ঘাড় মটকাত। কিন্তু আমি সেই সময় গুলি ছুঁড়লাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গুলি লাগল না—জানোয়ারটা পালিয়ে গেল।

তারপর মুরগির খাঁচার সামনে ফাঁদ পাতা হল। দু-রাত পরে সেটা নাচতে নাচতে এসে ধরা পড়ে গেল। অদ্ভুত কাণ্ড! জানোয়ারটা আর কিছু নয়, একটা কৃশকায় বুনো বেজি। কে জানত তার পেটে এত ফন্দি-ফিকির ও বদমাইশি!

দক্ষিণ আমেরিকার অজ্ঞাত পর্বত

ব্রিটিশ গায়েনার ঘন অরণ্যের মধ্যে রোরাইমা পর্বত অবস্থিত। যদিও এই সকল অরণ্যসংকুল স্থানের অনেক অংশ বিভিন্ন ভ্রমণকারীদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, রোরাইমা পর্বত সম্বন্ধে বাইরের লোকের জ্ঞান এখনও অল্পই। এখানে অসভ্য ইন্ডিয়ান অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার ব্রেজিলের অন্য অন্য স্থানের বনবাসী ইন্ডিয়ান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এজন্য নৃতত্ত্ব বিদ্যার দিক হইতেও এদেশ ভ্রমণের মূল্য কম নয়।

সম্প্রতি American Museum of Natural History-র তরফ হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ রোরাইমা পর্বত ও মালভূমিতে প্রেরিত হন সেখানকার জন্তু ও উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ করিতে। বিখ্যাত পক্ষীতত্ত্ববিদ্ মি. টি ডি কার্টার ইঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রোরাইমা মালভূমির সর্বোচ্চ স্থান রোরাইমা পর্বত—আগাগোড়া বেলেপাথরের, খাড়াই অসাধারণ, যেমন ভীষণ দর্শন তেমনি দুরারোহ। এখানকার জীবজানোয়ার সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় নাই বলিয়াই অনেকদিন হইতে জীবতত্ত্ববিদ্গণের নিকট এই প্রদেশ রহস্যময় ছিল। কার্টার সাহেবের দল ফিরিয়া আসিবার পরে যে ভ্রমণকাহিনি লিখিয়াছেন, তাহাতেও দেশের অধিবাসী ও জন্তুজানোয়ারদের বিষয়ে অনেক নূতন কথা জানা গিয়াছে।

ব্রিটিশ গায়েনা, ভেনেজুয়েলা ও ব্রেজিল—এই তিন দেশের সীমানা যেখানে মিশিয়াছে, রোরাইমা ঠিক সেখানে অবস্থিত। ভূতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এ পর্বত অতি প্রাচীন, প্রায় ত্রিশ কোটি বৎসর পূর্বে রোরাইমা পর্বতের জন্ম হয়, কিন্তু তখন ইহা পর্বত ছিল না এখনকার মতো। আদিম যুগের বিশাল, অগভীর হ্রদের তলদেশে ভবিষ্যতের রোরাইমা পর্বত ছিল সামান্য শুধু একটি মাটি ও কাদার ঢিবির মতো।

ক্রমে বহুকাল চলিয়া গেল। ভূপৃষ্ঠের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিল। সেকালের বড়ো বড়ো হ্রদ শুকাইয়া গেল। বহুবিস্তৃত পলিমাটির সঙ্গে বালি মিশিয়া রৌদ্রের তাপে সবটা জমাট বাঁধিয়া শক্ত সর পড়িয়া পাথরের আকার ধারণ করিল। পরবর্তী কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যে গলিত প্রস্তরের স্রোত উহার উপর পড়িয়া কঠিন স্তরের সৃষ্টি করিল—বর্তমানে বুঝিবার কোনোই উপায় নাই যে কোথা হইতে বা কীভাবে এই লাভাস্রোত আসিয়াছিল।

কালক্রমে নানা প্রাকৃতিক উৎপাতে এই শক্ত স্তরের চারিদিক খসিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে পড়িতে মাঝখানের খানিকটা অংশ নৈবেদ্যের মধ্যে আলোচালের চূড়ার মতো অবশিষ্ট রহিল—ইহাই বর্তমানকালের রোরাইমা পর্বত।

বহুকাল হইতে রোরাইমা পর্বতের শিখরদেশে উঠিবার চেষ্টা চলিতেছে, এদেশের উদ্ভিদ ও জন্তু সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়া দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গলের অনেকেই বেঘোরে প্রাণ হারাইয়াছে—তথাপি কেহই বিশেষ কিছু জানিতে পারে নাই এতকাল পর্যন্ত। সর্বোচ্চ শিখরে কেহ কেহ ইতিপূর্বে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং তাহারা সকলেই দু-এক ঘণ্টা উপরে কাটাইয়া তখন নামিয়া পড়ে।

এইজন্য ইহাদের বিবরণ পাঠে কোনো বৈজ্ঞানিক কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় না।

রোরাইমা অঞ্চলের প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে যতটুকু ইহার পূর্বে জানা গিয়াছে তাহাতে এই কৌতূহল বাড়িয়াছে বই কমে নাই। অনুসন্ধিৎসু পর্যটকেরা সামান্য কিছু নমুনা সঙ্গে করিয়া ফিরিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের জিনিস। কার্টার সাহেব ও তাঁর দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আরও বেশি নমুনা সংগ্রহ করা এবং রোরাইমার প্রাণী ও উদ্ভিদসমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা।

ইঁহাদের পূর্বে যাঁরা রোরাইমার পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে Sir Robert H. Schomburg-এর নাম বিখ্যাত। ইনি ১৮৩৫-৩৯ সালে এ অঞ্চলে আসিয়া কার্য শুরু করেন। কিছুকাল পরে পুনরায় ফিরিয়া সমস্ত জায়গাটার সীমানা নির্বাচিত করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে Everard F. Im

Thurn জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিবার সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বোচ্চ শিখরে উঠিতে সমর্থ হন নাই।

মি. কার্টার ও তাঁহার দল দক্ষিণ দিক হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। আমাজন নদী বাহিয়া মানাওস পর্যন্ত ও তথা হইতে ব্রাঞ্চো ও বোয়ো ভিস্টা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সুরুমু নদীতে পড়েন। স্টিমার ইহার বেশি অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাং একটা বড়ো নৌকাতে জিনিসপত্র বোঝাই দিয়া দলটি সুরুমু ও কাটঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে পৌঁছায়। এখান হইতে নদীপথ অতীব দুর্গম, নদী ক্রমশ উপরের দিকে উঠিয়াছে, ইন্ডিয়ান মাঝিরা কোমরে দড়ি বাঁধিয়া গুণ টানিতে টানিতে ভীষণ স্রোত ঠেলিয়া নৌকা উপরে উঠাইতে শুরু করিল।

লিসাও পৌঁছিয়া ইঁহারা বিলম্ব করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রেজিল গভর্নমেন্ট আরেকটি দল এ অঞ্চলের ইন্ডিয়ান জাতিসমূহের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে দিলেন, General Candido Marian da Silva Rondon-এর অধীনে। ইঁহাকে এখানকার ইন্ডিয়ানরা অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করে, ইঁহার আসিবার নাম শুনিয়া বহুস্থান হইতে তাহারা লিমাওতে জড়ো হইতেছিল, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সব ধরনের ইন্ডিয়ান। অনেক চেষ্টা করিয়াও মি. কার্টার কুলি জোগাড় করিতে পারিলেন না; General Rondon-কে না দেখিয়া নড়িতে রাজি নয়।

কয়েকদিন বৃথা চেষ্টা করিবার পর ইঁহাদের দলের অন্যতম বৈজ্ঞানিক মি. টেট্ অশ্বারোহণে দক্ষিণ দিকে দুই দিনের পথ গিয়া General Rondon-এর তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে উভয় দলের উদ্দেশ্য প্রায় যখন একই, তখন দল দুটি মিলিয়া একত্রে রওনা হইলে সকল দিকেই সুবিধা ঘটিবে।

General Rondon সানন্দে সম্মতি দিলেন, Sao Marcos হইতে এই দুই দল এক হইয়া রওনা হইল। সঙ্গে প্রায় তিন শত ইন্ডিয়ান স্ত্রী-পুরুষ, অনেক ইন্ডিয়ান স্ত্রীলোক পিঠের দিকের থলিতে ছোটো ছেলে ঝুলাইয়া চলিতেছিল।

এতগুলি লোক লইয়া রাস্তা চলা সহজ নহে, তার উপর যখন এত দুর্গম, কাজেই পনেরো দিনের স্থলে এক মাস সময় লাগিয়া গেল।

General Rondon-এর ইচ্ছানুসারে দলটি কিছুদুর উঠিয়া তাঁবু ফেলিল। কিছুকাল পূর্বে জনৈক জার্মান পণ্ডিত নূতন শ্রেণির উদ্ভিদের সন্ধানে আসিয়া তাঁবু ফেলিয়াছেন, তাঁহার নামে স্থানের নামকরণ হইল Phillip camp (৫২০০ ফুট)। এখানে কয়েক শ্রেণির অদৃষ্টপূর্ব পক্ষী ও উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেল, যাহা রোরাইমা পর্বত ভিন্ন অন্য কোথাও মেলে না। ইন্ডিয়ানরা বাঁশের চোঙের সাহায্যে তির ছুঁড়িয়া অনেক পক্ষী সংগ্রহ করিল।

এখান হইতে শিখরে আরোহণ করার উদ্যোগ চলিল। পথ অতীব দুর্গম ও বিপজ্জনক, সারা পথটি ধরিয়া বাঁদিকে গভীর খাত—অনেক সময় আরোহণ পথটির একেবারে ধারে—কখনো বা ২৫ ফুট বা ৩০ ফুট দূরে। দাবানলের প্রকোপ এখানেই সর্বাপেক্ষা বেশি, বৃহৎ বনস্পতিদের একটিও অক্ষত অবস্থায় নাই। নিম্নে জলপ্রপাতগুলির ধারা কুয়াশায় অদৃশ্য হইয়াছে, গাছপালাও চোখে পড়ে না।

শিখরে উঠিতে পুরা একদিন লাগিল। টেবিলের মতো সমতলভূমিতে তাঁবু ফেলা হইল। চারিধারের

সৌন্দর্য যেমন অপূর্ব, নিস্তব্ধতাও তেমনি অসাধারণ। মি. কার্টার লিখিয়াছেন, আমার মনে হইল প্রকৃতির এই গুপ্ত লীলাভূমিতে আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, এখানকার অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল, নিজেকে তুচ্ছ কীটানুকীট বলিয়া বুঝিলাম।

এখান হইতে কুকেলাম পর্বত পর্যন্ত একটা প্রস্তর সেতুর মতো আছে, তার দু-ধারের সমতলভূমি উপর হইতে সমুদ্রের মতো দেখায়। সমগ্র অঞ্চলটাই অদৃষ্টপূর্ব শ্রেণির পাখি ও উদ্ভিদের আবাসস্থান। যদিও Lost World-এ উল্লিখিত অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ারদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ছিল। তবু ইঁহারা যেসকল জন্তু ও উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা রোরাইমা অঞ্চলের বাহিরে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পাহাড়ি ফাটলে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ বিষাক্ত ব্যাং থাকে, যাহার গায়ে হাত দেওয়াও বিপজ্জনক, সে ব্যাং ইঁহারা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সিন্দূরবর্ণ নক্ষত্রাকৃতি এক ধরণের অতি সুন্দর ফুল পাহাড়ের সর্বত্র ফুটিয়াছিল। আইসক্রিম খাওয়ার চামচের মতো ঝাড়বিশিষ্ট নূতনধরনের ফার্ন, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত শ্রেণির মক্ষিকাভুক্ত গাছ, একপ্রকার খুব বড়ো বড়ো বৃশ্চিক, মাকড়সা, গুবরেপোকা প্রভৃতি এঅঞ্চলের জীব ও উদ্ভিদ জগতের বিশেষত্ব। কয়েকদিন বনে জঙ্গলে বেড়াইয়া এগুলির নমুনা ইঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

একধরনের পাখি রোরাইমার পবর্তশিখরে পাওয়া যায়, যার ডাক ঠিক ঘণ্টাধ্বনির মতো—কামার দোকানে নেহাই-এর উপর হাতুড়ির ঘা মারিলেই যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমনি ঠং ঠং—ক্লিং ক্লিং। সন্ধ্যাকালে ছাড়া এ পাখির ডাক অন্য সময়ে বড়ো একটা শোনা যায় না, নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে তখন এ অদ্ভুত রব এমন রহস্যময় মনে হয়।

রাত্রে তাঁবুতে আলো জ্বলিলে কোথা হইতে বড়ো বড়ো অদ্ভুতদর্শন পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া আলোর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কিন্তু দিনে ইঁহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন।

প্রথমে আধ শুকনো ঘাসের জমি বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এ অঞ্চলের পানীয় জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন, ঘাসের জমি ছাড়াইয়া জলাভূমি ও চূড়াকৃত ছোটখাটো অসংখ্য পাহাড়। তালগাছের সারির মধ্যে পাহাড়ি নদী ঝিরঝির করিয়া বহিতেছে, কখনো বা ইন্ডিয়ান গ্রামের তালপাতায় ছাওয়া কুটির। একটু দূরেই ঘন জঙ্গল, জমি স্যাঁতসেঁতে, দীর্ঘ দীর্ঘ সাভানা ঘাসে গাছের গুঁড়ি পর্যন্ত অনেকটা ঢাকা।

অরণ্যভূমি উত্তীর্ণ হইয়াই Serra Pacarima পর্বতশ্রেণি; ব্রেজিল ও ভেনেজুয়েলা রাজ্যদ্বয়ের সীমানা নির্দেশ করিতেছে। উত্তর দিকের ঢালু অত্যন্ত দুর্গম, ইহার শিখরে উঠিতে সারাদিন কাটিয়া গেল। এখান হইতে চতুর্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর, দক্ষিণে বহুদূর নীল কুকেলাস পর্বতমালা, নিম্নে সবুজ তৃণাবৃত পাহাড়ি ঢালুর পাদদেশে মিয়াং নদী, মাঝে মাঝে ঘন বন ও ধূসর রঙে বড়ো বড়ো প্রস্তরখণ্ড। সান্ধ্য কুয়াসাচ্ছন্ন রোরাইমা পর্বতচূড়া চল্লিশ মাইল দূরে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। চার দিনে পাহাড়ের অপর দিকে নামিয়া আমরা নৌকায় যাত্রা আরম্ভ করিলাম। রোরাইমা পর্বত কী ভীষণদর্শন ও অদ্ভুত মনে হইতেছিল! পাশাপাশি একটি সুবৃহৎ কুয়াশাবৃত চূড়া, একটি ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফুট ও অপরটি ৮৬০০ ফুট উচ্চ, দুটিরই মাথা সমতল, ঠিক যেন দুখানি বিরাটকায় পাথরের টেবিল। নির্জন অরণ্যে কোনো দৈত্যগণ তাহার উপরে লেখাপড়া করে। নানাস্থানে চকচকে রুপার সুতা ঝুলিতেছিল, সেগুলি পাহাড়ি ঝরনা, তাহাদের মধ্যে একটি মিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থল মিয়াং জলপ্রপাত।

বৈকালে দলটি রোরাইমার পাদদেশে পৌঁছিল।

পাদদেশের তাঁবু হইতে তিন হাজার ফুট খাড়াই উঠিলে তবে খানিকটা ছাদের মতো সমতল স্থান পাওয়া যায়, সেখান হইতে উপরে উঠিবার পথ আরও দুর্গম, এই অংশটুকু নিউইয়র্কের সর্বোচ্চ অট্টালিকা ওলওয়ার্থ বিল্ডিং-এরও দ্বিগুণ উচ্চ। খাড়াই এমন ভয়ানক উচ্চ যে দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। এই রোরাইমা পর্বত ও এই অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত বনভূমিকে অবলম্বন করিয়া ঔপন্যাসিক কোনান ডয়েল তাঁহার Lost World উপন্যাস লিখিয়াছেন। কারণ দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে যদি কোথাও সেকালের অধুনালুপ্ত অতিকায় জন্তুদের আজও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয়, তবে সে এখানেই। যাহা কিছু অদ্ভুত ও রহস্যময় ঘটনা, নির্বিবাদে তাহা এ অঞ্চলের ঘাড়ে চাপানো যাইতে পারে।

একটা ব্যাপারে ইঁহাদের বড়োই নিরাশ হইতে হইল। Im Thurn যে বিশাল অরণ্যের কাহিনি লিখিয়া গিয়াছেন, সে বন দাবানলে পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, রোরাইমার অধিত্যকার সে অপূর্ব আরণ্যশোভার কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। বছর দুই পূর্বে একবার এ অঞ্চলে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়। বনের গাছপালা শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায়, সেই সময় দাবানল আবির্ভূত হইয়া সমগ্র বনানীকে ধ্বংস করিয়া ফেলে—এখন যেদিকে চোখ পড়ে, সেদিকেই দগ্ধ গাছের গুঁড়ি দাঁড়াইয়া আছে।

দাবানলের উৎপাত নানাভাবে হইয়া থাকে। ইন্ডিয়ানরা পথ পরিষ্কার করিবার জন্য আগুন জ্বালাইয়া বন পোড়ায়, অনেক সময় বনে আগুন দিয়া সাপ মারে। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইবার ঘাসের ঝোপে আগুন দিয়া নিজের আগমন বার্তা জানাইয়া দেয়। এইসব আগুন হইতেই সাধারণ বনব্যাপী দাবানলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনুকূল বায়ু বহিলে তো কথাই নাই।

তাঁবুতে নানা জাতীয় ইন্ডিয়ান থাকায় তাহাদের আচার-ব্যবহার ও ধর্মবিশ্বাসের তুলনামূলক চর্চা করিবার যথেষ্ট সুবিধা ইহাদের ঘটিয়াছিল। রোরাইমা পর্বতের আশেপাশে আর্কুনা ইন্ডিয়ানদের বাস—ইহারা দেখিতে বেঁটে হইলেও খুব বুদ্ধিমান ও কৌতুকপ্রিয়। ইহারা নানারকম বন্য পশুপক্ষীর ডাকের নকল করিতে সুপটু—শুধু পশুপক্ষীর ডাক নয়, ইহারা যেকোনো শব্দ একবার শুনিলে তাহার নকল করিতে পারে। টাইপরাইটারের টিকটিক শব্দ তাঁবুতে বারকয়েক শুনিয়াই নকল করিয়া ফেলিল।

ইহারা ধনুর্বাণ ছুঁড়িতে বিলক্ষণ পটু। বাঁশের লম্বা চোঙের মধ্যে ফুঁ দিয়া ইহারা একরকম তির ছোঁড়ে (blowpipe darts)—সেগুলি প্রায়ই তালের কাঠের তৈরি এবং লম্বায় বারো ইঞ্চির বেশি নয়—কিন্তু আগায় বিষ মাখানো থাকে বলিয়া একবার গায়ে বিঁধিয়া গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বাঁশের চোঙগুলি আটফুটের বেশিও লম্বা হইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে মুদ্রার প্রচলন নাই। জঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বদলে ইহারা কাপড় লয়। রঙের মধ্যে লাল রংটাই ইহাদের খুব প্রিয়। কোমরে এক টুকরা লাল কাপড় জড়াইয়া রাখা এদেশের পুরুষদের একটা সৌখিনতা। খাটাইয়া লইবার পরে ইহাদের বেতন মুদ্রায় দিতে হয় না, মুদ্রার পরিবর্তে সুতা, সুঁচ, আয়না, বঁড়শি, লবণ প্রভৃতি দিলে চলে।

রোরাইমা পর্বতের শিখরদেশ বারোমাস কুয়াশাবৃত থাকে, শীতও বেশি, এজন্য সেখানে বেশিদিন তাঁবু খাটাইয়া বাস করা মোটেই আরামের নয়। মি. কার্টার যতদিন ছিলেন, নির্মল মেঘশূন্য আকাশ একদিনও পান নাই। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মেঘে ও কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা অস্পষ্ট—

ক্যামেরার সাহায্যে ফটো লওয়া একপ্রকার সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিখরদেশে প্রায়ই বড়ো গাছপালা নাই, বেলে পাথরের স্তরের ধারে ধারে একপ্রকার ছোটো ছোটো লাল রঙের চারাগাছ ও দু-দশটা শীর্ণকায় বৃক্ষ সেখানকার একমাত্র উদ্ভিদ। এই অনুর্বর পাথরের রাজ্যে যদিও জীবজন্তুর আহার্য অতীব দুষ্প্রাপ্য, তবু মি. কার্টার সেখান হইতে ১২০ প্রকার প্রাণী ও ৯০ প্রকার ফার্ন ও গাছপালা ও অনেক নতুন ধরনের শেওলা ও ছাতা জাতীয় উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

প্রস্তরময় শিখরের নানা স্থানে রৌদ্র-বৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নানা অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়াছে—সাপ, ছাতা, ড্রাগন—আবছায়া কুয়াশায়, কী রহস্যময়ই যে দেখায়! এই অজ্ঞাতপূর্ব জীবজন্তু সমাকুল কুয়াশাবৃত বিশালদর্শন পর্বত মনে ভয় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে—মনে হয় রোরাইমা শুধু নির্জীব প্রস্তরস্তূপ নয়, সে জীবন্ত, তার ব্যক্তিত্ব আছে, সে সব দেখিতেছে, সব বুঝিতেছে—সাধে কি বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতকে পিতা রোরাইমার ক্রুদ্ধ তর্জন কল্পনা করিয়া ভয়ে কাঁপে?

উত্তর কানাডায় রেডিয়াম খনি আবিষ্কার

রেডিয়াম বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খনিজদ্রব্য। উত্তর কানাডায় হঠাৎ রেডিয়াম খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় সভ্য জগতে কীরূপ হইচই পড়ে গিয়েছে আমরা তার বিশেষ কোনো খবর রাখি না, কী অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে এই খনি আবিষ্কৃত হল সে কাহিনি অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ।

উত্তর কানাডার তুষারবৃত পার্বত্যভূমি ও বিরাট সমতলক্ষেত্র নানা ধাতুর ভাণ্ডার। Kootenay, Klondike, Porcupine প্রভৃতি পৃথিবী বিখ্যাত খনির কথা ছেড়ে দিলেও ছোটো-বড়ো নানা ধরনের খনিতে এই দেশ পরিপূর্ণ। উত্তর কানাডার খনিজ সম্পদ সত্যই অতুলনীয়। এর সবটা এখনও অনাবিষ্কৃত—হাডসন ও শিস নদীর উত্তর-পূর্ব দিকে এমন সব স্থান আছে যেখানে আজও পর্যন্ত কোনো সভ্য মানুষ যায়নি। সেসব জায়গায় আরও কত মূল্যবান ধাতুর ভাণ্ডার আছে, কে তার খবর রাখে।

রৌপ্য ওদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রায় একশত ফুট উঁচু তামার পাহাড় চীনদেশের প্রাচীরের মতো দেশের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে—যদিও দৈর্ঘ্যে অত বড়ো নয়, মাত্র ৪০ মাইল—খনির মালিকের পক্ষে তাই বা কম কী? সোনা, লোহাও প্রচুর পাওয়া যায়।

কিন্তু বর্তমানে উত্তর কানাডার তুষারমেরুতে যেসকল এরোপ্লেন অনবরত যাতায়াত আরম্ভ করেছে সভ্যজগৎ থেকে ১৪০০ মাইল দূরে—তাঁদের উদ্দেশ্য সোনা বা রুপা খোঁজা নয়, এদের চেয়েও লক্ষ গুণ দামি জিনিসের সন্ধানে এরা বার হয়েছে—সেই মূল্যবান জিনিসটি রেডিয়াম।

ক্যানসার রোগের চিকিৎসার জন্য রেডিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রেডিয়াম ছাড়া ক্যানসারের আজকাল আর কোনো চিকিৎসা নেই—পৃথিবীর বাজারে এইজন্য রেডিয়াম খুব চড়া দামে কেনা ও বিক্রি হয়—আরও বিশেষ করে এর দাম এই জন্য বেশি যে, সারা পৃথিবীর বাজারে রেডিয়াম পাওয়া যায় মাত্র পৌনে এক সের। এক আমেরিকাতেই ক্যানসার চিকিৎসার জন্য যতগুলি হাসপাতাল আছে, তাতে এর তিনগুণ পরিমাণের রেডিয়াম দরকার—কিন্তু পাওয়া যায়? পৃথিবীর রেডিয়াম ভাণ্ডারের যখন এমন

অবস্থা সেই সময় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে উত্তর কানাডায় রেডিয়াম খনি আবিষ্কৃত হয়েছে—পৃথিবীসুদ্ধ একটা সোরগোল পড়ে গেল।

গিলবার্ট কাইন নামে একজন লোক ২৫ বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলে রৌপ্যখনি খুঁজে বেড়াত, এদিকের প্রত্যেক পাহাড়-পর্বত তার সুপরিচিত। আরও কতকগুলি ব্যাপার গিলবার্ট কাইনের সুপরিচিত ছিল।

সংক্ষেপে সে ব্যাপারগুলি এই—

উত্তর কানাডাতে যখন সর্বপ্রথম সভ্যমানুষ আসতে আরম্ভ করে, সেই সময় এখানকার বৃদ্ধ রেড ইন্ডিয়ানদের মুখে তারা প্রবাদ শোনে যে বহুদূর উত্তরে চিরতুষারভূমির মধ্যে কোথায় একটি নদী আছে, যার তীরে তামা পাওয়া যায়। তাদের কাছে বিশুদ্ধ তামায় গড়া কুড়াল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ছিল। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে স্যামুয়েল হার্ন নামে হাডসন বে কোম্পানির একজন কর্মচারী জনৈক বৃদ্ধ রেড ইন্ডিয়ান পথপ্রদর্শককে নিয়ে এই অজ্ঞাত তামার খনির সন্ধানে বাহির হন।

বহু বিপদ উত্তীর্ণ হবার পরে হার্ন এই নদী বার করেন ও তার নাম রাখেন copper mine; সেই নামেই এখনও এ নদী পরিচিত। উত্তর মেরু প্রদেশে তিনিই প্রথমে পদার্পণ করেন ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে—কিন্তু তামার খনির কাজ তিনি আরম্ভ করতে পারেননি—নানা কারণে গবর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটে, কিছুদিন সেখানে থাকবার পরে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এই ঘটনার দুশো ত্রিশ বছর পরে কানাডা গবর্নমেন্টের তরফ থেকে একজন কর্মচারী এই অঞ্চল জরিপ করতে প্রেরিত হন—তিনি রিপোর্ট করেন যে মেরু প্রদেশের প্রান্তসীমাবর্তী বিশাল হ্রদটির (Great Bear Lake) চারধারে যত পাহাড় আছে, সবগুলিতেই কোবাল্ট ও তামার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তাতে গবর্নমেন্ট বিশেষ কোনো কর্ণপাত করেন না। মাত্র বছর দশেক আগে চার্লি স্নোয়ান নামে আরেকজন দুঃসাহসী ব্যক্তি একই Great Bear Lake-এর তীরে ধাতুর সন্ধানে গিয়েছিল এবং সে ফিরে এসে ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি ঘুরে বেড়াত আর বলত, কিছু টাকা হলেই সে একেবারে প্রথম শ্রেণির খনির সন্ধান সবাইকে দিতে পারে ও খনির কাজ আরম্ভ করে দিতেও পারে—কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না।

এসব অতীত কাহিনির মধ্যে পড়ল। ইতিমধ্যে আকাশপথে চলাচল সহজ হয়ে গেল এরোপ্লেনের অদ্ভুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং এর আগে উত্তর কানাডার অজ্ঞাত বিশাল তুষারাবৃত অঞ্চলে যাওয়ার যে কষ্ট ছিল—তাও দূর হয়ে গেল। ১৯২৯ সালে গিলবার্ট কাইন এরোপ্লেনে রওনা হয়ে Great Bear Lake-এ পৌছান ও Hunter Bay-র ধারে তাঁবু খাটিয়ে কিছুদিন থাকেন। দিন পনেরো পরে চার্লি স্নোয়ান এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। তাঁরা দুজনে হ্রদের চারধারে ঘুরে বেড়িয়ে অনেক তামার খনির সন্ধান পান। কিন্তু তামার সন্ধান পেলে কী হবে, তাঁরা ভেবে দেখলেন এ তামা সভ্য জগতের বাজারে গিয়ে পৌছানোর কোনো বন্দোবস্ত হবার উপায় নেই—এত খরচ পড়ে যাবে যে তাতে বিশেষ কিছু থাকবে না। Hunter Bay তামার খনির নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন এডমন্টন ১৪০০ মাইল দূরে, এক টন তামা রেলে তুলতে ৪০০ ডলার খরচ পড়ে—সব দিক বিবেচনা করে গিলবার্ট কাইন দেখলেন যে Great Bear Lake-এর ধারে তামার যত পাহাড়ই থাকুক না কেন—ব্যবসা হিসেবে তা একেবারে অচল। ঠিক সেই সময়ে একটা ব্যাপার ঘটল। অদ্ভুত ব্যাপার—মানুষের ভাগ্যে তা সচরাচর ঘটে না।

তখন আগস্ট মাসের শেষ—মেরু প্রদেশের শীত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে—দিন ক্রমশ ছোটো হয়ে পড়ছে। বাতাস অসহ্য হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। শীতকাল আসবার বেশি দেরি নেই বুঝে গিলবার্ট কাইন তাঁবু তুলে ফেলে এরোপ্লেনে সভ্য জগতের দিকে রওনা হলেন।

এরোপ্লেন থেকে সে বছরের মতো শেষবার Great Bear Lake দেখবার জন্য নীচের দিকে চেয়ে গিলবার্ট কাইন অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর নীচে হ্রদের উভয় তীরের পর্বতশ্রেণি বিস্তৃত—কিন্তু ওপর থেকে তাদের চেহারা দেখাচ্চে অদ্ভুত—পর্বতমালা রং নানা ধরনের, এ যেন রঙের হোলিখেলা—সোনালি, হলদে, সবুজ, ফিকে সোনালি—চারধারে রঙের ছড়াছড়ি। প্রকৃতি লক্ষ বছর ধরে রঙিন হরফে বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছে যে তার ভাণ্ডারে এইসব মূল্যবান জিনিস সঞ্চিত হয়ে আছে, যে পার নিয়ে নাও—কিন্তু এতকাল যে বিজ্ঞাপন কারুর নজরে পড়েনি, আজ পড়ল গিলবার্টের নজরে। গিলবার্ট অভিজ্ঞ খনিজতত্ত্ববিদ্, তাঁর বুঝতে দেরি হল না যে এসব রঙের অর্থ এই যে শৈলমালা বিবিধ ধাতুর আকর, ধাতুর রেণুসকল বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে oxidised হয়ে ওইসব রঙের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু সে বছর আর সময় ছিল না। পরের বছর মার্চ মাসে গিলবার্ট কাইন আবার ফিরে এলেন এবং পায়ে হেঁটে হ্রদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে আকরের সন্ধান করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন—তুষারাবৃত শুভ্র ভূমিতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে অস্বাভাবিক ভাবে ঝকঝক করছিল, অনবরত সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর সাথি অন্ধ (Snow blind) হয়ে গেলেন, তবুও তাঁরা অনুসন্ধান করা থেকে বিরত না হয়ে অনবরত চলতে লাগলেন। Echo Bay-র তীরে একটা ছোটো পাহাড়ের গায়ে তাঁরা দেখলেন ন-ইঞ্চি চওড়া সবুজ ও কালো রঙের একটা ধাতুর পাড় বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে—এ পাথর থেকে ও পাথরে ওঠানামা করে যেতে যেতে পাড়টা শেষে হ্রদের জলের তলায় ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। গিলবার্ট নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না, সেটা যে পিচব্লেন্ড তা বুঝেও তাঁর পুরোপুরি বিশ্বাস করতে সাহস হল না। পিচব্লেন্ড থেকে জগতের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধাতু রেডিয়াম পাওয়া যায়—শুধু মূল্যবান নয়, সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্যও বটে।

গিলবার্টের আবিষ্কৃত খনি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রেডিয়াম ভাণ্ডার। ন-ইঞ্চি চওড়া দুটো পিচব্লেন্ডের পাড় থেকে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়াম পাওয়া যাচ্চে যার প্রতি গ্রামের দাম পঞ্চাশ হাজার ডলার থেকে পঁচাশি হাজার ডলার। কানাডা গবর্নমেন্টের খনি বিভাগের কর্মচারী হিউ স্পেন্স পরীক্ষা করে দেখেছেন যে Great Bear Lake-এর খনির এক টন পিচব্লেন্ড থেকে দেড়শত মিলিগ্রাম রেডিয়াম পাওয়া যেতে পারে। এতদিন পর্যন্ত রেডিয়াম ছিল বেলজিয়ামের একচেটে—বেলজিয়াম কঙ্গো ছাড়া আর কোথাও এতদিন রেডিয়াম পাওয়া যেত না, তাই রেডিয়ামের দামও ছিল অত্যন্ত বেশি, উত্তর কানাডায় এই আবিষ্কারের ফলে বোধ হয় রেডিয়ামের দাম কমবে।

শুধু তাই নয়, কানাডা গবর্নমেন্ট এখন এ অঞ্চলে রেলপথ খুলবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন—নিয়মিতভাবে এরোপ্লেন চালাবার জন্য কোম্পানি গঠিত হচ্ছে, কালে এই দুর্গম ভূভাগে মানুষের যাতায়াত সহজ হয়ে উঠবে আশা করা যায়।